রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা

ড: জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা

RABINDRANATHER TRAGEDY CHETANA

(Criticism)

by : Dr. Jiban Kumar Mukhopadhyay

Price : Rupees Twenty five only

ট্র্যাজেডি-চেতনা

ডঃ জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়
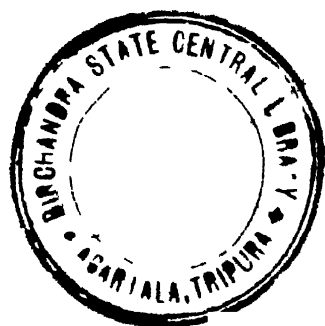
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড

সাহিত্যশ্রী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
হইতে শ্রীতপনকুমার ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম প্রকাশ :
জন্মাষ্টমী, ১৩৭০

মূল্য : পঁচিশ টাকা মাত্র

তাপসী প্রিন্টার্স, শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ ও লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস,
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলিকাতা-৬
হইতে মুদ্রিত।

পিতামাতার প্রতি ভক্তিপূর্ণ অঞ্জলি

"জীবনের ট্র্যাজেডি এইখানেই। সে ছোট হয়ে হৃদয়ের এক তলায় লুকিয়ে থাকে, তার পরে বড়োকে এক মুহূর্তে কাত করে দেয়। মানুষ আপনাকে যা বলে জানে, মানুষ তা নয়, সেই জন্যেই এত অঘটন ঘটে।"

—রবীন্দ্রনাথ : 'ঘরে বাইরে'

॥ নিবেদন ॥

বাংলা সাহিত্যে তত্ত্বনিষ্ঠ ব্যাখ্যামূলক গবেষণা প্রায় হয়ই না,—এমন অনুযোগ পূজ্যপাদ আচার্য এবং শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে প্রায়ই শুনে থাকি। এই অনুযোগটা মনে ছিল গবেষণার বিষয়টি গ্রহণ করবার সময়। সুতরাং এই আলোচনা একটি নতুন প্রচেষ্টা এবং কর্তব্যপরায়ণ উদ্যমশীলতা এর প্রেরণা।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এই প্রচেষ্টায় লিপ্ত হবার পথে বাধা অনেক, তার মধ্যে প্রধানতম আমাদের সংস্কার : 'ট্র্যাজেডি' কথাটা নাকি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুক্ত করা যায় না। কাজেই যুক্তি-তথ্য-তত্ত্বের পাথেয় নিয়ে খুব সতর্কভাবেই এগোতে হয়েছে এই আলোচনার প্রতি পদে। নতুন মনে হলেও সিদ্ধান্ত এখানে সর্বত্রই যুক্তি-তথ্য-তত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

আলোচনার সম্ভাবনা সম্পর্কে কোনো প্রত্যয় না থাকলে যেমন আলোচনার উপসংহার করা যায় না, তেমনি কি লিখছি এবং কেন লিখছি,—তাও স্পষ্ট থাকে না। এই আলোচনার ক্ষেত্রে কোন্ ভিত্তিতে এবং কিভাবে সেই প্রত্যয় গড়ে উঠল, তা বুঝিয়ে বলা হয়েছে এই গ্রন্থের 'পূর্ব প্রসঙ্গ'-অংশে। বস্তুত এই অংশেই সমগ্র আলোচনার খসড়াটি প্রাপ্য।

কেবল তথ্য-প্রমাণের জন্যই রবীন্দ্ররচনা থেকে ব্যাপকভাবে উদ্ধৃতি এখানে গ্রহণ করতে হয়েছে। ব্যাখ্যা যে মনগড়া নয়, তা বোঝানোর জন্য উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কথাই অনেকক্ষেত্রে তুলে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যেও ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতা আশ্রিত।

গবেষণা কার্যের রীতি এবং পদ্ধতিতে গ্রন্থটি লিখিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-পাঠিকার কাছে গবেষণা-গ্রন্থকে সুখপাঠ্য করার প্রয়োজনও ছিল, কাজেই মনে রাখতে হয়েছিল, যাতে প্রয়োজনীয় বিষয়টিকে খুঁজে নিতে তাঁদের হয়রাণ হতে না হয়।

মূল গবেষণা কার্যটি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পি. এইচ. ডি. উপাধির জন্য অনুমোদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান, রবীন্দ্রঅধ্যাপক ডঃ শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য, কলিকাতা ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি সাহিত্য বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ডঃ শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য এবং গবেষণা-নির্দেশক হিসেবে রবীন্দ্রভারতী

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য এই গবেষণা নিবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন। তাঁদের সপ্রশংস অনুমোদন আশীর্বাদ স্বরূপ। ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের সযত্ন তত্ত্বাবধানেই এর অনেক দোষত্রুটি সংশোধিত হয়েছে।

গবেষণার বিষয়টি অগ্রজ-প্রতিম শুভানুধ্যায়ী ডঃ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মৈত্র-র দেওয়া। তিনিই এ কাজে আমাকে সর্বপ্রথম উৎসাহিত করেন। তাঁর 'বাংলা কবিতার নবজন্ম' গ্রন্থ থেকেও নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি। গবেষণার বিস্তৃত পরিকল্পনা এবং আলোচনাধারা ৺ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের কড়া শাসনে এবং স্নেহচ্ছায়ায় পরিচালিত হয়েছিল। তাঁর সাহস এবং [illegible] দৃঢ়তা কখনোই আমাকে পিছু হটতে দেয়নি। গ্রন্থের সর্বত্র তাঁর সেই অমূল্য অবদান মিশ্রিত রয়েছে। গ্রন্থপ্রকাশের প্রাক্‌কালে তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই।

ডঃ শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী, ডঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ মিত্র এবং ডঃ শ্রীযুক্ত অজিতকুমার ঘোষ-এর কাছে মৌখিক আলোচনার সুযোগ পেয়েছি। এঁরা সকলেই আমার আচার্য এবং প্রণম্য। ডঃ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার দাশ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল ভৌমিক, সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত [illegible] এবং [illegible] অধ্যাপক শ্রীযুক্ত [illegible] মজুমদার-এর কাছেও নানা বিষয়ে আমি উপকৃত ও কৃতজ্ঞ।

গবেষণা নিবন্ধটি উপাধির জন্য গৃহীত হবার পর থেকেই শ্রদ্ধেয় আচার্য ডঃ শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য এটিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার ব্যাপারে যে আগ্রহ প্রকাশ করে আসছেন, তা আমার চিরকালের অনুপ্রেরণা। এ ব্যাপারে অগ্রজের পরামর্শ ও উৎসাহ পেয়েছি ডঃ শ্রীযুক্ত অরুণকুমার বসুর কাছ থেকেও। কাব্যশ্রী শ্রীযুক্ত গুরুপদ বন্দ্যোপাধ্যায় অপরিসীম যত্নের সঙ্গে এই গ্রন্থের প্রুফ দেখে দিয়ে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

'সাহিত্যশ্রী' অত্যন্ত যত্ন নিয়েই অতি দ্রুত গ্রন্থটিকে প্রকাশ করেছেন। দুর্মূল্যের দিনেও প্রয়োজনীয় অর্থব্যয় করতে তাঁরা কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নি। তাঁদের পরিকল্পনা অভিনন্দনযোগ্য। এখন রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসু পাঠক-পাঠিকার কাছে গ্রন্থটি গৃহীত হলেই সবকিছুর সার্থকতা।

বিনীত—

জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়

৪/৫৫, জহুরা বাজার লেন,
কলিকাতা-৪২

বিস্তারিত বিষয়সূচী

(বিষয়ের পরে অক্ষরসহ অঙ্কগুলি গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দেশক)

পূর্বপ্রসঙ্গ : আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা

প্রসঙ্গ ক : প্রাক্-রবীন্দ্র পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডি-চেতনার ইতিবৃত্ত

প্রসঙ্গ খ : প্রাক্-রবীন্দ্র বাংলা সাহিত্যে ট্র্যাজেডি-চেতনার ইতিবৃত্ত

প্রসঙ্গ গ : রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার প্রারম্ভ : বিষণ্ণ কল্পনার কাল

প্রসঙ্গ ঘ : রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা : উপন্যাসে

প্রসঙ্গ ঙ : রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা : ছোটগল্পে

প্রসঙ্গ চ : রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা : নাটকে

নাট্যকাব্যে :

তত্ত্বনাট্যে :

পূর্ব প্রসঙ্গ

আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা ॥

মানুষের জীবনকে নিয়ে মানুষ প্রথম যখন সাহিত্য রচনা সুরু করেছিল, তখন স্পষ্টতঃই মানুষের চোখে ধরা পড়েছিল, একটি মানুষের জীবনের সাফল্যের দিক, আর একটি মানুষের জীবনের ব্যর্থতার দিক। পাশ্চাত্যের প্রাচীনতম মহাকবি হোমারের চোখেও মানুষের জীবনের এই দুটি দিক ধরা পড়েছিল। তাই তিনি যে দু'খানি মহাকাব্য রচনা করলেন, তার একটিতে ফুটে উঠল জীবনের সাফল্যের দিক, আর একটিতে ফুটে উঠল জীবনের ব্যর্থতার দিক। সাফল্যের দিকটি নিয়ে রচিত হ'ল 'অডিসি' আর ব্যর্থতার দিকটি নিয়ে রচিত হ'ল 'ইলিয়াড'। এইভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্য প্রচেষ্টার সূচনা থেকেই 'অডিসি' এবং 'ইলিয়াড' মানুষের জীবনের ঐ দুটি দিককে চিত্রিত করবার দুটি পন্থাকে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে, যা কালক্রমে 'কমেডি' এবং 'ট্র্যাজেডি' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। স্পেনের নাট্য সমালোচক এবং নাট্যকার লোপ্ ডি ভেগা (১৫৬২—১৬৩৫) হোমারের 'অডিসি'কে একখানি 'কমেডি' এবং 'ইলিয়াড'কে একখানি 'ট্র্যাজেডি'র উদাহরণ হিসেবে মনে করতেন।[১] মানুষের জীবনের সাফল্যকে নিয়ে রচিত কাব্য এবং ব্যর্থতাকে নিয়ে রচিত কাব্য যখন যথাক্রমে 'কমেডি' এবং 'ট্র্যাজেডি'র অভিধা লাভ করেনি, তখন থেকেই এইভাবে মানুষের জীবনের এই দুটি দিক কবিদের হাতে চিত্রিত হয়ে আসছে। গ্রীক ট্র্যাজেডির প্রাচীনতম কবি ঈস্কাইলাসও এই ভাবে হোমারের কাব্য থেকে প্রেরণা লাভ করেই মানুষের জীবনের ব্যর্থতার দিকগুলিকে তাঁর কাব্যে চিত্রিত করেছেন।[২]

বস্তুত: প্রচলিত অর্থে আমরা ট্র্যাজেডি বলতে যা বুঝি, তার প্রাথমিক নিদর্শন হোমারের কাব্যেই পাওয়া যায়। এই জন্যই প্রসিদ্ধ সমালোচক জর্জ স্টাইনার বলেছেন, তিনহাজার বছরের সাহিত্য চর্চার মধ্যদিয়ে পাশ্চাত্যে

---

১. European Theories of Drama : B H. clark (1947), p. 90.

২. Greek Drama for Everyman : F. L. Lucas (1954), Introduction p. 8.

ট্র্যাজিক জীবনবোধ বলতে যা গড়ে উঠেছে, তার উৎস মোটামুটি ভাবে 'ইলিয়াড'।৩

হোমারের 'ইলিয়াড'. কাব্যে মানুষের জীবনের ব্যর্থতার দিককে যে ভাবে দেখানো হয়েছে, তারই অনুসরণ করেছেন ঈস্কাইলাস এবং অন্যান্য গ্রীক কবি। তাঁদের এইসব কাব্যকেই পরবর্তীকালে নাম দেওয়া হয়েছে 'ট্র্যাজেডি'। ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা ও স্বরূপ স্থিরীকৃত হয়ে যাবার পর গ্রীক কবিদের ঐ সব কাব্য রচিত হয়নি, পরন্তু হোমার সহ গ্রীক কবিদের ঐ সব কাব্য মানুষের জীবনের ব্যর্থতাকে যেভাবে রূপায়িত করা হয়েছে, তার নিরিখেই পরবর্তীকালে ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা ও স্বরূপ স্থিরীকৃত হয়েছে। সুতরাং ট্র্যাজেডির স্বরূপধর্ম ট্র্যাজেডির কোনো সংজ্ঞার মধ্যে নেই, আছে মানুষের জীবনের ব্যর্থতাকে রূপায়িত করতে বিভিন্ন কবির যে চেতনা ও কৌশল, তার মধ্যে। ঈস্কাইলাস, সফোক্লেস এবং ইউরিপিডিসের এই চেতনা ও কৌশলকে লক্ষ্য করে এ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে একটি তত্ত্ব প্রদান করে গেছেন। এই তত্ত্বের মধ্যে এ্যারিস্টটল যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন গ্রীক ট্র্যাজেডির প্রকৃত রসের পরিচয় দিতে এবং একটি পথ বেঁধে দিতে যাতে সেই পথ অনুসরণ ক'রে ইস্কাইলাস, সফোক্লেস এবং ইউরিপিডিসের মতো অন্যদের পক্ষেও অনুরূপ ট্র্যাজেডিরস সৃজন করা সম্ভব হয়।

কিন্তু গ্রীক কবিরা নিজেদের বিশিষ্ট জীবন-দৃষ্টির জন্য জীবনের ব্যর্থতাকে যেভাবে দেখেছেন, এবং ট্র্যাজেডিকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন, অন্যদেশের

---

৩. The Iliad is the primer of Tragic art. In it are set forth the motifs and images around which the sense of the tragic has crystallized during the nearly three thousand years of Western poetry: the shortness of heroic life, the exposure of man to the murderousness and caprice of the inhuman, the fall of the city. Note the crucial distinction: The fall of Jerico or Jerusalem is merely just, where-as the fall of Troy is the first great metaphor of tragedy. Where a city is destroyed because it has defiled God, its destruction is a passing instant in the national design of God's purpose. Its walls shall rise again, on earth or in the kingdom of heaven, when the souls of men are restored to grave. The burning of Troy is final because it is brought about by the fierce sport of human hatreds and the wanton, mysterious choice destiny.

—George Steiner: The Death of Tragedy, 1961, p. 5.

ও অন্তকালের কবিদের পক্ষে কেবলমাত্র ভিন্ন-জীবন দৃষ্টির জন্যই, এ্যারিস্টটলের তত্ত্বের সাহায্য নিয়েও, অনুরূপভাবে ট্র্যাজেডিকে চিত্রিত করা সম্ভব নয়। এইজন্যই অন্ধভাবে এ্যারিস্টটলকে অনুসরণ করতে গিয়ে অনেকেই ব্যর্থ হয়েছেন,—ট্র্যাজেডি বলতে কেবল ভয়াবহ এবং বীভৎস ঘটনারই অবতারণা করেছেন, সেনেকা যাঁদের অন্যতম।

প্রকৃতপক্ষে ট্র্যাজেডি সম্পর্কিত ধারণা দেশে-কালে পরিবর্তিত হওয়ারই কথা। এইজন্যই চতুর্দশ শতাব্দীর শেষদিকে ইংলণ্ডে চসার ট্র্যাজেডি সম্পর্কে ভিন্নতর ধারণার পরিচয় দিয়েছেন। সমকালীন রাষ্ট্রনৈতিক এবং নৃপতিবর্গের ভাগ্যবিপর্যয়ের আকস্মিকতার পরিপ্রেক্ষিতে চসার তাঁর 'Monk's Tale'-এর গোড়ার কথায় যা বলেছেন, তার সার কথা হচ্ছে, "A tragedy is a narrative recounting the life of some ancient or eminent personage who suffered a decline of fortune toward a disastrous end.[8] আবার শেক্সপীয়রের যুগে ট্র্যাজেডি সম্পর্কে এই মধ্যযুগীয় ধারণা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হ'ল এবং পরিবর্তে এক নতুন ধারণা গড়ে উঠল এবং সেই ধারণা অনুসারে ট্র্যাজেডি রচিত হতে থাকল যার নাম হ'ল রোমান্টিক ট্র্যাজেডি। গ্রীক নাট্যকারেরা যেখানে ভাগ্যকেই জীবনের নিয়ন্তা মনে করতেন, সেখানে শেক্সপীয়র এবং রোমান্টিক যুগের কবিরা মনে করলেন মানুষের চরিত্রই মানুষের নিয়ন্তা।[৫] ট্র্যাজেডির ধারণা সম্পর্কে এতবড় পরিবর্তন ভিন্ন দেশ কালের জন্যই সম্ভব হয়। এইভাবে এ্যারিস্টটল থেকে সুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপেই দেশ-কালের পার্থক্য অনুসারে ট্র্যাজেডি সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের পরিচয় আমরা দিয়েছি আমাদের আলোচনার প্রথম পরিচ্ছেদে। এর মধ্যে আমরা একটা বিষয়কেই বরাবর বুঝবার চেষ্টা করেছি যে, জীবনের ব্যর্থতার দিকটিই সর্বদা ট্র্যাজেডির বিষয় কিনা, এবং তার বিবরণ আমাদের কাছে কোন রসের স্বাদ মুখ্যতঃ বহন করে,—শোচনা ও ভয়ের একসঙ্গে না কেবল শোচনা অথবা কেবল ভয়ের?

---

৪. Steiner. The Death of Tragedy, (1961) p. 11.

৫. প্রকৃতপক্ষে অবশ্য গ্রীক ট্র্যাজেডিতে যেমন চরিত্রের ভূমিকা আছে, তেমনি শেক্সপীয়রীয় রোমান্টিক ট্র্যাজেডিতে নিয়তির ভূমিকাও আছে, যদিও গ্রীক নাটকে নিয়তির এবং রোমান্টিক নাটকে চরিত্রের ভূমিকা মুখ্য।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পারিভাষিক দিক থেকে 'ট্র্যাজেডি' কথাটি প্রচলিত হওয়ার পূর্ব থেকেই ট্র্যাজেডি বলতে আমরা যা বুঝি তার পরিচয় সাহিত্যে পাওয়া গেছে, এবং হোমারই এর সূত্রপাত করেন। হোমার তাঁর ইলিয়াড কাব্যে মানুষের জীবনের ব্যর্থতার দিককে চিত্রিত করেছেন প্রথমতঃ, এবং তাঁর অনুসরণ করেছেন ঈস্কাইলাস প্রমুখ গ্রীক কবি। জীবনের দুঃখের বা ব্যর্থতার দিক সম্বলিত গ্রীককবিদের এই সব কাব্য (নাটক) সমসাময়িক কালে অবশ্য 'ট্র্যাজেডি' বা 'ট্র্যাজয়ডিয়া' নামেই পরিচিত হয়, কিন্তু তার কারণ অন্য। ট্র্যাজেডি বলতে তখন কোনো ব্যর্থ জীবন-কাহিনী বোঝাত না, পরন্তু যে কোনো কাহিনীই বোঝাত। অবশ্য সেই কাহিনীকে গম্ভীর ভাবাত্মক হতে হ'ত।

গ্রীসে ডিওনিসাস (Dionysus) দেবতার উৎসবে এই সব গম্ভীর ভাবাত্মক কাহিনী গান ক'রে উপস্থাপিত করা হ'ত এবং সেই উপলক্ষেই এই সব কাহিনী 'ট্র্যাজয়ডিয়া' নামে (যার আভিধানিক অর্থ ছাগগীতি) পরিচিত হয়। গ্রীক 'ট্র্যাজস্' কথাটির অর্থ 'ছাগ' এবং 'অয়ডস্' (oidos) কথাটির অর্থ গায়ক। যারা এই সব কাহিনীর পালা-গান করত তারা অনেকসময় ছাগচর্মাবৃত হ'ত, বা ছাগবেশ ধারণ করত।[৬] হয়ত এইজন্যই তাদের বলা হত 'ট্র্যাজয়ডস্' (tragoidos) এবং তাদের গানকে বলা হত 'ট্র্যাজয়ডিয়া' (tragoidia) যা কালক্রমে ট্র্যাজেডি নামে পরিচিত হয়েছে। 'ডিওনিসাস' দেবতার উৎসবে এই সব গম্ভীর ভাবাত্মক কাহিনীর অভিনয়ের প্রতিযোগিতা হ'ত এবং কালক্রমে সেই প্রতিযোগিতায় ঈস্কাইলাসের মতো কবিরাও অংশ গ্রহণ করতেন। এই একই উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 'কমেডির' ও আবির্ভাব হয়েছে। ডিওনিসাস উপাসনার ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠান থেকে ট্র্যাজেডির এবং আনন্দোন্মত্ত ফ্যালিক (phallic) শোভাযাত্রাদি থেকে কমেডির জন্ম। আবার ট্র্যাজেডির মতোই কমেডি কথাটির অন্তরালে 'comos' কথাটির অবস্থিতিও গবেষকেরা মনে করেছেন।

সুতরাং গম্ভীর ভাবাত্মক কাহিনীর 'ট্র্যাজেডি' অভিধা লাভ করা একটা

---

৬. "The exact meaning of 'tragoidia' is disputed. The name may have arisen because the Chorus were originally dressed in goat skin, or dressed like goats; or because a goat was sacrificed, or because a goat was once the prize."—F. L. Lucas. Greek Drama for Everyman (1954) p. 6.

ঘটনামাত্র। জীবনের ব্যর্থতার বা বেদনার ভাব, যা ট্র্যাজেডির মধ্যে থাকে, তাকে দ্যোতিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে 'ট্র্যাজয়ডিয়া' বা "ট্র্যাজেডি" অভিধা গ্রহণ করা হয়নি। এইজন্যই মধ্যযুগ পর্যন্তও 'বিয়োগান্ত ট্র্যাজেডি' ও 'মিলনান্ত ট্র্যাজেডি'—এই দুই প্রকার ট্র্যাজেডির উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন সমালোচক। ইতালীর কস্তেলভেত্রো (১৫০৫-৭১) রেনেসাঁসের যুগেও মিলনান্ত ট্র্যাজেডির কথা বলেছেন, যদিও রেনেসাঁসের যুগে ট্র্যাজেডিকে বিয়োগান্ত করে তোলার দিকেই সাধারণ প্রবণতা ছিল। এফ. এল. লুকাসের গ্রন্থ থেকে জানতে পারি যে 'ট্র্যাজয়ডিয়ার' মধ্যে দুঃখ-যন্ত্রণার দৃশ্য থাকলেও দুঃখ-যন্ত্রণার কোনো দৃশ্যে বা বিয়োগ ব্যথার মধ্যে 'ট্র্যাজয়ডিয়া'কে পরিসমাপ্ত করার কোনো বাধ্য বাধকতা গ্রীকদের পক্ষেও ছিল না।[৭]

সুতরাং ট্র্যাজেডি বলতে আমরা বর্তমানে যা বুঝি, ট্র্যাজেডির অভ্যুদয়ের যুগে সকলে ঠিক তা-ই বুঝতেন না। কিন্তু কালক্রমে গ্রীসে যে সমস্ত 'ট্র্যাজয়ডিয়া' জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, সেগুলিতে গম্ভীর ভাবের সঙ্গে একটা দুঃখের ভাবও মিশ্রিত ছিল। এই দুঃখের ভাবের মিশ্রণের জন্যই ঈস্‌কাইলাস, সাফোক্লিস, ইউরিপিডিস প্রমুখের 'ট্র্যাজয়ডিয়া' বিখ্যাত হয়ে ওঠে, এবং আদর্শ 'ট্র্যাজয়ডিয়া' হিসেবে বিবেচিত হয়। এঁদের নাটকগুলিকে সামনে রেখে এ্যারিস্টটল তাঁর ট্র্যাজেডিতত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন বলেই তিনি ট্র্যাজেডিতে শোকভাব (pity)-এর অবস্থিতি সম্পর্কে এতটা গুরুত্ব দিয়েছেন। এইভাবে ট্র্যাজেডির অর্থ আর 'ছাগ-গীতি' থাকল না, ট্র্যাজেডির অর্থ দাঁড়াল বেদনা ভারাক্রান্ত কাহিনী। ইউরোপে রেনেসাঁসের যুগ থেকেই মোটামুটিভাবে ট্র্যাজেডির এই অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে, এবং আধুনিক যুগে এই অর্থকে গ্রহণ করা হয়েছে পাকাপাকিভাবে।

এইভাবে আমরা দেখি ট্র্যাজেডি সম্পর্কিত ধারণার একটা বিবর্তমানতা আছে, কোনো একটি সময়ে, একটি দেশে, একজনের হাতে 'ট্র্যাজেডি' কোনো চূড়ান্ত স্বরূপ লাভ করেনি। বিভিন্নকালের এবং বিভিন্ন দেশের মানুষের জীবন-দৃষ্টি অনুসারে এর স্বরূপের পরিবর্তন ঘটছে। সুতরাং কোনো একটি সূত্রের বাঁধনে 'ট্র্যাজেডি'কে বাঁধা যায় না,—কোনো একটি মাত্র নীতির নিরিখে ট্র্যাজেডির রূপ পর্যালোচনা করা যায় না। ঠিক এই কথাটিই বলেছেন

---

৭. F. L. Lucas: Tragedy, (1957), p. 24 (ch. II).

একজন মার্কিন সমালোচক, যাঁর মূল কথা হচ্ছে ট্র্যাজেডি নির্ভর করে কবির মনোভাব, জীবনানুভূতি এবং বর্ণনার ভঙ্গি বা সুরের উপর,—ট্র্যাজেডির মধ্যে একটি বিশিষ্ট জীবনবোধ থাকে, কিন্তু বিশিষ্ট কোনো নিয়ম থাকে না।[৮]

সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, কবি তাঁর নিজের এক বিশিষ্ট জীবনবোধ অনুসারে ট্র্যাজেডি রচনা করেন, তাঁর পক্ষে কোনো প্রতিষ্ঠিত সূত্র বা নীতিকে মেনে চলবার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কারণ ট্র্যাজেডি নির্ভর করে কবির বর্ণিতব্য বিষয় এবং কবির উদ্দেশ্যের উপর, কোনো প্রচলিত আঙ্গিকের উপর নয়।[৯]

এই ট্র্যাজিক জীবনবোধ (tragic sense of life) পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো কালের কবির মধ্যেই থাকতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এবং দুঃখের বিষয়, প্রাচীন ভারতীয় কবিরা তাঁদের বিপুল সংস্কৃত সাহিত্যে এই ট্র্যাজিক জীবনবোধের পরিচয় রাখেন নি। যদিও রামায়ণ-মহাভারতে[১০] জীবনের ট্র্যাজেডির দিকটাই শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য লাভ করেছে, তথাপি মহাকাব্যের এই আদর্শ পরবর্তী সংস্কৃত কবিদের দ্বারা অনুসৃত হয়নি। ঈস্কাইলাস ইলিয়াড থেকে প্রেরণা লাভ করেছিলেন, কিন্তু ভারতীয় কবি রামায়ণ-মহাভারতের প্রেরণা লাভ করলেন না। আসলে জীবন সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীকদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যতটা বস্তু-তান্ত্রিক, প্রাচীন ভারতীয়দের তা ছিল না। তাই রামায়ণ মহাভারতের দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতীয় কবির ট্র্যাজিক জীবনচেতনা প্রকাশ পায়নি। এ সম্পর্কে পূর্বোক্ত মার্কিন

---

৮. The vision of Tragedy is hardly reducible to easy formulas, and to show how it reveals itself in literature is to risk travesty. It has much to do with mood, feeling, tone—it has a sense of life, not a doctrine.

—Richard B. Sewall : The Vision of Tragedy (Yale, 1960), Preface p. VII

৯. What is tragedy? In a historical view, the clue to its essence is not form but content and purpose. Ultimately, it is the tragic spirit, the tragic sense of life.

--Herbert J. Muller : The Spirit of Tragedy (New York, 1956), Ch. I p. 14.

১০. 'মহাভারত' শান্তরসাশ্রিত হলেও রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় মহাভারত ট্র্যাজেডি দ্রঃ অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৬২, পৃ. ৭৬

সমালোচকের মন্তব্য কঠিন হলেও সঠিক। তাঁর মতে বস্তুতান্ত্রিক জীবন-চেতনার অভাবই সংস্কৃত-সাহিত্যে ট্র্যাজেডি রচিত না হওয়ার কারণ।[১১]

কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে যে, যে বিশেষ মায়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সংস্কৃত সাহিত্যে ট্র্যাজেডি রচিত হয়নি, সেই দৃষ্টিভঙ্গি কেবল সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মধ্যযুগের ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যে এই দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই পরিত্যক্ত হয়েছে, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তো বটেই। বাংলা মঙ্গলকাব্য সাহিত্যে এবং গীতিকা সাহিত্যে বাঙ্গালীর ট্র্যাজিক জীবন চেতনার পরিচয় খুব স্পষ্ট ভাবেই পাওয়া যায়। জীবনের দুঃখ-বেদনা-যন্ত্রণার প্রতি মধ্যযুগের বাঙ্গালী কবি অন্ততঃ উদাসীন হতে পারেন নি। অবশ্য এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, মধ্যযুগে বাঙ্গালীর জীবন সচেতনা এবং বস্তু-সচেতনা খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল, যদিও বিক্ষিপ্তভাবে এখানে ওখানে তার নিদর্শন কিছু আছে, যেমন চণ্ডী-মঙ্গলের ফুল্লরার চরিত্রে এবং মনসা মঙ্গলের বেহুলার চরিত্রে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের ঈশ্বরী পাটনী যে অন্নপূর্ণার কাছে সামান্য আধিভৌতিক প্রার্থনা ('আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে') জানিয়েছে, তাতেও ঈশ্বরী পাটনীর বস্তু-সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। গীতিকা সাহিত্যেও মহুয়া, মলুয়া, লীলা প্রভৃতির চরিত্রে প্রবল জীবন-সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এর মধ্যে একমাত্র বেহুলাকে বাদ দিলে আর সবক'টি চরিত্রই সমাজের অশিক্ষিত এবং অন্ত্যজ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এরা নিজেদের সহজ দৃষ্টিতে জীবনকে যে ভাবে দেখে, তারই পরিচয় তাদের চরিত্রে বিধৃত হয়েছে। যে

---

১১. "Ancient India, which produced an elaborate drama, affords a different perspective. Here tragedy was a taboo. The wise and holy men of India were generally agreed that the temporal, material sensory world--what most Westerners call the "real" reality was a timeless, spiritual reality, the world soul; the real business of man was to unite his soul with the world-soul; and the logical means to this mystical union was complete indifference to the temporal world, ideally a complete unconsciousness of it and of the self. Hence tragedy would naturally be regarded as a petty distraction, and any serious concern with it is folly."

—H. J. Muller: The Spirit of Tragedy, 1956, Ch. VII: Some contrasts with the ancient East. Pp. 327-328.

এই প্রসঙ্গেই উক্ত গ্রন্থে পাদটীকায় লেখক একথাও বলেছেন যে. "Under Western influence Indians might have a lovelier sense of tragedy." ঐ পৃ. ৩২৮

প্রবল বস্তুতান্ত্রিকতার পরিপ্রেক্ষিতে জীবন-সচেতনতা গড়ে ওঠে, তারজন্য একটা তাত্ত্বিক বা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার। বস্তু সচেতনতা এবং জীবন-সচেতনা সম্পর্কে এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ছিল সমগ্র মধ্যযুগে। শিক্ষিত এবং শিক্ষা-প্রভাবিত সমাজে তখন শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত দেববাদ-নির্ভর মানবতাবাদের প্রচলনই ছিল বেশী।

দার্শনিক বস্তুতান্ত্রিকতা বাঙ্গালী লাভ করেছে উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য প্রভাবের মাধ্যমে। পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং দর্শন বাঙ্গালীকে বস্তুমুখী এবং জীবনমুখী করে তুলল, এবং বাঙ্গালীও জীবনের লাভ-লোকসান, প্রত্যাশা-হতাশা, সাফল্য-ব্যর্থতা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের ট্র্যাজেডি-সাহিত্যের সঙ্গেও পরিচিত হল বাঙ্গালী, শেক্সপীয়রের নাটক হ'ল তাদের নিত্যসঙ্গী, অভিনয়ের উপকরণ। এইভাবে পাশ্চাত্যে যে ট্র্যাজেডির উদ্ভব, তা বাঙ্গালীর চিত্তকেও আলোড়িত করল, এবং সংস্কৃত সাহিত্যে যে ট্র্যাজেডি-চেতনা ছিল নিষিদ্ধ, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে ট্র্যাজেডি-চেতনা ছিল অস্পষ্ট এবং প্রকাশ-কুণ্ঠিত, সেই ট্র্যাজেডি-চেতনা বাঙ্গালীর মধ্যে স্পষ্টভাবে দেখা গেল। চকমকি পাথরের আগুনের মতো পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডির ঘা-য়ে বাঙ্গালীর ট্র্যাজেডি-চেতনা আত্ম-প্রকাশ করল। বাঙ্গালীর এই ট্র্যাজেডি-চেতনা গ্রীক ট্র্যাজেডি-চেতনা থেকে যেমন পৃথক, তেমনি শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি-চেতনা থেকেও পৃথক। এই পার্থক্য যে থাকতে বাধ্য সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন মধুসূদন। শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি-চেতনা যেমন গ্রীক ট্র্যাজেডি-চেতনার সঙ্গে মিল রেখে গড়ে ওঠে নি, তেমনি বাঙ্গালীর ট্র্যাজেডি-চেতনাও শেক্সপীয়রীয়-ট্র্যাজেডি-চেতনার সঙ্গে মিল রেখে গড়ে ওঠে নি, বরং দেশ-কালের বিভিন্নতার অবকাশ নিয়ে শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি-চেতনার প্রভাবেই বাঙ্গালীর ট্র্যাজেডি-চেতনা পৃথকভাবে গড়ে উঠেছে।

বাঙ্গালীর ট্র্যাজেডি-চেতনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা গড়ে উঠেছিল। পাশ্চাত্য-ট্র্যাজেডির মধ্যে যে একটা অনিষ্ট বা অমঙ্গলের অস্তিত্ব আছে, সত্য-সুন্দর-মঙ্গলের উপাসক রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ভাবনায় সেই রকমের কোনো অনিষ্ট বা অমঙ্গলের স্থান না পাবারই কথা। পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডির আদর্শকে স্মরণে রেখে সেইজন্যে আমরা রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার কথা সাধারণতঃ ভাবতে পারি না। কিন্তু আমরা এই আলোচনায়

গোড়াতেই দেখেছি যে 'ট্র্যাজেডি' একটা বিশিষ্ট জীবন-চেতনার নামমাত্র। গ্রীক ডিওনিসাস দেবতার উৎসবে এই জীবনচেতনা-বিশিষ্ট রচনাগুলি কেবল 'ট্র্যাজেডি' নামে পরিচিত হয়েছিল। এর কোনো অমোঘ রূপ ও রীতি নেই। জীবনের ব্যর্থতার দিক সম্পর্কে কবির যে সচেতনতা, তারই পরিচয় আমরা পাই হোমার থেকে সুরু করে গ্রীক নাট্যকারদের মধ্যে, রেনেসাঁসের ইতালীয় নাট্যকারদের মধ্যে, ফরাসী রাসিন-কর্ণেই প্রভৃতির মধ্যে, জার্মাণ লেসিং-শিলার-গ্যেটের মধ্যে, স্পেনীয় ট্র্যাজেডি রচয়িতাদের মধ্যে, ইংলণ্ডের মারলো-শেক্সপীয়র এবং অন্যান্যের মধ্যে। ট্র্যাজেডির নাম ও রীতি গড়ে উঠবার আগে থেকেই এই জীবন চেতনা পৃথিবীর সাহিত্যে রয়েছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই জীবন চেতনা না থাকার কোনো কারণ নেই। জীবনের ব্যর্থতার দিক রবীন্দ্রনাথের কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। জীবনের যন্ত্রণার অসংখ্য বৈচিত্র্য, বেদনার অতল-স্পর্শী গভীরতা, দ্বন্দ্বে এবং সংঘাতে জীবনের শোচনীয় বিনাশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ উদাসীন থাকতে পারেন না। এ উদাসীনতা আসতে পারে জীবন সম্পর্কে অনাগ্রহ থাকলে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে সামাজিক কারণেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই উদাসীনতা থাকতে পারে না এবং ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক সমুন্নতি সত্ত্বেও যুগধর্মের প্রভাবে এবং উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সাহিত্য-সাধনার ঐতিহ্য অনুসারে রবীন্দ্রনাথের জীবন সম্পর্কে আগ্রহ ছিল যথেষ্ট। তাই জীবনের ব্যর্থতার দিক সম্পর্কেও একটা সচেতনতা ছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে, তবে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক প্রত্যয়ের বিশেষত্বের জন্য এই সচেতনতার মধ্যে কিছু বৈচিত্র্য বা বিশেষত্ব স্বাভাবিক ভাবেই ছিল। জীবনের ব্যর্থতার দিক সম্পর্কে কবির এই সচেতনতাকেই আমরা ট্র্যাজিক জীবন-চেতনা বলছি এখানে। রবীন্দ্রনাথের এই ট্র্যাজিক-জীবনচেতনার বৈচিত্র্য ও বিশেষত্বও আমাদের কাছে লক্ষণীয় হবে।

একটা কথা বলা দরকার যে, সাহিত্যের পরিভাষা হিসেবে 'ট্র্যাজেডি' কথাটিকে যখন গ্রহণ করা হ'ল, তখন 'নাটকের' কথাকে মনে রেখে তা করা হয়েছিল। এ্যারিস্টটল 'ট্র্যাজেডি' সম্পর্কে যে তত্ত্ব প্রদান করেছেন তাও এ সম্পর্কিত গ্রীক নাটকগুলিকে মনে রেখে। কিন্তু যে কাব্যে হোমারের ট্র্যাজিক জীবন-চেতনা প্রকাশ পেয়েছে এবং যে কাব্যের মধ্যে বিধৃত হোমারের ট্র্যাজিক জীবন-চেতনার দ্বারা ঈস্‌কাইলাস প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা কিন্তু

নাটক নয়, মহাকাব্য। সুতরাং কবির ট্র্যাজিক জীবন-চেতনা যে কোনো রচনাতেই প্রকাশ পেতে পারে, তবে ট্র্যাজিক জীবন চেতনাকে কবি যেহেতু মানুষের জীবনের ঘটনাধারার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন, তাই সেই রচনাকে অবশ্যই আখ্যানমূলক হতে হবে, একমাত্র নাটকই যে হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। রচনা আখ্যানমূলক না হলে জীবনের ট্র্যাজেডিকে যথাযথভাবে দেখানো যায় না। একটা সঙ্গীত বা গীতিকবিতায় জীবনের গভীর দুঃখের একটি মুহূর্তের ভাবকে মাত্র প্রকাশ করা যেতে পারে; দুঃখে-দ্বন্দ্বে জীবনের ক্ষত-বিক্ষত রূপ, সামান্য ভুলের কারণে অপরিমেয় শাস্তি, জীবনের ধ্বংস, বিনাশ, সর্বস্বরিক্ততা প্রভৃতিকে ফুটিয়ে তুলতে গেলে প্রয়োজন একটি জীবন-বৃত্তের, প্রয়োজন অভিনয়ের অথবা বর্ণনার। সুতরাং ট্র্যাজিক জীবন-চেতনা সম্বলিত রচনাকে আখ্যানধর্মী হতেই হবে।

কিন্তু ইউরোপে ট্র্যাজেডিকে সাধারণতঃ নাটকের আধারেই দেখা হয়ে থাকে। এবং ইউরোপের যখন যেখানেই ট্র্যাজেডির আলোচনা হয়েছে, তখনই নাটকের প্রসঙ্গেই সে আলোচনা করা হয়েছে,—স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে ট্র্যাজেডিকে ফুটিয়ে তুলতে গেলে নাটকের আঙ্গিক কেমন হওয়া উচিত। আধুনিককালে অবশ্য এই ধারণার পরিবর্তন হচ্ছে, এবং সেই জন্যই ট্র্যাজেডি সম্পর্কে সম্প্রতিকালের আলোচনা গ্রন্থে অনেক উপন্যাসের আলোচনাও দেখা যায়।[১২] হার্বার্ট জে. মুলার-এর পূর্বোল্লিখিত একটি উদ্ধৃতি থেকেও আমরা একথার সমর্থন পাই যে, ট্র্যাজেডি সাহিত্যের কোনো বিশিষ্ট আঙ্গিকের উপর নির্ভর করে না।

এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত আখ্যানমূলক রচনাকে অবলম্বন করেই তাঁর ট্র্যাজেডি-চেতনাকে বুঝবার চেষ্টা করা হয়েছে, কেবল তাঁর নাট্য সাহিত্যকে অবলম্বন করে নয়। বরং এটাই দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ও গল্পে মানুষের জীবনের ট্র্যাজেডি প্রচলিত অর্থেই যত স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ পেয়েছে, নাটকের মধ্যে সর্বত্র ততটা হয়নি। নাটকের মধ্যেই কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথ মানুষের জীবনের ট্র্যাজেডি সম্পর্কে তাঁর বিশিষ্ট আদর্শকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। এই আদর্শের আড়ালের জন্য রবীন্দ্রনাথের

---

১২. যেমন, Richard B. Sewall রচিত 'The Vision of Tragedy", (New Haven Yale University Press, 1960).

নাটকে মানুষের জীবনের ট্র্যাজেডি কোথায় কেমন রূপ পরিগ্রহ করেছে, নাটকগুলির আলোচনায় সেই প্রসঙ্গ এসেছে।

এখন কথা হোল, রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার আলোচনার ভিত্তিটা কি? রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা কি আমাদের কাছেই কেবল ধরা পড়েছে, না এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেও সচেতন ছিলেন? যদি ট্র্যাজেডি সম্পর্কে কোন আলোচনা রবীন্দ্রনাথ নাও করে থাকতেন, তথাপি তাঁর ট্র্যাজেডি-চেতনা আলোচনা করবার অবকাশ থাকত। কারণ কবির আলোচনার সূত্র ধরে কবির সৃষ্টির সমীক্ষা কার্য যে পরিচালনা করতেই হবে, এমন কোনো রেওয়াজ সাহিত্য সমালোচনায় প্রচলিত নয়। পৃথিবীর অনেক বড়ো কবিই নিজের সৃষ্টি সম্পকে বিশেষ কিছু বলেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সমীক্ষায় সেইটাই প্রচলিত-প্রায় রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ ট্র্যাজেডি সম্পর্কে কিছু কথা রবীন্দ্রনাথ বলেও গেছেন। জীবনের দুঃখ বা জীবনে দুঃখের ভূমিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যখন আলোচনা করেছেন, তখন প্রায়ই তিনি প্রসঙ্গ ক্রমে 'ট্র্যাজেডি' কথাটা ব্যবহার করেছেন। তাঁর ট্র্যাজেডি-চেতনার আলোচনায় এই উক্তিগুলি অবশ্যই প্রয়োজনীয় এবং উল্লেখযোগ্য হয়েছে, কিন্তু কেবল 'ট্র্যাজেডি' সম্পর্কেও তাঁর আলোচনা আছে। 'ভারতী' পত্রিকায় ভাদ্র, ১২৮৯ সংখ্যায় তিনি "মেঘনাদবধকাব্য" এর যে সমালোচনা করেন, সেখানে 'ট্র্যাজেডি' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে। মহৎ সাহিত্যের বাহ্য আকার দেখে অনেকেই নকল করবার চেষ্টা করেন,—রচনার মর্ম ঠিকমতো না বুঝেই, আর সেখানেই নকল-নবিশের ব্যর্থতা। এর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ ট্র্যাজেডির প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, বলেছেন, "আমরা যতগুলি ট্র্যাজেডি দেখিয়াছি সকলগুলিতেই প্রায় শেষকালে একটা না একটা মৃত্যু আছে। তাহা হইতেই সাধারণতঃ লোকে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে, শেষকালে মরণ না থাকিলে আর ট্র্যাজেডি হয় না। শেষকালে মিলন হইলেই আর ট্র্যাজেডি হইল না। পাত্রগণের মিলন অথবা মরণ, সে ত কাব্যের বাহ্য আকার মাত্র, তাহাই লইয়া কাব্যের শ্রেণী নির্দেশ করিতে যাওয়া দূরদর্শীর লক্ষণ নহে। যে অনিবার্য নিয়মে সেই মিলন বা মরণ সংঘটিত হইল, তাহারই প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। মহাভারতের অপেক্ষা মহান্ ট্র্যাজেডি কে কোথায় দেখিয়াছ? স্বর্গারোহণকালে দ্রৌপদী ও ভীমার্জুন

প্রভৃতির মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়াই যে মহাভারত ট্র্যাজেডি তাহা নহে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ এবং শত সহস্র রাজা ও সৈন্য মরিয়াছিল বলিয়াই যে মহাভারত ট্র্যাজেডি তাহা নহে—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন পাণ্ডবদিগের জয় হইল তখনই মহাভারতের যথার্থ ট্র্যাজেডি আরম্ভ হইল। তাঁহারা দেখিলেন জয়ের মধ্যেই পরাজয়। এত দুঃখ, এত যুদ্ধ, এত রক্তপাতের পর দেখিলেন রাজ্য হাতে পাইয়া কোনো সুখ নাই, পাইবার জন্য উদ্যমেই সমস্ত সুখ; যতটা করিয়াছেন তাহার তুলনায় যাহা পাইলেন তাহা অতি সামান্য; এতদিন যুঝাযুঝি করিয়া হৃদয়ের মধ্যে একটা বেগবান্ অনিবার উদ্যমের সৃষ্টি হইয়াছে, যখনি ফললাভ হইল তখনই সে উদ্যমের কার্যক্ষেত্র মরুময় হইয়া গেল, হৃদয়ের মধ্যে সেই দুর্ভিক্ষ পীড়িত উদ্যমে হাহাকার উঠিতে লাগিল; কয়েক হস্ত জমি মিলিল বটে, কিন্তু হৃদয়ের দাঁড়াইবার স্থান তাহার পদতল হইতে ধসিয়া গেল, বিশাল জগতে এমন স্থান সে দেখিতে পাইল না যেখানে সে তাহার উপার্জ্জিত উদ্যম নিক্ষেপ করিয়া সুস্থ হইতে পারে। ইহাকেই বলে ট্র্যাজেডি।[১৩]

এখানে সুস্পষ্টতঃই ট্র্যাজেডি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চেতনার একটি নির্ভরযোগ্য পরিচয় পাওয়া যায়,—এখান থেকেই রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার স্বরূপ আমরা খানিকটা বুঝতে পারি। শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি-চেতনার সঙ্গে এর পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্র-ট্র্যাজেডি-চেতনার বিশিষ্টতাও এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে ট্র্যাজেডি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই আলোচনার উদ্দেশ্য 'বউঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসখানি যে ট্র্যাজেডি তা প্রতিপন্ন করা।[১৪] সুতরাং ট্র্যাজেডি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই আলোচনা তাঁর সচেতন এবং সতর্ক চিন্তা-ভাবনার সৃষ্টি এবং এর আলোকে রবীন্দ্রসাহিত্যে ট্র্যাজেডির আলোচনা করা চলে।

এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ যখন লিখেছেন, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স একুশ বছর। এত অল্প বয়সের রচনায় সুদীর্ঘ পরমায়ু বিশিষ্ট কবির সারা জীবনের বিশ্বাস ও ধারণার পরিচয় না থাকারই কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এরই মধ্যে 'রুদ্রচণ্ডের' (১৮৮১) মতো ট্র্যাজেডি রচনা করেছেন, 'করুণা' (১৮৭৭-৭৮), 'বনফুল' (১৮৮০), 'ভগ্নহৃদয়ে'র (১৮৮১-৮২) মতো করুণ-রসাত্মক রচনা

১৩. রবীন্দ্র রচনাবলী (অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড), ১৯৬২, পৃ. ৭৬।

১৪. রবীন্দ্র জীবনী (১ম), ১৩৫৩, পৃ. ১২৫।

সমাপ্ত করেছেন। সুতরাং জীবনের ব্যর্থতা বা জীবনের ট্র্যাজেডি সম্পর্কে নিজের কবি-প্রত্যয়কে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে অবশ্যই প্রকাশ করেছেন, এবং এর পরবর্তীকালে রচিত তাঁর সমগ্র সাহিত্যেও দেখি রবীন্দ্রনাথের এই কবি-প্রত্যয় অব্যাহত।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় ট্র্যাজেডি অনেকেরই চোখে পড়েছে, এবং অনেকেই বিক্ষিপ্ত ভাবে সে সম্পর্কে কিছু কিছু মন্তব্য করেছেন। যাঁরা যাঁরা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে, গল্পে এবং নাটকে ট্র্যাজেডির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী, ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট গবেষক ও সমালোচকদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আমাদের আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে এঁদের বিভিন্ন মন্তব্য উল্লেখিত হয়েছে, এবং এইসব মন্তব্যের সমর্থনের উপর আমাদের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

এঁরা ছাড়াও আরো অনেকে রবীন্দ্রনাথের রচনায় ট্র্যাজেডির সন্ধান বা রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার সন্ধান পেয়ে বিভিন্ন আলোচনায় উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন, যে-গুলিকে রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার আলোচনায় সাধারণ ভাবে উদ্ধৃত করা চলে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথা-সাহিত্যে প্রেমকে কিভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, সুসাহিত্যিক ভবানী ভট্টাচার্য, সে সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন।[১৫] অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত মহাশয় একটি প্রবন্ধে[১৬] 'মাস্টার মশায়', 'সুভা', 'পয়লানম্বর', 'রাসমণির ছেলে' প্রভৃতি গল্পের ট্র্যাজেডির বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে অপ্রত্যাশিত ভাবে গভীর ট্র্যাজেডির সন্ধান পেয়েছেন টম্‌সন সাহেবও।[১৭] সুসাহিত্যিক মুল্‌করাজ আনন্দ্‌

---

১৫. "The evocation of youthful love until its intensity is an agony too hard for the spirit to bear—that is a recurrent theme in several Tagore-stories; and at that level love's fulfilment is in tragedy alone. Tragedy cannot but have the last word. Here is an idea that challenges language."

—Rabindranath Tagore: A Centenary Volume (Sahitya Akademi, 1961), p. 99.

১৬. ঐ, পৃ. ২৮১-২৮৯।

১৭. E. J. Thompson; Rabindranath Tagore, His life and work 1961, p. 62.

রবীন্দ্র রচিত ট্র্যাজেডির মধ্যে একটা আশ্চর্যজনক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করেছেন, যা কেবল রবীন্দ্রনাথেরই বিশেষত্ব।[১৮]

সমালোচক এডোয়ার্ড টম্‌সন সাহেব রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে এ্যারিস্টটলীয় ট্র্যাজেডিতত্ত্বের (ক্যাথারসিস তত্ত্বের) সন্ধান পেয়ে সেগুলির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।[১৯]

বিদগ্ধ সমালোচক আবু সয়ীদ আইয়ুবও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ট্র্যাজেডি-চেতনার সন্ধান পেয়েছেন। তিনি এ সম্পর্কে একবার বলেছেন, "একটি বিশেষ দৃষ্টি কোণ থেকে আমি এখানে দেখতে চেয়েছি রবীন্দ্রনাথকে। অমঙ্গলের চেতনা রবীন্দ্রকাব্যের বিভিন্ন পর্যায়ে কীভাবে কখনো সংকুচিত, কখনো সম্প্রসারিত হয়েছে এবং শেষপর্বের কাব্য রচনায় কত গভীর ও পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে—সেটা স্পষ্ট ক'রে তোলা আমার রবীন্দ্র কাব্যালোচনার একটা পক্ষ। অন্যপক্ষে আমি দেখতে চেয়েছি যে, প্রধানতঃ এরই পরিণামে কবি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র বিশ্বনিরীক্ষা ও জীবনবোধ কেমন ক'রে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত ও পরিণত হয়েছে, রোম্যান্টিক উদ্বেলতা ও বিষাদ থেকে ঈশ্বরপ্রেমের সমাহিত প্রশান্তি, সেখান থেকে দুই ভিন্নপথে একই কালে এগিয়ে চলেছে পাশ্চাত্য হিউম্যানিজ্‌ম-এর দিকে এবং এমন এক ট্র্যাজিক চেতনার দিকে যাতে নক্ষত্রের ভাঙ্গাগড়া, সভ্যতার উত্থান-পতন, মানুষের সেই দুঃখ 'কোনো কালে যার অন্ত নাই'—সবকিছুর মধ্যে 'ভীষণের প্রসন্ন মূর্তি' দেখতে পাওয়া সম্ভব।"[২০]

রবীন্দ্র সাহিত্য রসিকদের এইসব বিক্ষিপ্ত মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা বিষয়ে একটা আনুপূর্বিক আলোচনার

---

১৮. "Alone among our nineteenth century writers, he shows a sense of humour in the midst of tragedy."

—Mulk Raj Anand : Homage to Tagore, (Lahore, 1946). p. 27.

১৯. "But few poems in any literature more justify Aristotle's test of tragedy as a purgation, than this group (Sati, Sojourn in Hell, Gandhari's prayer and Karna-Kunti)...............

All four plays have not only moments of intense passion, but a magic directness of language, a power to drag the very heart-depths with pity"

—Edward Thompson : Rabindranath Tagore—Poet & Dramatist, (Oxford 1948), p. 172.

২০. আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ (ভারবি, ১৯৬৮), পূর্বাভাষ, পৃ. ৮।

অবকাশ আছে। পূর্বে উল্লেখিত বিদগ্ধ গবেষক এবং রবীন্দ্রসমালোচকেরা রবীন্দ্রনাথের গল্প, উপন্যাস, নাটকের পৃথক পৃথক আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার দিকে অঙ্গুলি সংকেত করেছেন। আলোচনার লক্ষ্য ভিন্ন হওয়ায় ট্র্যাজেডির আলোচনা এ সব ক্ষেত্রে মুখ্য হয়নি। কেবল মাত্র রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার আনুপূর্বিক আলোচনা এর পূর্বে হয়নি। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার আলোচনা একটি নূতন প্রচেষ্টা।

এই আলোচনায় আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি, রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা তাঁর উপন্যাসে, গল্পে, নাটকে ও কাব্যনাট্যে কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে, এবং সেই ট্র্যাজেডি-চেতনা কোথায় কেমন বিশেষত্ব লাভ করেছে।

কোনো একজন, বা একটি দেশের, বা একটি সাহিত্যের ট্র্যাজেডি-র বিশেষত্বের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের ট্যাজেডি-চেতনা নির্ণয় করা হয়নি এখানে। এখানে, ট্র্যাজেডি সম্পর্কে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের যে সর্বজনীন এবং ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা, তারই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা সম্পর্কে একটি ধারণা গড়ে তুলবার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং সেইদিকে নজর রেখে এর পরিচ্ছেদ পরিকল্পনা করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে আছে পাশ্চাত্যের ট্র্যাজেডি-চেতনার ইতিবৃত্ত এবং তার মূল কথা।

দ্বিতীয় পবিচ্ছেদে আছে পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডি-চেতনার প্রভাবে বাঙ্গালীর ট্র্যাজেডি-চেতনা কিভাবে গড়ে উঠল, তার ইতিবৃত্ত, এবং সেই ট্র্যাজেডি-চেতনার একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক পরিচয়। বাঙ্গালীর ট্র্যাজেডি-চেতনার এই ধারাতেই রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট অবস্থান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রাক্-মানসী পর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যে সমস্ত অপরিণত রচনায় জীবনের দুঃখ-বেদনার দিক প্রকাশিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার মানসিক প্রস্তুতি হিসেবে, সেই সব রচনার আলোচনা করা হয়েছে। 'করুণা' এবং 'বউঠাকুরাণীর হাট' এবং 'রাজর্ষি' এই পর্বে রচিত হলেও ঐ তিনটি রচনায় উপন্যাসের লক্ষণ স্পষ্ট দেখা দেওয়ায় ওদের উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে, তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিবেচিত হয় নি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়, উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা।

পূর্ব-পরিচ্ছেদে পরিত্যক্ত 'করুণা', 'বউঠাকুরাণীর হাট' এবং 'রাজর্ষি'র সূত্র ধরে প্রথমে উপন্যাসের আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা কোথায় এবং কিরূপ, তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি। রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার অঙ্গ হিসেবে তাঁর দুঃখ তত্ত্বের বিশিষ্টতা কয়েকটি নাটকের মধ্যে থাকাতেই নাটকের প্রসঙ্গ এই ভাবে পরে আলোচিত হয়েছে, যাতে উপসংহার পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার বিশিষ্টতা আলোচনার সময় পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের সঙ্গে একটা যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ, বস্তুতঃ উপসংহার পরিচ্ছেদ,—রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার বিশিষ্টতা সমূহকে একত্র ক'রে দেখানোই এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য।

প্রসঙ্গ—ক

প্রাক্-রবীন্দ্র পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডি-চেতনার ইতিবৃত্ত ॥

পাশ্চাত্য জগতে ট্র্যাজেডি সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা সর্বপ্রথম করেছেন এ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রী: পূ:)। এইজন্য পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডি-চেতনার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করতে গেলে এ্যারিস্টটল তথা গ্রীক ট্র্যাজেডি-চেতনার প্রসঙ্গ থেকেই সুরু করতে হয়। এ্যারিস্টটল গ্রীক নাট্যকারদের অতুলনীয় নাট্যরাজির রসাস্বাদ গ্রহণ ক'রে তাঁর সাহিত্যতত্ত্বে (Poetics) ট্র্যাজেডির একটা আলংকারিক রূপ ও রীতি স্থিরীকৃত করেন। কিন্তু তার পূর্বেই ঈস্‌কাইলাস এবং অন্যান্য নাট্যকারেরা যথেষ্ট সফল ট্র্যাজেডি রচনা করে গেলেছেন। তা হ'লেই কথা ওঠে যে, এ্যারিস্টটলের তত্ত্বের পূর্বে ঈস্‌কাইলাস প্রভৃতি নাট্যকারেরা ট্র্যাজেডির প্রেরণা কোথা থেকে লাভ করলেন?—এবং ট্র্যাজেডির বিশিষ্ট অনুভূতিটাই বা তাঁরা পৃথক্ ক'রে পরম পুলকে কেন গ্রহণ করলেন কেবলমাত্র ট্র্যাজেডি রচনার জন্য!—এই সব প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গেলে দেখা যাবে যে, গ্রীক নাট্যকারেরা হোমারের মধ্যেই প্রকৃত পক্ষে ট্র্যাজেডি রচনার পথসন্ধান পেয়েছিলেন। হোমারের কাব্যই মানুষের জীবনের ট্র্যাজেডির দিকটা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে, যা পরবর্তীকালে ঈস্‌কাইলাস প্রভৃতি নাট্যকারেরা দৃশ্যকাব্যের রূপাবয়বে প্রকাশ করেছেন। ঈস্‌কাইলাস নিজেই তাঁর নাট্যরাজি সম্পর্কে বলতে গিয়ে হোমারের কাছে এই ঋণ স্বীকার করেছেন।[১]

ট্র্যাজেডির মূল ভাব এবং রস বস্তুতঃই হোমারের কাব্যের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল। জীবনে অদৃষ্টের পরিহাসের তীব্রতা হোমারের কাব্যের কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে অত্যন্ত গভীরভাবে রূপায়িত হয়েছে। হেলেনের

১. "Helpings from the great banquets of Homer".—F. L. Lucas: Greek Drama for Everyman, (1954), P. 8 (Introduction).

বিশ্বাসহীনতা, আগামেমননের ঔদ্ধত্য, এ্যাকিলিসের গর্ব প্রভৃতি সবই আপন আপন চরিতার্থতা লাভ করেছিল, কিন্তু চরিতার্থতা লাভ করে তারা দেখল যে তারা শুধু ধ্বংসকেই ত্বরান্বিত করেছে, সেই ধ্বংসও অন্যকারো নয়, তাদের নিজেদেরই। এইটাই অদৃষ্টের পরিহাস, যা হোমারের কাব্যে বর্ণিত হয়েছে।

মানুষের জীবন সম্পর্কে হোমারের অনুভূতি ছিল খুবই সকরুণ। ট্র্যাজেডি সম্পর্কে প্রসিদ্ধ প্রবক্তা এফ. এল. লুকাস মহাশয় তাঁর আলোচনায় হোমারের এই বিশেষ জীবনদৃষ্টির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[২] মানুষের জীবনের ট্র্যাজেডির দিকটা এইভাবে হোমারের কাব্যে পরিস্ফুট হওয়ায় এ কথা বলা যেতে পারে যে, হোমারই সর্বপ্রথম ট্র্যাজেডি-রসের পথ প্রদর্শন করেছিলেন[৩] এবং হোমারের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়ে ঈস্কাইলাস প্রভৃতি নাট্যকারেরা নাটকে ট্র্যাজেডির সেই রস-সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

যদিও ট্রয় নগরীর যুদ্ধের মধ্যদিয়েই হোমারের ট্র্যাজেডি-চেতনা প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু সেই সূত্রে পৌরাণিক বা মহাকাব্যের সমস্ত যুদ্ধ-বৃত্তান্তের মধ্যেই যে ট্র্যাজেডির-রস নিহিত রয়েছে, এমন মনে করার কোন কারণ নেই। ওল্ড টেস্টামেন্টে যে সমস্ত যুদ্ধের বর্ণনা রয়েছে, সেগুলি মারাত্মক এবং শোকাবহ হলেও পাশ্চাত্য সমালোচকেরা সেগুলিকে ট্র্যাজেডি বলতে নারাজ।[৪] কেবলমাত্র পেলোপনেসিয়ার যুদ্ধের মধ্যে তাঁরা ট্র্যাজেডির সন্ধান পেয়েছেন—যেখানে রাজনৈতিক ঘটনাচক্রে কোন বিদ্বেষ ছাড়াই এক অদ্ভুত ক্রোধ নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে ধ্বংসের শপথ নিয়েছে। সমালোচক স্টাইনার মহাশয় এই অস্পষ্ট ভবিতব্যতা এবং ভ্রান্ত বিচার বুদ্ধিকেই মানুষের ট্র্যাজেডির চিরকালের কারণ বলে মনে করেন। তাই তাঁর মতে পেলোপনেসিয়ার যুদ্ধের শেষ নেই[৫] —মানুষের জীবনের মধ্যে এই ট্র্যাজিক যুদ্ধ চলছেই।

---

২. F. L. Lucas: Greek Drama for Everyman, (1954)-p.8 (Introduction).

৩. George Steiner: The Death of Tragedy (1961.) ch. 1, p. 5.

৪. ঐ, পৃ, ৬।

৫. "We are still waging Peloponesian Wars. Our Control of the material world and our positive science have grown fantastically. But our very achievements turn against us, making politics more random and wars more bestial." —George Steiner: The Death of Tragedy, (1961)-p. 6.

সুতরাং পাশ্চাত্যে বাইবেলের মধ্য থেকে ট্র্যাজেডির প্রেরণা খুব বেশী আসেনি, এসেছে মহাকাব্যের মধ্য থেকে। হোমারের মহাকাব্যের মধ্যে নিহিত ট্র্যাজেডির রসকেই গ্রীক নাট্যকারেরা উত্তরোত্তর ফুটিয়ে তুলেছেন।

গ্রীক ট্র্যাজেডির কবিগণ ধরে নিয়েছেন যে, যে শক্তি আমাদের জীবনকে গড়ে বা ভাঙ্গে, সেই শক্তি আমাদের যুক্তি বা নিয়ন্ত্রণের বাইরে। শুধু তাই নয়, আমাদের চতুর্দিকেই যেন কতকগুলি আসুরিক শক্তি রয়েছে, যারা আমাদের আত্মাকে কোরে তোলে প্রমত্ত, অথবা আমাদের বাসনাকে কোরে তোলে বিষাক্ত, যাতে আমরা আমাদের নিজেদের অথবা আমাদের প্রিয়জনদের অপূরণীয় ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত হতে পারি।

গ্রীক ট্র্যাজেডির কবিরা এই অপূরণীয় ক্ষতির কথাটাই বলেছেন। সেখানে এই ক্ষতি বা সর্বনাশের কোনো পার্থিব কারণ খুঁজে পাওয়া যায়, অথবা যেখানে এই সর্বনাশের কোনো সামাজিক প্রতিকার আছে, সেখানে গ্রীক নাট্যকারেরা ট্র্যাজেডি রচনা করতে যাননি। কারণ সেখানে তাঁদের উদ্দিষ্ট ট্র্যাজেডি-রস অনুপস্থিত। কোনো নমনীয় সামাজিক আইনই আগামেমননের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারত না, তাদের ক্ষতি বা সর্বনাশ চূড়ান্ত। তাদের এই সর্বনাশের কোনো পার্থিব সুরাহা নেই। তাই তাদের নিয়ে ট্র্যাজেডি রচনা করা গেছে। কিন্তু জব-এর শেষ পর্যন্ত কোনো ক্ষতি থাকেনি, তাই তাকে নিয়ে ট্র্যাজেডিও রচিত হতে পারেনি।

গ্রীক ট্র্যাজেডি-রচয়িতাদের মধ্যে ঈস্‌কাইলাসের (৫২৫-৪৫৬ খ্রী. পূ.) নাটকে মানুষের প্রতি একটা সমবেদনার ভাব লক্ষ্য করা যায়। পূর্বপুরুষের কৃত অপরাধের শাস্তি পরবর্তী পুরুষদের বহন করাকে ঈস্‌কাইলাস নীতিগত-ভাবে সমর্থন করতে পারেননি।[৬] তাই ট্র্যাজেডির কবল-গ্রস্ত মানুষের প্রতি ঈস্‌কাইলাসের সুগভীর মমতা ছিল এবং সেই সূত্রেই তাঁর নাটকে একটা শোকভাবও অনুভব করা যায়।

কিন্তু দুঃখ-বেদনাগ্রস্ত মানুষের প্রতি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রীক নাট্যকার সফোক্লেসের (৪৯৬-৪০৬ খ্রী.পূ.) সমবেদনা ছিল আরো প্রবল, আর সেই জন্যই সফোক্লেসের নাটক অধিকতর শোকভাব-সমৃদ্ধ। সামাজিকের চিত্তেও সফোক্লেসের নাটক এই জন্য বেশী পরিমানে করুণ রস-সৃষ্টি করতে পেরেছে।

---

৬. F. L. Lucas : Greek Drama for Everyman (1954), Pp. 17-18.

প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডির শেষ বড় কবি ইউরিপিডেস (খ্রী. পূ. ৪৮৫-৪০৬)। বলতে গেলে, তিনি ছিলেন মুখ্যতঃ করুণ রসেরই নাট্যকার। প্রাচীন গ্রীক নাট্যকারদের মধ্যে তিনিই ছিলেন এ ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রণী। তাঁর করুণ-রস প্রবণতা সম্পর্কে প্রায়ই তাঁর আলসেসটিসের (Alcestis) উল্লেখ করা হয়। এফ. এল. লুকাস নাটকটিকে ট্র্যাজি-কমেডি বললেও[৭] করুণরসের আধিক্যের জন্য সমালোচকেরা এটিকে ইউরিপিডেসের করুণরস প্রবণতার দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ এই নাটকের মধ্যে এমন কতকগুলি অংশ রয়েছে, যেখানকার সহজ করুণরসের তীব্রতা সৃষ্টি করা অনেকের পক্ষেই অসাধ্য।[৮]

এই করুণরসের কারণেই ইউরিপিডেসের হাতে এতাবৎকাল প্রচলিত গ্রীকট্র্যাজেডির স্বরূপ খানিকটা পরিবর্তিত হয়ে যায়। ইউরিপিডেসের ট্র্যাজেডিগুলির এটা একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। চিরাচরিত রীতিতে যাঁরা ট্র্যাজেডি রচনা করতেন, তাঁরাও ইউরিপিডেসের এই বিশেষত্বের প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত করেছেন। ট্র্যাজেডির চিরাচরিত রীতিতে একটা বক্তব্যই শুনতে পাওয়া যায়: করুণরস যদি তার মধ্যে প্রবেশ করেই, তা হলেও তা একটা সামান্য উপাদান হিসেবেই প্রবেশ করবে—ট্র্যাজেডির মধ্যে তা কখনোই মুখ্য হয়ে উঠবেনা। সেই জন্য একটা কঠোর সত্যই চিরাচরিত রীতির ট্র্যাজেডির মূল কথা। চিরাচরিত প্রথায় বিশ্বাসী কবিরা এইজন্য ইউরিপিডেসকে তাঁদের দলভুক্ত মনে করেন না,—মনে করেন না প্রকৃত ট্র্যাজেডি-রচয়িতা হিসেবে। কিন্তু গ্রীক ট্র্যাজেডির শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার এ্যারিস্টটল ইউরিপিডেসের ট্র্যাজেডির মধ্যে অনেক ত্রুটি লক্ষ্য করলেও তাঁকেই শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিক কবির মর্যাদা দিয়েছেন,[৯] কারণ কাহিনীর দুঃখময় পরিণতি দেখানোর ব্যাপারে তিনি অদ্বিতীয়।

---

৭. Greek Drama for Everyman (1954), p. 231.

৮. "There are passages of that drama which, for truth and simplicity of pathos, it would be impossible to surpass."—Types of Tragic Drama, C. E. Vaughan, 1908, Pp. 64-65.

৯. "The critics, therefore, are wrong who blame Euripides for taking this line in his tragedies, and giving many of them an unhappy ending. It is, as we have said, the right line to take.. ...such plays are seen to be the most truly tragic; and Euripides, even if his execution be faulty in every other point, is seen to be nevertheless the most tragic certainly of the dramatists." —Poetics (Bywater translation, 1954), p. 51.

গ্রীক ট্র্যাজেডি-রচয়িতাদের এই সব প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতেই এ্যারিস্টটলের ট্র্যাজেডিতত্ত্ব আলোচিত হওয়া উচিত, তা হলেই বোঝা যাবে, এ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির মূল ভাব সম্পর্কে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন।

এ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন,[১০] সেখানে তিনি বলেছেন ট্র্যাজেডি সামাজিকের চিত্তে 'করুণা' ও 'ভীতি' (pity and fear)—এই দুটি ভাবকে উদ্রিক্ত করে। এ্যারিস্টটল কথিত এই 'করুণা' ও 'ভীতি'-র ভাব দুটিকে সাধারণতঃ সকলে ট্র্যাজেডির মূল ভাব হিসেবে মনে করেছেন। প্রকৃত পক্ষেও কাব্য হিসেবে ট্র্যাজেডিতে যে রসনিষ্পত্তি ঘটে, সেই রসের মূল ভাব সম্পর্কে এ্যারিস্টটল যদি কোনো ইঙ্গিত দিয়ে থাকেন তাঁর প্রদত্ত ট্র্যাজেডির সংজ্ঞায়, তবে তা এই 'করুণা' এবং 'ভীতি' (pity and fear)। এই ভাব দুটির প্রকৃত তাৎপর্য কি এবং এ্যারিস্টটল pity এবং fear বলতে কি বুঝেছিলেন বা বোঝাতে চেয়েছিলেন, সে প্রশ্নের মধ্যে এখনই প্রবেশ না করেও এটুকু বুঝে নেওয়া যায় যে, এ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডি সম্পর্কিত তাঁর সংজ্ঞায় ট্র্যাজেডির আঙ্গিক সম্পর্কে যেমন অনেকগুলি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে বলেছেন, তেমনি ট্র্যাজেডি যে ভাবের উদ্বোধন ঘটাবে, সেই ভাবকে ভালো করে ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারেও লক্ষ্য রাখতে বলেছেন, আর সেই ভাব যে pity এবং fear, তাও বোঝা যায় এ সম্পর্কে এ্যারিস্টটলের সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখে।

এখন pity এবং fear-এর প্রকৃত তাৎপর্য কি, এ্যারিস্টটল এ সম্পর্কে প্রকৃত পক্ষে কি ভেবেছিলেন, তা নির্ণয় করতে পারলেই ট্র্যাজেডির মূলভাব এবং রসের সন্ধান পাওয়া যাবে, এবং তা ভারতীয় রস-সংস্কারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে কিনা, তাও বোঝা যাবে।

Poetics গ্রন্থেরই ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে এই pity এবং fear সম্পর্কে এ্যারিস্টটল বলেছেন, কোনো একজনের অনুচিত ভাগ্যবিপর্যয় দেখলে আমাদের মনে জাগে করুণা, আর সেই অনুচিত ভাগ্য-বিপর্যয় যখন আমাদেরই মতো

---

১০. "A tragedy, then, is the imitation of an action that is serious and also, as having magnitude, complete in itself, in language with pleasurable accessories each kind brought in separately in the parts of the work, in a dramatic, not in a narrative form, with incidents arousing pity and fear, herewith to accomplish its catharsis of such actions."

—Poetics : (Bywater translation 1954), p. 35.

একজনের জীবনে ঘটে, তখন তাতে আমাদের মনে জাগে ভীতি।[১১]—এ্যারিস্টটলের এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় যে তিনি pity ভাব এবং fear ভাবের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য কল্পনা করেননি। যে কারণে আমরা দুঃখ পাই, সেই কারণেই আমরা ভয়ও পাই। কারো অনুচিত ভাগ্য বিপর্যয় দেখলে আমাদের মধ্যে দুঃখ বোধ জাগে, আর সেই অনুচিত ভাগ্য বিপর্যয় আমাদেরই মতো কারো জীবনে ঘটতে দেখলে, নিজের জীবনেও সেই ভাগ্য বিপর্যয়ের আশঙ্কায় জাগে ভয়। অর্থাৎ ভাগ্য বিপর্যয় জনিত দুঃখই আমাদের মনে ভয়কেও জাগিয়ে তোলে শেষ পর্যন্ত। ভাগ্য বিপর্যয়াত্মক ঘটনাগুলি যখন 'মমেতি' বোধে গৃহীত হয়, তখন ভয় জাগে, আর যখন 'পরস্য' বোধে গৃহীত হয়, তখন শোচনা জাগে।

Fear এর অনিবার্য পরিণাম যে Pity—সে সম্পর্কে এ্যারিস্টটলও যে সচেতন ছিলেন, আলোচনার মাধ্যমে তা প্রমাণ করা যেতে পারে। কোন্ ধরনের ঘটনা আমাদের কাছে ভয়াবহ্ বা করুণ হয়ে ওঠে,[১২] সেই প্রসঙ্গের আলোচনায় এ্যারিস্টটলের আসল মনোভাবটি ব্যক্ত হয়ে পড়েছে। তিনি 'horrible' এবং 'piteous' কথা দু'টিকে প্রায় সমার্থক কোরে ফেলেছেন। কারণ এখানে তিনি একমাত্র pity শব্দটিকেই ব্যবহার করেছেন—'pity or fear' বা 'pity and fear' ব্যবহার করেননি। তিনি লিখেছেন, একজন শত্রু যদি একজন শত্রুকে হত্যা করে তবে তা কোনোভাবেই আমাদের করুণা (Pity) উদ্রেক করে না, যদি না নির্যাতিত ব্যক্তিটির দুঃখভোগই যথেষ্ট করুণ হয়।[১৩] লক্ষণীয়, এখানে 'pity' শব্দটি একাই বসেছে, সঙ্গে 'fear' নেই। "অতএব এ সিদ্ধান্ত অবশ্যই করা যেতে পারে যে, এ্যারিস্টটলের মতে 'pity'ই হচ্ছে ট্র্যাজেডির স্থায়িভাব এবং 'fear' প্রভৃতি আনুষঙ্গিক ভাব।"[১৪]

---

১১. "Pity is occasioned by undeserved misfortune and fear by that of one like ourselves." —Poetics (Bywater, 1954), p. 50.

১২. "Let us see, then, what kinds of incident strike one as horrible, or rather as piteous." —Poetics (Bywater, 1954), p. 53.

১৩. "When enemy does it on enemy, there is nothing to move us to pity either in his doing or in his meditating the deed, except so far as the actual pain of the sufferer is concerned." —Poetics, (Bywater, 1954), p. 53.

১৪. ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য : নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা (১৩৬৩ সংস্করণ), পৃ. ৩৫৬।

ট্র্যাজেডির গঠন বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির 'প্লটের' তিনটি অংশের উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে তৃতীয় অংশটি হচ্ছে দুঃখ বর্ণনা (Suffering), যার অর্থ হচ্ছে মঞ্চের উপর হত্যা, নির্যাতন, আঘাত-প্রভৃতির মত ধ্বংসাত্মক বা বেদনাত্মক ঘটনাবলী।[১৫] অর্থাৎ এ্যারিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডির শেষ পর্বে একটা বিনাশ বা দুঃখভোগের (disaster ot suffering) বিবরণ উপস্থাপিত করতে হবেই। এবং এর উদ্দেশ্য যে শেষ পর্যন্ত 'pity' জাগ্রত করা তা সহজেই বোঝা যায়।

এই ভাবে ট্র্যাজেডির শেষ পর্বে pity ভাবোদ্দীপক ঘটনাবলীর উপস্থাপনার উপর এ্যারিস্টটল যে গুরুত্ব দিয়েছেন, তাতে বোঝা যায় pity বা 'শোচনাই' হচ্ছে ট্র্যাজেডির মূল বা স্থায়িভাব।

এ্যারিস্টটল গ্রীসের যে ট্র্যাজেডিগুলিকে সামনে রেখে তাঁর ট্র্যাজেডিতত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন, সেই ট্র্যাজেডিগুলির প্রত্যেকটিতেই প্রায় দেখা যায় যে শেষ পর্যন্ত একটা 'শোচনা' বা 'pity'-র ভাব বজায় থাকে। এটাই সম্ভবতঃ গ্রীক ট্র্যাজেডির একটা সাধারণ বিশেষত্ব। এই জন্যই হয়তো জন স্মার্ট গ্রীক ট্র্যাজেডি সম্পর্কে বলেছেন, "What is common to all is the element of calamity and suffering,'[১৬] এখান থেকেও বোঝা যায় যে করুণ রসই ট্র্যাজেডির প্রকৃত রস, কারণ calamity এবং suffering করুণ রসেরই স্থায়িভাব 'শোক বা শোচনা'কেই উদ্‌বোধিত করে।

অধ্যাপক হাম্ফ্রি হাউস এ্যারিস্টটল-কথিত pity এবং fear-এর প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন এ্যারিস্টটলেরই রচিত 'রেটোরিক (২য়)' গ্রন্থের সাহায্যে। 'রেটোরিক' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে (Rhetoric, Book II, ch-V) fear সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটা হচ্ছে ভবিষ্যতের কোন ধ্বংসাত্মক বা বেদনাত্মক অমঙ্গলের মানসিক উদ্বেগজনিত এক ধরনের বেদনা বা অশান্তি।[১৭] এই সঙ্গে এ্যারিস্টটল আরো বলেছেন যে, এই আসন্ন অমঙ্গলকে

---

১৫. "An action of destructive or painful nature, such as murders on the stage, tortures, woundings, and the like." —Poetics (Bywater, 1954), p. 48.

১৬. দ্রষ্টব্য: ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের এ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব (১৯৫৬) পৃ. ২৯৫।

১৭. "A kind of pain or disturbance due to a mental picture of some destructive or painful evil in the future."

খুবই নিকটবর্তী হতে হবে, দূরবর্তী হলে চলবে না। কিন্তু একই পরিচ্ছেদে একটু পরেই তিনি বলেছেন, "Speaking generally, anything causes as to feel fear that when it happens to or threatens others causes us to feel pity" এ্যারিস্টটলের এই কথায় অর্থের দিক থেকে pity এবং fear পরস্পরের খুবই কাছাকাছি চলে এসেছে। pity ও fear-এর এই অভিন্নত্ব আরো স্পষ্ট হয়েছে ঐ গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদে এ্যারিস্টটল pity-র যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, সেখানে। সেখানে pity হচ্ছে,—"a sort of pain at an evident evil of a destructive or painful kind in the case of some body who does not deserve it, the evil being one which we might expect to happen to ourselves or to some of our friends, and this at a time when it is said to be near at hand." এখানে এই pity ও একটু পরেই fear-এর সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে পড়ল যখন এ্যারিস্টটল বললেন যে, যখন pity বা করুণার পাত্রটি আমাদের এত কাছের মানুষ হয়ে ওঠে যে, মনে হয় তার দুঃখভোগ যেন আমাদেরই দুঃখভোগ, তখন সেই pity বা করুণা সহজেই feer বা ভয়ে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কারণ প্রকৃতপক্ষে নিজেদের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে যে দুর্ভাগ্যকে আমরা ভয় করি, অপরের জীবনে সেই দুর্ভাগ্য ঘটলে তাতে আমরা করুণা প্রকাশ করি। সুতরাং আমাদের অনুভূতির দিক থেকে ট্র্যাজেডির pity ও fear কার্যতঃ একই বস্তু।

এইজন্যই এ্যারিস্টটলের বিবেচনায় ভয়ের ভাব ব্যতিরেকে করুণার ভাব বজায় থাকতেই পারেনা। করুণা এবং ভয়,—উভয়েরই জন্ম আত্ম-ভাবনার মধ্যে—স্বার্থ চিন্তার মধ্যে। ট্র্যাজিক চরিত্রের দুঃখ-দুর্দশা আমার নিজের জীবনেও ঘটতে পারে, আমার এই আত্মগত ভয়ের ভাবনা থেকেই ট্র্যাজিক চরিত্রের প্রতি আমার করুণা জাগে। এই কারণেই ট্র্যাজেডিতে যার প্রতি আমাদের করুণা জাগার কথা, তাকে আমাদের মতো একজন সাধারণ মানুষ হতে হবেই। প্রায় এই একই কথা বলেছেন এ্যারিস্টটল ট্র্যাজিক চরিত্রের গুণাবলী আলোচনা প্রসঙ্গে। 'পোয়েটিক্‌স' এর পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে এ্যারিস্টটল ট্র্যাজিক চরিত্রের চারটি গুণ থাকার কথা বলেছেন। এর মধ্যে তৃতীয় গুণটি হচ্ছে, ট্র্যাজিক চরিত্রকে বাস্তব-সম্মত

হতে হবে।[১৮] —এইটিই হচ্ছে সেই গোড়ার কথা, যার কারণে ট্র্যাজেডিতে অপরের জন্য আমাদের ভাবনা করা, অপরের জন্য আমাদের সহানুভূতি-সম্পন্ন হওয়া সম্ভব হয়। এই কারণেই একটি ভালোমানুষের উন্নতিতে আমরা আনন্দিত হই যেমন, তেমনি একটি ভালো মানুষের দুঃখ-বেদনায়, তার দুঃখের ও ভয়ের আমরা যেন অংশীদারও হয়ে যাই। এই প্রক্রিয়া বা ব্যাপারটাই হচ্ছে করুণা বা pity.[১৯]

অধ্যাপক হাম্‌ফ্রি হাউসের এই আলোচনা থেকে এটাই বোঝা যায় যে, সহানুভূতিটাই বড়কথা, এবং এই সহানুভূতির কারণে আমাদের মধ্যে একটিই বোধ জাগে, যা নিজের সম্পর্কে জাগায় ভয়কে, এবং অপরের সম্পর্কে জাগায় করুণাকে। অর্থাৎ ভয় ও করুণা যেন একই ভাবের দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। একই ভাগ্য বিপর্যয়ের ঘটনা এই দুটি ভাবকেই উদ্বোধিত করে। সুতরাং pity ও fear-এর আভিধানিক অর্থ যাই হোক না কেন, ভাব-উদ্বোধন এবং রসনিষ্পত্তির ব্যাপারে এরা মূলতঃ এক। মানুষের ভাগ্যবিপর্যয় দেখলে আমরা যে প্রথমতঃ শোকার্ত হই, সেখানেই ট্র্যাজেডির মৌল সার্থকতা। সুতরাং করুণরসই যে ট্র্যাজেডির মূলরস, তা নিশ্চিত ভাবেই বলা চলে।

এ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্‌স এবং আনুষঙ্গিক গ্রন্থের সাহায্যে এইভাবে ট্র্যাজেডির স্থায়িভাব এবং মূল রসের সন্ধান পাওয়া গেল। এখন পাশ্চাত্যের অন্যান্য জাতির এ সম্পর্কে মনোভাব কি, বা তারা এ্যারিস্টটল কথিত pity ও fear-কে কোন্ অর্থে গ্রহণ করেছে, তা অনুধাবন করা দরকার ট্র্যাজেডির স্থায়িভাব এবং রসনিষ্পত্তি সম্পর্কে একটা নির্ভরযোগ্য এবং সঠিক ধারণা গড়ে তুলবার জন্য।

এ্যারিস্টটলের পর এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন হোরেস (খৃ. পূ. ৬৫—৮)। হোরেস তাঁর Epistle to Pisos বা Art of Poetry গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন সফল ট্র্যাজেডির রীতি কিরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু বিশদভাবে প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়নি বলে ট্র্যাজেডি তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর কোনো

---

১৮. To make them like the reality, which is not the same as their being good and appropriate in our sense of the term."

—Poetics (Bywater, 1954), p. 56.

১৯. দ্রষ্টব্য: Aristotle's Poetics: Humphry House, London, (1961), Pp. 100—104.

সুস্পষ্ট মত ঐ আলোচনা থেকে পাওয়া যাবে না। তবে ট্র্যাজেডির অভিনয়ের সময় ট্র্যাজেডির সফল রস সৃষ্টির জন্য তিনি একটি বিষয়ের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করেছেন, যা উল্লেখযোগ্য। ট্র্যাজিক চরিত্রের প্রতি দর্শক যাতে সহানুভূতিসম্পন্ন হতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন, মানুষ যেমন মানুষের হাসি দেখে হাসে, তেমনি অপরের দুঃখ দেখে কাঁদে। সুতরাং ট্র্যাজেডির দর্শকদের যদি কাঁদাতে হয়, তবে, নাটকের মধ্যে সেই ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলতে হবে।[২০]

এর পরেই তিনি অভিনেতাদের উপদেশ দিয়ে আরো বলেছেন, মুখের বিষন্ন ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলার পক্ষে করুণ ঘটনাই উপযুক্ত। সুতরাং বোঝা যায় যে, এই বিষাদের ভাবটি যাতে অভিনেতৃবর্গ যথার্থভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন, সে ব্যাপারে হোরেসের বেশ একটু আগ্রহ ছিল। এই বিষাদের ভাবটি যাতে ভালোভাবে ফুটে ওঠে, তার জন্য হোরেসের এত আগ্রহ কেন?—এই প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক। উত্তরে এই কথাই বলতে হয় যে, বিষাদের ভাবটিকেই বোধ হয় হোরেস ট্র্যাজেডির মূলভাব হিসেবে বিবেচনা করতেন। তাই ট্র্যাজেডির সফল অভিনয়ের জন্য তিনি এই ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলার প্রতি এত গুরুত্ব দিয়েছেন।

ট্র্যাজেডির মূল রসসৃষ্টি সম্পর্কে তিনি কোনো আলোকপাত করেন নি। কিন্তু তিনি বোধ হয় বিশ্বাস করতেন যে, ট্র্যাজেডি থেকে করুণরসই দর্শক গ্রহণ করে থাকে। তাই তিনি করুণ রসের উদ্দীপক হিসেবে বিষাদের ভাবের পরিস্ফুটনের প্রতি লক্ষ্য রাখতে বলেছেন।

হোরেসের পরে রেনেসাঁসের পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপে নাট্যতত্ত্ব নিয়ে গভীর আলোচনা কিছুই হয়নি। কেবল এ্যারিস্টটল ও হোরেসের অনুসরণই হয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে। চতুর্দশ শতাব্দীতে রেনেসাঁসের পূর্ব-মুহূর্তেও দান্তে হোরেসের সমর্থক ছিলেন।

২০. "As the human countenance smiles on those that smile, so does it sympathize with those that weep. If you would have me weep you must first express the passion of grief yourself; then, Telephus or Peleus, your misfortunes hurt me: if you pronounce the parts assigned you ill, I shall either fall asleep or laugh."

—B. H. Clark (ed): European Theories of Drama, (1947), p. 31.

রেনেসাঁসের যুগে নাট্যতত্ত্ব, এবং সেই প্রসঙ্গে ট্র্যাজেডিতত্ত্ব নিয়ে বেশ অনেকটাই আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ড্যানিয়েল্লো (Daniello), মিণ্টুর্ণো (Minturno), স্ক্যালিগের (Scaliger), কস্তেলভেত্রো (Costelvetro) প্রধান। এঁরা সকলেই ইতালীয় মানুষ।

ষোড়শ শতাব্দীর ড্যানিয়েল্লোর Poetica (১৫৩৬) গ্রন্থটি ইতিহাসের দিক থেকে খুবই উল্লেখযোগ্য। ড্যানিয়েল্লোর ট্র্যাজেডিতত্ত্ব এ্যারিস্টটল ও হোরেসের মতবাদেরই মোটামুটি সংমিশ্রণ। ট্র্যাজেডির ভাব-রস সম্পর্কে তিনিও terror ও pity-র কথা বলেছেন। কিন্তু তিনিই আবার বলেছেন যে, ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য বেদনা সৃষ্টি করা, এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি কবিদের স্বাধীনতাও দিতে চেয়েছেন।[২১] ড্যানিয়েল্লোর এই ভাবনা থেকে এই কথাটাই মনে করা যেতে পারে যে, ট্র্যাজেডির-রস পরিণাম সম্পর্কে এইটাই সমকালীন লোকপ্রচলিত সংস্কার। তাই তত্ত্বগতভাবে, অনেকটা যেন অভ্যাসবশতঃ, এ্যারিস্টটলের মতই terror ও pity-র কথা বলেও ড্যানিয়েল্লো ট্র্যাজেডির মধ্যে প্রত্যাশানুযায়ী বেদনা সৃষ্টির প্রতি কবির অধিকারের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করেছেন।

ষোড়শ শতাব্দীর আরেকজন ইতালীয় তাত্ত্বিক মিণ্টুর্ণো তাঁর Arte Poetica (১৫৬৩ খৃঃ) গ্রন্থে ট্র্যাজেডি সম্পর্কে এক সুবিন্যস্ত আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি বলেছেন,[২২] ট্র্যাজেডির কবি আমাদের মনে বিস্ময়, ভয় এবং করুণার ভাবকে সৃষ্টি ক'রে আমাদের মনকে আলোড়িত করে। এবং চিত্তে এই আলোড়ন সৃষ্টি করাটিকেই তিনি সবচেয়ে ট্র্যাজিক বলেছেন। তার পরেই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, চিত্তে আলোড়ন সৃষ্টিকারী যে সব ঘটনার দৃষ্টান্ত তিনি গ্রীক সাহিত্য থেকে তুলে ধরেছেন, সেগুলিকে তিনি

---

২১. "Nor does one deny the right to the tragic poet to lower himself when he wishes, to humble speech, in order to weep and lament."

—European Theories of Drama. B. H. Clark (ed.), 1947, p. 55.

২২. "With the force of his (poet's) words, and the weight of his thoughts, he can stir up passions in the mind producing wonder, fear and pity. What is more tragic than to move others ? What is so moving as the terrible unexpected, such as the cruel death of Hippolytus, the wild and piteous madness of Hercules, the unhappy exile of Oedipus ?" —ibid. p. 58.

নিজে terrible unexpected বললেও প্রকৃতপক্ষে সেগুলি piteous unexpected-ও বটে। কারণ সেই ঘটনাগুলির সংঘটনের কারণগুলি terrible হলেও সংঘটনাগুলি নিশ্চয়ই শোচনীয় (piteous), যেহেতু সেগুলি সংঘটনের মুহূর্তে অন্ততঃ আমাদের মনে শোচনা উদ্রেক করে। মনে হয় মিণ্টুর্ণো নিজেও এই ঘটনাগুলির প্রকৃত রসাবেদন সম্পর্কে একেবারে অসচেতন ছিলেন না। তাই তিনি হিপোলিটাসের মৃত্যুকে 'cruel' বললেও হারকিউলিসের উন্মত্ততাকে বলেছেন 'piteous' এবং ঈডিপাসের রাজ্যত্যাগকে বলেছেন 'unhappy'.

সুতরাং মিণ্টুর্ণো যে বলেছেন, ট্র্যাজেডি আমাদের মনের মধ্যে বিস্ময়, ভয় এবং করুণা সৃষ্টি কোরে আমাদের চিত্তকে আলোড়িত করে, সে কথা আপাততঃ মেনে নিলেও, যদি প্রশ্ন ওঠে, এর তিনটির মধ্যে কোন্ ভাবটির আমাদের চিত্তকে আলোড়িত করবার শক্তি সবচেয়ে বেশী?—তা হ'লে অবশ্যই বলা যায় 'করুণা'।—এই 'করুণা' ট্র্যাজিক চরিত্রগুলির প্রতি আমাদের সহানুভূতি সম্পন্ন কোরে তোলে এবং সহানুভূতির জন্যই আমাদের চিত্ত আলোড়িত হয়। মিণ্টুর্ণোর আরো একটি উক্তি থেকেও একথা সমর্থিত হয়। তিনি বলেছেন, অপরের দুঃখ-জনিত ভয় এবং করুণার দ্বারা আমাদের চিত্ত আলোড়িত হয়।[২৩] অর্থাৎ দুঃখের কারণ যখন ভাবি, তখন ভয় জাগতে পারে, কিন্তু দৃশ্যতঃ দুঃখ যখন দেখি, তখন করুণাটাই প্রধান হয়ে চিত্তকে আলোড়িত করে। সুতরাং ট্র্যাজেডি সম্পর্কে মিণ্টুর্ণো যে আলোচনা করেছেন, তা থেকে মোটা-মুটি এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, করুণা বা শোচনাই হচ্ছে ট্র্যাজেডির প্রকৃত ভাব, ভয়ের ভাবটি নেপথ্যে থাকলেও।

মিণ্টুর্ণোর পরে জুলিয়াস সীজার স্ক্যালিগার ট্র্যাজেডি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন Poetics Libri Septem (1561) গ্রন্থে। এই আলোচনায় তিনি ট্র্যাজেডির কয়েকটি স্থূল বাহ্য লক্ষণের কথা বললেও ট্র্যাজেডির প্রকৃত রসাবেদন সম্পর্কে কোনো আলোকপাত করেননি। তবে মনে হয় নাট্যরসিক হিসেবে তিনি মোটামুটি বুঝতেন যে, নায়কের জীবনের যথেষ্ট দুঃখ-দুর্দশাই ট্র্যাজেডির বোধটিকে সৃষ্টি করে। তিনি একটি কৌতূহলজনক প্রসঙ্গের

---

২৩. "Being moved by fear and pity of the unhappiness of others..."
—ibid, p. 58.

অবতারণা করেছেন যা থেকে এই ধারণা করা চলে: ম্যাসিডনের রাজা আর্কিলাউস (Archelaus) একদিন ইউরিপিডিসকে অনুরোধ করেন, তাঁকে অবলম্বন ক'রে একখানি ট্র্যাজেডি-রচনা করতে। কিন্তু রাজার জীবনে যথেষ্ট দুর্ভাগ্যের অভাব থাকায় ইউরিপিডিস অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন।[২৪]

স্ক্যালিগারের পরে কস্তেলভেত্রো নাট্যতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে ট্র্যাজেডি সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। তাঁর একটি উক্তি খুবই উল্লেখযোগ্য: তিনি বলেছেন, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, করুণ পরিসমাপ্তি ছাড়া ট্র্যাজেডি 'ভয়' বা 'করুণা'—এর কোনোটিই উদ্রিক্ত করতে পারে না, এবং করেও না।[২৫] ট্র্যাজেডি সম্পর্কিত এ যাবৎ আলোচনায় অভিজ্ঞতার দাবি কেউ তোলেন নি। কস্তেলভেত্রো যে অভিজ্ঞতার কথা তুললেন, তাতেই বোঝা যায় যে, শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা সর্বদা অভিজ্ঞতাকে অনুসরণ করে না, বা অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত হয় না। শাস্ত্রীয় নির্দেশ ব্যতীত মানুষের একটা স্বাভাবিক সংস্কার আছে (স্থায়িভাব), যে সংস্কারের সাহায্যে সে একটা বিশেষ রসের স্বাদ নিতে পারে। ট্র্যাজেডির ভয় ও করুণার জন্য মানুষের সেই স্বাভাবিক রসসংস্কার যে কাহিনীর একটা দুঃখময় পরিণতি প্রত্যাশা করে, এ থেকেই বোঝা যায় যে ঐ দুঃখময় পরিণতি থেকে বেরিয়ে আসে যে করুণা বা শোচনার ভাব, সেইটাই ট্র্যাজেডির মূল ভাব,—ভয়ের ভাবটি এরই উপর নির্ভরশীল।

রেনেসাঁসের যুগের নাট্যতাত্ত্বিকদের প্রভাব সপ্তদশ শতাব্দীতে ছিল। এই-জন্য সপ্তদশ শতাব্দীতে নতুন কোনো আলোচনা হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভিত্তোরিও আলফিয়েরি নামে এক নাট্যকার ট্র্যাজেডি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন, তবে সে আলোচনার কোনো লিখিত পাঠ পাওয়া যায় না। আধুনিককালের ইতালীতে ফ্রান্সেসকো ডে স্যাঙ্কতিস এবং বেনেডেট্টো ক্রোচে এই দু'জন সুবিখ্যাত নন্দনতাত্ত্বিক জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁরা নাটক বা ট্র্যাজেডি সম্পর্কে কিছু বলেন নি। আধুনিক ইতালীতে নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কে প্রাচীনকালের পরিপ্রেক্ষিত বিশেষ কিছুই হয় নি।

---

২৪. Euripides replied: Indeed, I cannot do it; your life presents no adequate misfortune."

২৫. "Tragedy without a sad ending cannot excite and does not excite, as experience shows, either fear or pity." —Ibid, p. 65.

এইভাবে ইতালীয় ট্র্যাজেডি-তত্ত্ব বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যায় যে ইতালীয়রা ট্র্যাজেডির প্রকৃত রস হিসেবে করুণরসকেই মূলতঃ বুঝেছেন এবং সেইসূত্রে ট্র্যাজেডির করুণ-রস নিষ্পত্তির দিকে সতর্ক থেকেছেন।

ফরাসী দেশে বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকায় বা বিভিন্ন আলোচনায় প্রসঙ্গতঃ নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কে কিছু কিছু উল্লেখ বহুকাল থেকেই দেখা যায়। এ সবের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'চ্ছে টমাস সিবিলের (Thomas Sibilet, 1512-1589) 'কাব্যকলা' (Art of Poetry, 1548) গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ের The Morality সম্পর্কে আলোচনা। তিনি এখানে যা বলেছেন,[২৬] তা থেকে এই কথাটা মনে করা যেতে পারে যে, উন্নত বিষয়বস্তু সম্বলিত নাটকের পরিণতি দুঃখ বা বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলেই তাকে ট্র্যাজেডি ব'লে স্বীকার করা যায়। যদিও এই সাহিত্য-শাস্ত্রী ট্র্যাজেডির স্বরূপ লক্ষণ নিয়ে এখানে গভীরভাবে কোনো তাত্ত্বিক আলোচনা করেননি, তথাপি তাঁর এই উক্তিটি থেকে ট্র্যাজেডি সম্পর্কে একটা সাধারণবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এবং এই বোধটিই ট্র্যাজেডির ট্র্যাজেডিত্ব নির্ণয়ে সবচেয়ে বেশী সহায়ক, কারণ এর মধ্য থেকেই ট্র্যাজেডির রস এবং স্বাদ সম্পর্কে কিছু বুঝতে পারা যায়। ট্র্যাজেডির বেদনাময় পরিণতির মধ্য দিয়েই যে ট্র্যাজেডির প্রকৃত স্বাদটি পাওয়া যায়, তা এই সাহিত্য-শাস্ত্রীর কথা থেকে বোঝা যায়।

সিবিলের পরে উল্লেখযোগ্য জঁ্যা দ্য লা তেল্ (Jean de la Taille) তিনি শুধু একজন তাত্ত্বিক ছিলেন না, একজন নাট্যকারও ছিলেন। তিনি একটি নাটকের ভূমিকায় ট্র্যাজেডি সম্পর্কে যা বলেছেন, তাঁর মূলকথা হল, জীবনের মর্মান্তিক দুঃখের অশ্রু-সজল বিবরণই ট্র্যাজেডির উপজীব্য বিষয়।[২৭]

---

২৬. "The French Morality in some way represents Greek and Latin tragedy, principially in that it treats of grave and important subjects. If the French had managed to make the ending of the Morality invariably sad and dolorous, the Morality would now be a tragedy."

—European Theories of Drama, (1947), p. 75.

২৭. "Its true province is the depiction of the pitiful ruin of lords, the inconstancy of fortune, banishments, wars, pests, famines, captivity and the execrable cruelties of tyrants ; in short, tears and extreme misery."

—European Theories of Drama, (1947), p. 76.

তিনি এখানে আরো বুঝিয়েছেন যে সুস্পষ্ট কারণ বশতঃ যে দুঃখ-বেদনা আমাদের জীবনে প্রত্যহ ঘটে, তা নিয়ে কোনো ট্র্যাজেডি রচিত হতে পারে না। স্বাভাবিক মৃত্যু, শত্রুর হাতে মৃত্যু, আইনের বিচারে মৃত্যুদণ্ড প্রভৃতি কখনোই ট্র্যাজেডির বিষয় হতে পারে না। কারণ, এই সব ঘটনা কখনোই আমাদের চিত্তকে আলোড়িত করেনা। আমাদের চক্ষুকে অশ্রুসিক্ত করেনা। যে ধরনের ঘটনা আমাদের চিত্তে দুঃখকে উদ্রিক্ত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব আবেগে আমাদের চিত্তকে আপ্লুত করে সেই ধরনের ঘটনাই ট্র্যাজেডির বিষয় হবে। কোনো ঘটনা, তা যত দুঃখপূর্ণই হোক না কেন, তা যদি এই আবেগকে সৃষ্টি করতে না পারে, তা হলে তা কখনোই ট্র্যাজেডির বিষয় হবেনা।[২৮]

তেল্-এর এই তত্ত্বটি ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের অলৌকিক রসবাদের সঙ্গে তুলনীয় হয়ে পড়ে। ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, সাধারণ শোকের ঘটনা যখন কবির ভাষায় অলৌকিত্ব লাভ করে, তখনই আমরা এক অপূর্ব আবেগে ঘটনাটির করুণ রসের আস্বাদ লাভ করি। তেল্ও সেইভাবে বলেছেন, জগতের নিত্য-নৈমিত্তিক দুঃখ-বেদনার ঘটনাকে ট্র্যাজেডি বলা যায় না। সেই ঘটনা যখন আমাদের চিত্তকে আবেগে মথিত করে তোলে এবং সেই আবেগ মথিত চিত্তে যখন আমরা সেই ঘটনাটির দুঃখে অভিভূত হই তখনই তা হয় ট্র্যাজেডি। সুতরাং ট্র্যাজেডির রসাবেদন সম্পর্কে তেল্ এখানে যা বলেছেন, তাতে দেখা যায় যে, ভারতীয় করুণ রসের সঙ্গে ট্র্যাজেডির রসের একটা আশ্চর্য মিল আছে। এখানে লক্ষণীয় যে, তেল্ কেবল দুঃখের, শোচনার কথাই বলেছেন, ভয় বা ভীতির কথা আদৌ বলেননি। তাহলে একথা মনে করা যেতে পারে যে, ট্র্যাজেডির প্রকৃত রস সৃষ্টির ব্যাপারে ভীতির ভাবের কোন ভূমিকা আছে বলে তেল্ মনে করেননি। এ্যারিস্টটল 'শোচনা' ও 'ভীতির' কথা বলেছেন, সেনেকা শুধু ভীতির দিকেই ঝুঁকেছিলেন, আর তেল্ কেবল দুঃখ বা শোচনার কথাই বলেছেন। তাই মনে হয়, দেশ কালের মানুষের স্বভাব ও রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে ট্র্যাজেডি সম্পর্কে ধারণার ও পরিবর্তন হয়,—ট্র্যাজেডি সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট চিরকালের গ্রহণযোগ্য ধারণা বোধ হয় এই জন্যই তৈরী হতে পারে না।

---

২৮. Ibid, p. 77.

ফরাসী ট্র্যাজেডি রচয়িতারাও ট্র্যাজেডি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে রাসিনের (Jean Racine, 1639—99) আলোচনা উল্লেখযোগ্য। রাসিন তাঁর 'এ্যাণ্ড্রোম্যাক্' নাটকের ভূমিকায় এ্যারিস্টটলের মতের প্রতিধ্বনি ক'রে ট্র্যাজিক চরিত্র সম্পর্কে যা বলেছেন,[২৯] তার মধ্যে দেখা যায় যে, তিনি ট্র্যাজেডির মধ্য দিয়ে দুঃখ বা শোচনার ভাবটিকেই ফুটিয়ে তুলতে চান। এ্যারিস্টটল এবং হোরেসের প্রভাব তাঁর উপরে থাকায় তিনি গ্রীক (এবং হয়তো সেনেকারও) আদর্শে নাটক রচনা করতেন। তাই কিছু হত্যাদৃশ্য তাঁর নাটকে আছেই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁর নাটকে শোচনার ভাবটি ফুটে উঠেছে নায়ক-নায়িকার দুর্দশায়, তাঁদের আবেগ-তীব্র প্রেমে। মানসিক দ্বন্দ্ব এবং আবেগ-তীব্র প্রেমের কাহিনী নিয়ে তিনিই প্রথম ট্র্যাজেডি রচনা করলেন ফরাসী সাহিত্যে, এবং তার মধ্য দিয়ে তিনি বস্তুতঃ শোচনার ভাবটিকেই ফুটিয়ে তুললেন।[৩০]

রাসিনের আর একখানি ট্র্যাজেডি 'বেরেনিস্' (Berenice. 1670)। এই নাটকের আখ্যানে করুণা সৃষ্টির জন্যই নাট্যকার তাঁর সমস্ত সাফল্য দাবী করেছেন। নাটকটির আখ্যান ভাগের সরলতার জন্য যে অভিযোগ উঠেছিল, তার উত্তর প্রসঙ্গে নাট্যকার যা বলেছেন,[৩১] তা থেকেই নাট্যকারের করুণ রস প্রবণতা এবং নাটকটির করুণ-রসাধিক্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

---

২৯. "He (Aristotle) does not want them (tragic characters) to be extremely good, because the punishments of good men would excite indignation, rather than pity in the audience; nor that they be excessively bad, because there can exist no pity for a scoundrel."

—European Theories of Drama, (1947), p. 155.

৩০. এইখানেই অন্যতম বিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার কর্নেই (Pierre Corneille)-এর সঙ্গে রাসিনের পার্থক্য—এবং এর মধ্য দিয়েই যে রাসিন তাঁর ট্র্যাজেডিতে অধিকতর কারুণ্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, সে সম্পর্কে একজন গবেষকের মন্তব্য,—"He differed from Corneille... by placing in most of his tragedies greater emphasis upon love and upon the inner struggle, by seeking more frequently to rouse pity rather than admiration,"

—Lancaster; A History of French Literature in the Seventeenth Century (1942), Part V, p. 92.

৩১. "Let them leave to us the trouble of interpreting Aristotle's theory of poetry, and reserve for themselves the pleasure of weeping and being moved." —European Theories of Drama, (1947), p. 156.

সুতরাং একথা বেশ স্পষ্ট করেই বোঝা যায় যে, ফরাসী নাট্যকারেরা এবং নাট্যতাত্ত্বিকেরা অত্যন্ত রস-সচেতন ছিলেন। নিজেদের রসবোধের সমর্থন না পেলে তাঁরা কোনো প্রচলিত তত্ত্বকেই মানতেন না। এই জন্যই ট্র্যাজেডি সম্পর্কে এ্যারিস্টটলের যে তত্ত্ব, তা ফরাসীদের কাছে অমোঘ ব'লে গৃহীত হয়নি। তাঁরা ট্র্যাজেডি রচনা করেছেন নিজেদের রসবোধের সঙ্গে সুর মিলিয়ে। ট্র্যাজেডির মধ্যে ভীতির ভাবকে ফুটিয়ে তোলার আদর্শের সঙ্গে তাঁদের রসবোধের সুর মেলেনি। ফরাসী ট্র্যাজেডি-রচয়িতাদের এই মনের কথা খুব স্পষ্ট করে বলেছেন ফ্রাঁসোয়া অগিয়ের (Francois Ogier) এবং সেণ্ট এভ্রেমণ্ড (Saint Evremond).

ফ্রাঁসোয়া অগিয়ের একখানি নাটকের ভূমিকায় (১৬২৮) গ্রীক এবং লাতিন সাহিত্যতত্ত্ব অনুসরণ করতে গিয়ে ফরাসী কবিরা যে ব্যর্থতা প্রকাশ করেছিলেন, সে সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, যে, এই সব অনুকরণ-প্রিয় ফরাসী কবিরা এই কথাটা বিবেচনা করলেন না যে, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রকার রুচি।[৩২] সুতরাং এ্যারিস্টটলের গ্রীক আদর্শে ট্র্যাজেডি রচনা করতে চাইলে, ফরাসী নাট্যকারেরা যে ফরাসী মেজাজ অনুযায়ী ট্র্যাজেডি রচনা করতে পারবেননা, এবং রস-স্রষ্টা হিসেবে যে ব্যর্থ হবেন, তা বলা বাহুল্য। তার চেয়ে গ্রীক আদর্শের কাঠামোর মধ্যেই ফরাসী রসতৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যদি কিছু কিছু পরিবর্তনকে স্বীকার ক'রে নেওয়া যায়, তবে প্রকৃত ফরাসী ট্র্যাজেডি রচিত হতে পারে। এই কথাই অগিয়ের ফরাসী ট্র্যাজেডি রচয়িতাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন।[৩৩] এই জন্যই ফরাসী ট্র্যাজেডির

---

৩২ "They (French Dramatists) did not consider that the taste of nations is different, as well in matters pertaining to the mind as in those of the body, and that, just as the moors, and without going so far, the Spaniards, imagine and prefer a type of beauty quite different from that which we prize in France."

—European Theories of Drama, (1947), p. 121.

৩৩. "...the Greeks worked for Greece, and were successful in the judgement of the cultured people of their day, and that we shall imitate them much better if we grant something to the genius of our own country and to the preferences of our language, than if we compel ourselves to follow step by step their plan and their style as a few of our writers have done,"

—European Theories of Drama, (1947), p. 121.

মধ্যে (সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত) গ্রীক নেমেসিসের কঠোরতা এবং তজ্জনিত ভয়াল পরিস্থিতি প্রায়শঃই অনুপস্থিত, এবং পরিবর্তে ফরাসী রুচি, বিশ্বাস ও জীবনধর্ম অনুসারে বেদনা এবং অশ্রুরই প্রাধান্য। অগিয়ের যে নাটকটির (Tyre and Sidon) ভূমিকায় এই কথাগুলি বলেছেন, সেই নাটকটির মধ্যেও এই পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য করা যায়।

পূর্বে জ্যাঁ দ্য লা তেল্-এর ট্র্যাজেডি-তত্ত্ব আলোচনায় যে বিশিষ্ট মনোভাবের সন্ধান পাওয়া গেছে, অর্ধশতাব্দী পর অগিয়েরের ভাষায় তার প্রকাশ্য সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। এটা একটা লক্ষণীয় ব্যাপার।

অগিয়ের-এর এই বক্তব্যকেই আরো গুছিয়ে ব্যক্ত করেছেন সেণ্ট এভ্রেমণ্ড। তিনি প্রাচীন ট্র্যাজেডি ও আধুনিক ট্র্যাজেডির তুলনামূলক আলোচনায় (De la Tragedie ancienne et moderne, 1672) তাঁর বক্তব্যকে পেশ করেছেন। এ্যারিস্টটলের ট্র্যাজেডিতত্ত্বের মানদণ্ডে যে পৃথিবীর সর্বদেশের এবং সর্বকালের ট্র্যাজেডির ট্র্যাজেডিত্ব পরিমাপ করতে হবে, একথা গোড়াতেই খারিজ কোরে দিয়েছেন সেণ্ট এভ্রেমণ্ড।[৩৪] তিনি এ্যারিস্টটলের ক্যাথারসিস তত্ত্বেরও কঠোর সমালোচনা করেছেন ; বলেছেন, এটা একটা হাস্যকর তত্ত্ব। সম্ভবতঃ যে পরিস্থিতি এবং যে পরিবেশের মধ্যে এ্যারিস্টটল এই ক্যাথারসিস তত্ত্বকে গড়ে তুলেছিলেন, সেই পরিস্থিতি ও পরিবেশের অভাবে অন্য দেশ ও অন্য জাতির মধ্যে এই ক্যাথারসিস তত্ত্বের কোনো অর্থই থাকে না। এইজন্যই 'শোচনা' ও 'ভীতি' বলতে এ্যারিস্টটল যা বুঝতেন, অন্যদেশ বা অন্যজাতি তা বুঝবে না। সুতরাং ট্র্যাজেডির রস দেশকালের বিভিন্নতায় বিভিন্নভাবে গৃহীত হবেই। সেণ্ট এভ্রেমণ্ড এই কথাটাই বুঝিয়েছেন। ট্র্যাজেডির রসাবেদন তাঁর কাছে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ছিল। এ্যারিস্টটল কথিত 'ভীতি' ও 'করুণা'র তিনি সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন,

---

৩৪. "Aristotle's Art of Poetry is an excellent piece of work ; but, however, there's nothing so perfect in it as to be the standing rules of all nations and all ages......as our philosophers have observed errors in his physics, our poets have spied out faults in his poetics, at least with respect to us, considering what great change have undergone since his time."

—European Theories of Drama, (1947), p. 164.

কারণ এগুলি তাঁরা কাছে এক ভিন্নতর স্বাদ বহন করত।[৩৫] ট্র্যাজেডির রসাবেদনের অপরিবর্তনীয়তার প্রতি এরূপ অস্বীকৃতি এবং যুগে যুগে ও দেশে দেশে ট্র্যাজেডির বিভিন্ন প্রকার রসনিষ্পত্তির সম্ভাবনাকে প্রতিপন্ন করাই ফরাসী ট্র্যাজেডি চেতনার সবচেয়ে বড়ো অবদান।

প্রকৃতপক্ষে ফরাসীদের এই পৃথক রুচি ও রসবোধের জন্য তাঁরা একমাত্র ইউরিপিডিস ছাড়া অন্য কোনো গ্রীক ট্র্যাজেডি রচয়িতাদের বিশেষ আমল দেননি। হেন্‌রি ক্যারিংটন ল্যাঙ্কাস্টার সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী নাটক নিয়ে সুদীর্ঘ গবেষণা ক'রে ফরাসী নাটকে গ্রীকপ্রভাব সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ঈস্‌কাইলাসের কোনোই প্রভাব ছিলনা, সফোক্লিসেরও প্রভাব খুব কম। প্রভাব ছিল কেবল ইউরিপিডিসের।[৩৬] করুণরসপ্রধান ইউরিপিডিসের নাটক ফরাসীদের প্রিয় হওয়াটা, ট্র্যাজেডি সম্পর্কে ফরাসীদের একটা পৃথক রসবোধেরই সাক্ষ্য দেয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভলতেয়ার এবং দিদেরো নাট্যতত্ত্ব নিয়ে পাণ্ডিত্য-পূর্ণ আলোচনা করেছেন। কিন্তু এঁদের আলোচনায় ট্র্যাজেডির রস নিষ্পত্তি সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত নেই,—যা আমাদের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এই সময়েই

---

৩৫. "Our theatrical representations are not subject to the same circumstances as those of the ancients were, since our fear never goes so far as to raise this superstitious terror, which produced such ill effects upon valor. Our fear, generally speaking, is nothing else but an agreeable uneasiness, which consists in the suspension of our minds : 'tis a dear concern which our soul has for objects that draws its affection to them.

We may almost say the same of pity as 'tis used on our stage. We divest it of all its weakness, and leave it all that we call charitable and human. I love to see the misfortune of some great unhappy person lamented ; I am content with all my heart that he should attract our compassion : nay, sometimes, command our tears ; but then I would have these tender and generous tears paid to his misfortunes and virtues together, and that this melancholy sentiment of pity be accompanied with vigorous admiration, which shall stir up in our souls a sort of an amorous desire to imitate him." —European Theories of Drama, (1947), p. 166.

৩৬. "Despite their talk of Aristotle, who would have recommended Oedipus Rex, French dramatists preferred the more emotional qualities of Euripides in the time of Rotrou and in that of Racine."

—H. C. Lancaster : A History of French Dramatic Literature Part V, (1942) p. 27.

ব্যুমারশে (Beaumarchais) ট্র্যাজেডি সম্পর্কিত আলোচনায় ট্র্যাজেডির মূলরস-সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। এঁর প্রকৃত নাম Pierre Augustin Caron (1732—99), তবে ব্যুমারশে নামেই তিনি পরিচিত। তিনি তাঁর 'গভীর ভাবাত্মক নাটক সম্পর্কিত প্রবন্ধে' ট্র্যাজেডির প্রকৃত রস কোন্‌টি, সেদিকে আলোকপাত করেছেন। তিনি গ্রীক ট্র্যাজেডির ভয়ের ভাবের মধ্যে ট্র্যাজেডির প্রকৃত রস খুঁজে পাননি। কারণ তাঁর ধারণায় ট্র্যাজেডির প্রকৃত রস নির্ভর করে যে শোকের ভাবের উদ্রেকের উপর,—যে স্বতোৎসারিত চোখের জলের মধ্যে, গ্রীক ট্র্যাজেডির মধ্যে তা তিনি পান না, বরং পরিবর্তে পেয়েছেন প্রচণ্ড ভীতি, যা প্রকৃত ট্র্যাজেডি রসের পরিপন্থী মনে হয় তাঁর কাছে।[৩৭]

সুতরাং ব্যুমারশের মতে স্বতোৎসারিত শোকই ট্র্যাজেডির প্রকৃত রসের নিষ্পত্তি করে, এবং তা থেকেই আমরা ট্র্যাজেডির যথার্থ নন্দন তৃপ্তি পাই।

উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী নাট্যচিন্তায় প্রচণ্ড আধুনিকতার ছাপ রয়েছে। এই সময় যাঁরা নাট্যচিন্তা করেছেন, তাদের মধ্যে ভিক্টর হুগো, আলেকজাণ্ডার ডুমা ফিল্‌স্‌, (Alexander Dumas Fils) ফ্রান্সিস্ক সারসি (Francisque Sarcy), এমিল জোলা, ব্রুনটিয়ের (Fardinand Brunetie're), মেটারলিঙ্ক, বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা জীবনের সঙ্গে বা জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কোনো প্রকার কৃত্রিম বিভাজনের উপরই আধুনিক মানুষের আস্থা নেই। তাই আধুনিক

৩৭. "When we see the ancient tragedies, I am seized with a feeling of personal indignation against the cruel gods who allow such terrible calamities to be heaped upon the innocent. Oedipus, Jocasta, Phaedra, Ariadne, Philoctates, Orestes, and many others, inspire more terror in me than interest. Devoted passive beings, blind instruments of the wrath and caprice of the gods, I am more horrified at, than compassionate toward them. Everything in these plays seems monstrous to me : unbridled passions, atrocious crimes, these are as far from being natural as they are unusual in the civilization of our time. In all these tragedies we pass through nothing but ruins, oceons of blood, heaps of slain and arrive at the catastrophe only by way of poisoning, murder, incest and parricide. The tears shed are forced, they seldom flow, and when they do, they are burning hot: they cause the forehead to contract before tears finally flow."

—European Theories of Drama, (1947), p. 304.
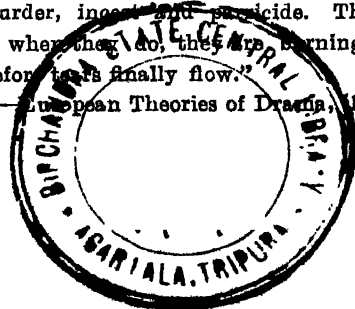
ফরাসী নাট্যতাত্ত্বিকেরাও পরিপূর্ণ ট্র্যাজেডি বা পরিপূর্ণ কমেডি নামে জীবনের অভিজ্ঞতার দুটি বিভাগের প্রতিও বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। অবশ্য ফ্রান্সিস্ সারসি নাটকে ভাবের ঐক্যের (unity of impression) কথা বলেছেন,—বলেছেন শোক বা হাস—নাটকে একটি ভাবেরই প্রাবল্য থাকা উচিত ব্রুনটিয়েরও ট্র্যাজেডিকে উঁচুতে স্থান দিয়েছেন, বলেছেন জীবনে বাসনার পরাভবেই আমাদের সবচেয়ে বড় বেদনা এবং সেইটাই ট্র্যাজেডি। মেটার-লিঙ্কের মতে অনাবশ্যক সংলাপের মধ্যদিয়েই জীবনের প্রকৃত ট্র্যাজেডি ফুটে ওঠে। এঁরা কেউই ট্র্যাজেডির ভাব-রস সম্পর্কে আলোচনা করেননি। তাই স্পষ্ট বোঝা যায় না, তাঁরা কোন্ ভাবটিকে ট্র্যাজেডির মূল ভাব মনে করতেন।

তবে ব্যুমারশে পর্যন্ত প্রাগাধুনিক ফরাসী ট্র্যাজেডি-চেতনার ইতিবৃত্তে দেখা যায়, প্রাগাধুনিক ফরাসীদের কাছে জীবনের দুঃখের দিকের নাট্য-রূপায়ণই প্রকৃত ট্র্যাজেডি হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। 'শোচনার' ভাবটিই ট্র্যাজেডির মূল ভাব হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল। এর সঙ্গে বাঙ্গালীর ট্র্যাজেডি-চেতনার মিল আমাদের লক্ষনীয় হবে।

জার্মানীতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে সাহিত্যের সাধারণ সমালোচনার ধারার মধ্য দিয়েই জার্মাণ নাট্যতত্ত্ব আলোচনা সুরু হয়। যাঁরা প্রথম যুগে নাট্যতত্ত্ব আলোচনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে লেসিং উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি।

গটহোল্ড এফ্রাইম লেসিং (Gotthold Ephraim Lessing 1729-1781) তাঁর 'হামবুর্গ ড্রামাটার্জি' (১৭৬৯) প্রবন্ধে নাট্যকলা এবং নাট্যরস সম্পর্কে যুগান্তকারী আলোচনা করেছেন। তিনি মূলতঃ এ্যারিস্টটলকেই অনুসরণ করেছেন, এবং এ্যারিস্টটলের নাট্যতত্ত্ব তথা ট্র্যাজেডিতত্ত্বের নতুন ক'রে ভাষ্য দিয়েছেন।

ট্র্যাজেডির কলা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন তাঁর প্রবন্ধের ৩৮ নং অনুচ্ছেদে। সেখানে তিনি এ্যারিস্টটলকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, ট্র্যাজিক এ্যাকশনের জন্য এ্যারিস্টটল তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করতেন,—(১) পরিস্থিতির বা ভাগ্যের পরিবর্তন (Peripety) (২) প্রত্যভিজ্ঞান (Recognition) এবং (৩) দুঃখ (Pathos) এর মধ্যে আবার তিনি তৃতীয় বিষয়, অর্থাৎ দুঃখের উপরই সবচেয়ে বেশী নির্ভর করতেন, ট্র্যাজিক এ্যাকশন তৈরী করার জন্য। লেসিং বলেছেন, প্রথম দুটি বিষয়ের দ্বারা কেবলমাত্র একটা সরল কাহিনীকে জটিল

কোরে তোলা যায়, বৈচিত্র্যময় এবং উপভোগ্য কোরে তোলা যায়। এ দু'টি ছাড়াও কাহিনীর সম্পূর্ণতা এবং মহনীয়তা বজায় থাকতে পারে, কিন্তু তৃতীয় বিষয়টি, অর্থাৎ দুঃখের বিবরণ ছাড়া ট্র্যাজেডি হয়ই না।[৩৮] লেসিং এর মতে দুঃখের দৃশ্য থেকেই শোক এবং ভয় দুইই জাগবে,—মানুষের দুর্ভাগ্য দেখে যেমন আমরা হই শোকার্ত, তেমনিই হই ভয়ার্ত। ভয়ার্ত হয় এই ভেবে যে, অনুরূপ ভাগ্যবিপর্যয় যদি আমারই জীবনে ঘটে বা অনুরূপ আত্মনাশী কার্যকলাপে যদি আমিও প্রমত্ত হয়ে পড়ি।[৩৯] এখন এই ধরনের ভয় আমরা যে কোনো দুঃখের ঘটনা থেকেই পেতে পারি। রাবণের বিপর্যয় বা সীতার পাতাল প্রবেশের ঘটনা থেকেও এই ভয় আমরা পেতে পারি। ভয়ের ভাব বলতে এখানে লেসিং নিশ্চয়ই তা বুঝছেন না, গ্রীক নাট্যকারেরা বা সেনেকা যা বুঝতেন। তাঁরা ভয়ের ভাবকে ফুটিয়ে তোলার জন্য ভয়ানক দৃশ্যের অবতারণা করতেন। কিন্তু এখানে লেসিং ভয়ানক দৃশ্যের উপস্থাপনার কথা বলছেন না, তিনি ভয়ের ভাবকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য নির্ভর করছেন করুণ দৃশ্যের উপর। এটাই উল্লেখযোগ্য।

এই করুণ-দৃশ্য সম্বলিত নাটককেই আমরা করুণ রসাত্মক নাটক বলি। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে, লেসিং এর দৃষ্টিতে যা ট্র্যাজিকবোধ, তা আমাদের করুণ রসাত্মক নাটক বা কাহিনীতেও প্রাপ্তব্য হ'তে পারে।

লেসিং এর পরে জার্মাণ নাট্যতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শিলার Friedrich Von Schiller (1759-1805)। তিনি তাঁর ট্র্যাজেডির শিল্পকলা নামক প্রবন্ধে ট্র্যাজেডির মূল ভাব এবং আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার সুরুতেই এ্যারিস্টটলের সঙ্গে তাঁর একটা মস্তবড় পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ট্র্যাজেডির মূলভাব সম্পর্কে এ্যারিস্টটল যেখানে

৩৮. But without the third we conceive of no tragical action; every tragedy must have some form of suffering,......be its fable simple or involved, for herein lies the actual intention of tragedy, to awaken fear and pity.

—European Theories of Drama, (1947), p. 264.

৩৯. "......We suddenly find ourselves......full of terror at the consciousness that a similar stream might also thus have borne ourselves away to do deeds which in cold blood we should have regarded as far from us."

—European Theories of Drama, (1947). p. 261.

'শোচনা' ও ভীতির উল্লেখ করেছেন, শিলার সেখানে উল্লেখ করেছেন কেবল শোচনার, এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি ট্র্যাজেডির সম্পূর্ণ নতুন একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন।[৪০] এই সংজ্ঞার দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, শিলার ক্যাথারসিসতত্ত্বের ধার দিয়েও যাননি। তিনি যা বলেছেন, তার সার কথা হচ্ছে এই যে, ট্র্যাজেডি সৃষ্টির সময় কবি শুধু করুণাসৃষ্টির দিকেই নজর রাখবেন। তিনি কবি হিসেবে অনেক কিছুই অবলম্বন করতে পারেন, কিন্তু এই করুণাসৃষ্টির সহায়ক নয়, এমন কোনো উপায় গ্রহণ করা থেকে তিনি বিরত থাকবেন।[৪১]

তিনি ট্র্যাজেডির আঙ্গিক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, ট্র্যাজিক চরিত্রের শোচনীয় পরিণতি ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। দৈবিক সংযোগ-সম্পন্ন বহু ঘটনার মধ্যদিয়ে এই শোচনীয় পরিণতি না দেখালে, আমাদের মধ্যে সহানুভূতি জাগবে না, আর সহানুভূতি না জাগলে 'শোক' ভাবও উদ্রিক্ত হবে না। তাঁর কথায়, ট্র্যাজিক চরিত্রের প্রতি আমাদের মমত্ববোধই তাদের প্রতি আমাদের শোকার্ত কোরে তোলে।[৪২]

শিলারের এই আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ট্র্যাজেডির মূল ভাব সম্পর্কে তিনি শুধু 'করুণা'কেই বুঝেছিলেন। ট্র্যাজেডির মধ্যদিয়ে ভয়ের ভাবও যে উদ্রিক্ত হবে,—এমন কোনো কথা শিলার বলেননি। সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর রুচি ও রসবোধের ব্যক্তিগত প্রকাশ ঘটেছে তাঁর এই ট্র্যাজেডিতত্ত্বের আলোচনায়। এ সম্পর্কে কোনো পূর্ব-সংস্কার তাঁর ট্র্যাজেডির রসাস্বাদ গ্রহণে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তাঁর আলোচনায় যখন তিনি ঈডিপাসের কথা এবং ইয়াগোর কথা উল্লেখ করেছেন, তখন এ কথা ধরে

---

৪০. "Tragedy might be defined as the Poetic imitation of a coherent series of particular events (forming a complete action): an imitation which shows us man in a state of suffering and which has for its end to excite our pity." —European Theories of Drama, (1947), p. 320.

৪১. Many means the tragic poet tekes might serve another object; but he frees himself from all requirements not relating to this end, and is thereby obliged to direct himself with a view to this supreme object.
—Ibid, p. 322.

৪২, "If we do not feel that we ourselves in similar circumstances should have experienced the same feelings and acted in the same way, our pity would not be awakened." —Ibid, p. 321.

নেওয়া যেতে পারে যে, বহু সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সর্বজন-স্বীকৃত ট্র্যাজেডির তিনি রসাস্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। এবং এই রসাস্বাদ গ্রহণের সময় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় তিনি বোধহয় ট্র্যাজেডির মধ্যে কেবল করুণ রসেরই আস্বাদ খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই ট্র্যাজেডি সম্পর্কিত তত্ত্বালোচনায় এবং ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা নির্ণয়ে তিনি করুণ রসের কারণ হিসেবে 'শোক' ভাবটিকে নাটকের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার আবশ্যিকতার কথা বলেছেন এমন ভাবে। দেশ-কালের বিভিন্নতায় ট্র্যাজেডির রসাস্বাদও যে বিভিন্ন হতে পারে, শিলারের আলোচনা থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

জার্মান মহাকবি গ্যেটে নানা প্রকার আলাপ আলোচনায় সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেছেন (১৮৩৮—৪৮ এর মধ্যে)। এই সব আলাপ-আলোচনায় ট্র্যাজেডির ভাব-রস সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, তাতে দেখা যায় যে, ট্র্যাজেডির মূল ভাব হিসেবে তিনি দুঃখকেই বুঝেছেন। মলিয়েরের Miser নাটকটির আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, এই নাটকটি প্রায় ট্র্যাজেডির কাছাকাছি চলে গেছে। কারণ, পিতা ও পুত্রের মধ্যকার স্বাভাবিক বাৎসল্য-শ্রদ্ধার সম্পর্কটির ধ্বংস হয়ে যাওয়াটা খুবই ট্র্যাজিক।[৪৩] কারণ, আমরা সহজেই বুঝি, ব্যাপারটি বেদনার। আর এই বেদনার ব্যাপারটিই Miser নাটকে দেখানো হয়েছে। গ্যেটে বোধহয় মনে করতেন যে, বেদনা যেখানে অসহনীয় হয়ে ওঠে, সেখানেই প্রকৃত ট্র্যাজেডি ফুটে ওঠে।[৪৪]

এ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডিতে করুণার সঙ্গে ভীতির ভাবের বজায় থাকার কথা বলেছেন, এবং গ্যেটে এ্যারিস্টটলের ট্র্যাজেডি-তত্ত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তথাপি তিনি ভীতির ভাবকে বাদ দিয়ে কেবল দুঃখ এবং অসহনীয় দুঃখের অবস্থিতির মধ্যেই ট্র্যাজেডির রস খুঁজে পেয়েছেন।

গ্যেটের এই আলাপ-আলোচনারই শেষের দিকে লক্ষ্য করা যায় যে তিনি ভয়ের ভাবকে ট্র্যাজেডির একটা ভাব হিসেবে আপাততঃ স্বীকার করছেন।

---

৪৩. "His Miser, where the vice destroys all the natural piety between father and son, is especially great, and in a high sense tragic."

—Ibid, p. 329.

৪৪. "But what is tragic there, or indeed every where, except what is intolerable ?"

—Ibid, p. 329.

তিনি এ্যারিস্টটলের নামে একটি উক্তির উল্লেখ করেছেন যে, ভালো ট্র্যাজেডি হ'তে হলে ভয়ের ভাবকে উদ্রিক্ত করতেই হবে। এবং তারপর সেই সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, একথা কেবল ট্র্যাজেডি সম্পর্কেই সত্য নয়, সাহিত্যের অন্যান্য রূপ সম্পর্কেও সত্য। তিনি নানা বই-এর উল্লেখ কোরে দেখিয়েছেন যে, কমেডিতে পর্যন্ত এই ভয়ের ভাব বজায় থাকতে পারে। সুতরাং ভয়ের ভাবটি যে কেবল বিশেষ ভাবে ট্র্যাজেডির জন্যই সুনির্দিষ্ট, গ্যেটের আলোচনা থেকে এমন কোনো আলোক পাওয়া যায় না। মনে হয় গ্যেটের মনেও সে রকম কোনো ধারণা ছিলনা। ভয়ের ভাবটিকে বিশেষ পাত্র-পাত্রীর জীবন থেকে নির্বিশেষ সামাজিকের জীবনের মধ্যে সাফল্যের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া, ট্র্যাজেডি সহ যে কোনো ভালো সাহিত্যসৃষ্টিরই সামান্য লক্ষণ হিসাবেই বোধহয় তিনি মনে করতেন। এ্যারিস্টটল যেমন ভয়ের ভাবকে শোকের ভাবের সঙ্গে সংযুক্ত কোরে বিশেষ ভাবে ট্র্যাজেডির জন্য সুনির্দিষ্ট কোরে রেখেছেন, গ্যেটে তা করেননি। অথচ পূর্বেই দেখেছি, দুঃখ বা বেদনার অসহনীয়তাকে তিনি বিশেষভাবে ট্র্যাজেডির ভাব ব'লে স্বীকার করেছেন। সুতরাং গ্যেটের এই আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, দুঃখের ভাবকেই তিনিও ট্র্যাজেডির মূল ভাব হিসেবে মানতেন।

গ্যেটের 'মহাকাব্য ও নাটক' (১৭৯৭) প্রবন্ধেও ট্র্যাজেডির মূল ভাব সম্পর্কে গ্যেটের উপরিউক্ত ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডির বিষয় সম্পর্কে তিনি বলেছেন, মহাকাব্য এবং নাটকের বিষয়-বস্তুকে হতে হবে মানবিক, অর্থপূর্ণ এবং দুঃখময়।[৪৫] এখানে মনে হতে পারে যে মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডির মূল ভাবের মধ্যে গ্যেটে বুঝি কোনো পার্থক্য টানছেন না। কিন্তু একটু পরেই দেখা যায় যে, মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে তিনি সচেতন আছেন। কারণ মহাকাব্যের কবি এবং ট্র্যাজেডির কবির উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, মহাকাব্য মানুষের ব্যাপক এবং সুগভীর কর্মতৎপরতাকে নিয়ে রচিত হয়, আর ট্র্যাজেডি রচিত হয় কেবল মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার দিকটাকে অবলম্বন

---

৪৫. "The subjects of epic poetry and of tragedy should be altogether human, full of significance and pathos." —Ibid, p. 338.

ক'রে।[৪৬] এইজন্যই মহাকাব্যের জন্য দরকার বিশাল পরিসর, কিন্তু ট্র্যাজেডির জন্য দরকার স্বল্প একটু স্থান।[৪৭]

সুতরাং পরিষ্কার ভাবেই বোঝা যায় যে গ্যেটে ট্র্যাজেডির রস এবং আঙ্গিক সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই তিনি দুঃখ-যন্ত্রণাকে যখন ট্র্যাজেডির জন্যই বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট করেন, তখন আমরা সেই দুঃখ-যন্ত্রণাকেই, গ্যেটের মতে, ট্র্যাজেডির মূল ভাবের অর্থাৎ 'শোক' ভাবের উদ্দীপক হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।

গ্যেটের পর বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত শ্লেগেল (August Wilhelm Schlegel, 1767-1845) তাঁর 'নাট্যকলা এবং নাট্যসাহিত্য সম্পর্কিত ভাষণে' ট্র্যাজেডির মূল সুর সম্পর্কে একটা সুন্দর ধারণার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মানুষের মধ্যে দু'টি মনোভাব লক্ষ্য করা যায়, একটি হচ্ছে earnest (অর্থাৎ গভীর মনোভাব), এবং অপরটি হ'চ্ছে sport (অর্থাৎ হাল্কা মনোভাব)। প্রথমটি ট্র্যাজেডির এবং দ্বিতীয়টি কমেডির উপজীব্য। তারপর কিভাবে এই গম্ভীর মনোভাব অর্থাৎ earnestness থেকে ট্র্যাজেডির সুর[৪৩] বেরিয়ে আসে তার ব্যাখ্যা তিনি করেছেন কাব্যপূর্ণ ভাষায়।

ট্র্যাজেডির মূল সুর সম্পর্কে শ্লেগেলের এই ব্যাখ্যা[৪৮] থেকে বোঝা যায়,

---

৪৬. "The epic poem represents above all things circumscribed activity, tragedy circumscribed suffering." —Ibid, p. 338.

৪৭. "Tragedy gives us man thrown in upon himself, and the actions of genuine tragedy therefore stand in need of but little space." —Ibid, p. 338.

৪৮. Earnestness in the most extensive signification, is the direction of our mental powers to some aim. But as soon as we begin to call ourselves to account for actions, reasons compels us to fix this aim higher and higher, till we come at last to the highest end of our existence ; and here that longing for the infinite which is inherent in our being is baffled by the limits of our finite existence. All that we do, all that we effect, is vain and perishable ; death stands everywhere in the background, and to it every well or ill spent moment brings us nearer and closer ; and, even when a man has been so singularly fortunate as to reach the utmost term of life without any grievous calamity, the inevitable doom still awaits him to leave or to be left by all that is most dear to him on earth. There is no bond of love without a seperation, no enjoyment without the grief of losing it. When, however, we contemplate the relations of our existense

মানুষ যে তার সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টার বিনিময়ে পুরো ফললাভ করেনা, বা আদৌ ফললাভ করেনা, এবং সেই কারণে মানুষের জীবনের অন্তর্নিহিত যে বিষাদ সুস্পষ্টভাবে নাট্যে রূপায়িত হয়, তাকেই শ্লেগেল ট্র্যাজেডি বলেছেন। ট্র্যাজেডির মধ্যে যখন তিনি এই বিষণ্ণতার সুরকে খুঁজে পেয়েছেন, তখন বোঝা যায় যে, বিষাদের ভাবই ট্র্যাজেডির মূল ভাব এবং সেই সূত্রে করুণ রসই ট্র্যাজেডির প্রকৃত রস।

কিন্তু লক্ষণীয় যে, তিনি বলেছেন, জয়লাভের জন্য মানুষের প্রচেষ্টা এবং অনিবার্য পরাভব দুটিকেই পাশাপাশি স্থাপন করে পরিণামের বিষাদকে স্থায়ী কোরে তুলতে হবে। বোঝাতে হবে যে, মানুষের এত কর্মপ্রচেষ্টার কোনো মূল্য নেই। তবেই বিষাদের ভাবটি স্থায়িত্ব পাবে।

আবার এটাও লক্ষণীয় যে তিনি সর্বত্রই কেবল বিষাদের কথা বলেছেন। এই বিষাদ থেকে 'করুণা' (pity) ভাবটি জন্মায়। সুতরাং এই 'করুণা'ভাব সম্পর্কে তিনি নিশ্চয়ই অবহিত ছিলেন। কিন্তু তিনি ট্র্যাজেডিতে 'ভয়ের' ভাবের অবস্থিতির কথা বলেননি। ভয়ের ভাবকে বাদ দিয়েই বোধ হয় তিনি ট্র্যাজেডির প্রসঙ্গটি বিবেচনা করতেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে শেক্সপীয়রের নাটকের অনুবাদ করেছিলেন। সেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল। এমন কি গ্রীক-ট্র্যাজেডি

---

to the extreme limit of possibilities ; when we reflect on its entire dependence on a chain of causes and effects stretching beyond our ken ; when we consider how weak and helpless, and doomed to struggle against the enormous powers of an unknown world, as it were shipwrecked at our very birth ; how we are subject to all kinds of errors and deceptions, any one of which may be our ruin ; that in our passions we cherish an enemy in our bosoms ; how every moment demands from us in the name of the most sacred duties the sacrifice of our dearest inclinations, and how at one blow we may be robbed of all that we have acquired with much toil and difficulty ; that with every occasion to our stores the risk of loss is proportionately increased, and we are only the more exposed to the malice of hostile force ; when we think upon all this, every heart which is not dead to feeling must be overpowered by an inexpressible melancholy for which there is no other counterpoise than the consciousness of a vocation transcending the limits of this earthly life. This is the tragic tone of mind ; and when this tone pervades and animates a visible representation of the most striking instances of violent revolutions in a man's fortunes,......then the result is Tragic Poetry." —Ibid, p. 344.

সম্পর্কেও যে ধারণা ছিল, তা মনে করা যেতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে এইসব ট্র্যাজেডি-সাহিত্যের স্বাদ নেওয়ার সময় বোধ হয় তাঁর মনে ভয়ের ভাবের কোনো উপলব্ধি জাগেনি, তাই সে প্রসঙ্গের অবতারণা তিনি করেননি কোথাও। শ্লেগেলের ট্র্যাজেডি-রস রসিকতার সাক্ষ্য নিয়েও বলা যায় যে শোকের ভাবটাই ট্র্যাজেডির মূল ভাব ; করুণ রসেই এর প্রকৃত রস নিষ্পত্তি।

মূলকথা জার্মান নাট্যতাত্ত্বিকেরা (যাঁরা নিজেরাও নাটক রচনা করতেন) মোটামুটিভাবে শোক ভাবকেই যে ট্র্যাজেডির প্রধানভাব বলেছেন তা আলোচনা করে দেখা গেল।

স্পেনের নাট্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে তিনজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—সার্ভান্তিস (Cervantes), লোপ ডি ভেগা (Lope De Vega) এবং টির্সো ডি মোলিনা (Tirso de Molina)—এঁদের তিনজনেরই জীবৎকাল ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী। এঁরা নাট্যতত্ত্ব নিয়ে যে সব আলোচনা করেছেন, তার সবটাই নাট্যআঙ্গিক বিষয়ে, নাট্যরস বিষয়ে নয়। এঁদের মধ্যে সার্ভান্তিস ছিলেন একেবারেই প্রাচীনপন্থী, নাটকের মধ্যে যে কোনোপ্রকার নূতনত্বেরই ঘোরতর বিরোধী। কিন্তু লোপ্ ডি ভেগা এবং টির্সো ডি মোলিনার মধ্যে স্বাধীন নাট্যচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

লোপ ডি ভেগা তাঁর The New Art Of Writing Plays In This *Age (1609)* প্রবন্ধে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে নিজেদের স্বাধীনভাবে নাটক রচনা করার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, প্রাচীন নাট্যরীতি না মানবার জন্য হয়তো ফরাসী এবং ইতালীয়রা তাঁকে মূর্খ বলবে। তথাপি সম্পূর্ণ কবি-বিশ্বাস নিয়ে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে গেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর উক্তিটি সাহিত্য বিচারে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য।[৪৯]

লোপ ডি ভেগার নতুন নাট্যরীতি উদ্ভাবনের ঘোরতর সমর্থক ছিলেন টির্সো ডি মোলিনা। তিনি তাঁর 'The Orchard of Toledo

---

৪৯. "I defend what I have written, and I know that, though they (Italians and French) might have been better in another manner, they would not have had the vogue which they have had ; for sometimes that which is contrary to what is just, for that very reason, pleases the test."

—European Theories of Drama, (1947), p. 93.

(1624) প্রবন্ধে লোপ ডি ভেগার নতুন নাট্যরীতিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন। সাহিত্যতত্ত্বে যে চিরকাল প্রচলিত একটা রীতি থাকতে পারেনা, যুগান্তকারী কবিরা যে যুগে যুগে নতুন নতুন তত্ত্ব সৃষ্টি করে যান,—এমন একটা কথা টির্সো ডি মোলিনা বলেছেন লোপ ডি ভেগাকে সমর্থন করতে গিয়ে।[৫০]

টির্সো ডি মোলিনার এই উক্তিটি নাটকের আঙ্গিকের নতুনতর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে,—যদিও সে কথা টির্সো ডি মোলিনা নিজে বলে যাননি। কিন্তু আমরা দেখেছি, অনেক ফরাসী নাট্যকার এবং নাট্যতাত্ত্বিক ট্র্যাজেডির রস স্বরূপে নতুনতর ব্যাখ্যা নিজেদের রসাস্বাদ অনুসারে দিতে গিয়ে টির্সো ডি মোলিনার মতোই কথা বলেছেন। এই সব কথা থেকে এটাই প্রতিষ্ঠিত হয় সাহিত্যের গঠন ও রসাবেদনের বিশ্লেষণ কোনো একটা প্রচলিত মতকে অবলম্বন কোরে বা একটা প্রচলিত মতের নিরিখে কখনোই যথার্থভাবে সমাধা হতে পারে না, বা সমাধা হওয়া উচিত নয়, কারণ তাতে সাহিত্য বিচারের নামে সাহিত্যের অবিচারই হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন কালের ট্র্যাজেডির রস স্বরূপের বিশ্লেষণ হওয়া উচিত।

স্পেনীয় সাহিত্য প্রকৃতির ট্র্যাজেডির পরিচয় খুব বেশি পাওয়া যায় না। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'দি লিটারেচার অব্‌ দি স্প্যানিশ পীপ্‌ল' (১৯৫১) গ্রন্থে স্পেনীয় নাট্যকারদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার পেড্রো ক্যাল-ডিরন ডি লা বার্কা-র (১৬০০—১৬৮১) তিনখানি ট্র্যাজেডির উল্লেখ আছে। তিনখানি ট্র্যাজেডিই স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সন্দেহ নিয়ে রচিত। এর মধ্যে প্রথম দুখানি ট্র্যাজেডিতে (El Medica de Su Honra এবং A Secreto Agrovio Secreta Venganza) প্রকৃত ট্র্যাজেডি হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করার সুযোগ আছে। কারণ এই দুটি নাটকেই দেখা যায়

---

৫০. "I claim that if the pre-eminence in Greece of Aeschylus and Euripides (as among the Latins of Seneca and Terence) suffices to establish the laws of those masters who are now so vigorously upheld, the excellence of our Spanish Lope de Vega makes his improvements in both styles of play so conspicuous that the authority he brings to this improvement is sufficient to reform the old laws."

—European Theories of Drama, (1947). p. 95.

স্বামী নিছক সন্দেহ বশেই স্ত্রীকে সন্দেহ করেছে, এবং হত্যা করার সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছে যাতে ধরা পড়ে তার সম্মান নষ্ট না হয়। এবং দুটি নাটকের প্রত্যেকটিতেই দেখা যায়, স্ত্রী হত্যার জন্ত স্বামী রাজার সমর্থনও পেয়ে যাচ্ছে। এর মধ্য থেকে যেন এই শিক্ষাই দেওয়া হচ্ছে যে, স্ত্রী বিশ্বাসঘাতিনী হলে তাকে সমুচিত শাস্তিই দেওয়া উচিত। এই ধরনের রূঢ় আদর্শ এমনিতেই সমস্ত প্রকার সাহিত্যরসের পরিপন্থী। তদুপরি এই দুটি নাটকের কোনটারই নায়কের প্রতি আমাদের কোনো সহানুভূতি জাগেনা এবং নায়িকাদের মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তিতেও যে করুণা উদ্রিক্ত হওয়ার কথা ছিল, তাও হয় না। কারণ স্বামীর প্রতি প্রেমের একনিষ্ঠতার দৃষ্টান্ত এই নাটক-টিতে দেখানো হয়নি। স্ত্রী একান্ত ভাবেই পতিগতপ্রাণা, তথাপি স্বামী তাকে সন্দেহ করেছে, এবং মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে, এটা খুবই ট্র্যাজিক, কারণ এর মধ্য থেকে শোচনা বা করুণা জাগে। এই নাটক দুটিতে তা জাগেনি বলেই ট্র্যাজেডির স্বাদ পাওয়া যায় না।

অথচ ক্যালডিরণের তৃতীয় ট্র্যাজেডিতে প্রকৃতই ট্র্যাজেডির স্বাদ পাওয়া যায়। এই নাটকে (Jealousy the Greatest Monster) টেট্রার্ক অব জুডিয়া শত্রু অক্টাভিয়াসের হাতে বন্দী হলে টেট্রার্ক তার পত্নীর সতীত্বনাশের আশঙ্কায় ভৃত্যকে আদেশ করে পত্নী মারিয়ানকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু মারিয়ান এই আশঙ্কা জানতে পেরে অক্টাভিয়াসের "শিভ্যালরি"র কাছে অনুরোধ জানিয়ে স্বামীকে মুক্ত করে। কিন্তু অক্টাভিয়াসের সহবাসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং তার সতীত্ব এবং স্বামীগতপ্রাণতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ টেট্রার্কের একটা ব্যাধি, যার প্রকোপ থেকে সে মুক্ত হতে পারে না। তাই সে শেষ পর্যন্ত স্ত্রীকে হত্যা করে। এখানে অবশ্যই মারিয়েনের প্রতি আমাদের সহানুভূতি জাগে, তার দুঃখে আমরা দুঃখিত হই, এবং টেট্রার্কের অবস্থাবৈগুণ্যের জন্য তার প্রতিও আমাদের সহানুভূতি জাগে। এই জন্যই এই নাটককে গেরাল্ড ব্রেনান বলেছেন একখানি যথার্থ ট্র্যাজেডি।[৫১]

তাহলেই দেখা যাচ্ছে ট্র্যাজিক নায়ক নায়িকার জীবনে দুঃখ-যন্ত্রণার চিত্র-

---

৫১. "Jealously is seen as a monstrous and irresistible passion, and the play is therefore a genuine tragedy."

—Gerald Brenan : The Literature Of The Spanish People (1951) p. 285.

গুলিকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে, যাতে সামাজিকের মনে করুণার ভাবটি জেগে ওঠে। এই করুণার ভাবটি নাট্যকার জাগিয়ে তুলতে ব্যর্থ হলে, ট্র্যাজেডি কখনোই সার্থক হতে পারেনা। তাই প্রথম দুটি নাটকে ট্র্যাজেডি হয়নি, কিন্তু শেষেরটিতে হয়েছে। ট্র্যাজেডির সাফল্যের জন্য শোচনা ভাবের আবশ্যিকতা এখানেই প্রমাণিত হয়।

ইংলণ্ডে সাহিত্য সমালোচনা এবং সেই সূত্রে নাট্যতত্ত্ব আলোচনা সুরু হয় ষোড়শ শতাব্দীতে। ইংলণ্ডে এই সময়ে পিউরিটানদের আক্রমণের হাত থেকে শিল্প সাহিত্যকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়েই ইংলণ্ডে সাহিত্য সমালোচনা তথা নাট্যতত্ত্ব আলোচনা সুরু হয়েছিল। এই সব আলোচনার মধ্যে স্যার ফিলিপ সিড্‌নীর আলোচনা 'An Apologie For Poetry' বা 'A Defence of Poesie' (1595) খুবই বিখ্যাত। ফিলিপ সিডনীর এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, নাটকের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সুদৃঢ়ভাবে প্রাচীনপন্থী। বিখ্যাত এলিজাবেথীয় নাটক সমূহ লিখিত হবার আগেই ফিলিপ সিডনী—এই নাট্যতত্ত্বালোচনাটি লিপিবদ্ধ করেন। তাই ট্র্যাজেডি সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, তার মধ্যে প্রাক্-শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। ট্র্যাজেডির কার্যকারিতা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন, যে, ট্র্যাজেডি বিস্ময় ও শোচনার ভাবকে উদ্রিক্ত কোরে আমাদের বুঝিয়ে দেয় জগৎ ও জীবনের অনিত্যতা, ক্ষণভঙ্গুরতা।[৫২]

প্লুটার্ক কথিত একজন ঘৃণ্য স্বৈরাচারী সম্রাটের উল্লেখ কোরে তিনি বলেছেন, ঐ সম্রাট নিজে নির্দয়ভাবে অসংখ্য নরহত্যা সাধন করলেও, একখানি সুলিখিত ও সু-অভিনীত ট্র্যাজেডি দেখে তিনি প্রভূত অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন।

ফিলিপ সিড্‌নীর এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, ট্র্যাজেডিকে তিনি মানব-চরিত্র শোধনের উপায় হিসেবেই দেখেছিলেন। ট্র্যাজেডির করুণা থেকে নিষ্ঠুর চিত্ত দ্রবীভূত হ'তে পারে,—এ সম্ভাবনা ট্র্যাজেডির মধ্যে তিনি দেখেছিলেন। সুতরাং ট্র্যাজেডিতে করুণা-সৃষ্টির ব্যাপারটা যে প্রাক্-শেক্স-

---

৫২. "......that with stirring the effects of admiration and commiseration, teacheth the uncertainty of this world, and upon how weak foundations guilden roofs are builded."

—European Theories of Drama (1947), p. 104.

গ্রীকরীয় যুগে খুব জরুরী ছিল, তা স্যার ফিলিপ সিডনির এই আলোচনা থেকে বোঝা যায়।

তারপর ইংলণ্ডের সপ্তদশ শতাব্দীর নাট্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে বেন্ জন্‌সনের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি সার্থক ট্র্যাজেডি রচয়িতাও ছিলেন। 'Sejanus' (1603) নামে একখানি সার্থক ট্র্যাজেডি তিনি রচনা করেন। সুতরাং ট্র্যাজেডি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য হতে পারত। কিন্তু ঐ নাটকের ভূমিকায় বা অন্যত্র তিনি ট্র্যাজেডির ভাব-রস সম্পর্কে কিছু বলেন নি।

বেন্ জনসনের পর নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন জন ড্রাইডেন (১৬৩১-১৭০০)। তিনি 'Preface to Troilus and Cressida (১৬৭৯) নামক আলোচনায় মোটামুটি এ্যারিস্টটলের ট্র্যাজেডিতত্ত্বকেই নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বিশদ করেছেন। তিনি বলেছেন, কাব্যমাত্রই আমাদের আনন্দ-প্রদ নীতি-শিক্ষা দেয়। দর্শনশাস্ত্র থেকেও আমরা শিক্ষা পাই, কিন্তু সে শিক্ষায় আমাদের আনন্দ হয়না, অথবা, উদাহরণের মাধ্যমে যে আনন্দ পাই, সেই আনন্দ হয়না। তাই তাঁর মতে একমাত্র ট্র্যাজেডিই উদাহরণ সংযোগে সেই আনন্দ-প্রদ নীতি শিক্ষা দিতে পারে। কি ভাবে ট্র্যাজেডি এই নীতি শিক্ষা দিতে পারে, তার আলোচনা করতে গিয়েই তিনি ট্র্যাজেডির মূল ভাব হিসেবে 'ভীতি' এবং 'করুণা' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

ট্র্যাজেডি থেকে আমরা নীতি শিক্ষা পাই বলেই তিনি ট্র্যাজেডিতে 'ভীতি' এবং 'করুণা' ভাব দুটির বজায় থাকার আবশ্যিকতা সম্বন্ধে জোর দিয়েছেন। কিন্তু ট্র্যাজেডি থেকে যে আমরা আনন্দ পাই, ট্র্যাজেডির প্রতি যে আমরা সানন্দে আকৃষ্ট হই, তা ট্র্যাজেডির মধ্যকার 'করুণা'ভাবের জন্য, ভীতিভাবের জন্য নয়। ড্রাইডেন নিজেও এটা উপলব্ধি করেছিলেন। একটু পরেই তিনি যা বলছেন, তা থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলছেন, ট্র্যাজেডির নায়কের পক্ষে কখনোই দুর্বৃত্ত প্রকৃতির লোক হওয়া চলবে না। কারণ দুর্বৃত্ত প্রকৃতির লোকের শাস্তিতে আমাদের চিত্তে করুণাভাবটি উদ্রিক্ত হয় না। এই করুণাভাবটি উদ্রিক্ত না হলে যে ট্র্যাজেডির বোধ জাগে না, তা ড্রাইডেন উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তিনি এই কথা বিশেষভাবে বলেছেন। নায়কের সদ্‌গুণাবলম্বী হওয়ার কথা অবশ্য এ্যারিস্টটল থেকেই সকলে বলে আসছেন, এবং তা থেকে এটাই বোঝা যায় যে, ট্র্যাজেডিতে করুণা ভাবটির গুরুত্ব চিরকালই অনুভূত হয়েছে। যাই হোক ড্রাইডেনও বলেছেন, এই-

অত্যাবশ্যকীয় অনুকম্পা আমরা যাতে প্রকাশ করতে পারি এমন কিছু গুণ অন্ততঃ নায়কের থাকা দরকার।[৫৩]

ড্রাইডেন আরো বলেছেন, নিশ্ছিদ্র ভালোমানুষ পৃথিবীতে হয়না বলে-ই, সামান্য অসঙ্গতি বা সামান্য ত্রুটিপূর্ণ মানুষের জীবন নিয়ে ট্র্যাজেডি রচিত হয়। কিন্তু ঐ সামান্য অসঙ্গতি বা ত্রুটি চরিত্রের অন্যান্য গুণাবলীর তুলনায় হবে খুবই নগন্য। তাই ট্র্যাজিক চরিত্রের ঐ সামান্য অসঙ্গতি বা ত্রুটির জন্য তার যা শাস্তি, তা আমাদের চিত্তে জাগাবে সামান্য ভয়, কিন্তু তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী সদ্‌গুণের অধিকারী হওয়াতেও যে সে নিষ্কৃতি পায় না, তাতেই জাগে অসামান্য করুণা।[৫৪] এই অসামান্য করুণাই ট্র্যাজেডির মূলভাব, যা ট্র্যাজেডির বিশিষ্টবোধকে সৃষ্টি করে। ট্র্যাজেডির রসনিষ্পত্তির ব্যাপারে কোন্ ভাবটির কতখানি গুরুত্ব, ড্রাইডেনের উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা তার যথেষ্ট ইঙ্গিত পাই।

মহাকবি জন মিল্টন তাঁর 'স্যামসন এ্যাগোনিসটিস' নাটকের ভূমিকায় (১৬৭১) ট্র্যাজেডিতত্ত্ব আলোচনা করেছেন। 'করুণা' ও 'ভীতি'ভাবের উল্লেখ ক'রে তিনি প্রাচীন যুক্তি দিয়ে ক্যাথারসিস তত্ত্বেরও সমর্থন করেছেন।

জোসেফ এ্যাডিসন (১৬৭২—১৭২০) 'স্পেক্টেটর' (১৭১১) পত্রিকায় ১৪ই এপ্রিল এবং ১৬ই এপ্রিলের দুটি আলোচনায় ট্র্যাজেডি-তত্ত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সমসাময়িক ইংরেজ নাট্যকারেরা ট্র্যাজেডিতে সৎলোকের দুঃখ-দুর্গতির রূপটিকে অত্যন্ত তীব্রভাবে প্রদর্শন করলেও, পরিণামে তাদের সমস্ত দুঃখ দুর্দশা, থেকে অব্যাহতি দিতেন। এ্যাডিসন নাট্যকারদের এই প্রবণতার বিরোধিতা করেছেন এবং বিয়োগান্ত পরিণতিই যে ট্র্যাজেডিকে উপাদেয় করে তোলে, তা তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে

৫৩. "It is necessary that the hero of the play be not a villain, that is, the characters, which should move our pity, ought to have virtuous inclinations, and degrees of moral goodness of them."

—European Theories of Drama, (1947), p. 194.

৫৪. "As for a perfect character of virtue, it never was in Nature, and therefore there can be no imitation of it, but there are allovs of frailty to be allowed for the chief persons, yet so that the good which is in them shall outweigh the bad, and consequently leave rooms for punishment on the one side and pity on the other."

—European Theories of Drama, (1947), Pp. 194-95.

দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, শেক্সপীয়র যে ভাবে 'কিং লীয়র' নাটকটি লিখেছিলেন, তাতে তা একখানি সুন্দর ট্র্যাজেডি হয়েছিল, কিন্তু কবির ন্যায়বিচার সম্পর্কে এক বিচিত্র বুদ্ধির তাড়নায় নাটকটিকে যেভাবে সংশোধন করা হয়েছে, তাতে নাটকটির অর্দ্ধেক সৌন্দর্যই বিনষ্ট হয়ে গেছে।[৫৫]

তাঁর মতে 'ভয়'ও 'শোচনা' ট্র্যাজেডির মূলভাব, এবং তাদের ঠিকভাবে উদ্রিক্ত করতে গেলে ট্র্যাজেডির পক্ষে বিয়োগান্ত নাটক হওয়াই বাঞ্ছনীয়।[৫৬] ট্র্যাজেডি বিয়োগান্ত না হ'লে ট্র্যাজেডি দর্শকের চিত্তকে বিগলিত করতে পারে না, আর দর্শকের চিত্ত বিগলিত না হলে যে ট্র্যাজেডি উপাদেয় হয় না, এ্যাডিসনের তত্ত্ব থেকে তার সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে।

জোসেফ এ্যাডিসনের পর, ডঃ স্যামুয়েল জনসন, অলিভার গোল্ড্‌স্মিথ অষ্টাদশ শতাব্দীতে নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁদের এই সব আলোচনায় ট্র্যাজেডির রস-নিষ্পত্তি সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে প্রভূত নাট্যতত্ত্বালোচনা হয়েছে। এইসব নাট্য-তাত্ত্বিকদের মধ্যে এস. টি. কোল্‌রিজ, চার্লস ল্যাম্‌, উইলিয়াম হাজ্‌লিট, স্যার আর্থার পিনেরো, হেনরি আর্থার জোন্‌স, বার্নার্ড শ', উইলিয়াম আর্চার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। নির্বিশেষ নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কেই এঁরা আলোচনা করেছেন। চার্লস ল্যাম্‌ এবং হ্যাজ্‌লিট কমেডি সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন, কিন্তু বিশেষভাবে ট্র্যাজেডি-তত্ত্ব বা ট্র্যাজেডির রস-নিষ্পত্তি সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট আলোচনা বা সূত্র নির্দেশ করেননি।

এঁরা ছাড়া আরো অনেক ইংরেজি সাহিত্য সমালোচক ট্র্যাজেডি সম্পর্কে, বর্তমান এবং বিগত শতাব্দীতে অনেক আলোচনা করেছেন। এঁদের আলোচনা মূলতঃই শেক্সপীয়রের নাট্যাদর্শকে মেনে নিয়ে। ট্র্যাজেডি সম্পর্কে বিশেষ কোনো তত্ত্বকে এঁরা প্রতিষ্ঠিত করতে যাননি।

আমেরিকায় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব থেকেই নাটক লিখিত হ'চ্ছে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পূর্বে লিখিত কোনো উল্লেখযোগ্য নাট্যতত্ত্বের পরিচয়

৫৫. "King Lear is an admirable tragedy of the same kind as Shakespeare wrote it, but as it is reformed according to the chimerical notion of poetical justice, in my humble opinion it has lost half its beauty."

—European Theories of Drama, (1947), Pp. 227-28.

৫৬. Ibid, Pp. 227-28.

আমেরিকায় পাওয়া যায় না। আমেরিকানদের উল্লেখযোগ্য নাট্যতত্ত্বগুলি সবই বিংশ শতাব্দীতে গড়ে উঠেছে। এই সব নাট্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে যাঁরা ট্র্যাজেডি সম্পর্কে বিশেষভাবে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন—যোসেফ উড্ ক্রাচ ('দি ট্র্যাজিক ফ্যালাসি' প্রবন্ধ), ম্যাক্সওয়েল এ্যাণ্ডারসন ('দি এসেন্স অব্ ট্র্যাজেডি' প্রবন্ধ), জন গ্যাসনার ('ক্যাথারসিস এ্যাণ্ড দি মডার্ণ থিয়েটর' প্রবন্ধ), জন্ ম্যাসন ব্রাউন ('দি ট্র্যাজিক ব্লু প্রিণ্ট' প্রবন্ধ)। এঁদের কেউই ট্র্যাজেডির ভাবরস সম্পর্কে কিছু বলেননি, কেবল ট্র্যাজেডির দার্শনিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তাই তাঁদের বক্তব্য এখানে উপস্থাপিত করার সুযোগ নেই, যেহেতু আমরা ট্র্যাজেডির মূল ভাব-রসকেই এখানে কেবল অনুসন্ধান করছি।

তবে এঁদের মধ্যে জন ম্যাসন ব্রাউন তাঁর দি 'ট্র্যাজিক ব্লু প্রিণ্ট' প্রবন্ধে ট্র্যাজেডির নায়ক-নায়িকার মৃত্যু এবং দুর্ভাগ্য সম্পর্কে যে তাত্ত্বিক উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছেন, তার সঙ্গে এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের তাত্ত্বিক উপলব্ধির মিল লক্ষ্য করা যায়। এবং সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে জন ম্যাসন ব্রাউন-এর ট্র্যাজেডি সম্পর্কিত উক্ত আলোচনাটির বক্তব্য বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

জন ম্যাসন ব্রাউনের মতে ট্র্যাজেডির নায়ক যখন মৃত্যু বরণ করে, তখন সেই মৃত্যু নায়কের জীবনে এক সুগভীর পূর্ণতা এনে দেয়। মৃত্যুর মধ্যদিয়ে সে জীবন পরিত্যাগ করে না, জীবন থেকে মুক্তিলাভ করে।[৫৭]

জন ম্যাসন ব্রাউনের এই উপলব্ধির সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ভাবনার সাধর্ম্য লক্ষ্য করা যায়।

পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডি-চেতনার এই ইতিবৃত্তে লক্ষ্য করা যায় যে, ট্র্যাজেডির মূল ভাব সম্পর্কে এ্যারিস্টটল সর্বপ্রথম যে 'করুণা' ও 'ভীতি'র কথা বলে-

---

৫৭. "When they die, self realized by their suffering, they do not relinquish life but are at least released from it. They fall as mortals so complete that they have lost both their desire and excuse for living. Death for them is not a cessation of life. It is a fulfilment of self. Their living on, when the book is closed, would only mean for them and us the letdown of a sequel."

—European Theories of Drama, (1947), p. 556.

ছিলেন, তা আক্ষরিক অর্থে সমস্ত দেশ এবং সমস্ত জাতি মেনে নেয়নি। এ্যারিস্টটলের 'করুণা' ও 'ভীতি' যে প্রকৃত পক্ষে 'করুণা' ছাড়া আর কিছু নয়, তা আমরা দেখেছি। কিন্তু যেহেতু তিনি পৃথক পৃথকভাবে 'করুণা' ও 'ভীতি' কথা দুটির উল্লেখ করেছেন, তাতেই সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে। 'করুণা' ও 'ভীতি' কথা দুটির পৃথক পৃথক আভিধানিক অর্থ ধরে নেওয়ায় কোথাও ট্র্যাজেডি হয়েছে ভীতি-প্রধান, কোথাও 'করুণা'-প্রধান, আবার কোথাও 'ভীতি' ও 'করুণা'র মিশ্রিত ভাব-প্রধান। সেনেকা এবং কোনো কোনো ইতালীয় কবি 'ভীতি' ভাবটিকেই ট্র্যাজেডির মূল ভাব ভেবে-ছিলেন, তাই তাঁদের ট্র্যাজেডি হয়েছে ভীতি-ভাব প্রধান, আবার ফরাসী দেশের কোনো কোনো ট্র্যাজেডি-তাত্ত্বিক (যেমন অগিয়ের, সেণ্ট এভ্‌রেমণ্ড প্রভৃতি) 'করুণা'কেই ট্র্যাজেডির মূল ভাব ভেবেছিলেন। অনেক জার্মাণ-তাত্ত্বিকেরও মত তাই, বিশেষতঃ শিলারের। সেনেকার ট্র্যাজেডি, কয়েকখানি ইতালীয় ট্র্যাজেডি এবং কিছু কিছু স্পেনীয় ট্র্যাজেডিকে বাদ দিলে ইউরোপের অন্যান্য সমস্ত দেশের ট্র্যাজেডিতেই জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে 'করুণা' ভাবটিকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাই বলা যায় ইউরোপের বেশীরভাগ ট্র্যাজেডিই করুণাভাব-প্রধান। যেখানে 'ভীতি' ও 'করুণা'-ভাবের মিশ্রণ ঘটেছে, সেখানেও মুখ্য হয়ে উঠেছে করুণাভাব। ইউরোপের বেশির ভাগ ট্র্যাজেডি-তাত্ত্বিকের আলোচনাতেও দেখি, ট্র্যাজেডির মূল ভাব হিসেবে 'করুণা' ভাবটাই প্রকারান্তরে স্বীকৃতি পেয়ে যাচ্ছে। আসলে জীবনের দুটি দিক—একটি সাফল্যের, একটি ব্যর্থতার। সাফল্যের দিককে নিয়ে রচিত সাহিত্য কমেডি, আর ব্যর্থতার দিককে নিয়ে রচিত সাহিত্য ট্র্যাজেডি। এখন ট্র্যাজেডিতে জীবনের এই ব্যর্থতার দিকটা তুলে ধরতে গেলে যে ভাবটা জেগে উঠবে, তা অনিবার্যভাবেই 'করুণার'-ভাব, 'ভীতির'-ভাব নয়, বা 'করুণা' ও 'ভীতির' মিশ্রিত ভাবও নয়। কোনো কোনো পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডি রচয়িতা এবং তাত্ত্বিক এ্যারিস্টটলের প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্যের জন্য এই সহজ কথাটা বিশ্বাস করে নিতে পারেননি। তাই কোথাও কোথাও করুণাভাব বর্জিত ট্র্যাজেডি রচিত হয়েছে। আমরা পাশ্চাত্যের সমস্ত ট্র্যাজেডি-তত্ত্বের পাশাপাশি আলোচনা করে দেখলাম, এ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্‌স-নিরপেক্ষ ভাবে যাঁরা ট্র্যাজেডির মূল ভাবের সন্ধান করেছেন, তাঁরা ট্র্যাজেডির মূল ভাব হিসেবে 'করুণা' ভাবকেই স্বীকার

করেছেন। সুতরাং করুণার ভাবই যে ট্র্যাজেডির মূল ভাব, তাতে সন্দেহ থাকে না।

পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডি-চেতনার এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বাংলার বা বাঙালীর ট্র্যাজেডি-চেতনা অনুসন্ধান করতে হবে। ভিন্ন দেশে, কালে ট্র্যাজেডি-চেতনার কেমন পরিবর্তন হয়, সেকথা স্মরণে রেখেই বাঙালীর ট্র্যাজেডি-চেতনার বিশেষত্ব পর্যালোচনা করতে হবে এবং তবেই রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার স্বরূপ নির্ধারণ সম্ভব হবে,—কোনো একটি বিশিষ্ট ট্র্যাজেডি-তত্ত্বের নিরিখে রবীন্দ্র-ট্র্যাজেডি-চেতনার স্বরূপ নির্ধারণ করা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়।

বাঙালীর ট্র্যাজেডি-চেতনা এবং সেইসূত্রে রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে আমাদের একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, বাংলা-সাহিত্যে যে সব শোচনা-ভাব-প্রধান ট্র্যাজেডি রচিত হয়েছে, সেই সব শোচনা-ভাব-প্রধান ট্র্যাজেডিও যে ট্র্যাজেডির একটি প্রজাতি হতে পারে, তা এ্যারিস্টটলও স্বীকার করেছিলেন। 'পোয়েটিক্স'-এর অষ্টাদশ অনুচ্ছেদে এই শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ আছে।[৫৮] তিনি বলেছেন, ট্র্যাজেডি মোটামুটি চারপ্রকার—(১) কমপ্লেক্স ট্র্যাজেডি বা ঘটনা প্রধান ট্র্যাজেডি, (২) দুঃখভোগের ট্র্যাজেডি (৩) চরিত্র ধর্মী ট্র্যাজেডি এবং (৪) দৃশ্য প্রধান ট্র্যাজেডি।

এর মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উল্লেখিত ট্র্যাজেডিই প্যাথেটিক ট্র্যাজেডি নামে পরিচিত। এই শ্রেণীর ট্র্যাজেডিই বাঙালী কবির হাতে বেশি রচিত হয়েছে। এ্যারিস্টটল বলেছেন, এ হচ্ছে দুঃখভোগের ট্র্যাজেডি (tragedy of suffering) —সুতরাং শোচনাভাবই এই ট্র্যাজেডির মূলভাব।

ড্রাইডেন 'ট্রয়লাস এ্যাণ্ড ক্রেসিডার' ভূমিকায় ট্র্যাজেডির যে শ্রেণী বিভাগ করেছেন, সেখানেও দেখা যায় তিনি বিস্ময় প্রধান, ভয় প্রধান এবং শোচনা-

৫৮. 'There are four distinct species of Tragedy—that being the number of the constituents also that have been mentioned: first the complex tragedy which is all Peripety and Discovery; second, the tragedy of suffering, e. g. the Ajaxes and Ixions; third the tragedy of character, e. g. the Phthiotides and Peleus. The fourth constituent is that of 'Spectacle', exemplified in The Phorcides, in Prometheus, and in all plays with the scene laid in the nether world."   —Poetics (Bywater), 1954, p. 64.

প্রধান—এই তিন শ্রেণীর ট্র্যাজেডির কল্পনা করেছেন। এই তিন শ্রেণীই কালক্রমে 'হিরোয়িক ট্র্যাজেডি', 'হরর ট্র্যাজেডি', এবং 'প্যাথেটিক ট্র্যাজেডি' নামে পরিচিত হয়েছে।

সুতরাং বাঙালী কবির হাতে রচিত শোচনা-ভাব-প্রধান প্যাথেটিক ট্র্যাজেডিগুলি গোত্রবিহীন নতুন কিছু নয়, চিরকালের স্বীকৃত ট্র্যাজেডিরই একটি প্রজাতিমাত্র,—যে প্রজাতি এ্যারিস্টটল থেকেই স্বীকৃত হয়ে আসছে।

আর একটা কথা,—ট্র্যাজেডি হ'চ্ছে সিরিয়াস এ্যাকশনের অনুকরণ। আর এ্যারিস্টটলের মতে এই সিরিয়াস এ্যাকশন হ'চ্ছে তাদেরই ঘটনা, যারা মারাত্মক কোনো কাজ করেছে অথবা মারাত্মক দুঃখভোগ করেছে (done or suffered something terrible)। আমরা লক্ষ্য করব, বাঙালী কবি এবং রবীন্দ্রনাথ যে সব ট্র্যাজেডি রচনা করেছেন, সেই সব ট্র্যাজেডির নায়ক-নায়িকারা এ্যারিস্টটল কথিত দ্বিতীয় বিকল্প অনুসারে ট্র্যাজিক চরিত্র,—তারা মারাত্মক কাজ ততটা করেনি, যতটা মারাত্মক দুঃখভোগ করেছে (suffered something terrible.)।

প্রসঙ্গ—খ

প্রাক্-রবীন্দ্র বাংলা সাহিত্যে ট্র্যাজেডি-চেতনার ইতিবৃত্ত ॥

পারিভাষিক অর্থে যাকে ট্র্যাজেডি বলা হয়, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে তার পরিচয় তো পাওয়া যায়ই না, এমন কি জীবনের দুঃখময়তা,—ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ট্র্যাজেডি-চেতনার মধ্যে যাকে সামান্য লক্ষণ হিসেবে খুঁজে পাওয়া যায়,—জীবনের সেই দুঃখময়তাকেও ভারতীয় কবি বিশেষ চিত্রিত করেননি। প্রাচীন-ভারতীয় কবিদের মধ্যে ট্র্যাজেডি-চেতনার এই অভাব নিতান্তই বিস্ময়কর। বিশেষতঃ যে দেশের রামায়ণ-মহাভারতে জীবনের বিষাদ-করুণ পরিণতির অনিবার্যতা মহাকবিদের ট্র্যাজেডি-চেতনার পরিচয় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, সেই দেশের পরবর্তী কবিদের কাছে রামায়ণ-মহাভারতের এই দৃষ্টান্ত যে অনুসৃত হয়নি, এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। ইউরোপীয় ট্র্যাজেডি-চেতনার ইতিবৃত্তে আমরা দেখেছি যে, ট্র্যাজেডির যেটা প্রকৃত রস সেই রস সৃষ্টির ব্যাপারে pity বা 'শোক'-ভাবের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমন কি অনেক সময় 'শোক' ভাবটিই ট্র্যাজেডি-রসের একমাত্র স্থায়িভাব হিসেবেও পরিগণিত হয়েছে,—ফরাসী এবং জার্মান ট্র্যাজেডি-চেতনার মধ্যে এটা আমরা লক্ষ্য করেছি। ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্র ইতিহাসেও দেখা যায় যে, ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা সাহিত্যে যে ক'টি মুখ্য রসের নিষ্পত্তি হওয়ার কথা বলেছেন, তার মধ্যে 'করুণ'রসকে এবং সেই করুণরসের স্থায়িভাব হিসেবে 'শোক' ভাবটিকেও যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেছেন। এমনকি করুণরস থেকে কেন এবং কিভাবে আমরা আনন্দ পাই, তারও তাঁরা তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। সাহিত্যের তাত্ত্বিক আলোচনায় 'শোক' ভাব এবং 'করুণ' রস এইভাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় কবিরা সাহিত্যের করুণরসাত্মক পরিণতি দেখাতে চাননি। এমন কি যে সমস্ত কাব্যে এই করুণ-রসাত্মক পরিণতি অনিবার্য

ছিল, সেই সমস্ত কাব্যেও তাঁরা প্রায় জোর ক'রেই করুণরসাত্মক পরিণতিকে পরিহার করে গেছেন। 'বিক্রমোর্বশী' 'উত্তররামচরিত' প্রভৃতি কাব্যে এই-ভাবে কৃত্রিম উপায়ে কবিরা মিলনান্ত পরিণতি সাধন করেছেন।

প্রাচীনভারতের সংস্কৃত সাহিত্যের সচেতন কবিরা কেন এমনটা করতেন, তা একটু বোঝা দরকার। এবং তা বুঝবার জন্য সংস্কৃত সাহিত্যের কবিদের জীবনবোধের প্রতি লক্ষ্য দেওয়ার দরকার আছে। গ্রীক ট্র্যাজেডি থেকে সুরু ক'রে রোমাণ্টিক ট্র্যাজেডি পর্যন্ত পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডির যে ধারা, তাতে দেখা যায় যে জগৎ ও জীবনের প্রতি এক অপরিসীম আসক্তিই হচ্ছে পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডি-চেতনার ভিত্তি। জগতে আমরা পরিপূর্ণভাবে বাঁচতে চাই, জীবনকে যদৃচ্ছা উপভোগ করতে চাই। কিন্তু পারিনা নিয়তির প্রতিকূলতায় বা নিজেদেরই কোন ত্রুটির জন্য,—এইখানটাতেই আমাদের যাবতীয় বেদনা এবং আর্তনাদ, পাশ্চাত্য কবিরা মানুষের জীবনের এইদিকটিকে চিত্রিত করেছেন এবং নাম দিয়েছেন ট্র্যাজেডি। সুতরাং সমস্ত প্রকার দৈব-দুর্বিপাককে অস্বীকার করে এবং নিজেকে অভ্রান্ত ও নিষ্কলুষ ভেবে নিয়ে জগৎ ও জীবনের ভোগসুখের জন্য যেখানে আকাঙ্খা প্রবল, সেখানেই প্রকৃত ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হতে পারে, বা সেখানেই কবিরা ট্র্যাজেডির প্রকৃত রসসৃষ্টির উপাদান খুঁজে পেতে পারেন। কিন্তু ভারতীয় জীবনবোধ এই পাশ্চাত্য জীবনবোধ থেকে মূলতঃই পৃথক। ভারতীয় কবির কাছে মানুষের জীবন বিধিনির্দিষ্ট বা কর্মফলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিধির বিধান থেকে বা কর্মফলভোগের বাধ্যবাধকতা থেকে এখানে মানুষের অব্যাহতি নেই। মর্তজীবনটাই এখানে মানুষের কাছে লোভনীয় নয়। ইহলোকের চেয়ে পরলোকের জন্যই মানুষের ভাবনা বেশী। সুতরাং ইহজীবনে প্রবলভাবে বেঁচে থাকবার প্রচেষ্টা এখানে কোনোদিন প্রশ্রয় পায়নি। যেখানে মর্তজীবনে মানুষের প্রবলভাবে বেঁচে থাকবারই কোনো বাসনা নেই, বলিষ্ঠ-ভাবে জীবনের ভোগ-সুখকে আস্বাদ করবার জন্য কোনো আকুলতা নেই, সেখানে প্রবলভাবে বেঁচে থাকতে না পারলে বা জীবনের ভোগ-সুখের আস্বাদ-নিতে ব্যর্থ হ'লে মানুষের মনে দুঃখবোধও পুঞ্জীভূত হয় না। জীবনের ব্যর্থতা-জনিত এই দুঃখবোধটাই হচ্ছে ট্র্যাজিকজীবন চেতনার মূল কথা। ভারতীয় জীবনে যখন এই দুঃখবোধই সুতীব্র নয়, তখন ভারতীয় কবির মধ্যেও জীবন সম্পর্কে কোনো প্রকার ট্র্যাজেডি-চেতনা গ'ড়ে না উঠবারই কথা। এবং এই

অন্যও সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে করুণরস সম্পর্কে প্রভূত আলোচনা হলেও, করুণ-রসকে সংস্কৃত সাহিত্যের কবিরা কাব্যের পরিণতি হিসেবে গ্রহণ করেননি। করুণরসের নিষ্পত্তির মধ্যে যদি তাঁরা 'বিক্রমোর্বশী', 'উত্তররামচরিত' বা 'রাধাকৃষ্ণ পদাবলী' প্রভৃতি সমাপ্ত করতেন, তবে আমরা ভারতীয় কবিদের ট্র্যাজিক জীবনবোধের পরিচয় পেতে পারতাম। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে ভারতীয় কবিদের এইধরনের কোনো ট্র্যাজিক জীবন-বোধের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই একথা স্বীকার করতেই হয় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকে বাঙালী কবিদের মধ্যে যে ট্র্যাজেডি-চেতনা দেখা গেছে, তা প্রাচীন ভারতের উত্তরাধিকার থেকে সম্পূর্ণই বিচ্যুত এবং সরাসরি ইউরোপীয় ট্র্যাজেডি-চেতনা, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের এলিজাবেথীয় ট্র্যাজেডি-চেতনার প্রভাব-পুষ্ট।[১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন প্রথম বাংলা নাটকগুলি রচিত হয়, তখন সেগুলি স্পষ্টতঃই ইংরাজী নাটক বা পাশ্চাত্য নাটকের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েই রচিত হয়।[২] এই সূত্রেই পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডি-চেতনা বাঙালী কবির চিত্তে প্রভাব বিস্তার করে এবং বাঙালী কবিও জীবনের দুঃখময়তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে থাকেন, এবং তার ফলে বাংলা সাহিত্যেও ট্র্যাজেডি-চেতনা আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।[৩]

পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী বা ভোগবাদী জীবনদর্শনের প্রভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও মায়াবাদী এবং নেতিবাচক জীবনদর্শনের জড়তাকে পরিত্যাগ করে ইহলোক এবং মর্তজীবন সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। এবং তার ফলে তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে জীবনের সুখ ও দুঃখ—সুখের আহ্লাদ এবং

---

১. ডঃ অজিতকুমার ঘোষ 'ট্র্যাজেডি ও ভারতীয় জীবনাদর্শ সম্পর্কে' যে আলোচনা করেছেন, তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

দ্রষ্টব্য : নাটকের কথা, (১৯৫৯), পৃঃ. ৬১—৬৭।

২. দ্রষ্টব্য : ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের প্রবন্ধ "প্রথম বাংলা নাটক" (কথা সাহিত্য, পৌষ, ১৩৬৮)।

৩. বাঙালী কবিদের মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাব সত্ত্বেও ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী যে একেবারে বাদ পড়ে গিয়েছিল, তা নয়। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী মাঝে মাঝেই আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁদের কাজকর্মে এবং রচনায়।

দ্রষ্টব্য : বাংলার নাটক ও নাট্যশালা ; শচীন সেনগুপ্ত, (১৩৬৪), পৃ. ৬৭—৯০।

দুঃখের বেদনা। এই বেদনাও তার কাছে কম মূল্যবান মনে হ'ল না। বাঙালী কবি এই বেদনাকেও চিত্রিত করলেন সাহিত্যে। এবং তার মধ্য দিয়ে প্রকাশমান হয়ে উঠল বাঙালীর ট্র্যাজেডি-চেতনা।

প্রথম বাংলা বিষাদান্ত নাটক "কীর্তিবিলাসের" রচয়িতা যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্তের এ্যারিস্টটলের "পোয়েটিক্স" সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকলেও এই সময়কার বাঙালী কবিদের ট্র্যাজেডি-চেতনা মূলতঃ শেক্সপীয়র চর্চার[৪] মধ্য দিয়েই অনুপ্রাণিত হতে থাকে। 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২) রচিত হবার অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশে শেক্সপীয়রের নাটক সমূহ পঠিত ও অভিনীত হয়ে আসছে। শেক্সপীয়রের এই সব নাটকের মধ্যে তাঁর বিখ্যাত ট্র্যাজেডিগুলিও ছিল, এবং বাঙালী সেগুলির ট্র্যাজেডিরসের আস্বাদ সঠিকভাবেই নিয়েছে। এইভাবেই জীবনের ট্র্যাজিক দিক সম্পর্কে বাঙালীর সচেতনতা বাড়তে থাকে এবং নিজেরাও জীবনের ট্র্যাজিকদিকটিকে সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলতে অনুপ্রাণিত হয়।

বাংলা সাহিত্যে বিশেষতঃ বাংলা নাটকে শেক্সপীয়রের প্রভাব দু'দিকে অনুভব করা যায়। প্রথমতঃ নাটকের আঙ্গিকে এবং চরিত্রায়ণে এবং দ্বিতীয়তঃ নাটকের রসসৃষ্টির ব্যাপারে, অর্থাৎ কমেডি রচনায় এবং ট্র্যাজেডি রচনায়। শেক্সপীয়রের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েই বাঙালী নাট্যকারেরা সুস্পষ্টভাবে কমেডির রস এবং ট্র্যাজেডির রস নাটকে সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হন।

বাংলা নাটকের আঙ্গিকে এবং চরিত্রায়ণে শেক্সপীয়রের প্রভাব প্রদর্শন করা আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। নাটকে রস বিশেষতঃ ট্র্যাজেডির রসোপলব্ধির ব্যাপারে শেক্সপীয়রের প্রভাব কতখানি, তা-ই আমাদের মুখ্যতঃ আলোচনার বিষয়। তথাপি সংক্ষেপে বলা যায় যে, হিন্দুকলেজে শেক্সপীয়রের নাটকের অধ্যাপক ডি. এল. রিচার্ডসনের কাছে শেক্সপীয়র পাঠ ক'রে সমকালীন ছাত্রেরা, শেক্সপীয়রের ন্যায় কবি নেই, ইংরাজি সাহিত্যের ন্যায় সাহিত্য নেই,—এই ধারণায় মানসিক পরিপুষ্টি লাভ করত। ফলতঃ এই ছাত্রদের নাট্যশিল্প-বোধ ও নাট্যরস-বোধ শেক্সপীয়রের রোমান্টিক নাটকের আদর্শে-ই নিয়ন্ত্রিত হ'ত। হিন্দুকলেজের ছাত্রদের এই নাট্যশিল্প-বোধ ও

---

৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' (১৩৫৬) পৃ. ২১-৩১এ বাঙ্গালী কর্তৃক শেক্সপীয়রের নাটক অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

নাট্যরসবোধই তখন বাঙলাদেশের সাধারণ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে পরিব্যাপ্তি লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথেরও প্রথম পর্বের নাটকে, বিশেষতঃ 'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জন' নাটকের নাট্যাদর্শ শেক্সপীয়রের রোমাণ্টিক নাটকের আদর্শেই গঠিত। 'মালিনী' নাটকের ভূমিকায় তিনি স্বীকারই করেছেন যে, শেক্সপীয়রের নাটকই তাঁর কাছে বরাবর নাটকের আদর্শরূপে বিবেচিত হয়েছে। "শেক্সপীয়রের নাটকের বহু শাখান্বিত বৈচিত্র্য ব্যাপ্তি ও ঘাতপ্রতিঘাত প্রথম থেকেই" তাঁদের "মনকে অধিকার করেছে।" এইভাবে বাঙলা নাটকের গোড়াপত্তনের যুগে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পর্যন্ত, এমনকি রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার প্রারম্ভিক পর্বে, নাটকের আঙ্গিকে এবং চরিত্রায়ণে শেক্সপীয়রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু নাটকের রসসৃষ্টির ব্যাপারে শেক্সপীয়রের যে প্রভাব, তা বাঙালীর জীবনে আরো সুদূর প্রসারী হয়েছিল। ভারতীয় কবিদের মধ্যে যে ট্র্যাজিক রসচেতনার অভাব চিরকাল লক্ষ্য করা গেছে, শেক্সপীয়র-চর্চার মধ্য দিয়ে বাঙালী কবির চিত্তে সেই ট্র্যাজিক রসচেতনার উদ্বোধন ঘটল।

পাশ্চাত্য ভাবধারা ও জীবনবোধের সংস্পর্শে এসে পরলোক অপেক্ষা ইহলোকের প্রতি আমাদের অনুরাগ বর্ধিত হ'ল এবং স্বর্গ অপেক্ষা মাটির মহিমা আমাদের কাছে বড় হয়ে উঠল। সুতরাং মর্তজীবনের দুঃখের প্রতি আমরা আর উদাসীন থাকতে পারলাম না। তা আমাদের নিজেদেরই জীবনের দুঃখ ব'লে সেই দুঃখের কাহিনীগুলিও আমাদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠল। দুঃখকে আমাদের বিবেচনার, এমন কি সারস্বত সাধনার বিষয় করে নিলাম আমরা। এইভাবে ট্র্যাজেডির যে রসানুভূতি অর্থাৎ দুঃখময়-জীবনবোধ, তা আমাদের রসচেতনার মধ্যে স্থান পেয়ে গেল। ট্র্যাজেডি জীবনের দুঃখময় দিক উদ্ঘাটন করে বটে, কিন্তু সেই দুঃখময় জীবনের আস্বাদ গ্রহণ ক'রে, জীবনকে আমরা অধিকতর মূল্যবান মনে করি। ট্র্যাজেডির দুঃখ জীবন সম্বন্ধে আমাদের নৈরাশ্যবাদী ক'রে তোলে না। বরঞ্চ সেই দুঃখ জীবনকে আরো নিবিড়ভাবে, আরো পূর্ণভাবে পাবার জন্য আমাদের আশান্বিত ক'রে তোলে। উনিশ শতকে নবজাগ্রত জাতির জীবনরসাসক্তির ফলে ট্র্যাজেডির দুঃখময় রূপের প্রতি আমাদের একটি কৌতূহল ও অনুরাগ দেখা দিল।

বাঙলা নাট্যসাহিত্যের সর্বপ্রথম বিষাদান্ত নাটক 'কীর্তিবিলাসের' নাট্যকার ভূমিকায় বলেছেন, "অত্যল্প বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, শোকজনক ঘটনা আন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ সুখোদয় হয়, এ কারণ শেক্সপীয়র নামা ইংলণ্ডীয় মহাকবি লিখিয়াছেন,—আমার অন্তঃকরন শোকানলে দহন হইতেছে, তত্রাপি আমার মন অবিরত ঐ শোকপ্রয়াসী।" কীর্তিবিলাসের ভূমিকায় ট্র্যাজেডির এই যে আনন্দের কথা বলা হ'ল, এই আনন্দ পরবর্তী বহু নাট্যকার তাঁদের নাটকে ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন। মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ সকলেই জীবনের ট্র্যাজিক দিকের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হলেন। শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিতে চরিত্রের বহির্দ্বন্দ্ব অপেক্ষা তীব্রতর যে দ্বন্দ্ব, সেই অন্তর্দ্বন্দ্বই পরিস্ফুট হয়েছে বেশী। দুই বিরোধী প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে মানুষের মন যখন ক্ষত-বিক্ষত, তখনই মানুষের ট্র্যাজেডি হয়ে ওঠে হৃদয় বিদারক। এই ট্র্যাজেডি বাংলা নাটকের মধ্যে অনেক স্থানেই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে। ভীমসিংহ, সাজাহান, আলমগীর, বিক্রমদেব, রঘুপতি, জয়সিংহ, সুপ্রিয়, বিনোদিনী, কুমুদিনী, বাঁশরী প্রভৃতি চরিত্র প্রবল ও শক্তি-মান, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার সংঘাতে এবং বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির পারস্পরিক সংঘর্ষে তারা সীমাহীন বেদনায় আলোড়িত। এই সংঘাত, সংঘর্ষ ও বেদনা শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির বিশিষ্টদান। বাঙলা সাহিত্য এই ট্র্যাজিক রসোপলব্ধি জাগিয়ে তোলার মধ্যেই বাঙলাদেশে শেক্সপীয়রের প্রভাবের সুদূর প্রসারী গুরুত্ব।[৫]

শেক্সপীয়রের প্রভাবে বাঙালীর ট্র্যাজিক রসোপলব্ধি ঘটেছে, এবং বাঙালী ট্র্যাজেডি রচনায় আত্মনিয়োগ করেছে, কিন্তু দেখা যায় যে, বাঙালী নাটকের মধ্যে ঠিক শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডিকে ফুটিয়ে তুলতে পারেনি, বাঙালীর নিজস্ব রস-সংস্কার এই ট্র্যাজেডিকে এক ভিন্নতর রূপে প্রকাশ করেছে। ট্র্যাজেডি রচনায় বাঙালীর প্রথম প্রচেষ্টা থেকেই বাঙালীর ট্র্যাজেডি-চেতনার এই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে।

কীর্তিবিলাসের ভূমিকায় লেখক বলেছেন "ভারতবর্ষীয় পূর্বতন পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেন যে, ধার্মিক ব্যক্তির দুঃখাভিনয় করিবার সময়ে তাহাকে

---

৫. ডঃ অজিত কুমার ঘোষ—বাংলা নাটকের ইতিহাস (১৯৬৬), পৃ. ৩০—৩৫

দুঃখার্ণবে রাখিয়া গ্রন্থ শেষ করিতে নাই। ইহা কেবল তাহাদিগের ভ্রান্তি মাত্র। জীবনধারণ করিলেই ইষ্ট-অনিষ্ট উভয়েরি ভাগী হইতে হইবে। ধার্মিক হইলেই যে আপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইবে না এমত নহে।"

লেখকের এই বক্তব্য থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রকৃত ট্র্যাজেডি-চেতনার জন্য যে জীবনবোধ গড়ে ওঠার দরকার, তা যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের ছিল। তাঁর এই জীবনবোধ নিঃসন্দেহে শেক্সপীয়রের জীবনবোধের সহধর্মী। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'কীর্তিবিলাস' নাটকে তিনি যে ট্র্যাজেডি-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন, তা আদৌ শেক্সপীয়রীয় নয়। বাঙালীর রস-সংস্কার অনুযায়ী করুণরসই এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। সপত্নী পুত্রের প্রতি বিমাতার নিষ্ঠুর পরিণতির মধ্য দিয়ে এই করুণরসের নিষ্পত্তি ঘটেছে। এই করুণরসও এখানে যুক্তিগ্রাহ্য কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে অনিবার্য হয়ে ওঠেনি। শীত-বসন্তের রূপকথার মতো এক তরল করুণ রসকে লেখক উপযুক্ত কার্য কারণের সূত্র ব্যতীতই সৃষ্টি করে গেছেন। সুতরাং করুণরসও এখানে নাট্য-রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তা না হলেও এই করুণ রস সৃষ্টির মধ্যদিয়েই যে পরিচায়িত হয়েছে লেখকের ট্র্যাজেডি-চেতনা, তা বোঝা যায়, কারণ তিনি শেক্সপীয়রের নাটকের ট্র্যাজেডির আদর্শ মনে রেখেও ট্র্যাজেডি নামে যা সৃষ্টি করেছেন, তা এই করুণরসাত্মক কাহিনী। সুতরাং করুণরস সম্পর্কে বাঙালীর তথা ভারতীয়ের যে প্রচলিত সংস্কার, তা যে প্রবলভাবে লেখকের মনে ক্রিয়াশীল থেকে 'ট্র্যাজেডি' অর্থে 'বিষাদান্ত' কাহিনীর বোধ সৃষ্টি করেছে এবং ট্র্যাজেডির রস অর্থে নির্বিকল্প করুণরসকেই চিনিয়ে দিয়েছে, তা স্পষ্টতঃই বোঝা যায়। যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের পরবর্তী ট্র্যাজেডি রচয়িতাদের ট্র্যাজেডি-চেতনা আরো উন্নতমানের হলেও, তার মৌল স্বরূপ মোটামুটি যে একই থেকে গেছে, তা আমরা পরবর্তী ট্র্যাজেডি রচয়িতাদের ট্র্যাজেডি-চেতনা আলোচনা করলেই দেখতে পাব।

যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' ট্র্যাজেডি রচনার প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবেই উল্লেখযোগ্য। সার্থক ট্র্যাজেডি হিসেবে এই গ্রন্থ স্বীকৃত নয়। কিন্তু মধুসূদনের "কৃষ্ণকুমারী" (১৮৬১) বাঙালীর রচিত প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি হিসেবেই পরিচিত। সমসাময়িককালে এই নাটকটির অভিনয়ের সময় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই নাটকটিকে ট্র্যাজেডি হিসেবেই প্রচার করা হয়। মধুসূদন নিজেও ট্র্যাজেডি রচনার সমস্ত প্রকার সচেতনতা নিয়েই নাটকটি যে

রচনা করেছিলেন, তারও প্রমাণ আছে। অভিনেতা কেশব গাঙ্গুলীকে লিখিত মধুসূদনের একটি পত্রের মধ্যেই মধুসূদনের এই সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। কেশব গাঙ্গুলীকে তিনি লিখেছিলেন, "As the play is a tragedy, I have not thought it proper to begin any scene with the determination of being comic ; in my humble opinion such a thing would not be in keeping with the nature of the play,"[৬]

কিন্তু মধুসূদন এ বিষয়েও সচেতন ছিলেন যে, ঠিক শেক্সপীয়রের আদর্শে ট্র্যাজেডি রচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির আদর্শে তাঁর নাটকের বিচার করলে যে ভুল হবে, তাও তিনি মনে করতেন। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একটি পত্রে এ সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন, "Some of my friends—and I fancy you are among them, as soon as they see a Drama of mine, begin to apply the cannons of criticism that have been given-forth by the masterpieces of William Shakespeare. They perhaps forget that I write under different circumstances. Our social and moral developments are of a different character. We are no doubt actuated by the some passions, but in us those passions assume a milder shape.[৭] এইজন্যই তাঁর এই নাটকে ঠিক শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি রসের পরিবর্তে ভারতীয় করুণরসই নিষ্পন্ন হয়েছে বেশী। যে নাটক হচ্ছে "the story of unhappy Princess Kissen Kumary,"[৮] সেই নাটকে ট্র্যাজেডি-রস হিসেবে করুণ রসেরই যে আধিক্য ঘটবে, তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। নাট্যকার নিজেও যথেষ্ট শোক ভাবাপন্ন হয়েই নাটকটি রচনা করেছিলেন। কৃষ্ণকুমারীর আত্মহত্যা দৃশ্য রচনা করার সময় মধুসূদন নিজেই যে যথেষ্ট শোকার্ত হয়েছিলেন, তা তিনি নিজেই স্বীকার করে গেছেন:

---

৬. নগেন্দ্রনাথ সোম: মধুস্মৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১৩৬১, পৃ. ৬৩২।

৭. মধুস্মৃতি (১৩৬১), পৃ. ৬১৯—২০।

৮. ঐ পৃ. ৬০৯।

"I shed many a tears when poor Kissen Kumari stabbed herself and fell on her bed."[৯]

কিন্তু এই unhappy princess Kissen Kumary-র শোকাবহ জীবন-বৃত্তান্ত নিয়ে তিনি যে নাটক রচনা করলেন, তা এইভাবে করুণরস প্রধান হয়ে ওঠা সত্ত্বেও, তাকে তিনি regular tragedy হিসেবেই বিবেচনা করে গেছেন। রাজনারায়ণকে তিনি লিখেছিলেন, "I have been dramatizing, writing a regular tragedy in prose! The plot is taken from Tod, vol. I. P. 461. I suppose you are well acquainted with the story of the unhappy princess Kissen Kumary."[১০]

তাহ'লে আমরা দেখলাম যে, যে নাটকটি মধুসূদনের নিজের দৃষ্টিতেই করুণ-রস প্রধান, সেই নাটকটিকেই তিনি যোল আনা (regular) ট্র্যাজেডি ব'লে পরিচিত করেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে করুণ-রস প্রধান নাটক মাত্রই ট্র্যাজেডি নয়, তাহ'লে "কীর্তিবিলাস"-কেও ট্র্যাজেডি হিসেবে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু 'কীর্তিবিলাস' ট্র্যাজেডি লেখার প্রাথমিক চেষ্টা মাত্র। করুণরস যখন চিত্ত আলোড়নকারী ব্যাপ্তি ও গভীরতা পেয়ে গম্ভীর ও মৌন হয়ে ওঠে, তখনই—তা ট্র্যাজেডি হয়ে ওঠে।

দুঃখে ভূমি লুণ্ঠিত ভীম সিংহের আত্মঘাতী হৃদয়ের আর্তনাদই কৃষ্ণকুমারী নাটকটিকে যথার্থ ট্র্যাজেডির মর্যাদা প্রদান করেছে। গ্রীক সেনাপতি আগামেম্‌নন্ যেমন দেশ ও জাতির কল্যানার্থে নিজের কন্যা ইফিজিনিয়াকে উৎসর্গ করেছেন, তেমনি এখানে দেশের ও প্রজার হিতার্থে ভীম সিংহও নিজের কন্যাকে উৎসর্গ করতে উদ্যত হলেন। এতে তিনি দেশকে হয়তো রক্ষা করতে পারলেন, কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারলেন না। নিদারুণ দুঃখ এবং প্রচণ্ড আত্মগ্লানিতে তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেল। ভীম সিংহের এই বিপর্যস্ত অবস্থায় সঙ্গে লীয়রের বিপর্যস্ত অবস্থার মিল সহজেই চোখে পড়তে পারে। এবং তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই ভীম সিংহকে শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজিক চরিত্র বলে মনে হতে পারে।

এই নাটকের করুণরসের স্থায়ি-ভাব শোকভাবটি নাটকের শেষের দিকে অত্যন্ত প্রবলভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। পঞ্চম অঙ্কের তিনটি দৃশ্যই এই ব্যাপারে

৯. ঐ পৃ. ৬৩৪—৩৫।

১০. ঐ পৃ. ৬০৯।

অত্যন্ত কার্যকরী। কন্যার জীবনাশঙ্কায় মাতা ও পিতার বিলাপ, বলেন্দ্র সিংহের আত্মধিক্কার এবং দুঃখপ্রকাশ, পিতা ভীম সিংহের উন্মাদ অবস্থা প্রাপ্তি প্রভৃতি সবকিছুই সমগ্র পঞ্চম অঙ্কটিতে সর্বক্ষণ শোকভাবটিকে জাগিয়ে রাখে। কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যুর আশংকায় এই যে চতুর্দিকে শোকের ঝড় উঠেছে, এটাই যথার্থ ট্র্যাজেডির পরিবেশ সৃষ্টি করেছে এই নাটকে। মধুসূদন সুপরিকল্পিতভাবেই পঞ্চম অঙ্কে এই শোকের পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন নাটকটির ট্র্যাজিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য। কেশব গাঙ্গুলিকে লিখিত পত্রে তিনি এই পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন,—"I shall soon finish the Last Act ; It will be highly tragic. Poor Kissen Kumari will die"[১১] সুতরাং মধুসূদন যে তাঁর এই regular tragedy-কে মূলতঃ শোকভাবের উদ্দীপন ও করুণরসের সৃজনের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা বোঝা যায়। নাটকটির এই শোক-ভাবের তীব্রতা এবং করুণরসের গভীরতার জন্যই, আমাদের পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত ট্র্যাজেডির নিরিখে এর ট্র্যাজেডিত্ব বিচার করা না গেলেও, একে ট্র্যাজেডি হিসেবে স্বীকার না করে পারা যায় না। এইজন্যই এই নাটকের অনেক ত্রুটি দেখিয়েও ডঃ শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মন্তব্য করেছেন, "এই নাটকে ট্র্যাজেডির বিষাদময় গভীরতা, কমেডির চটুলতা ও ইতিহাসের প্রত্যক্ষতার সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায় অথচ কাহিনীটিকে এমনভাবে সাজান হইয়াছে যে সমস্ত নাটকখানি যে ট্র্যাজেডি সেই সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না।"[১২]

কৃষ্ণকুমারী উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে বহুবার অভিনীত হয়েছে। সেই সব অভিনয়ের বিবরণ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সমসাময়িক দর্শকচিত্তে নাটকটির করুণ রসাবেদনই ছিল মুখ্য। ১৮৭৪, ২৪ শে জানুয়ারীতে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে কৃষ্ণকুমারীর যে অভিনয় হয়েছিল, সে সম্পর্কে পরবর্তী ৩০শে জানুয়ারীর 'ভারত সংস্কারক' পত্রিকায় দেখা যায়, "বলেন্দ্র সিংহ যখন কৃষ্ণাকে নিহত করিতে আসিতেছেন, তখন তাহার প্রবেশ যথার্থ হৃদয়ভেদী হইয়াছিল।" বোঝা যায়, এই হৃদয়ভেদী ভাবটাই দর্শককে বেশী মুগ্ধ করেছিল। এই হৃদয়ভেদী ভাবটাকেই পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডির pity ভাবের সমপর্যায়ভুক্ত মনে করা যায়। এ থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, ট্র্যাজেডি সম্পর্কে

---

১১. নগেন্দ্রনাথ সোম ; মধুস্মৃতি (১৩৬১), পৃ. ৬৩১।

১২. ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত : মধুসূদন : কবি ও নাট্যকার, (১৯৬০), পৃ. ১৪১।

বাঙালী (লেখক বা দর্শক) প্রথম যখন চিন্তা করতে সুরু করেছেন, তখন তাঁরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে বা সংস্কার বশে ট্র্যাজেডির pity এবং fear-ভাবের মধ্যে মুখ্যতঃ বা কেবলমাত্র pity ভাবটিকেই প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন, এবং সেই অভ্যাসটিই পূর্ব সংস্কারের সূত্রে এখনো বাঙালীর মধ্যে চলে আসছে।

'মায়াকানন' (১৮৭৪) মধুসূদনের আর একখানি ট্র্যাজেডি। কবির অন্তিম জীবনে রচিত এই ট্র্যাজেডিখানি 'কৃষ্ণকুমারী'র মতো খ্যাতিলাভ করেনি।

মধুসূদনের জীবনচরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু এই নাটকটির মধ্যে কবির বিষাদময় জীবনের প্রতিবিম্বপাত লক্ষ্য করেছেন। ডঃ সুকুমার সেনও অনুরূপ মন্তব্য করে বলেছেন, "মায়াকাননের ট্র্যাজেডি নিষ্করুণ শোকাবহ এবং মধুসূদনের জীবনে যেমন, এখানেও তেমনি নায়ক-নায়িকার সব আশা-ভরসা নিঃশেষে চুকিয়া গিয়া যবনিকা পতন হইয়াছে।"[১৩]

শেষ দৃশ্যে পরপর অনেকগুলি অনিবার্য মৃত্যু সমস্ত পরিবেশটিকে বিষণ্ণ করুণ করে তুলেছে। প্রকৃতপক্ষে চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্ক থেকেই ওই বিষণ্ণতার ভাবটি তীব্র হয়ে উঠেছে এবং তা পঞ্চম অঙ্কের দু'টি দৃশ্যেই অব্যাহত থেকেছে। সর্বমোট এই তিনটি দৃশ্যই নাটকের ট্র্যাজেডির দিকটাকে গড়ে তুলেছে। বিষণ্ণতার ভাবটাই এখানে ট্র্যাজেডির মূলভাব। এখানে গ্রীক-ট্র্যাজেডির মতো নিয়তির প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। নিয়তির প্রতিবন্ধকতাই অজয়-ইন্দুমতীর জীবনের সর্বনাশ সাধন করেছে। এই সর্বনাশের জন্য তাদের নিজেদের কোনো দায়িত্ব ছিলনা। কেবল অজয় তার পিতা ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শ মেনে না নেওয়ায় তার হয়তো কিছু অপরাধ হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ইন্দুমতীর সঙ্গে তার বিবাহে যে দেবতাদের প্রতিবন্ধকতা আছে, তা একমাত্র অজয়ের পিতাই জানতেন, কিন্তু তা তিনি অজয়ের কাছে ব্যক্ত করেননি—এবং অন্য কোনো ভাবেই অজয় সে ইঙ্গিত পায়নি। সে স্বাভাবিক যৌবনধর্মে পিতার পরামর্শ অগ্রাহ্য করেছে। কিন্তু এটাই তার অপরাধ, এবং এর জন্য শাস্তি তাকে পেতেই হবে। তাই বলা চলে, নিছক নিয়তির নিষ্পেষণাতেই এই দুটি নিরপরাধ জীবনে ট্র্যাজেডি নেমে এসেছে, আর এই

---

১৩. বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), (১৩৫৬), পৃ. ৪৯।

নিয়তির নিষ্পেষণার জন্যই এই ট্র্যাজেডির মধ্যে গ্রীকট্র্যাজেডির লক্ষণ দেখা যায়।

যে ভাবের উপর এই নাটকের ট্র্যাজেডি নির্ভর করে আছে, তা নিঃসন্দেহে শোক (pity) ভাব। শশিকলা, ইন্দুমতী, সুনন্দা-র আবেগ উচ্ছ্বসিত রোদন, বিষণ্ণ রাজার দীর্ঘনিশ্বাস, এবং কাতর স্বগতোক্তি এই নাটকটিকে প্রায় আগাগোড়াই বিষাদে পরিপূর্ণ করে রেখেছে। নাটকের পাত্র-পাত্রীদের এই আবেগ-উচ্ছ্বসিত বিষাদ কোনো সময়ই কৃত্রিম কিংবা মাত্রাতিরিক্ত হয়নি। মধুসূদনের পরিমিতিবোধ এবং সচেতন শিল্পী-মানস সর্বদাই সেদিকে সতর্ক ছিল। তাই পাত্র-পাত্রীদের দীর্ঘনিশ্বাস, কাতরতা, ক্রন্দন সবসময়ই মনে হয়েছে স্বাভাবিক এবং অনিবার্য, এবং সেই কারণই দর্শকচিত্তে অনুকূল ভাটিবই স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেগে ওঠে। অর্থাৎ নাটকের 'শোক' ভাবটি দর্শকের মধ্যেও 'শোক' ভাবটিকেই জাগিয়ে তোলে। নাটকটির প্রথম সংস্করণের প্রকাশক শরচ্চন্দ্র ঘোষ এবং অখিলনাথ চট্টোপাধ্যায় এই অভিজ্ঞতার কথাই প্রকাশ করেছেন—"মায়াকানন বিয়োগান্ত নাটক; ইহা অন্তর্গত করুণরস পাঠ করিয়া কোনক্রমে অশ্রু সংবরণ করা যায় না।"[১৪]

মধুসূদন 'মায়াকানন' নাটকটিকে কৃষ্ণকুমারীর মতো একখানি regular ট্র্যাজেডি করতে চেয়েছিলেন কিনা, তার কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু ট্র্যাজেডির মূল ভাবটি সৃষ্টি করার ব্যাপারে কৃষ্ণকুমারী এবং মায়াকানন একই-ভাবে শোকের ভাবটিকেই উদ্রিক্ত করেছে বেশী, যা বাঙালীর রসগ্রাহী চিত্তের অনুকূল।

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 'মায়াকাননে'র ট্র্যাজেডির ভিত্তিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। গান্ধারের অধিপতি ধূমকেতুর পুত্র জয়কেতুর সঙ্গে ইন্দুমতীর বিবাহের যে প্রস্তাব দেবী অরুন্ধতী করেছিলেন, (ডঃ সেনগুপ্তের মতে), তা-ই নাটকটির বিষাদান্ত পরিণতির কারণ। তিনি বলেছেন, "এই প্রস্তাব অতর্কিত না হইলেও বিস্ময়কর, ইন্দুমতী ও অজয় পরস্পরের প্রতি গভীর প্রণয়ে আসক্ত আর রাজা ধূমকেতু ইন্দুমতীর পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন। এই প্রস্তাব উপস্থাপিত হওয়া মাত্র আখ্যায়িকা নূতন পথে ধাবিত হইয়া অনিবার্য বিষাদান্ত পরিণতিতে পহুঁছিল। যে ভয়াবহ প্রস্তাব এই ট্র্যাজেডির মূল

---

১৪. ভূমিকা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 'মায়াকানন', চতুর্থ মুদ্রণ (১৩৬২)।

তাহা যে তপস্বিনী অরুন্ধতীর মুখ হইতে নিঃসৃত হইল তাহার মধ্যে আশ্চর্য্য সুসঙ্গতির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিজে বিষয়-ব্যাবৃত্তচিত্ত, জনসাধারণের হিতৈষিণী হইলেও ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগ সম্পর্কে উদাসীন। অথচ তিনিই ইন্দুমতীর সর্বাপেক্ষা আপনার জন। তিনিই শুভলগ্নে ইন্দুমতীকে মায়াকাননে পাঠাইয়াছিলেন। ইন্দুমতী দৈবের করাল নির্দ্দেশ পাইলেন তাঁহার একান্ত বিশ্বস্ত শুভাকাঙ্ক্ষিনীর নিকট হইতে। ইহাই শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডির নিয়ম।"[১৫]

ডঃ সেনগুপ্তের এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণই যুক্তিযুক্ত এবং এর দ্বারা এটাই আরো সুস্পষ্ট হয় যে হতভাগিনী ইন্দুমতীর সর্ববিধ ভাগ্যবিড়ম্বনাজনিত যে বিষাদ, তা-ই এই নাটকটিকে ট্র্যাজেডি করে তুলেছে। সুতরাং বাঙালীর অভ্যস্ত বিষাদের ভাবটিকে নিয়েই এই ট্র্যাজেডি রচিত হয়েছে,—রসের বিচারে যে শ্রেণীর ট্র্যাজেডিকে আমরা প্যাথেটিক ট্র্যাজেডি বলতে পারি,—বাঙালী শিল্পীর পক্ষে যা সম্ভব এবং সহজ।

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকটিও ট্র্যাজেডি হিসেবে উল্লেখ-যোগ্য। একই গ্রামের একটি ধনী পরিবার ও আর একটি দরিদ্র কৃষক পরিবারের সঙ্গে অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের সঙ্গে সংঘর্ষের উপক্রমের মধ্যে নাটকের আরম্ভ এবং সেই সংঘর্ষের শোচনীয় পরিণতিতে নাটকের উপসংহার। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করবার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে নাটকটি রচিত। নাট্যকার তাঁর এই উদ্দেশ্যকে কখনো গোপন করেননি —নাটকের ভূমিকাতেই উদ্দেশ্যের কথা স্পষ্ট করে বলেছেন। এই উদ্দেশ্যের জন্যই তাঁর পক্ষে প্রয়োজন ছিল কৃষকদের দুর্দশাকে খুব স্পষ্টভাবে তুলে ধরা। তাই তিনি করেছেন। এবং তা করতে গিয়ে অসহায় কৃষকদের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করবার জন্য তাদের দুঃখকে এমন ব্যাপকভাবে চিত্রিত করেছেন যে নাটকটি প্রায় আগাগোড়াই করুণ রস-সিক্ত হয়ে উঠেছে। এবং পরিণতিও কতকগুলি শোকসন্তপ্ত মৃত্যুর জন্য আর নীলকরদের অত্যাচারের কাছে গ্রামবাসীদের সামগ্রিক পরাজয়ের জন্য অত্যন্ত বিষাদাত্মক হয়ে উঠেছে। এখন নাটকের এই করুণরস এবং বিষাদময় পরিণতি, নাটকটিকে প্রকৃত ট্র্যাজেডি করে তুলেছে কিনা, সেটাই আলোচ্য-বিষয়।

---

১৫. মধুসূদন : কবি ও নাট্যকার (১৯৬০), পৃ. ১৪৫—৬

নীলদর্পণকে ট্র্যাজেডি বলে স্বীকার করতে গিয়ে প্রায়ই দু'টি আপত্তি উত্থাপিত হয়। প্রথমতঃ এখানে দুঃখের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ খুব সক্রিয় নয়, আর দ্বিতীয়তঃ নাটকের শেষে মৃত্যুর আতিশয্যে ট্র্যাজেডির রসকে বিঘ্নিত করে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই নাটকে বসু পরিবার এবং সাধুচরণের পরিবারের যে দুঃখ তা মোটেই নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে আসেনি। তোরাপ, রাইচরণ প্রভৃতি রায়তেরা তাদের নিজস্ব বুদ্ধি ও শক্তিতে এবং নবীনমাধবেরা তাদের মধ্যবিত্ত পন্থায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। অসংগঠিত কৃষক হিসেবে রাইচরণ-তোরাপের এবং ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত হিসেবে বসু পরিবারের-এর বেশী আর কিছু প্রকৃত পক্ষে করার ছিল না। সমকালীন সামাজিক পরিস্থিতির কথা মনে রাখলে, এদেশীয় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এর চেয়ে কঠোর প্রতিরোধ প্রত্যাশা করা যায় না—এবং প্রকৃত পক্ষে তা তখন সম্ভব ছিল না। যে জাতি আবহমানকাল থেকে সমস্ত দুঃখ-দুর্গতিকে ভবিতব্য বলে মেনে নিতেই অভ্যস্ত, সে জাতির মানুষের পক্ষে পরাক্রান্ত ইংরেজ সরকারের অনুগ্রহ-পুষ্ট নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ঐ টুকুই যথেষ্ট। এবং তাতেও যে তারা বিপর্যয়কে রোধ করতে পারেনি, সেইটাই ট্র্যাজেডি।

আর মৃত্যুর আতিশয্যও এই নাটকে ট্র্যাজেডি-রসকে বিঘ্নিত করেনি। ভয়াবহ মৃত্যুর আতিশয্য আমাদের শোকাভিভূত চিত্তকে বিমূঢ় করে ফেলে এবং আমরা ট্র্যাজেডির বিধ্বংসীরূপকে প্রত্যক্ষ করি। মধ্যযুগের ইউরোপীয় সাহিত্যের ও অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুর আতিশয্য দেখিয়েই ট্র্যাজেডি রচনা করা হত। সুতরাং নীলদর্পণে মৃত্যুর আতিশয্য দেখে আমরা একথা মনে করি না যে মৃত্যু খুব সহজ ব্যাপার এবং তা আমাদের শোকাবিষ্ট করে না। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের মাত্রা যেখানে সীমাহীন, সেখানে সেই অত্যাচারের বলি হিসাবে কয়েকটি শোকসন্তপ্ত মৃত্যু কিছু অস্বাভাবিক নয়, বরং তা নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের ভয়ানক পরিণামকেই বুঝিয়ে দেয়। গোলোক বসু, নবীনমাধব, সাবিত্রী, সৈরিন্ধ্রী, ক্ষেত্রমণি প্রভৃতির জীবনের যে করুণ পরিণতি, তা তাদের কোনো আচরিত কর্মের ফলে হয় নি। অথচ বাইরের নিষ্ঠুর অত্যাচারের বলি হিসেবে তাদের নীরবে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। এটা কিছু কম দুঃখের নয়, এবং প্রকৃতপক্ষে এটাই মস্ত ট্র্যাজিক। ডঃ সুশীলকুমার দে

ঠিকই বলেছেন যে, "প্রাচীন গ্রীক নাটকের অন্তর্গত যে ট্র্যাজেডি পরিকল্পনা, তাহার সহিত নীলদর্পণের করুণভাবের সাদৃশ্য আছে।"[১৬]

সুতরাং নীলদর্পণকে ট্র্যাজেডি বলার বিরুদ্ধে যে দুটি আপত্তি উত্থাপিত হয়ে থাকে, সেগুলি যথার্থ নয় বলেই মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে নীলদর্পণে গোলোক বসুর পরিবারে এবং সাধুচরণের পরিবারে যে এক তরফাভাবে দুঃখের দুর্যোগ নেমে এসেছে, যার ফলে দু'টি পরিবারেরই সর্বনাশ সাধিত হ'ল, তা আমাদের চিত্তে যথেষ্ট শোকের ভাবকে জাগিয়ে তোলে। এই শোক আরো তীব্র ও অসহনীয় হয়ে ওঠে শেষ দৃশ্যের মৃত্যু ঘটনাগুলির দ্বারা। মৃত্যু ঘটনাগুলি শিল্পসম্মত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে, এবং হয়তো মৃত্যু ঘটনাগুলি পুরোপুরি শিল্পসম্মত হয়নি বলেই সেগুলির ট্র্যাজিক কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু এই নাটকের ট্র্যাজেডির মূলরস করুণরস এবং তার যে স্থায়িভাব শোক, তার আলম্বন বিভাব গোলোক বসু প্রভৃতি এবং সাধুচরণ প্রভৃতি, আর তার উদ্দীপন বিভাব দুর্বল প্রতিরোধোত্তর অমানুষিক দুঃখভোগ এবং এই মৃত্যু দৃশ্যগুলি। এইভাবে এই ট্র্যাজেডির করুণরসের নিষ্পত্তি অত্যন্ত সার্থক হওয়াতে, এইটিই পরবর্তী অনেকগুলি বিয়োগান্ত নাটকের আদর্শ হয়ে দাঁড়ায় এবং প্যাথেটিক শ্রেণীর ট্র্যাজেডির প্রতি বাঙালীকে অনুপ্রাণিত করে।

বাঙলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসকার ডঃ অজিতকুমার ঘোষ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "করুণ রসাত্মক নাটকের আদর্শরূপেও 'নীলদর্পণ' পরবর্তী নাট্য-সাহিত্যে বিশেষভাবে অনুসৃত হইয়াছিল।" গিরিশচন্দ্রের বিষাদান্ত সামাজিক নাটকে 'নীলদর্পণে'র প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। মৃত্যুদৃশ্যের আধিক্য, করুণরসের আতিশয্য, প্রতিবাদহীন দুঃখভোগ প্রভৃতি যে যে করুণ রসাত্মক লক্ষণ এই নাটকের মধ্যে বিদ্যমান সেগুলি বহুলাংশে 'প্রফুল্ল', 'বলিদান' প্রভৃতি পরবর্তী প্রসিদ্ধ নাটকে পরিস্ফুট হয়েছিল।[১৭]

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা নাটকের উপর গবেষণা করতে গিয়ে একজন পণ্ডিত সমালোচক 'নীলদর্পণে'র মৃত্যুঘটনা সম্বলিত ভয়াবহ দৃশ্যগুলির কার্যকারিতা এবং নাটকীয় তাৎপর্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পেরেছিলেন।

---

১৬. ডঃ সুশীলকুমার দে : দীনবন্ধু মিত্র, (১৩৬৬), পৃ. ৪৫।

১৭. বাংলা নাটকের ইতিহাস (১৯৬৬), পৃ. ১১২।

তাঁর মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য : "His principal aim was to awaken sympathy for those who suffered, and indignation against those who inflicted the sufferings. But curiously enough, the first natural reaction to the play is to shrink from these horrors and these scenes of ghastly cruelty. It was quite unnecessary to fill the entire story with blood and torture, suffering and death, even though it was intended to be a genuine tragedy. Temperamentally, the dramatist was so much moved by the inhuman cruelties of indigo industy which he quite conceivably had seen enacted before his eyes, that it was impossible for him to bring a sense of detachment to bear upon his writing of the drama."[১৮] নাটকীয় তাৎপর্য এবং ট্র্যাজিক কার্যকারিতার দিক থেকেও হয়তো এই সব মৃত্যুদৃশ্যের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু নাট্যকার ঐসব মারাত্মক ঘটনা নীল-চাষীদের জীবনে এত বেশী ঘটতে দেখেছেন যে, নাটকে ঐসব ঘটনাকে বাদ দেবার মতো সাহিত্যিক নিরপেক্ষতা তিনি বজায় রাখতে পারেন নি। পরন্তু ঐসব ঘটনার মধ্য দিয়েই তিনি অত্যাচারিত স্বরপুর গ্রামবাসীদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন, এবং এই সহানুভূতি যে তিনি আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তা কতকগুলি তথ্য থেকে জানা যায়।

কলিকাতা 'ন্যাসনেল্ থিয়েট্রিকেল সোসাইটির' সভ্যরা নীলদর্পণ নাটকের প্রথম অভিনয় করলে, এডুকেশন গেজেট (১লা ডিসেম্বর, ১৮৭২) সেই অভিনয়ের যে বিস্তৃত বিবরণ দেয়, তাতে দেখা যায়, "পঞ্চম অঙ্কে সৈরিন্ধ্রীর বিলাপ লহরী এত স্বাভাবিক ও ভাবপূর্ণ হইয়াছিল যে তদ্ভবনে এমত শ্রোতা ছিলনা, যে একবিন্দু অশ্রুপাত করেন নাই।...দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক সরলতার বিলাপ লহরীও অনেকের হৃদয়ভেদী হইয়াছিল।"

তারপর 'জামাইবারিকে'র একটি অভিনয়ের আলোচনা করতে গিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকার (১৯শে ডিসেম্বর, ১৮৭২) সমালোচক 'নীলদর্পণে'র

---

১৮. P. Guha Thakurta : Bengali Drama, Its Origin and Development, (London), (1930), p. 110.

হৃদয়বিদারক অভিনয়কে স্মরণ না করে পারেননি। তিনি লিখেছেন, "গ্রাশনাল্ থিয়াটরে নীলদর্পণের অভিনয় দেখিয়া আমরা ক্রন্দন করি, গত শনিবারে জামাইবারিক দেখিয়া তেমনি হাসিয়াছিলাম।"

এইসব তথ্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ট্র্যাজেডি সম্পর্কে বাঙালী লেখক এবং দর্শক উভয়েই জীবনের বিষাদের, অপচয়ের, ক্ষতির একটা বৃত্তান্তকেই বুঝেছিলেন। লেখক সেই ধারণা নিয়েই নাটক লিখতেন, আর দর্শক সেই ধারণা নিয়েই নাটকের স্বাদ নিতেন। এতে নাট্যকারের যেমন সাফল্য, দর্শকেরও তেমন তৃপ্তি।

স্মরণ রাখা দরকার যে 'নীলদর্পণ' সমসাময়িক কালে ট্র্যাজেডি নামেই পরিচিত হয়েছিল। ২৯শে মার্চ, ১৮৭৩ এর 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস' পত্রিকায় 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের বিজ্ঞাপনে "The Tragedy of Nildurpan" কথাটি ব্যবহৃত হয়েছিল। দীনবন্ধু নিজে ব্যাকরণসম্মত ট্র্যাজেডি হিসেবে সচেতন-ভাবে নাটকটি না লিখেও থাকতে পারেন, কিন্তু সমসাময়িক নাট্যরসিক ব্যক্তিবর্গ যে নাটকটিকে ট্র্যাজেডি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, তা থেকে ট্র্যাজেডি সম্পর্কে তাঁদের একটি বিশিষ্ট চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি-চেতনার মিল না থাকতে পারে, তবু 'ট্র্যাজেডি'র নাম উচ্চারণ করেই যে তখনকার দিনের নাট্যরসিকেরা তাঁদের ট্র্যাজেডি-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে এটাই বোঝা যায় যে পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডি এবং বাঙলা ভাষায় রচিত বিয়োগান্ত নাটকগুলির মধ্যে মূল ভাববিষয়ে নিশ্চয়ই তাঁরা সাধর্ম্য লক্ষ্য করেছিলেন। জীবনের দুঃখের দিকটাই সেই মূলভাব,—যা পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডিতে এবং বাঙলা বিয়োগান্ত নাটকে সাধারণ ভাবে আছে। 'নীলদর্পণ' প্রভৃতি বিয়োগান্ত নাটকে এই মূল ভাবটি বজায় থাকার জন্যই 'নীলদর্পণ' প্রভৃতি 'ট্র্যাজেডি' নামেই পরিচিত হয়েছে বা বাঙালী 'ট্র্যাজেডি'-নামেই এই সব নাটককে পরিচিত করেছে। এই সব নাটককে ট্র্যাজেডি নামে অভিহিত করার মধ্য দিয়েই বাঙালী নাট্যরসিকদের বিশিষ্ট ট্র্যাজেডি-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাঙলা সাহিত্যে ট্র্যাজিক রসচেতনার পরিচয় পাওয়ার জন্য জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুরের কয়েকটি নাটকের আলোচনা করা দরকার।—

সরোজিনী (১৮৭৫),—এই নাটকে নায়িকা সরোজিনীর ট্র্যাজেডি দেখানো হয়েছে। নাটকের প্রথম গর্ভাঙ্ক থেকে সুরু করে পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পর্যন্ত ঘটনা প্রবাহের এক ট্র্যাজিক জটিলতার মধ্য দিয়ে সরোজিনীর দুর্ভাগ্য অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে যদি সরোজিনীর যথার্থই বলিদান সম্ভব হ'ত, তবে তার ট্র্যাজেডি একটা জীবন্তরূপ পরিগ্রহ করত। কারণ, সেই ট্র্যাজেডির কারণ হ'ত সরোজিনীর অন্ধ পিতৃ আনুগত্য—সেটাই হ'ত তার চরিত্রের ট্র্যাজিক ভ্রান্তি। পিতার প্রতি আনুগত্যকে অস্বীকার করে সে যদি বিজয় সিংহের পরামর্শ গ্রহণ করত, তবে তাকে বলির স্থানে উপস্থিত হতেই হ'তনা। কিন্তু তা না করাতেই তাকে বলি দেওয়ার সমস্ত আয়োজন করা সম্ভব হয়েছিল। পিতৃভক্তির এই ট্র্যাজিক পরিণতি ট্র্যাজেডির যথার্থ মহিমালাভ ক'রত কারণ সেই ট্র্যাজেডি তার চরিত্রের ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসছে। ট্র্যাজেডির উৎস যখন চরিত্রের মধ্যেই নিহিত থাকে, তখনই ট্র্যাজেডি জীবন্ত হয়ে ওঠে : What we do feel strongly, as a tragedy advences to its close, is that the calamities and catastrophe follows inevitably from the deeds of men, and that the main source of these deeds is character.[১৯]

কিন্তু এই নাটকে তা হয়নি। পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে সরোজিনীর জীবনের ট্র্যাজিক পরিণতি দেখানো হয়নি। তা দেখানো হয়েছে আরো পরে ষষ্ঠ অঙ্কে। এবং সেখানে যে ট্র্যাজেডি সংঘটিত হ'ল তার জন্য সরোজিনীর চরিত্র মোটেই দায়ী নয়, দায়ী তার ভাগ্য।

সুতরাং দেখা যায়, সরোজিনীর ট্র্যাজেডির জন্য নাট্যকার সরোজিনীর চরিত্রের উপর নির্ভর করেননি, নির্ভর করেছেন সরোজিনীর ভাগ্যের উপর, এবং নাটকের ট্র্যাজিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য নাট্যকারকে আশ্রয় নিতে হয়েছে করুণরসের। সরোজিনীর ভাগ্য বিড়ম্বিত জীবনের দুঃখ বা শোক আমাদের চিত্তে করুণরসের সৃষ্টি করে, এবং আমরা তার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হই।[২০]

---

১৯. Bradley : Shakespearean Tragedy, (1952), p. 13.

২০. সরোজিনীর সঙ্গে ইউরিপিডেসের Iphigenia at Aulis নাটকের মিল লক্ষ্য করা যায়। লক্ষ্মণ সিংহ, রণধীর এবং বিজয় সিংহ যেন যথাক্রমে এ্যাগামেমনন, মেনেলাউস এবং এ্যাকিলিস।

বাঙলা নাটকের সুরু থেকেই আমরা দেখেছি, ট্র্যাজেডি বলতে বিষাদাত্মক জীবনের দুঃখ-ময়তাকেই ধরা হয়েছে। হয়তো এই দৃষ্টিভঙ্গী জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরও ছিল। তাই তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে করুণরস সৃষ্টি করেছেন এই নাটকে এবং এইভাবেই তিনি বাঙলা বিষাদাত্মক নাটকের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের উপর এই নাটকটির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এই নাটকের "জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" গানটি রবীন্দ্রনাথের লিখিত। রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকের সঙ্গে এই নাটকের বহু অংশের মিল রয়েছে। এই নাটকটি যখন রচিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়স। সরোজিনীর বিষণ্ণতাই হয়তো রবীন্দ্রনাথের কৈশোর জীবনের রচনায় ছায়া ফেলেছে। তাই তাঁর কিশোর জীবনের রচনাগুলি বিষণ্ণতায় এত ভরপুর। এই ভাবটিই রবীন্দ্রনাথের জীবনে স্থায়ী হয়েছিল। পরবর্তীকালেও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে, গল্পে, নাটকে জীবনের ট্র্যাজিক উপলব্ধি বিষণ্ণতার ভাবের মধ্য দিয়েই ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে জীবনের এই বিষণ্ণতা বা দুঃখভোগ অনেক সময় ভিন্নপ্রকার দার্শনিক তাৎপর্য[২১] লাভ করেছে। কিন্তু জীবনের ট্র্যাজিক দিক বলতে আমরা যা বুঝি, রবীন্দ্রসাহিত্যে জীবনের দুঃখ ভোগের মধ্য দিয়ে যা পরিচিত হয়েছে, তার প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ পূর্ববর্তী বাঙলা বিষাদাত্মক নাটকের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই নাটক থেকেও যথেষ্ট লাভ করেছেন।

অশ্রুমতী (১৮৭৯)।—ব্যর্থ-প্রেমের বিষাদান্ত নাটক। ব্যর্থ প্রেমের মধ্যে যে জীবনের ব্যর্থতা, তার মধ্যে যে ট্র্যাজেডি, তাই অশ্রুমতীর ট্র্যাজেডি। সেলিমের সঙ্গে তার প্রেম সফল হলেও পিতৃকুলের দিক থেকে তার উপর আঘাত আসত, কিন্তু সে আঘাত তার জীবনকে ব্যর্থ করে দিতে পারত না। কিন্তু এখানে সেলিমের সঙ্গে তার প্রেমও ব্যর্থ হ'ল, অথচ পিতার কাছ থেকেও এল নিদারুণ আঘাত। এবং তাতেই তার জীবন শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল। অশ্রুমতীর এই ট্র্যাজেডি তার চিত্তের আভ্যন্তরীণ কোনো দ্বন্দ্বের ফলে

---

২১. "দুঃখে আমাদের স্পষ্ট ক'রে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা, ট্র্যাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে, সেই ভূমৈব সুখম্।" —রবীন্দ্রনাথ —সাহিত্যের পথে, (১৩৬৫), ভূমিকা পৃ, ৯।

ঘটেনি। ঘটেছে বাইরের ঘটনার জটিলতায়। ঘটনাগুলি তার ভাগ্যের পক্ষে প্রতিকূল হয়ে এমনভাবে ঘটে গেছে, যে তার করণীয় কিছুই ছিল না। নিছক বহিরঙ্গগত ঘটনার চাপেই তার জীবনের ট্র্যাজিক বিপর্যয় ঘটে গেল। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে অশ্রুমতীর ট্র্যাজেডিতে রোমাণ্টিক ট্র্যাজেডির লক্ষণ পাওয়া যায় না, বরং ক্ল্যাসিক্যাল ট্র্যাজেডির লক্ষণই পাওয়া যায়।

অশ্রুমতীর ট্র্যাজেডির মধ্য দিয়ে ক্ল্যাসিক্যাল ট্র্যাজেডির রীতিতে একটা ভয়ের ভাবকেও সৃষ্টি করা হয়েছে। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে বিধর্মীর সঙ্গে প্রণয়কে প্রশ্রয় দিলে, নিস্তার যে কিছুতেই নেই, এই সাবধান বাণীটি যেন শোনানো হয়েছে এখানে। অবশ্য একথাও ঠিক যে এই ভয়ের ভাবের চেয়ে অশ্রুমতীর দুঃখে শোকের ভাবটাই বেশী জাগে আমাদের চিত্তে। নাট্যকারের প্রযত্নও যেন সেই দিকেই বেশী লক্ষ্য করা যায়।

এই নাটকের হিন্দু-মুসলমানের প্রণয় ঘটনার দৃষ্টান্তেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ সতী নাট্যকাব্যটি রচনা করেছিলেন।

স্বপ্নময়ী (১৮৮২)।—নাটকের শেষে জগৎ রায় ও তার স্ত্রী সুমতির মিলন ঘটলেও নাটকটি বিয়োগান্ত। কারণ নাটকের আখ্যান ভাগের কেন্দ্রে রয়েছে স্বপ্নময়ী ও শুভ সিংহ। তাদের কাহিনী মিলনান্ত নয়। স্বপ্নময়ীর সম্মুখে শুভ সিংহের আত্মহত্যায় স্বপ্নময়ীর জীবন একেবারেই শূন্য হয়ে গেল। এদিক থেকে স্বপ্নময়ীর জীবনে ঘটেছে ট্র্যাজেডি। আবার অন্যদিকে ঐ সময়েই (পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে) রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের প্রাসাদে আগুন, রাজার মৃত্যু, কৃষ্ণরাম রায়ের একটা সামগ্রিক ট্র্যাজেডিকে (Collective tragedy) যেন সূচিত করেছে।

ট্র্যাজেডির রসের বিচারে এখানে দেখি, যে কারণে আমরা স্বপ্নময়ীর প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হই, তা স্বপ্নময়ীর বেদনা বা দুঃখ। সে শেষ পর্যন্ত শুভ-সিংহকে দেবতা হিসেবে চায়নি, মানুষ হিসেবেই চেয়েছিল। সুতরাং তার প্রত্যাশা ছিল সাধারণ নারীর মতো অল্পই। সেই অল্পটুকুও যখন তার জুটলনা, তখন তার দুঃখ অসীম। এই অসীম দুঃখ আমাদের চিত্তে শোকের ভাবকে উদ্রিক্ত করে এবং তাতেই আমরা স্বপ্নময়ীর ট্র্যাজেডি উপলব্ধি করি। স্বপ্নময়ীর অসীম দুঃখ থেকে যে pity ভাবের জন্ম, তা-ই এই ট্র্যাজেডির মূল ভাব হিসেবে কাজ করেছে।

সুতরাং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি পদবাচ্য নাটকগুলি আলোচনা করেও

দেখা যায় যে, তিনি প্যাথেটিক শ্রেণীর ট্র্যাজেডি রচনা করতেই চেষ্টা করেছেন।

বাঙলা সাহিত্যে ট্র্যাজেডি-চেতনার আলোচনায় প্রাক্ রবীন্দ্রপর্ব বলতে, সাল-তারিখের ইতিহাসে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পর্ব পর্যন্তই বুঝতে হয়। কারণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরবর্তী লেখকদের যে সমস্ত গ্রন্থ এই প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য, সেই সমস্ত গ্রন্থ যখন রচিত হয়েছে, তখন রবীন্দ্রনাথেরও সাহিত্য সাধনা সুরু হয়েছে।[২২] অতএব সেই সমস্ত গ্রন্থকে কালানুক্রম অনুসারে প্রাক্ রবীন্দ্র ঠিক বলা হয়তো চলে না। কিন্তু তথাপি সেই সমস্ত গ্রন্থ আমরা এই পর্বেই আলোচনা করব, কারণ সেই সমস্ত গ্রন্থও তাদের রচয়িতারা রবীন্দ্র-প্রভাবিত যুগের মধ্যে অন্ততঃ পড়েন না, এবং রবীন্দ্রপ্রভাবও এই সমস্ত গ্রন্থে অনুভূত হয় না। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব থেকেই ট্র্যাজেডি-চেতনার যে ধারা আমরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে দেখেছি, সেই ধারাই রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িককাল পর্যন্ত চলে এসেছে রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্ত থেকে। অন্ততঃ বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে আমরা সেই সূত্রে আলোচ্য পর্বে গ্রহণ করতে পারি। এঁদের ট্র্যাজেডি-চেতনা আলোচনা করলে, পাশ্চাত্য প্রভাবিত ট্র্যাজেডি-রচনার প্রথম প্রচেষ্টা 'কীর্তিবিলাসে'র (১৮৫২) লেখক যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত থেকে সুরু ক'রে রবীন্দ্রসমসাময়িক কাল পর্যন্ত ট্র্যাজেডি-চেতনার পূর্ণপরিচয় পাওয়া যাবে এবং সেই ট্র্যাজেডি-চেতনার সাধারণ রূপ ও রীতি নির্ণয় করে নিলে আমরা বুঝতে পারব, রবীন্দ্রপূর্ব ট্র্যাজেডি-চেতনার স্বরূপ। এবং তারপর আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হবে, রবীন্দ্রনাথ ট্র্যাজেডি-চেতনার এই ধারাকেই বহন করে নিয়ে গেছেন, না ভিন্ন কোন চেতনার পরিচয় দিয়েছেন।

---

২২. রবীন্দ্রনাথের দুঃখবোধের অভিব্যক্তি কাহিনীভিত্তিক রচনার মধ্য দিয়ে পাওয়া যাচ্ছে ১৮৭৮ থেকে। ১৮৭৮ এ রবীন্দ্রনাথের 'করুণা', 'কবি কাহিনী' : ১৮৮০তে 'বনফুল' ; ১৮৮১ তে রুদ্রচণ্ড' ; ১৮৮১-৮২ তে 'ভগ্ন হৃদয়' ; ১৮৮২ তে 'কালমৃগয়া' : ১৮৮৩-৮৪ তে 'বউঠাকুরাণীর হাট', '১৮৮৪-৮৫ তে 'নলিনী' : ১৮৮৯ তে 'রাজা ও রাণী' রচিত হয়।

আর গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' ১৮৮৯ তে, 'বলিদান' ১৯০৫-এ, 'শাস্তি কি শান্তি' ১৯০৮ এ রচিত হয়—যখন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনা পূর্ণ গৌরবে চলছে। দ্বিজেন্দ্রলালেরও দুর্গাদাস (১৯০৬), 'নুরজাহান' ১৯০৮, 'সাজাহান' ১৯০৯-এ প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া', 'নৌকাডুবি' 'কথা ও কাহিনীর' যুগে।

একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিই (১৮৬৫-১৮৮৭) প্রাকরবীন্দ্র পর্বের বলা যায়।

সুতরাং আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রলালের ট্র্যাজেডি-চেতনা আলোচনা করে দেখা দরকার। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ট্র্যাজেডি-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন উপন্যাসে, এবং আমরা এখন পর্যন্ত ট্র্যাজেডি চেতনার পরিচয় যে সমস্ত গ্রন্থে পাচ্ছি, সে সমস্তই নাটক। নাটকের মধ্যে প্রাপ্ত এই ট্র্যাজেডি-চেতনা মোটামুটি একই স্বরূপে এগিয়ে এসেছে। বঙ্কিম উপন্যাসে যে ট্র্যাজেডি-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন তার স্বরূপ একটু ভিন্নতর। তাই আলোচনার সঙ্গতি রক্ষার জন্য আপাততঃ নাটকে লব্ধ গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের ট্র্যাজেডি-চেতনার আলোচনা সেরে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ট্র্যাজেডি-চেতনার আলোচনা করাই শ্রেয়।

ট্র্যাজেডি হিসেবে গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলিই আমাদের আলোচ্য হবে। এই সব নাটকের মধ্যে 'প্রফুল্ল', 'বলিদান', এবং 'শাস্তি কি শান্তি' আলোচনা করলেই যথেষ্টভাবে গিরিশচন্দ্রের ট্র্যাজেডি-চেতনার পরিচয় পাওয়া যাবে।

প্রফুল্ল (১৮৮৯)। 'প্রফুল্ল' নাটক একটি সুখী পরিবারের বিপর্যয়ের বা দুর্ভাগ্যের কাহিনী। যোগেশের 'সাজানো বাগান' কি করে শুকিয়ে গেল, তারই দুঃখময় কাহিনী এই নাটকে বলা হয়েছে। শুধু কাহিনীতেই নয়, এই নাটকের একাধিক চরিত্রের ভাগ্যেও নানা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে,—বিশেষতঃ, যোগেশ, জ্ঞানদা ও প্রফুল্ল-র জীবনের দুর্ভাগ্য সত্যই বড় ভয়াবহ। সুতরাং 'প্রফুল্ল' নাটকটি আগাগোড়াই একটা 'মিস্‌ফরচুনের' কাহিনী। এখন এই মিস্‌ফরচুন আমাদের কাছে 'আন্‌মেরিটেড' মনে হয় কিনা, বা এই সব চরিত্রের দুঃখভোগ এবং ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যোগেশের সাজানো পরিবার বাগানের শুকিয়ে যাওয়ার যে দৃশ্য নাটকে আগাগোড়া প্রকাশিত হয়েছে, তা দেখে আমাদের মধ্যে যথেষ্ট শোচনাবোধ জাগে কিনা, তারই উপরে এই নাটকের ট্র্যাজেডিত্ব নির্ভর করছে। সুতরাং আমাদের সেই দিক থেকে আলোচনা করা দরকার।

এই নাটকে যোগেশের শোচনীয় পরিণাম, শুধু যোগেশেরই শোচনীয় পরিণাম নয়, যোগেশের পরিবারেরই শোচনীয় পরিণাম। যোগেশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সমৃদ্ধ, সুখী ও সুন্দর পরিবারটি সংকটের আবর্তে পড়ে ক্রমশঃ এক শোচনীয় পরিণাম লাভ করেছে। যোগেশের এই পারিবারিক বিপর্যয়ের মূল কারণ ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া নয়, এর মূল কারণ

রমেশ। রমেশই যোগেশকে জীবন্মৃত করেছে, মা-কে পাগল করেছে, জ্ঞানদারও মৃত্যুর কারণ হয়েছে, স্ত্রীকে স্বয়ং গলাটিপে হত্যা করেছে, এবং শিশু ও নারী হত্যার দায়ে শেষ পর্যন্ত কারাগারে গেছে। এইভাবে সমগ্র পরিবারটি ষড়যন্ত্র, মৃত্যু এবং অপমৃত্যুতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। তাই একথা স্বীকার করতেই হয় যে 'প্রফুল্ল' একখানি সার্থক পারিবারিক ট্র্যাজেডি। সমগ্র পরিবারব্যাপী যে বিপর্যয় ও দুঃখভোগের (calamity and suffering) ঘটনা ঘটেছে, তা এই নাটকের মধ্যদিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে pity ভাবকে জাগিয়ে তুলেছে এবং তাতেই এই নাটকের ট্র্যাজেডির রূপটি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভ্রাতা রমেশের দ্বারা যোগেশের পারিবারিক বিপর্যয় সংঘটিত হওয়ায় এখানে ট্র্যাজেডির তীব্রতাও বেশী হয়েছে। এইভাবে প্রিয়জনের কাছ থেকে আঘাত আসা "শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডির নিয়ম" হিসাবে ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত উল্লেখ করেছেন অন্য প্রসঙ্গে।[২৩] এ্যারিস্টটলও ট্র্যাজেডি রচয়িতাদের সার্থক ট্র্যাজেডির জন্য এই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে উপদেশ দিয়েছেন।[২৪]

এই নাটকে 'প্রফুল্ল'র যে পরিণতি ঘটেছে তাও যথেষ্ট শোচনীয়। ধর্মপ্রাণ এবং স্বামীর কল্যাণাকাঙ্ক্ষী বালিকা বধূ স্বামীকে জঘন্য পাপকার্য থেকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে স্বামীরই হাতে প্রাণ দিয়েছে, এই ঘটনা বাস্তবিকই যেমন মহনীয়, তেমনি শোচনীয়। সুতরাং এই নাটক মূলতঃ প্রফুল্লর ট্র্যাজেডি, এমন সিদ্ধান্তও করা যেতে পারে। কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে কৃষ্ণকুমারীর ট্র্যাজেডি মুখ্য উপস্থাপ্য বিষয় হলেও, ভীম সিংহের ট্র্যাজেডি যে ভাবে এবং যে কারণে অনেক বড় হয়ে উঠে কৃষ্ণকুমারীর ট্র্যাজেডিকে আচ্ছাদিত করে ফেলেছে, তেমনি এখানেও যোগেশের ট্র্যাজেডি একই ভাবে এবং একই কারণে প্রফুল্লর ট্র্যাজেডিকে ছাপিয়ে উঠেছে।

এইজন্য 'প্রফুল্ল' নাটক মূলতঃ যোগেশের ট্র্যাজেডি এই ভাবেও ব্যাখ্যা করা

---

২৩. মধুসূদন : কবি ও নাট্যকার, (১৯৬০), 'মায়াকানন' প্রসঙ্গে, পৃ. ১৪৬।

২৪. Whenever the tragic deed is done within the family—when murder or the like is done or meditated by brother on brother, by son on father, by mother on son, or son on mother, these are the situations the poet should seek after.

—Aristotle : Poetics (: Bywater), 1954. p. 53.

চলে। যোগেশের ট্র্যাজেডির মূল কারণ সম্পর্কে, তাঁর ট্র্যাজিক ভ্রান্তি সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলেন। তাঁর মদ্যাসক্তি দেখে সেটাকেই তাঁর বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে অনেকে মনে করেছেন। কিন্তু ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এমন একটি কারণ খুঁজে বার করেছেন, যেটিকে প্রকৃতই যোগেশের ট্র্যাজেডির কারণ বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন, "তিনি (যোগেশ) অবস্থা বিপর্যয়ে তত বিচলিত নন্, বিচলিত ঋণ শোধের জন্য। তবে ট্র্যাজেডি কেন হইল? হইল—যে সুনামকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়াছেন, তাহার রক্ষা না পাওয়ায়।"[২৫] অর্থাৎ যোগেশের দুর্নাম রটে যাওয়াটাই তাঁর মস্ত বড় ট্র্যাজেডি, একবার সুনাম যখন তাঁর কলঙ্কিত হয়ে গেল, তখন তাঁর আর বিপর্যয় রোধের জন্য সক্রিয়তা কিছুই থাকল না। সুনামরূপ একটা 'এ্যাবস্ট্রাকৃশনের উপর জীবনের সমস্ত মূল্য আরোপ করাটাই যোগেশের চরিত্রের ট্র্যাজিক ভ্রান্তি।

ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত যোগেশের চরিত্রের আরো কতকগুলি ত্রুটি আবিষ্কার ক'রে তাঁর সঙ্গে হ্যামলেটের তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "যোগেশ মূলতঃ ছিলেন দুর্বল প্রকৃতি, শ্লথ বুদ্ধি, ভাব-বিহ্বল ও কর্মক্ষেত্রে যন্ত্রস্বরূপ। কি আপনাতে, কি ভগবানে তাঁহার প্রত্যয় ছিল শিথিল। এতবড় ট্র্যাজেডি সম্ভব হইয়াছে ঐজন্যই।"[২৬] যোগেশের চরিত্রে এই ত্রুটিগুলি যে ছিল না তা নয়, কিন্তু এই ত্রুটিগুলি প্রকৃত পক্ষে তাঁর চরিত্রের মৌলিক ত্রুটি—সুনামরূপ একটা 'এ্যাবস্ট্রাকৃশনে'র উপর জীবনের সমস্ত মূল্য আরোপ করারই অনুসৃষ্টি। যাই হোক, যোগেশের সঙ্গে হ্যামলেটের যে তুলনা ডঃ দাশগুপ্ত করেছেন তা বেশ উল্লেখযোগ্য—"হ্যামলেট ছিলেন এমনি দুর্বল প্রকৃতি, ভাববিহ্বল, শিথিল-প্রত্যয় ব্যক্তি। অগাধ পাণ্ডিত্য ও দার্শনিকতা তাঁহার চরিত্রগত দুর্বলতা জয় করিতে পারে নাই। সে দুর্বলতারও পরিণাম ট্র্যাজেডি—পিতৃবধের প্রতিহিংসার কথা একটা উপলক্ষ্য মাত্র।"[২৭]

যোগেশ চরিত্রটির মধ্যে, আসন্ন বিপর্যয়কে প্রতিরোধ করার মতো কোনো ব্যবহারিক সক্রিয়তা দেখতে না পাওয়ায় অনেকেই যোগেশকে ঠিক এই ট্র্যাজেডির নায়কের মর্যাদা দিতে চান না। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক

---

২৫. গিরিশ প্রতিভা, (কলিকাতা, ১৩৩৫), পৃ. ২৯৬।

২৬. গিরিশ প্রতিভা (১৩৩৫) পৃ. ৩০০।

২৭. গিরিশ প্রতিভা পৃ. ৩০১।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রশ্নে যে আলোকপাত করেছেন, তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, "ট্র্যাজেডি ঘটার কারণ নিয়তি প্রেরিত দুর্দৈব বা নায়কের চারিত্রিক দুর্বলতা, ঘটনা নিয়ন্ত্রণের অক্ষমতা— সমস্ত সম্ভাবনাকে নিঃশেষ করে না, জাগতিক বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের আরো অনেক অভিনব হেতু আবিষ্কৃত হইতে পারে। সুতরাং কারণের দিকে বেশী ঝোঁক না দিয়া নায়কের আচরণের উপর তাহাদের প্রতিক্রিয়াটি বিবেচনা করিলে প্রশ্নের মীমাংসা সহজেই হইতে পারে। আমাদের দেখিতে হইবে যে দিক দিয়া নায়কের জীবনে দুর্দৈবের অভিঘাত প্রবেশ করুক না কেন, তাহার আচরণে উপযুক্ত গভীরতা ও চরিত্রের মহনীয়তার নিদর্শন স্ফুরিত হইয়াছে কি না।··· সমস্ত দুর্বিপাকের মধ্যে তাহার চরিত্রে একটা গৌরবের সুপ্তাবশেষ ফুটিয়া উঠিয়াছে কিনা, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। পাঠকের মনে সর্বশুদ্ধ যে ধারণাটি স্থায়ী হয়, তাহাতে যোগেশ চরিত্রে এই মহনীয়তার লক্ষণ স্থান পায়। মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া লোকের ধর্ম, কিন্তু পাতালের অন্ধতম স্তরে অতল গভীরতায় অবতরণ অভিজাত চরিত্র ছাড়া সম্ভব হয় না। প্রতিরোধ না করিয়া চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ, স্ত্রীর মৃত্যুতে ঔদাসীন্য, ছেলের হাত হইতে তাহার শেষ সম্বল একটি সিকি কাড়িয়া লওয়া, ভস্মীভূত সমস্ত জীবন হইতে উত্থিত একটি শ্বাসরোধকারী, একটি ধূম্রোচ্ছ্বাস ও বহ্নিগর্ভ খেদোক্তি— আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল—ইহাই যোগেশের ট্র্যাজিক নায়কের উপযোগিতার, তাহার চরিত্রের কৌলীন্য মর্যাদার নিদর্শন।

নিষ্ক্রিয়তা যখন আসে অসংবরণীয় ভাবাবেগ হইতে, সমস্ত সত্তার উল্লিখিত ভাব বিপর্যয় হইতে, তখনি ইহা প্রকৃতির একটা রাজকীয় বহির্লক্ষণরূপে প্রতিভাত হয়, অন্যথা নহে।"[২৮]

সুতরাং ট্র্যাজেডির নায়ক হিসেবে যোগেশের যোগ্যতা এবং সামগ্রিক-ভাবে যোগেশের ও তাঁর পরিবারের ট্র্যাজেডি সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। এই ট্র্যাজেডি যোগেশ ও পরিবারের অন্যান্যের দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে উদ্রিক্ত 'শোক' ভাবের সঙ্গে ভয় ও বিস্ময়ভাবের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে। কিন্তু এর মধ্যে 'শোক' ভাবদ্বারা নিষ্পন্ন করুণ রসই আমাদের কাছে তীব্রভাবে

---

২৮. ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের 'নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা (ডঃ শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত)।

অনুভূত হয়, কারণ যোগেশের সাজানো বাগান শুকিয়ে যাওয়ার বারংবার করুণ ঘোষণা আমাদের মধ্যে শোক ভাবটিকেই বারবার উদ্রিক্ত করে। গিরিশচন্দ্রের প্রায় প্রত্যেকটি সামাজিক নাটকেই এইভাবে একটি না একটি চরিত্রের করুণ ভাগ্য বিপর্যয়কে মুখ্য ক'রে দেখানো হয়েছে। তাই তাঁর প্রায় সবক'টি সামাজিক নাটকই করুণ রসাত্মক। দেবেন্দ্রনাথ বসু এই করুণ রসাত্মক নাটকগুলিকেই সুস্পষ্টভাবে ট্র্যাজেডি নামে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "এক 'হারানিধি' ব্যতীত গিরিশচন্দ্রের সকল সামাজিক নাটকই করুণ রসাত্মক (ট্র্যাজেডি) ;" তার কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, "—যে সংসার কাম-কাঞ্চনের মৃগয়াক্ষেত্র, স্বার্থপরতা যেখানে কার্যের প্রেরণা ; আসক্তি কর্মের উদ্দীপনা ; শঠতা, কপটতা যথায় সিদ্ধির উপাদান ; যে সংসারে সত্যের পথ কণ্টকাকীর্ণ। মিথ্যা শ্বাসবায়ুর ন্যায় স্বচ্ছন্দ-গতি ; প্রবঞ্চনা দক্ষতার প্রমাণ ; সরলতা, সহানুভূতি, দয়া, দুর্বলতা ; দ্বেষ, হিংসা, নির্যাতন, অনিষ্ট সাধন যেখানে আনন্দের উপকরণ ; স্বেচ্ছাচার যে সংসারে পৌরুষ ; প্রত্যয় নিরাশ্রয় ;—সে সংসারে ঘটনার স্বাভাবিক গতিই ট্র্যাজেডির দিকে—কমেডি দৈব ঘটিত।"[২৯]

বলিদান (১৯০৫)।—বাঙালী পরিবারের কন্যার বিবাহ সমস্যাকে নিয়ে নাটকটি রচিত। কন্যা সম্প্রদানকেই এখানে 'বলিদান' নামে আখ্যাত করা হয়েছে।

নাটকটি সুরু থেকেই ট্র্যাজিক ছিল। কিন্তু পরে ট্র্যাজিক আবহাওয়া কেটে যায়। কিন্তু নাট্যকার সমস্যার ভয়াবহতাকে স্পষ্ট করার জন্য পুনরায় নাটকটিকে ট্র্যাজিক করে তুললেন। কন্যার বিবাহ সমস্যায় হয় কন্যাকে, না হয় কন্যার পিতা-মাতাকে,—কাউকে না কাউকে মূল্য দিতে হবেই—এটাই যেন লেখকের উদ্দেশ্য। তাই তিনি করুণাময় ও সরস্বতীর মৃত্যুকে শেষকালে সংঘটিত করলেন।

নাটকের একেবারে শেষে ঘনশ্যামের উক্তিটি লক্ষণীয় : "আমাদের সমাজে কন্যার পিতার এই পরিণাম! ঘরে ঘরে এই শোচনীয় অবস্থা! কোথাও পুত্রবধূর আত্মহত্যা, কোথাও কন্যা পরিত্যক্তা! প্রতিগৃহে দরিদ্রতা! সকলের চক্ষের উপর এই শোচনীয় দৃশ্য গৃহে গৃহে নিত্য বিরাজমান।"

---

২৯. দেবেন্দ্রনাথ বসু : গিরিশচন্দ্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, (১৯৩৯) পৃ. ৪৭-৮।

—এইটিই নাট্যকারেরও বক্তব্য। বক্তব্যকে নাট্যায়িত করতে গেলে নাটককে ট্র্যাজেডি করে তুলতে হবেই, এবং নাট্যকার তাই করেছেন।

এখানে ট্র্যাজিক ঘটেছে সামাজিক সমস্যার জটিলতার কারণে। নিষ্ঠুর সামাজিক প্রথার চাপে করুণাময় হারালেন তাঁর চিত্তের সামঞ্জস্যের ভাব, হারালেন বাৎসল্য, হয়ে উঠলেন বিশ্ববিদ্বেষী, হতাশাগ্রস্ত এবং সংশয়বাদী এবং একেবারে শেষে হলেন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী। আত্মজীবনের এতবড় বিপর্যয়কে সহ্য করাও করুণাময়ের পক্ষে অসম্ভব। তাই নৈতিক দিক থেকে বিপর্যস্ত আত্মজীবনকে বিনাশ করে ফেলাই তাঁর কাছে একমাত্র মুক্তির পথ। তিনি সেই পথেই গেছেন, আর তারই ফলে নাটকে ট্র্যাজেডি ঘটেছে। পত্নী সরস্বতীর মৃত্যু এই ট্র্যাজেডির তীব্রতাকে বাড়িয়ে তুলেছে, কিন্তু মূল ট্র্যাজেডি ঘটেছে করুণাময়ের মৃত্যুতে।

এখানে ট্র্যাজেডির কারণ সামাজিক সমস্যার মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেও, তা শেষ পর্যন্ত জীবন বহির্ভূত নিছক একটা সামাজিক সমস্যা হয়েই থাকেনি। তা ধীরে ধীরে জীবনের নীতিবোধের সমস্যায় পরিণত হয়ে গেছে। সামাজিক পরিস্থিতি এই নীতিবোধের সমস্যার কারণ ব'লে করুণাময় নিজেকে ক্ষমা করতে পারেন নি। সামাজিক কারণেই হোক, বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, নিজেকে যখন তিনি অপরাধী বিবেচনা করেছেন, তখন শাস্তি তাঁর আছেই। এই দিক থেকে এই নাটকের ট্র্যাজেডি ছিল অনিবার্য। নীতিবোধ এই ট্র্যাজেডির ভিত্তি হওয়ায় অল্পতেই এ পরিপূর্ণ ট্র্যাজেডি রস পরিগ্রহ করতে পেরেছে। এখানে pity ও fear দু'টি ভাবই ট্র্যাজেডির রসকে নিষ্পন্ন করেছে। হিরণ্ময়ী, করুণাময় ও সরস্বতীর মৃত্যু যেমন pity ভাবকে উদ্রিক্ত করে, তেমনি সমস্যার ভয়াবহতা fear ভাবটিকেও মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলে। রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' গল্প একই বিষয় নিয়ে লিখিত, কিন্তু সেখানে করুণরসেরই তীব্রতা বেশী।

'বলিদান' নাটকের ট্র্যাজেডি রসের মুখ্য আলম্বন বিভাব হিসেবে করুণাময়ের ট্র্যাজিক চরিত্রায়ণ অনেকের কাছেই প্রশংসনীয় বিবেচিত হয়েছে। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন, "করুণাময়ের অভিমান মনুষ্যত্বের অভিমান, তাই প্রতিকূল অবস্থার সহিত তাহার সংঘর্ষ ও অবশেষে পরাজয়ে যে মর্মন্তুদ দুরবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহাতে হৃদয় যেমন বিদীর্ণ হয়, মধ্যবিত্ত দুঃস্থ গৃহস্থ করুণাময়ের প্রতি তেমনি প্রত্যেক পাঠকের সর্বাংশে

শ্রদ্ধাই উৎপাদিত হয়। এরূপ অদ্ভুত করুণ রসাত্মক সামাজিক চরিত্র এ পর্যন্ত সৃষ্ট হইয়াছে কিনা সন্দেহ।"[৩০]

আরেকজন সমালোচকের মতে, "Balidan is admittedly the best of Giris Chandra's social plays, and in literary power and tragic intensity of emotion, it is not surpassed by any of his plays. It has that kind of startling realism in which Giris Chandra at his best excels all modern dramatists. With sureness of touch and wealth of feeling he describes, the tragic happenings of Karunamay Basu, who, in his efforts to get his three daughters married, is completely ruined because of the Hindu dowry system."[৩১]

শাস্তি কি শান্তি (১৯০৮)।—বিধবা সমস্যা নিয়ে রচিত গিরিশচন্দ্রের এই সামাজিক নাটকখানি পরিণামে যথার্থ ট্র্যাজেডি হয়ে উঠেছে।

এই নাটকে নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল, শাস্ত্র-শাসিত নিয়ম বিধবা যদি অনুসরণ না করে, তবে তাকে যে সাংঘাতিক পরিণামী হতে হয়, তা দেখানো। এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি ভুবনমোহিনী ও প্রকাশের পারস্পরিক নৈতিক পদস্খলনের চিত্র এঁকে দু'জনের ভাগ্যেই মর্মান্তিক অপমৃত্যুকে নির্দিষ্ট করেছেন। উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য লেখক এই যে কাহিনীটি গ্রহণ করেছেন, এইটি পরিণামে যথার্থ ট্র্যাজেডি হয়ে উঠেছে এবং নাটকে প্রকৃত ট্র্যাজেডির মর্যাদা এনে দিয়েছে।

মৃত্যুর সময় ভুবনমোহিনীর স্বামী বেণীমাধব যেভাবে বন্ধু প্রকাশের হাতে স্ত্রীর ভার অর্পণ করে গিয়েছিলেন, তাতে ভুবনমোহিনীও প্রকাশের অবৈধ প্রণয় এবং পদস্খলন অনিবার্য ছিল। তারা উভয়েই এর জন্য দোষী, কেউই অপর পক্ষকে এক তরফাভাবে অভিযুক্ত করতে পারে না। এই অপরাধবোধ তাদের দু'জনের মধ্যেই পরবর্তীকালে জেগেছে, কিন্তু তখন বিপজ্জনক ঘটনা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। সুতরাং উদ্ধারের কোন উপায় নেই। এমতাবস্থায়

---

৩০. গিরিশ প্রতিভা (১৩৩৫), পৃ. ৩১৮-১৯।

৩১. P. Guha Thakurta : Bengali Drama : Its Origin and Development, London, (1930), p. 138.

অনর্থক অনুতাপও বড় করুণ হয়ে ওঠে। তাই এই অবস্থায় ভুবনমোহিনীর অনুতাপ, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা (চতুর্থ অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য) এবং আরো নানা প্রকার বিপর্যয়ের সঙ্গে নৈতিক ব্যভিচারের আত্মগ্লানির তুষানলে দগ্ধ প্রকাশের প্রবল আত্মধিক্কার (পঞ্চম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য) ট্র্যাজিক হয়ে উঠেছে।

নাটকে শেষ পর্যন্ত অন্যান্য সমস্ত সমস্যারই সমাধান হয়ে গেল, সমাধান হ'ল না কেবল ভুবনমোহিনী ও প্রকাশের জীবন-সমস্যার। লেখক প্রকাশের কথা আর উত্থাপিত না করলেও পারতেন, আর হরমণির কৃপায় ভুবনমোহিনীরও একটা বন্দোবস্ত হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু লেখক তাদের গুরুতর অপরাধের জন্য উভয়কেই ভয়াবহ এক ট্র্যাজিক পরিণামের সম্মুখীন করেছেন, নাটকের শেষ দৃশ্যে।

বিকৃত মস্তিষ্ক প্রসন্নবাবু কলঙ্কিনী কন্যাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে না পেরে এই দৃশ্যে কন্যাকে গঙ্গাজল পান করিয়ে তারপর পুনঃ পুনঃ ছুরিকাঘাতে তার মৃত্যু ঘটালেন। (এর পূর্বে নাটকের দুর্বৃত্ত পক্ষ মিথ্যা এক খুনের অপরাধে প্রসন্নবাবুকে জড়াতে চেয়েছিল। খুনী হবার মনস্তত্ত্ব প্রসন্নবাবু সেখান থেকেও পেয়ে থাকতে পারেন।) প্রকাশ সেখানে এসে পড়ে এবং এই দৃশ্য দেখে নিজেও প্রসন্নবাবুর কাছে মৃত্যু প্রার্থনা করে। কিন্তু এই মর্মান্তিক দৃশ্যকে দেখাবার জন্য প্রসন্নবাবু তাকে ছুরিকাঘাত করেন না; প্রকাশ তখন নিজেই ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করে। তৎক্ষণাৎ রক্তক্রন্দন করতে করতে প্রসন্নবাবুরও মৃত্যু হয়।

এই ভয়াবহ মৃত্যুই নাটকটিকে ট্র্যাজেডি করে তুলেছে। প্রকাশ ও ভুবনমোহিনী ভয়ানক অপরাধে অপরাধী। ভয়ানক শাস্তিই তাদের প্রাপ্য। কিন্তু এই ভয়ানক শাস্তি যাতে সাহিত্যের রসাস্বাদে প্রকৃত ট্র্যাজেডি হয়ে ওঠে, তারজন্য নাট্যকারের কর্তব্য তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতিকে উদ্রিক্ত করা, তাদের জন্য আমাদের মধ্যে করুণার ভাবটিকে জাগিয়ে তোলা। প্রকাশ ও ভুবনমোহিনী যখন আত্মগ্লানির তুষানলে দগ্ধ হচ্ছে, তখন তাদের প্রতি আমাদের করুণাবোধ কিছুটা জাগে, তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি সৃষ্টি হয়। এখানে শিল্প হিসেবে ট্র্যাজেডি রচনা করার দিকে নাট্যকারের সচেতন কোনো লক্ষ্য ছিল না বলেই এই করুণার ভাবটিকে তিনি আরো পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি করেন নি, তথাপি অসতর্কভাবে তাদের মধ্যে যে আত্মগ্লানির যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা শেক্সপীয়রের রোমান্টিক ট্র্যাজেডির সঙ্গেই সঙ্গতি রক্ষা করে। এই আত্মগ্লানির যন্ত্রণায়

বিবরণই আমাদের মধ্যে 'শোক' ভাবটিকে উদ্রিক্ত করে। আর ভুবনমোহিনী-প্রকাশের যেভাবে অপঘাতে মৃত্যু হল, তা আমাদের মধ্যে 'ভয়' ভাবটিকেই উদ্রিক্ত করে—আমরা যেন সাবধানবানী শুনি,—ভয়ানক অপরাধের জন্য ভয়ানক শাস্তিই নির্দিষ্ট আছে,—তাকে খণ্ডানো যায় না কিছুতেই। এইভাবে করুণা ও ভয়ের ভাবের সংমিশ্রণই এই নাটকের ট্র্যাজেডি রসের নিষ্পত্তি ঘটিয়েছে।[৩২]

সুতরাং গিরিশচন্দ্রের মুখ্য প্রবণতা করুণ রসাত্মক 'প্যাথেটিক ট্র্যাজেডি' বা 'ট্র্যাজেডি অব সাফারিং'-এর দিকে হলেও মাঝে মাঝে তিনি 'ভয়ের' ভাবটিকেও সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন।

গিরিশচন্দ্রের নাটকে ট্র্যাজেডি ঘটেছে ঘটনাচক্রে বা সামাজিক পরিস্থিতির কারণে। জীবনের বাইরের দিক বা ব্যাবহারিক দিকের নানাবিধ ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে গিরিশচন্দ্রের বেশীর ভাগ নাটকে (এই শ্রেণীর নাটকে) ট্র্যাজেডির রূপটি ফুটে উঠেছে। জীবনের সুগভীর দ্বন্দ্ব, অপরিসীম বেদনা এবং মূল্য-বোধের নির্যাতনের মধ্যদিয়ে জীবনের যে গভীরতর ট্র্যাজেডি ফুটে ওঠে, গিরিশচন্দ্র তাকে ঠিক রূপায়িত করতে পারেন নি। তার কারণ গিরিশচন্দ্র জীবনের সামাজিক ও ব্যাবহারিক দিকটি সম্পর্কে যত সতর্ক ছিলেন, জীবনের ভিতরের দিক বা ব্যক্তিগত দিকটি সম্পর্কে তত সতর্ক ছিলেন না। এরজন্য নাট্যকারের আরো আধুনিক জীবনদর্শনের প্রয়োজন। আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে সেই আধুনিক জীবনদর্শন বা জীবনবোধের পরিচয় পাই। সুতরাং আধুনিক জীবন-বোধসম্পন্ন কবির ট্র্যাজেডি-চেতনার পরিচয় পাবার জন্য আমাদের পক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকটি ট্র্যাজেডির আলোচনা করা দরকার।

নুরজাহান (১৯০৮)।—এই নাটকের ট্র্যাজেডির আদর্শ সম্পূর্ণভাবেই শেক্সপীয়রের আদর্শে রচিত। শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিতে যেমন দেখা যায়

---

৩২. ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই নাটকের ট্র্যাজেডি সম্পর্কে প্রসন্নকুমারের চরিত্রের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন। তিনি বলেছেন, "ইনি (প্রসন্নবাবু) অত্যন্ত স্নেহশীল। মমতা ও করুণায় তাঁহার কোমল হৃদয় পরিপূর্ণ। কিন্তু সে হৃদয় সামান্য আঘাতেই উদ্বেলিত হইয়া উঠে। সামান্য কারণেই তিনি উত্তেজিত হইয়া ধৈর্যসংযম হারাইয়া ফেলেন। এই ভাব-প্রবণতারই পরিণাম ফল সাংসারিক জীবনে বিশৃঙ্খলা—নাট্যশিল্পে ট্র্যাজেডি।" —গিরিশ প্রতিভা, (১৩৩৫), পৃ. ৩২৩

মানুষের চরিত্রই কিভাবে মানুষের বিপর্যয়কে ঘনিয়ে তোলে, তেমনি এই নাটকেও দ্বিজেন্দ্রলাল দেখিয়েছেন, নুরজাহানের চরিত্রই কিভাবে নুরজাহানের জীবনের ট্র্যাজিক বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে।

নুরজাহানের জীবনের মধ্যে তাঁর ট্র্যাজিক বিপর্যয়ের যে কারণ নিহিত ছিল, তা তাঁর দুষ্প্রতিরোধ্য প্রবৃত্তি এবং অপরিমিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা। চরিত্রের এই 'ত্রুটির' কারণে শেক্সপীয়রের রীতিতে যে কি ভয়াবহ ট্র্যাজেডি সংঘটিত হতে পারে, দ্বিজেন্দ্রলাল নুরজাহানের জীবনের মধ্য দিয়ে তা দেখিয়েছেন।

প্রবৃত্তি, উচ্চাশা এবং অহঙ্কারের বিষে পরিপূর্ণ ছিল নুরজাহানের চিত্ত, সেই বিষের জ্বালায় তিনি নিজেই ছিলেন জর্জরিত। এই বিষাক্ত চিত্তের ছোবল হানবার জন্য তাঁর পক্ষে প্রয়োজন ছিল অসীম ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের অধিকারী একজন পুরুষের। সেলিম ছিলেন সেই পুরুষ।

সেলিম সম্রাট হয়েছেন, এই কথা শোনা মাত্র, শের খাঁর সঙ্গে তাঁর সুখের বিবাহিত জীবন হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর চিত্তের বিষ চঞ্চল হয়ে উঠল—(প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য), এবং পরে স্পষ্টই বুঝলেন যে, তাঁর এই চিত্তের চাঞ্চল্য দুর্নিবার। সেলিমের প্রতি তাঁর আকর্ষণকে তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন, বাল্যের একটা খেয়াল। কিন্তু আজ বুঝতে পারছেন, "সে প্রবৃত্তি তখন চাপা ছিল মাত্র, মরেনি। স্ফুলিঙ্গ ছাই ঢাকা ছিল, নিভে যায়নি। সেই স্ফুলিঙ্গ নূতন ইন্ধন সংযোগে আবার ধোঁয়াচ্ছে"—(১/৮)।

সেলিমকে অবলম্বন করে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার দারুণ লালসা এমনিতেই তাঁকে জর্জরিত করছিল, এবং তার উপরে ছিল পিতা ও ভ্রাতার প্ররোচনা। সুতরাং তিনি আত্মসমর্পণ করলেন তাঁর লালসার কাছে, মুক্ত ক'রে দিলেন তাঁর দ্বিধায় বাঁধা প্রমত্ত-প্রবৃত্তি এবং স্বেচ্ছাচারিতাকে। তিনি বুঝলেন, এরপর (সেলিমকে বিবাহ করার পর) তাঁর দ্বারা ঘটবে শুধু অঘটন, শুধু অমঙ্গল। তিনি স্পষ্ট করেই বলে দিলেন ভ্রাতা আসফকে, "কিন্তু সাবধান আসফ। এর পরে যা হবে, তার জন্য আমি দায়ী নই। মনে রেখ যে, পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রীকে পুরপথে ছেড়ে দিচ্ছ। যে ঝঞ্ঝাকে হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি বক্ষে চেপে রেখেছিলাম, সে শক্তি তোমরা সরিয়ে দিলে। এখন এই ঝটিকা নির্বিরোধে এই সাম্রাজ্যের উপর দিয়ে বয়ে যাক্"—(২/৫)। নিজের অশুভ শক্তি সম্পর্কে নুরজাহানের এই যে ভাবনা, নুরজাহানের সমস্ত সম্রাজ্ঞীজীবনে হয়েছে সেই অশুভ শক্তিরই ট্র্যাজিক বহিঃপ্রকাশ,

এবং তারই পরিণামে নুরজাহানের জীবনে ঘটেছে শোচনীয় এবং ভয়াবহ ট্র্যাজেডি।

নুরজাহানের ট্র্যাজিক অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ট্র্যাজিক জীবনযন্ত্রণা কার্যতঃ সুরু হয়েছে দ্বিতীয় অঙ্কের অষ্টম দৃশ্য থেকেই। এই দৃশ্যেই তিনি নিজের সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছেন,—"আমি আজ ভারতের সম্রাজ্ঞী! কিন্তু এ-আমার গৌরব, না লজ্জা? এ আমার জয় না পরাভব?—উঃ কি পরাজয়!......আমি আমার সব হারিয়েছি। তবে আর কিসের ভয়! যখন সম্রাজ্ঞী হয়েছি, তখন সব বাধা, সব বিঘ্ন আমার পথ থেকে সরে যাক! যখন বিবেক খুইয়েছি, তখন সব দ্বিধা-সংকোচ হৃদয় থেকে দূর হোক্!" এই দৃশ্যেই তিনি কন্যা লয়লার কাছে মর্মান্তিকভাবে তিরস্কৃত হয়েছেন। কন্যা লয়লা জননীর এই নৈতিক অধঃপতনে প্রচণ্ড ধিক্কার দিয়ে বলেছে,—"কাঁদো, কাঁদো, চিরজীবন কাঁদো, যদি তাতেও এ কালিমা কিছু ধৌত হয়ে যায়!" নিজের কন্যার কাছে জননীর এইভাবে অপরাধী বিবেচিত হওয়া জননীর পক্ষে অবশ্যই শোচনীয়।

তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখি উচ্চাকাঙ্ক্ষা মৃগতৃষ্ণিকার হাতছানির মতো নুরজাহানকে মুগ্ধ করেছে। ক্ষমতার স্বাদ লাভ ক'রে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। তিনি বলেছেন, "আমি ক্ষমতার মদিরা পান করেছি। প্রতি ধমনীতে তার উষ্ণ উত্তেজনা অনুভব কর্চ্ছি।—এই তো জীবন! শুধু আত্মরক্ষা আর জন্মদানের তন্ত্র—এই সৃষ্টির মহাচক্র ঘোরাচ্ছে না! এর মধ্যে সম্ভোগও আছে। নহিলে বিহঙ্গ এত আবেগে গেয়ে ওঠে কেন? বৃক্ষ এত বিবিধ পত্রপুষ্পে বিকশিত হয়ে ওঠে কেন?..." নুরজাহানের সম্রাজ্ঞীজীবনের প্রাথমিক সাফল্যের এই আত্মপ্রসাদ এবং উল্লাস তাঁকে উচ্চাকাঙ্ক্ষার চোরাবালির মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে পরিণামে তাঁকে ট্র্যাজেডির সম্মুখীন করেছে।

উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য নুরজাহানের এই মোহের নেশা কিছুতেই কাটে না। মহাবৎ খাঁর কৃপায় জীবন ফিরে পেয়ে নুরজাহান একবার ভেবেছিলেন, "নুরজাহান! আর কেন? ফেরো! এখনও ফেরো!" কিন্তু তার পরেই আবার তিনি ভাবতে বাধ্য হলেন, "না, আর ফির্তে পারি না। পর্বতের এমন যায়গায় এসেছি যে, ওঠার চেয়ে নামা ভয়াবহ। চল, চল, অগ্রসর হও নুরজাহান। এখনও শিখরে উঠতে পারো। শতরঞ্চ খেলায় দাবা হারিয়েছো; তবু জিততে পারো। খেলে যাও"—(৫/১)।

উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য নুরজাহানের এই নেশা এবং নেশার ঘোরের তৎপরতা পরবর্তীকালে তাঁর জীবনে একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। তিনি বুঝেছেন যে, আলেয়ার পিছনে ছুটে ছুটে, তিনি অনেক নৈতিক মূল্য দিয়েছেন, কিন্তু কার্যতঃ পান নি কিছুই। তবু তিনি সে আলেয়ার পিছনেই চলেছেন,— নিজের শক্তিতে নয়, একটা অভ্যাসে। যদিও তিনি জানেন, এ চলারও কোন অর্থ নেই, এবং হয়তো এই চলা তাঁকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তবু তিনি চলায় ক্ষান্তি দিতে পারছেন না—(৫/৬), উচ্চাকাঙ্ক্ষার এই মারাত্মক পরিণাম তাঁর জীবনের এক নিদারুণ ট্র্যাজেডিকে ঘনিয়ে তুলেছে। শেষ দৃশ্যে (৫/৮) কন্যা লয়লার কাছে স্বকৃত দুষ্কর্মের অনুশোচনায়, নিজের জননী-রূপকে লাঞ্ছিত করার অনুতাপে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন। তাঁর এই অনুশোচনার অশ্রুবিধৌত রূপ, তাঁর অপরিমেয় পাপ সত্ত্বেও আমাদের কাছে সহানুভূতির যোগ্য হয়ে ওঠে। এইভাবে দ্বিজেন্দ্রলাল নুরজাহানের ট্র্যাজেডিকে ঠিক শেক্সপীয়রের রীতিতেই গড়ে তুলেছেন।

ডঃ অজিতকুমার ঘোষ নুরজাহানের এই ট্র্যাজেডিকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনেক ট্র্যাজিক নারী-চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয় বিবেচনা করেছেন,[৩৩] এবং বস্তুতঃই পাশ্চাত্য সাহিত্যে যে সমস্ত পুরুষোচিত ভাব সমৃদ্ধ[৩৪] ট্র্যাজিক নারী চরিত্র আমরা দেখি, নুরজাহান তাদেরই অনুরূপ, দ্বিজেন্দ্রলালের ট্র্যাজেডি-চেতনার এ একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি।

---

৩৩. "সে (নুরজাহান) মিডিয়ার ন্যায় প্রতিহিংসাময়ী, লেডি ম্যাকবেথের ন্যায় অপ্রকৃতিস্থ ও হেডডা গ্যাব্‌লারের ন্যায় দুর্দম প্রবৃত্তির বশীভূত। কিন্তু এগ্যামেমননপত্নী ক্লাইটেম্‌নেষ্ট্রার সহিত তাহার সদৃশ্য সর্বাপেক্ষা বেশী। ক্লাইটেম্‌নেষ্ট্রারের ন্যায় বীর ও উদার স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামী-হন্তাকেই সে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ক্লাইটেম্‌নেষ্ট্রারের ন্যায় সেও কন্যার নিকট হইতে শত্রুর আঘাত পাইয়াছে এবং অন্ততঃ ইউরিপিডিসের ক্লাইটেম্‌নেষ্ট্রারের (Electra নাটকে) ন্যায় সেও তাহার অন্যায় অপরাধ সত্ত্বেও আমাদের বেদনাকরুণ সহানুভূতির পাত্রী হইয়া উঠিয়াছে।"—বাংলা নাটকের ইতিহাস, (১৯৬৬), পৃ. ২৬৬।

৩৪. A. Nicoll তাঁর The Theory of Drama (1937) গ্রন্থে ১৫৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, ট্র্যাজেডির কেন্দ্রীয় চরিত্র যদি নারী হয় তবে, তাকে পুরুষোচিত ভাব সমৃদ্ধ হতে হবে, সেই নারী হবে "a woman who, like Lady Macbeth or Iphigenia or Medea, has in her temper some adamant qualities and severity of purpose not ordinarilly associated with the typically feminine."

সাজাহান (১৯০০)।—'মুরজাহান' নাটকের মতো 'সাজাহান' নাটকেও দ্বিজেন্দ্রলালের ট্র্যাজেডি-পরিকল্পনা মূলত শেক্সপীয়রের আদর্শে-ই গড়ে উঠেছে। এমনকি শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি-চেতনারও ছাপ পড়েছে দ্বিজেন্দ্রলালের এই দুটি নাটকে। মুরজাহান এবং সাজাহান উভয়েরই ট্র্যাজেডির মূল কারণ তাদের নিজেদেরই চরিত্রের বা স্বভাবের মধ্যে নিহিত ছিল। কিন্তু মুরজাহান এবং সাজাহানের ট্র্যাজেডির মধ্যে পার্থক্য আছে,—মুরজাহানের ট্র্যাজেডি বিচিত্র মানসিক জটিলতার মধ্য দিয়ে সুতীব্র হয়ে উঠেছে, আর সাজাহানের ট্র্যাজেডি জীবনের একটা মৌলিক সুকুমার বৃত্তির (সন্তানস্নেহ) কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে অসামান্য বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ করেছে। সেইদিক থেকে 'সাজাহানের' ট্র্যাজেডির সঙ্গে শেক্সপীয়রের 'কিং লীয়রে'র ট্র্যাজেডির মিল লক্ষ্য করা যায়।

বাঙলা নাটকের ট্র্যাজেডির সম্পর্কে প্রায়ই নানা রকম প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু 'সাজাহান' নাটক সম্পর্কে সে রকম কোনো প্রশ্ন ওঠে নি। 'সাজাহান' নাটকটি যে একটি প্রকৃত ট্র্যাজেডি, তা মোটামুটি সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু এই ট্র্যাজেডি প্রকৃতপক্ষে কোন্‌খানে বা কার চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, তা নিয়ে অবশ্য মত বিরোধ আছে। আমরা মোটামুটি ট্র্যাজেডি-রসাস্বাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জানি যে ট্র্যাজেডি প্রথমতঃ জীবনের দুঃখময়তার উপরই গড়ে ওঠে। 'সাজাহান' নাটকে জীবনের এই দুঃখময়তা বর্ণনায় নাট্যকারের সমস্ত আনুকূল্য পেয়েছে মাত্র দু'টি চরিত্র, দারা এবং সাজাহান। সুতরাং এই নাটকের ট্র্যাজেডি কার্যতঃ কোন্‌ চরিত্রকে অবলম্বন ক'রে প্রকাশিত হয়েছে সেই প্রশ্নের উত্তরে অনেকে অনেক চরিত্রের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করলেও কেবল দারা এবং সাজাহান ছাড়া, আর কোনো চরিত্রকে এই প্রসঙ্গে বিবেচনা করার কোনো প্রয়োজন বোধ হয় নেই।

পিতৃভক্ত, প্রজাবৎসল, ভ্রাতৃপ্রেমিক, এবং সবকিছুর উপরে উদারহৃদয়-মানবতাবাদী দারার জীবনে একটার পর একটা বিপর্যয় এবং তজ্জনিত তার অপরিসীম দুঃখভোগ দেখে আমাদের মনে হতে পারে যে 'সাজাহান' নাটকে প্রকৃত ট্র্যাজেডি ঘটেছে দারার,—পিতার জন্য বা পিতার স্বার্থে। বিশেষতঃ এই নাটকে অন্ততঃ দুটি দৃশ্য আছে, যেখানে দারাকে নিদারুণভাবে ট্র্যাজিক চরিত্র হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে দারার সাধ্বী পত্নী নাদিরার শোচনীয় মৃত্যুদৃশ্য দারার বিপর্যস্ত অবস্থাকে শোচনীয়তর করে

তুলল। ঔরংজেবের সঙ্গে পর পর যুদ্ধে পরাজিত দারা জিহন খাঁর আশ্রিত। এই জিহন খাঁকে দারা পূর্বে দু'বার মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু সেই জিহন খাঁ ঔরংজেবের আদেশে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে দারাকে ঔরংজেবের কাছে সমর্পণ করতে উদ্যত। ঠিক এর পূর্ব মুহূর্তে রোগগ্রস্ত নাদিরার শোচনীয় মৃত্যু হয়েছে। সেই সময় বিশ্বাসঘাতক জিহন খাঁর উদ্দেশ্যে শোক-সন্তপ্ত দারার মর্মভেদী উক্তি তাঁর বিপর্যস্ত এবং শোচনীয় অবস্থাকে দুঃখ-ভোগের গভীরতায়, ব্যাপকতায় এবং তীব্রতায় প্রকৃত ট্র্যাজেডির পর্যায়ে উন্নীত করে দেয়। দারা তখন জিহন খাঁকে বলেছিলেন, " অন্যে হয়ত ভাব্‌তো যে এ কতবড় কৃতঘ্নতা যে, যাকে আমি দু'বার বাঁচিয়েছি, সে আমায় কপট আশ্রয় দিয়ে বন্দী করে—এ কতবড় নৃশংসতা। আমি তা ভাবি না। আমি জানি জগতে সব—সব উচ্চ প্রবৃত্তি সাপের ভয়ে মাটির মধ্যে মাথা লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে—উপর দিকে চোখ তুলে চাইতেও সাহস কর্চ্ছে না। আমি জানি পৃথিবীতে ধর্ম এখন স্বার্থ-সিদ্ধি, নীতি—শাঠ্য, পূজা—খোসামোদ, কর্ত্তব্য—জোচ্চোরি। উচ্চ প্রবৃত্তিগুলো এখন বড় পুরাতন হয়ে গিয়েছে। সভ্যতার আলোকে ধর্মের অন্ধকার সরে গিয়েছে। সে ধর্ম যা কিছু আছে এখন বোধ হয় কৃষকের কুটিরে, ভীল কোল মুণ্ডাদের অসভ্যতার মধ্যে।—কর জিহন খাঁ, আমায় বন্দী কর।"

দারার এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর জীবনের মূল্যবোধ কি গভীরভাবে বিচলিত হয়ে গেছে। জীবনের মূল্যবোধ যেখানে বিচলিত হয়ে যায়, ট্র্যাজেডি সেখানেই সবচেয়ে বেশী নৈতিক গুরুত্বলাভ করে।

তারপর দারা জিহন খাঁর কাছে অনুরোধ করেন নাদিরার দেহকে লাহোরে সমাধিস্থ করতে,—যেখানে সম্রাট পরিবারের অন্যান্যেরাও সমাধিস্থ। এই ভিক্ষাও তিনি চাইতে পারলেন জিহন খাঁকে দু'বার মৃত্যু থেকে রক্ষা করে-ছিলেন বলেই, নইলে এই ভিক্ষা চাওয়ারও কোনো অধিকার হৃত-সর্বস্ব দারার ছিল না। শেষে তিনি মৃত পত্নীর শয্যাপার্শ্বে জানু পেতে, হাতে মুখ ঢেকে শোক প্রকাশ করার পর জিহন খাঁ-র বন্দীত্ব বরণ করলেন। পূর্বাপর সমস্ত ঘটনাই দারার ট্র্যাজেডিকে ঘনীভূত করে তোলে।

চতুর্থ অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে এই জিহন খাঁ ঘাতক সহ বন্দীশালায় দারাকে হত্যা করবার জন্য ঔরংজেবের আদেশ নিয়ে উপস্থিত। এই দৃশ্যে পুত্র সিপারের কাছ থেকে দারার অন্তিম বিদায় নেওয়ার দৃশ্য বড়ই করুণ।

প্রিয়তম পুত্রের কাছে বিদায়-কালীন কয়েকটি আবেগ সন্তপ্ত কথা বলতে গিয়ে দুঃখক্লিষ্ট দারার কণ্ঠের স্বরভঙ্গ হয়ে গেল। পুত্র সিপার পিতার মৃত্যুদৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে পারবে না ব'লে দারা চাইলেন পুত্রকে গৃহান্তরিত ক'রতে, কিন্তু রোরুদ্যমান পুত্র পিতার সঙ্গ কিছুতেই পরিত্যাগ করবে না। পিতার জন্য পুত্রের এবং পুত্রের জন্য পিতার এই কাতরতা দুঃসহ ট্র্যাজেডির উপাদান। শেষকালে দারার বক্ষে শেষ আলিঙ্গন লাভ করে পুত্র পিতার নির্দেশে গৃহান্তরে চলে গেল। এবং দারা ঊর্দ্ধমুখে বুকে হাত দিয়ে "ঈশ্বর পূর্বজন্মে কি মহাপাপ করেছিলাম! ওঃ যাক্, হয়ে গিয়েছে। নাজীর তোমার কার্য্য কর"—ব'লে ঘাতকের কাছে নিজেকে সমর্পণ করলেন। মহাপ্রাণ দারার এই শোচনীয় এবং পৈশাচিক হত্যা তার জীবনের ট্র্যাজেডিকেই স্পষ্ট ক'রে তোলে।

দারার এই মর্মান্তিক মৃত্যুই যেন 'সাজাহান' নাটকের শেষ ঘটনা। এতকাল দারা-ই যেন সাজাহানের ইচ্ছাকে রূপায়িত এবং মহানুভবতাকে প্রকাশিত করার জন্য নৈতিক এবং সামরিক অভিযান চালনা ক'রে আস-ছিলেন। দারার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যেন তার অবসান হ'ল। এইজন্য দারার মৃত্যুকেই অনেকে এই নাটকের চূড়ান্ত ট্র্যাজেডি বলে মনে করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় এই মনোভাবকে খুব স্পষ্ট করেই প্রকাশ ক'রেছেন : "দারার মৃত্যুই 'সাজাহান' নাটকের চরম ট্র্যাজেডি —চূড়ান্ত ঘটনা। দারার জীবনাবসানের সহিত নাটকের শেষ যবনিকা পতিত হওয়া উচিত ছিল। সাজাহান বিদ্রোহের পূর্বে যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই আগ্রার দুর্গপ্রাসাদে ভোগসুখে রহিলেন। দারাই সিংহাসন ও জীবন—উভয়ই হারাইলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ভাগ্য বিপর্যয়ের উপরই নাটকের ভিত্তিস্থাপিত এবং তাঁহার মৃত্যু ঘটনায় মন এরূপ অবসাদগ্রস্ত হয় যে, নাট্যকারের প্রভূত গুণপনা সত্ত্বেও পরবর্তী দৃশ্যগুলিতে অবহিত হইবার আর ধৈর্য থাকে না।"[৩]

কিন্তু নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের এই উক্তির সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। কারণ প্রথমতঃ দারার ভাগ্য বিপর্যয় সাজাহানের ভাগ্যবিপর্যয়েরই একটা অঙ্গ এবং দ্বিতীয়তঃ দারার মৃত্যু সাজাহানের বিপর্যস্ত অবস্থাকেই যেন আরো অসহায় এবং আরো শোকাবহ করে তোলে। পঞ্চম অঙ্কে বস্তুতঃ সাজাহানের

৩৫. সাহিত্য, (১৩১৭), মাঘ চৈত্র।

এই অধিকতর অসহায় ও ততোধিক শোকাবহ অবস্থা আমাদের এত বেশী আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে, যে আমরা পৃথক্‌ভাবে আর দারার জন্য বিচলিতবোধ করার সুযোগ পাই না। দারার ট্র্যাজেডি একটি শাখার মতো মহীরুহ-সাজাহানের ট্র্যাজেডির অঙ্গীভূত হয়ে ওঠে। সুতরাং 'সাজাহান' নাটকের ট্র্যাজেডি সম্রাট সাজাহানের চরিত্রকে অবলম্বন করেই যে গড়ে উঠেছে, তা বোধহয় মোটামুটি বলা চলে।

'সাজাহান' নাটকের সুরু থেকেই সম্রাট সাজাহানের মহানুভবতার লাঞ্ছনা, চূড়ান্ত কৃতঘ্নতা, অকল্পনীয় বিশ্বাসঘাতকতা সম্রাট সাজাহানকে এক অনিবার্য ট্র্যাজেডির দিকে ঠেলে নিয়ে গেছে এবং নাটকের শেষে সেই অনিবার্য ট্র্যাজেডির ভয়াবহ রূপটাই আমরা প্রত্যক্ষ করি। নাটকের সুরু থেকেই আমরা সম্রাট সাজাহানের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করি, যে দ্বন্দ্ব তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডিকে ঘনিয়ে তুলেছে। তিনি একদিকে যেমন পরম পুত্র-বৎসল পিতা, তেমনি অন্যদিকে এক প্রবল-পরাক্রান্ত সম্রাট। পিতা হিসাবে তিনি সন্তানদের স্নেহ করতে চান, চান অবাধ্য পুত্রদের ক্ষমা করতে, আবার নিজের সম্রাট-সত্তাকেও তিনি ধূলায় লুটাতে দেবেন না কিছুতেই। এই দ্বন্দ্বের আবর্তেই মহানুভব সম্রাট সাজাহান বিপদগ্রস্ত এবং ট্র্যাজিক পরিণতির জন্য অপেক্ষমান।

নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই দেখা যায় সাজাহানের তিন পুত্রই (সুজা, মোরাদ ও ঔরংজেব) পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। জ্যেষ্ঠপুত্র দারা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চান, কিন্তু স্নেহান্ধ পিতা পুত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দ্বিধাগ্রস্ত। দারা এবং জাহানারার নির্ভরযোগ্য পরামর্শ সত্ত্বেও তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন, "ঈশ্বর! পিতাদের এই বুকভরা স্নেহ দিয়েছিলে কেন কেন তাদের হৃদয়কে লৌহ দিয়ে গড়নি! ওঃ!" সম্রাট অবশ্য শেষ পর্যন্ত পুত্রদের বিদ্রোহ দমন করবার জন্য দারাকে ক্ষমতা দিলেন। কিন্তু তাঁর পুত্র-বৎসল হৃদয় একটু পরেই কেঁদে উঠল। তিনি বলে উঠলেন,"—এ শাস্তি তাদের এক নয়, এ শাস্তি আমারও। পিতা যখন পুত্রকে শাসন করে—পুত্র ভাবে যে পিতা কি নিষ্ঠুর। সে জানেনা যে পিতার উদ্যত বেত্রের অর্দ্ধেকখানি পড়ে সেই পিতারই পৃষ্ঠে।"

সম্রাট সাজাহানের এই এক তরফা এবং অতিরিক্ত পুত্রস্নেহই যে তাঁর চরম ট্র্যাজেডির কারণ তা আমরা দেখতে পাই প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে। ধূর্ত ঔরংজেব পিতার এই দুর্বলতার ষোল আনা সুযোগ নিয়েছে, কিন্তু স্নেহান্ধ

পিতা পুত্রের ধূর্ততা, শঠতা বুঝতে পারেননি, সতর্ক হননি, নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছেন।

আগ্রার দুর্গে অবস্থান রত বৃদ্ধ সম্রাটকে ঔরংজেবের পুত্র মহম্মদ সহস্র সৈনিক নিয়ে গিয়ে বন্দী করল। কন্যা জাহানারা তখনও জানেন যে তাঁর পিতা সাজাহানই সম্রাট। তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কে এই দশ সহস্র সৈনিককে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করতে দিল? তখন সাজাহান বললেন, "আমি দিয়েছি জাহানারা। সব দোষ আমার। আমি স্নেহবশে ঔরংজীব পত্রে যা চেয়েছিল, সব দিয়েছিলাম। ওঃ, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি মহম্মদ!"

সাজাহান বুঝলেন যে, তিনি কার্যতঃ আগ্রার দুর্গে বন্দী এবং তাঁকে সবদিক থেকে সম্পূর্ণভাবে নিঃসহায় করা হয়েছে, তিনি ডাকলে নিজের পক্ষে একটি দেহরক্ষীও পাবেন না। তখনই সুরু হ'ল তাঁর অত্যধিক পুত্রস্নেহের অনুশোচনা। ট্র্যাজিক অন্তর্দাহ নিয়ে তিনি বলে উঠলেন, "পিতা সব, আর নিজে না খেয়ে পুত্রদের খাইও না; বুকের উপর রেখে ঘুম পাড়িও না; তাদের হাসিটি দেখার জন্য স্নেহের হাসিটি হেসো না।...তাদের সকালে বিকালে জোরে কষাঘাত কোরো।...তা হলে বোধহয় তারা এই মহম্মদের মত বাধ্য, পিতৃভক্ত হবে। তা'দের এই শাস্তি দিতে যদি তোমাদের বুকে ব্যথা লাগে ত বুক ভেঙ্গে ফেলো, চোখে জল আসে ত' চোখ উপড়ে ফেলো; আর্তনাদ কর্তে ইচ্ছা হয় ত নিজের টুঁটি ধোরো।...

তারপরই সম্রাটের সম্রাট-সত্তা জেগে উঠল। কিন্তু এখন তিনি নিরস্ত্র এবং নিঃসহায়। তাই মনের আক্রোশ প্রকাশিত হ'ল ভাষায়। ঔরংজেবকে দমন করার উদ্দেশ্যে জাহানারাকে তিনি বললেন, "আমি অগ্নির মত জ্বলে উঠি, তুই বায়ুর মত ধেয়ে আয়। আমি ভূমিকম্পের মত সাম্রাজ্যখানি ভেঙ্গে চুরে দিয়ে যাই, তুই সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মত তাকে এসে গ্রাস কর।......"

এক সময়কার প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাটের আজ এই অসহায়—অবলম্বনহীন নিষ্ফল আক্রোশ, অবাধ্যপুত্রকে শাসন করবার জন্য ব্যর্থ উদ্যম আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়, সম্রাট সাজাহান কি অসীম এবং শুষ্ক এক ট্র্যাজেডির বায়ুলেশহীন শূন্যতার মধ্যে শোচনীয়ভাবে নিপতিত।

কৃতঘ্ন পুত্রের কাছে মর্মান্তিক আঘাত পেয়ে পুত্রস্নেহের মাধুর্য এবং সার্থকতা তাঁর কাছে অন্তর্হিত হয়ে গেছে অনেক আগেই, এখন আবার তাঁর মনে জেগে

উঠল ঈশ্বরের বিধান সম্পর্কে সংশয়, জগৎ সংসারের সামঞ্জস্য সম্পর্কে অবিশ্বাস; প্রকৃতির চিরন্তন শুভময়তা সম্পর্কে প্রশ্ন—"সূর্য্য! তুমি এখনো আকাশের উপরে কেন! নির্লজ্জ! নেমে এসো! একটা মহাসংঘাতে তুমি চূর্ণ হয়ে যাও। ভূমিকম্প! তুমি ভৈরব হুঙ্কারে জেগে উঠে এ পৃথিবীর বক্ষ খান খান ক'রে ভেঙ্গে ফেল। একটা প্রকাণ্ড দাবানল জ্বলে উঠে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়ে চলে যাও। আর একটা বিরাট ঘূর্ণী ঝঞ্ঝা এসে সেই ভস্মরাশি ঈশ্বরের মুখে ছড়িয়ে দাও"—(২/২)।

মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বর সম্পর্কে সম্রাটের পূর্বতন আস্তিক্যবোধ বা প্রসন্ন দৃষ্টির পরিবর্তে এখনকার এই নাস্তিক্যভাব বা বিদ্বেষদৃষ্টি আমাদের কাছে সম্রাটের নিপীড়িত চিত্তের ভয়াবহ ভগ্নদশার পরিচয় প্রদান করে। অ-লোক সামান্য মহত্বের আধার যে চিত্ত, সেই চিত্ত যখন মর্মান্তিকভাবে ভেঙ্গে যায় তখনই শোচনীয় ট্র্যাজেডির ভয়াবহ রস-রূপটি প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

মানুষের জীবনে এই ট্র্যাজেডির বিস্তৃতি ঘটে উন্মাদনায়, 'রাজা লীয়রে'র যেমন হয়েছিল। এই নাটকের পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যটি সম্রাট সাজাহানের ট্র্যাজেডির এই বিস্তৃত রূপটিকে প্রকাশ করেছে। দৃশ্যটি এইজন্য স্মরণীয়। উন্মাদ অবস্থাপ্রাপ্ত সম্রাট সাজাহানের এই রূপটি আমাদের দেখিয়ে দেয়, তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডি কত গভীর, কত ব্যাপক।

নাটকের শেষ দৃশ্যে অবশ্য সাজাহান ঔরংজেবকে ক্ষমা করেছেন এবং তাতে হয়ত নাটকের পরিণতিতে খানিকটা মাধুর্য (happy ending) এসেছে। কিন্তু তাতে সম্রাট সাজাহানের ট্র্যাজেডির গভীরতা ও ব্যাপকতা বিন্দুমাত্রও কমে না। কারণ এখানে সাজাহানের প্রতি আমাদের ট্র্যাজিক সহানুভূতির সমস্তটাই নির্ভর করেছে ঔরংজেবের প্রতি আমাদের ঘৃণার উপর। শেষ দৃশ্যে পিতার কাছে ঔরংজেব ক্ষমা চাওয়ায় এবং স্নেহার্দ্রচিত্ত পিতা অবাধ্য পুত্রকে ক্ষমা করায় ঔরংজেবের প্রতি আমাদের পূর্বেকার ঘৃণা আদৌ অন্তর্হিত হয়না। এর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ঔরংজেবের প্রতি জাহানারার জ্বালাময়ী সমালোচনা, দিলদারের কঠোর শ্লেষবাক্য এবং পরে জহরৎ উন্নিসার মর্মভেদী ভৎর্সনা ও অভিশাপের মধ্যে ঔরংজেব নিতান্ত অশ্রদ্ধার পাত্রই হয়ে থাকেন। উপরন্তু দারা, সুজা, মোরাদের জন্য পুত্র বিয়োগের বেদনায় এবং ঔরংজেবের কাছে থেকে শৌনিক-সুলভ আচরণ পাওয়ার ক্ষোভে অধীর ও উন্মাদ পিতা সাজাহান যখন ঔরংজেবের প্রতি মমতায় বিগলিত হয়ে তাকে ক্ষমা করলেন,

তখন অকস্মাৎ আমরা যেন, বাঙালী বা ভারতীয় হিসেবে এই ট্র্যাজেডি নিপীড়িত পিতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সাযুজ্য লাভ করি, সাজাহানের ট্র্যাজেডি অন্তর্হিত হয়েছে বা কমে গেছে,—একথা আদৌ মনে করিনা। শেক্সপীয়রের আদর্শে এই নাটকের ট্র্যাজেডি পরিকল্পিত হলেও, দ্বিজেন্দ্রলালের এই বিশিষ্টতা টুকুও লক্ষণীয়। বাঙালীর রসসংস্কার-ই মনে হয় দ্বিজেন্দ্রলালের এই বিশিষ্ট-ট্র্যাজেডি-চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে,—যে রসসংস্কার সর্বদাই অশ্রুপাতের সুযোগ সৃষ্টি করতে চায়, নাটককে করুণরসাত্মক করে তুলতে চায়, এবং পরিনামে প্যাথেটিক ট্র্যাজেডির দিকেই নাটককে এগিয়ে নিয়ে যায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের ট্র্যাজেডি-চেতনার পরিচয় কেবল যে এই ক'খানা সার্থক ট্র্যাজেডির মধ্যেই পাওয়া যায়, তা নয়। সাহিত্যের তাত্ত্বিক আলোচনা প্রসঙ্গেও তিনি তাঁর ট্র্যাজেডি-চেতনার পরিচয় রেখে গেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের এইসব আলোচনা থেকে মনে হয়, মানুষ জীবনে যা একান্তভাবে চায়, সেটাকে না পাওয়ার যে বেদনা, তাকেই দ্বিজেন্দ্রলাল ট্র্যাজেডি হিসাবে মনে করতেন। 'কাব্যের উপভোগ' শীর্ষক আলোচনায় তিনি এই সম্পর্কে বলেছেন, "মনুষ্য জীবনে অনেক ট্র্যাজেডি আছে। যেমন বাপ কি মা ছেলের জন্য এত করে, ছেলে তার দশমাংশও প্রতিদান করে না। পিতামাতার এই স্নেহ-দৌর্বল্য একটা ট্র্যাজেডি। মা ছেলের জন্য এত চিন্তিত, কিন্তু মৃত্যুর পর একবার ফিরে এসে চেয়েও দেখে না। এ একটা ট্র্যাজেডি। আজীবন সেবার প্রতিদানে নির্বাসন বা নির্যাতন একটা ট্র্যাজেডি। উদ্দেশ্য মহৎ, প্রতাপ সিংহের মত প্রাণপণ উদ্যম, তথাপি ঘটনার আবর্তে প'ড়ে সে প্রাণপণ উদ্যমও তৃণখণ্ডের মত ডুবে যায়।—এ আর এক ট্র্যাজেডি। সভ্যতার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সারল্যের তিরোভাব আর এক ট্র্যাজেডি। মানুষের প্রতি মানুষের কৃতঘ্নতা, বিশ্বাস ঘাতকতা, নির্দয়তা এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ট্র্যাজেডিতে পূর্ণ। তিনিই কবি যিনি এই eternal tragedyগুলি মধুরভাবে ব্যক্ত করতে পারেন।"[৩৬]

ট্র্যাজেডি হিসেবে আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের যে ক'খানা নাটকের আলোচনা করেছি, তার সব ক'খানির মধ্যদিয়েই দ্বিজেন্দ্রলালের এই ট্র্যাজেডি-চেতনার

৩৬. বঙ্গদর্শন, মাঘ, (১৩১৪)।

পরিচয়ই পাওয়া যায়। এই সব ট্র্যাজেডি দ্বিজেন্দ্রলাল শেক্সপীয়রের রীতিতেই গড়ে তুলেছিলেন, কিন্তু ট্র্যাজেডির স্বরূপধর্ম সম্পর্কে তিনি যা বুঝেছিলেন, যার পরিচয় তিনি দিয়েছেন উপরিউক্ত আলোচনার মধ্যে, দ্বিজেন্দ্রলালের সেই বিশিষ্ট ট্র্যাজেডি-চেতনা শেক্সপীয়রীয় পরিকল্পনার মধ্যেও স্বরূপতঃ অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে ট্র্যাজেডি রচনার সুযোগ ছিল না। কারণ সেখানে পুণ্যের জয় এবং পাপের পরাজয় দেখাতেই হবে। দ্বিজেন্দ্রলাল এই দৃষ্টিভঙ্গি স্বীকার করতেন না। তাঁর মতে, "বাস্তবজীবনে অধর্মের জয়ই বরং অধিক দেখা যায়। নহিলে ক্ষুদ্রতা, স্বার্থ, প্রতারণায় পৃথিবী ছাইয়া পড়িত না।··· মনুষ্য জীবনে দেখা যায় যে, ধর্ম অনেক সময় আমৃত্যু শির অবনত করিয়া থাকে, এবং অধর্ম শেষ পর্যন্ত উচ্চশির করিয়া চলিয়া যায়। যীশুখৃষ্টের জীবন ও Martyer দের জীবন তাহার জলন্ত উদাহরণ।"[৩৭] সুতরাং তাঁর মতে সাহিত্যে ট্র্যাজেডি রচনা করার সুযোগ আছে, বিশেষ যেহেতু সাহিত্য চলমান বাস্তব জীবনেরই দর্পণ।

এখানেও আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের ট্র্যাজিক জীবনবোধের পরিচয় পাই। ট্র্যাজিক জীবনবোধ এমন সুস্পষ্ট হলেই সার্থক ট্র্যাজেডি রচনা সম্ভব হতে পারে, এবং সেইজন্য দ্বিজেন্দ্রলালের ট্র্যাজেডিগুলি এমন সার্থক হতে পেরেছে। তিনি ট্র্যাজিক চরিত্রসৃষ্টির পদ্ধতি সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। ট্র্যাজিক চরিত্রের সংঘাত থাকা দরকার, এবং সেই সংঘাত যত মানসিক (অন্তর্দ্বন্দ্ব) হবে, ততই যে ট্র্যাজেডি হবে উচ্চ অঙ্গের, সে সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন।[৩৮]

সুতরাং মধুসূদনের পর রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যেই একটা আনুপূর্বিক ট্র্যাজেডি-চেতনার পরিচয় পাই। রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা এই ট্র্যাজেডি-চেতনা থেকে স্বরূপতঃ ভিন্ন ছিল। কারণ রবীন্দ্রনাথের জীবন-বোধই ছিল ভিন্নতর।

বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিশেষতঃ ইংরাজী সাহিত্যের গুণমুগ্ধ পাঠক ছিলেন। এইজন্য পাশ্চাত্য কবিদের জীবন-দৃষ্টি বিশেষতঃ শেক্সপীয়রের

---

৩৭. কালিদাস ও ভবভূতিঃ দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ), ১ম খণ্ড, (১৯৬৪) পৃ. ৬২২।

৩৮. কালিদাস ও ভবভূতি : ঐ, পৃ. ৬৫২।

জীবনদৃষ্টি বঙ্কিমের কবিচিত্তকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। শেক্সপীয়র তাঁর নাটকগুলির মধ্যে, বিশেষতঃ ট্র্যাজেডিগুলির মধ্যে মানুষের জীবনে প্রবৃত্তির ভূমিকার যে সব শোচনীয় ও ভয়াবহ চিত্র প্রদান করেছেন, তা যে বঙ্কিমের ট্র্যাজিক জীবন-চেতনাকে গড়ে তুলতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বঙ্কিমের এই ট্র্যাজিক জীবন-বোধের পরিচয় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর এই ট্র্যাজিক জীবনবোধ যে বিশেষভাবেই শেক্সপীয়রীয় তার প্রমাণ তিনি রেখেছেন তাঁর "কমলাকান্তের দপ্তরের" 'পতঙ্গ' নামক রচনাটিতে।

জীবনে প্রবৃত্তিরূপ বহ্নির ভূমিকা বঙ্কিম যে শেক্সপীয়র ছাড়াও দেশের অন্যান্য কবির কাব্যেও লক্ষ্য করেছেন, তা তিনি করেছেন শেক্সপীয়রেরই ট্র্যাজিক জীবনদর্শনের আলোকে। জীবনে এই বহ্নির দাহ এবং তাতে জীবনের সম্পূর্ণ ধ্বংসকে শেক্সপীয়র যেভাবে আনুপূর্বিক এবং উজ্জ্বলভাবে দেখিয়েছেন, তাতেই জীবনে এই প্রবৃত্তিরূপ বহ্নির ভূমিকা সম্পর্কে বঙ্কিম সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, এবং শেক্সপীয়র ছাড়াও অন্যত্র সেই বহ্নির ভূমিকাকে খুঁজে পেয়েছেন। শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিতে এই বহ্নির রহস্যকে যেমন দুর্জ্ঞেয় ক'রে চিত্রিত করা হয়েছে, তেমন আর কোথাও হয়নি। বঙ্কিমের দৃষ্টিতেও এই বহ্নির কোনো ব্যাখ্যা ছিলনা, "এখানে দর্শন হারি মানে, বিজ্ঞান হারি-মানে।" এই জন্যই বলা চলে যে এই প্রবৃত্তি তাড়িত জীবনের সর্বনাশ বা ট্র্যাজেডি সম্পর্কে বঙ্কিমের চেতনা শেক্সপীয়রের আদর্শেই গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু এরই মধ্যে আবার বঙ্কিমের মননে ভারতীয় মূল্যবোধও সক্রিয় ছিল। তিনি এই প্রবৃত্তিবহ্নিতে ভস্মীভূত হওয়ার মধ্যে কোনো মাহাত্ম্য খুঁজে পাননি, বরং এই বহ্নির দাহ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি উপায়ের সন্ধান করেছেন। জীবনে প্রবৃত্তির সর্বনাশা ভূমিকা দেখেও তিনি জীবন সম্পর্কে নিরাশ হননি, সর্বনাশকে তিনি জীবনে অনিবার্যরূপে গ্রহণ করতে চাননি, বরং সর্বনাশের উপরে জীবনের জয়কেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, এবং তারই মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন জীবনের মহিমা। প্রবৃত্তি-সাধিত এই সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বঙ্কিম তাঁর জীবনদর্শন অনুযায়ী যে উপায়কে খুঁজে পেয়েছেন, তা প্রেম যা রূপজমোহ বা কাম থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। কিন্তু এই প্রেমের মাধুর্য এবং গৌরব যতই থাক, বাস্তবের

মাটিতে এই প্রেমের প্রতিষ্ঠার পথ কণ্টকাকীর্ণ, বাস্তবের সঙ্গে এই প্রেমের বড় কঠিন এবং কুটিল দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বেরই পরিণাম কুন্দনন্দিনীর ট্র্যাজেডি। হয় এই প্রেম প্রতিষ্ঠিত হয়ে জীবনকে ধন্য করে, নয় একেবারে জীবনকে বিনাশ করে ফেলে। কোনো মাঝামাঝি অবস্থান এই প্রেমের নাই। এই প্রেমের এইরূপ স্বভাবের জন্যই কুন্দনন্দিনীর ট্র্যাজেডি এমন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

গোবিন্দলালের ট্র্যাজেডির প্রধান কারণ গোবিন্দলালের প্রতি ভ্রমরের অবিশ্বাস ও অভিমান। পত্নীর এই অবিশ্বাস ও অভিমানই গোবিন্দলালকে রোহিণীর দিকে অধিকতর পরিমাণে ঠেলে দিয়েছে এবং তারই পরিণামে গোবিন্দলালকে এক ট্র্যাজেডির মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়েছে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছেন, "তাহার (ভ্রমরের) অনুচিত অভিমান ও সন্দেহ-প্রবণতা ট্র্যাজেডিকে আসন্নতর করিয়াছে।" এ ছাড়াও ভ্রমরের শ্বশ্রূঠাকুরাণীর ভূমিকা, কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু প্রভৃতিও এই ট্র্যাজেডিকে ক্রমশঃ অনিবার্য করে তুলেছে। সবই যেন নিয়তির খেলা। বাইরের প্রতিবন্ধক এসে ভ্রমর-গোবিন্দলালের অন্তরের বিরোধটিকে জটিলতর এবং দুরতিক্রমনীয় করে তুলেছে। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের মতো এখানে সহজেই নায়ক নায়িকার মিলন সাধিত হয়নি। লেখক এখানে যেন কঠিন বাস্তবের নির্দয় সত্যকে অনুসরণ করতে চেয়েছেন এবং ট্র্যাজেডিও এখানে গভীর ভাবাত্মক হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের মতে রোহিণীর মৃত্যু এবং ভ্রমরের অভিমানের জন্য গোবিন্দলালের ট্র্যাজেডি পূর্ণভাবে বিকাশিত হয়ে উঠতে পারেনি। ভ্রমরের অভিমান গোবিন্দলালের ট্র্যাজেডির কারণ হয়েছে, আবার ঐ অভিমানই গোবিন্দলালকে এক ট্র্যাজিক সংকটের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। কবি-সমালোচকের ভাষায়: "রোহিণী চরিত্রও যেমন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় নাই, তাহাকে অর্দ্ধপথেই হত্যা করা হইয়াছে, তেমনিই ভ্রমরও পূর্ণ বিকশিতা নারী নয়—তেজস্বিনী বালিকা মাত্র; তেমন নারী পাপে তাপে, সংশয়-সংকটে, হৃদয়-দুর্বল পুরুষের সহধর্মিনী বা সহায়-স্বরূপিণী হইবার যোগ্য নহে। তাহার হৃদয়ের সেই অন্ধ ধর্ম বিশ্বাস—স্বামীকে মানুষ না হইয়া দেবতা হইতে হইবে, এই যে তাহার দাবী, ইহাই ঐ ট্র্যাজেডির একটা বড় কারণ হইয়াছে। অতএব এই উপন্যাসে পুরুষের জীবন দুইদিকেই একটা অতিস্থূল ও রূঢ় ধাক্কায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; তাহাকে সেই আদি প্রকৃতি-শক্তির বা গভীরতর আত্মিক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। এই জন্যই "কৃষ্ণকান্তের

উইল" শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির আদর্শে কল্পিত হইলেও শেষ পর্যন্ত তাহা একটা করুণ রসাত্মক মেলোড্রামায় পর্যবসিত হইয়াছে।"[৩৯]

অবশ্য এরই মধ্যদিয়ে এই শ্রদ্ধেয় কবি-সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের ট্র্যাজেডি-চেতনার প্রকৃত রূপটিকে নির্ণয় করতে পেরেছেন। তাঁর মতে শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির আদর্শকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করতে যাওয়াতেই এখানে ট্র্যাজেডি মেলোড্রামায় পর্যবসিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, "গোবিন্দলালের রোহিণী-হত্যা যেমন, তেমনিই তাহার সেই সন্ন্যাসিবেশে পুনরাবির্ভাব এবং সেই উক্তি একই চরিত্রের পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও, উহাতে শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির স্পষ্ট অনুভাবনা আছে বলিয়াই এমন রসাভাস ঘটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই গোবিন্দলালকে তেমনিই একটা ট্র্যাজিক চরিত্ররূপে খাড়া করিতে চাহিয়াছেন ; কিন্তু য়ুরোপীয় জীবনে যাহা সম্ভব, ভারতীয় এবং বিশেষ করিয়া বাঙালী জীবনে ও চরিত্রে তাহা আদৌ সম্ভব নহে ;...বঙ্কিমের কবি প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব ইহাই যে, তিনি কল্পনার আতিশয্যে বাস্তবকে কোথাও লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। তাই শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির আদর্শে বাংলা কাব্য রচনা করিতে গিয়াও বাঙালী জীবন ও বাঙালী চরিত্রের সত্যকে লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। তথাপি, হয়তো ইহাই মনে করিয়া তিনি আশ্বস্ত হইয়াছিলেন যে, বাঙালী জীবনের ট্র্যাজেডি ইহা অপেক্ষা ভীষণতর হইতে পারে না।"[৪০]

এইখানেই শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি-চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব ট্র্যাজেডি-চেতনার বিশিষ্টতা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। শেক্সপীয়র যেমন মানুষের জীবনে প্রবৃত্তি-শক্তির তাণ্ডবে স্তম্ভিত হয়ে, মানুষের জীবনের ট্র্যাজেডিকে সকল জিজ্ঞাসা-সংশয়ের ঊর্ধ্বে স্থাপিত করে রেখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তা পারেননি। হয়ত তিনি ততখানি বিশুদ্ধ কবিত্ব শক্তির অধিকারীই ছিলেন না, বা শেক্সপীয়রের সমতুল্য রসমগ্নতাও তাঁর ছিল না। তিনি মানুষের জীবনে প্রবৃত্তি-তাড়িত ট্র্যাজেডিকে স্বীকার করে নিয়েছেন, কিন্তু শেক্সপীয়রের মতো উদাসীন রসমগ্নতা নিয়ে মানুষের জীবনে প্রবৃত্তির লীলা-খেলাকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি প্রবৃত্তি-তাড়িত ট্র্যাজেডির শূন্যতার অন্তরালে জীবনের কোনো সার্থকতাকে খুঁজে পান নি। পরন্তু

৩৯. মোহিতলাল মজুমদার : বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস (কলিঃ বিশ্বঃ), (১৯৫৫). পৃ. ৩৭।

৪০. ঐ পৃ. ৪২।

শেক্সপীয়র ট্র্যাজেডির সর্বনাশের মধ্যেই জীবনের একটা গৌরবকে যেন খুঁজে পেয়েছিলেন। ট্র্যাজেডি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এই যে একটা নিজস্ব চেতনা, এটা তাঁর নিজস্ব রসসংস্কার অনুসারে শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির রসাস্বাদ গ্রহণেরই ফল।

পাশ্চাত্ত্য ট্র্যাজেডি-চেতনার প্রভাবে বাঙালীর ট্র্যাজেডি-চেতনা গড়ে উঠলেও পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডি-চেতনা থেকে তা বহুলাংশে পৃথক। পাশ্চাত্ত্যের মত জীবনে নিয়তির বিধ্বংসী প্রতিকূলতা বা মানুষের প্রবৃত্তির আত্মনাশী সক্রিয়তাকে বাঙালী তার রস-সংস্কারের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেনি। বাঙালীর নিজস্ব জীবন-দর্শন নিতান্তই ধর্মকেন্দ্রিক ও দৈবনির্ভর। তাই সে জগতে এবং জীবনে অশুভকে অমোঘ হিসেবে মেনে নিতে পারে নি,—দেবতার কৃপায় সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি, সমস্ত অসামঞ্জস্যের অবসান, সমস্ত বিপর্যয় থেকে অব্যাহতি এক সময় ঘটবেই, এইটিই ভারতীয় হিসেবে বাঙালীর সংস্কার। তাই পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডির রূপ,—ক্রূর দৈবের অভিশাপে বলিষ্ঠ জীবনের শোচনীয় পরাজয়, প্রবৃত্তির দুর্নিবার তাড়নায় বিধ্বস্ত জীবন-সামঞ্জস্য,—বাঙালীর ট্র্যাজেডি-চেতনার মধ্যদিয়ে ফুটে ওঠে নি। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও আমরা এই একই ব্যাপার লক্ষ্য করব।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাঙালীকে ট্র্যাজেডি রচনা করতে হয়েছে এবং সেখানে বাঙালীচিত্ত একটা মীমাংসা করে নিয়েছে পাশ্চাত্য জীবন-দর্শন, এবং ভারতীয়-জীবন দর্শনের মধ্যে। এইজন্যই বাঙালীর সৃষ্ট ট্র্যাজেডিতে বাঙালীর রস-সংস্কার অনুসারে করুণ রসের যেমন স্বাভাবিক প্রাধান্য আছে, তেমনি জীবনের বিপর্যস্ত অবস্থাকে প্রকাশ করবার জন্য পাশ্চাত্য রীতিতে নিতান্ত কৃত্রিমভাবেই হৃদয়বিদারক দৃশ্যের আধিক্য আছে। মনস্বী সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন, "বাংলা ট্র্যাজেডি তাই আতিশয্যস্ফীত, অন্তরের সহজ প্রেরণার অভাব কৃত্রিম বিভীষিকা ও অহেতুক হৃদয়বিদারক দৃশ্য সংযোজনার দ্বারা পূরণ করিতে অতিমাত্রায় আগ্রহশীল। পাশ্চাত্য জাতির প্রকৃতিগত রক্ত-পিপাসা উহার নাটকে যে পরিমাণ খুন-জখম ও দৈহিক পীড়নের ভার বহন করিতে পারে, আমাদের দৈবনির্ভর শান্তি প্রিয়তা সে পরিমাণ নৃশংসতাকে কলাসম্মত স্বাভাবিকতা দিতে পারে না।"[৪১]

---

৪১. ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা (পৃ. ২৬): ডঃ বৈদ্যনাথ শীল রচিত "বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা" গ্রন্থ, (১৩৬৪)।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আরো একটা মূল্যবান কথা বলেছেন যে, বাঙালীর "চিরন্তন পৌরাণিক সংস্কারই তাহার ট্র্যাজেডির ধারণার মূলে সক্রিয় ছিল। শ্রীবৎসচিন্তা, নলদময়ন্তী, রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতির উপাখ্যানের ন্যায় বাঙালীর সাধারণ জীবনে অপরিমিত ও অজস্র দৈব উৎপীড়নই তাহার নিকট ট্র্যাজেডির মূল তত্ত্বরূপে প্রতিভাত হইত।"[৪২] ফলতঃ বাঙালীর ট্র্যাজেডি-চেতনায় করুণরসই সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। আমরা প্রথম পরিচ্ছেদের আলোচনায় দেখেছি, এই করুণরসই কী ভাবে ট্র্যাজেডির মূলরস হয়ে উঠতে পারে। ইউরোপীয় ট্র্যাজেডি-চেতনায়ও এই করুণরসের প্রাধান্য যথেষ্ট প্রশ্রয় পেয়েছিল।

আমরা সাধারণতঃ শেক্সপীয়রের নাটকের আদর্শেই অন্যান্য ট্র্যাজেডির রসাস্বাদ করতে যাই এবং তার ফলে শেক্সপীয়রের নাট্য সাহিত্যের বাইরে আমরা সার্থক ট্র্যাজেডি খুঁজে পাই না। আমাদের রসচেতনার এই ভ্রমাত্মক দিকটির প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করেছেন ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়—দ্বিজেন্দ্রলালের ট্র্যাজেডি-চেতনা নির্ণয় প্রসঙ্গে। তিনি বলেছেন, "শেক্সপীয়রের আদর্শ ও সমুন্নতির আলোকে যে কোনো নাটক-ই খর্ব মনে হবে, এবং একথাও ঠিক যে ইংরেজি সাহিত্যেও শেক্সপীয়র একজনই ছিলেন। বেশীদূর না গিয়ে যদি এলিজাবেথের যুগের আর একজন খ্যাতনামা নাট্যকার মার্লোর নাটক আলোচনা করা যায়, তাহলে বোধ হয় বক্তব্যটি পরিস্ফুট হবে। মার্লোর চারখানি নাটকে (ট্যাম্বারলেন্, জু অব মাল্টা, ডক্টর ফাউস্টাস, এডোয়ার্ড দি সেকেণ্ড) নাটকীয় দ্বন্দ্বসংঘাতের তীব্রতা, স্পন্দিত কবি-কল্পনা ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের তীব্রোজ্জ্বল মূর্চ্ছনা প্রভৃতি রোমান্টিক নাটকের কতকগুলি শক্তিশালী অভিব্যক্তি লক্ষণীয়। কিন্তু পরবর্তী নাট্যকার শেক্সপীয়রের তুলনায় মার্লোর প্রতিভা নিতান্ত প্রাথমিক ধরণের মনে হয়। অতিনাটকীয় আতিশয্য, ভাষা ও চরিত্র পরিকল্পনায় বৈচিত্র্য হীনতা, নারী চরিত্র অঙ্কনের ব্যর্থতা,...প্রভৃতি মার্লোর নাটকের কয়েকটি সর্বজন স্বীকৃত ত্রুটি।"[৪৩]

সুতরাং বাঙালীর ট্র্যাজেডি-চেতনা শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি-চেতনার মতো পরিপূর্ণ এবং উচ্চাঙ্গের না হতে পারে, কিন্তু শেক্সপীয়রের প্রভাবে প্রভাবিত

---

৪২. ঐ, পৃ. ২৭ (ভূমিকা)।

[illegible] কবি ও নাট্যকার, (১৯৬০) পৃ. ৩৮১।

হয়ে নিজের রসসংস্কারের উপর ভিত্তি রেখে বাঙালী যে ট্র্যাজেডি-চেতনার পরিচয় দিয়েছে তার সাহিত্যে, তার একটা নিজস্ব বিশিষ্টতা আছেই। এই বিশিষ্টতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, এর চিত্ত আলোড়নকারী ক্ষমতা কতখানি, এবং জীবনের দুঃখময়তাকে তা কতখানি কাব্যসম্মতভাবে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে, তা-ই আমাদের নির্ণেয়। রবীন্দ্র ব্যতিরিক্ত বাঙালীর ট্র্যাজেডি-চেতনার ইতিবৃত্তে আমরা সেইটাই নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছি এবং রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার মধ্যেও আমাদের সেইটাই নির্ণেয় বিষয় হবে।

বাঙালী তার নাটকে উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডি ভালোভাবে সৃষ্টি করতে না পারলেও গল্পে বা উপন্যাসে অপেক্ষাকৃত উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করতে পেরেছে। তার কারণ নাটকে ট্র্যাজেডির একমুখী মারাত্মক রূপকে সৃষ্টি করতে গিয়ে বাঙালীর কবিচিত্ত যতটা আনুকূল্য প্রদান করতে পারে, গল্পে বা উপন্যাসে সেই ট্র্যাজেডির অপেক্ষাকৃত স্তিমিত এবং তরল রূপকে সৃষ্টি করতে বাঙালীর কবিচিত্ত তারচেয়ে বেশী আনুকূল্য প্রদান করতে পারে। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার তাঁর "বাংলা সাহিত্যে ট্র্যাজেডি" নামক সুদীর্ঘ আলোচনায় এই সিদ্ধান্ত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, তত্ত্বের দিক থেকে এবং জীবনদর্শনের দিক থেকে শেক্সপীয়রীয় রীতিতে ট্র্যাজেডি রচনায় বাঙালীর পক্ষে কোনো বাধা থাকার কথা নয়। কিন্তু পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডির অন্তর্গত তত্ত্বের সঙ্গে আমাদের যতই জ্ঞাতিত্ব থাক, ঐ তত্ত্বকেও আমরা একেবারে রসরূপেই আস্বাদন করি, জীবনের ক্ষেত্রে তা বেশীক্ষণ অবস্থান করতে পারে না, একটি ভাবস্থির অনুভূতিরূপে তা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গীতিকাব্যের সৃষ্টি করে।

এইজন্যই নাটকের বাইরে বাঙালী ঐ ট্র্যাজেডির একটা মোটামুটি রূপদান করতে পেরেছে। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বেশ স্পষ্ট করেই বলেছেন, "ট্র্যাজেডির নাটকীয় রূপ যেমনই হোক, জীবনে তাহাকে আমরা নানারূপে দেখিয়া থাকি এবং তাহাতেও সেই রসের চকিত চমক থাকে। ট্র্যাজেডি শব্দটির এখন যে বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহার কারণ আছে। জীবনে যে দুঃখ আছে—সেই দুঃখের বৈচিত্র্য ও ভীষণতার অন্ত নাই, ইহা সর্ববাদী সম্মত। সেই দুঃখ সাহিত্যের কোন একটা বিশেষ রসরূপে নাটকীয় ঘটনাচক্রের সুবলয়িত আকারে, এবং তন্নিহিত একটি তত্ত্বরূপে ফুটিয়া না

উঠিলেও, সেই দুঃখকে সহ্য করিবার খাঁটি ট্র্যাজিক চরিত্র আমরা জীবনে প্রায় দেখিয়া থাকি; অতএব আধুনিক কাব্যে, উপন্যাসে তাহার প্রতিচ্ছায়া থাকিবেই। এ কালের রসিক-চিত্তে রসসঞ্চারের জন্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট; জীবনের অভিজ্ঞতা ও ভাবুকতা অনেক বাড়িয়াছে, এজন্য সবই আর চোখে দেখিতে হয় না, ঐ ইঙ্গিতই যথেষ্ট, তাহা হইতেই পুরা নাটকখানি মনের মধ্যে নানা আকারে গড়িয়া লওয়া যায়। ট্র্যাজেডির সেই খণ্ডরূপ আমাদের নব্য সাহিত্যে দেখা দিয়াছে।[৪৪]

বাঙালীর ট্র্যাজেডি-চেতনার ইতিবৃত্ত সংগ্রহের সময় এবং গল্প-উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার স্বরূপ নির্ণয় করবার পূর্বে আমাদের এই কথাগুলি স্মরণে রাখা যেতে পারে।

৪৪. মোহিতলাল মজুমদার: "সাহিত্য বিতান" ("বাংলা সাহিত্যে ট্র্যাজেডি" প্রবন্ধ), (১৩৬৮), পৃ. ২৯৯।

প্রসঙ্গ—গ

রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার প্রারম্ভঃ বিষণ্ণ কল্পনার কাল ॥

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডি-চেতনা ও বাঙালীর ট্র্যাজেডি-চেতনার যে পরিচয় আমরা সংগ্রহ করেছি, তাতে দেখা যায় যে, যে সমস্ত কবি ট্র্যাজেডি রচনা করেছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই দৃষ্টিতে জীবন ছিল মূলতঃ বেদনাময়। জীবনের এই বেদনার এক গভীর ও ব্যাপক পরিণাম প্রদর্শন করে তাঁরা ট্র্যাজেডি রচনা করেছেন। পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডি এবং বাঙলা ট্র্যাজেডির মধ্যে বহুপ্রকারের রূপগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, স্বরূপগত পার্থক্য এই জন্যই যে, পাশ্চাত্য কবি ও বাঙালী কবি উভয়েই ট্র্যাজেডি রচনা করতে গিয়ে জীবনের এই অনিবার্য বেদনাময়তায় বিশ্বাস করেছেন। এই কারণেই পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডি এবং বাংলা ট্র্যাজেডিতে যা সাধারণভাবে দেখা যায় তা হচ্ছে, বেদনাময় জীবনের বিপর্যয় এবং দুঃখ ভোগ। গ্রীক ট্র্যাজেডির সামান্য লক্ষণ হিসেবে জন স্মার্ট বলেছিলেন যে,[১] সর্বত্রই সাধারণভাবে দেখা যায় জীবনের বিপর্যয় ও দুঃখ ভোগ,—সেই উক্তিকে একটু সম্প্রসারিত ক'রে আমরা পাশ্চাত্য ও বাংলা ট্র্যাজেডিরও সাধারণ লক্ষণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথও যে ক'খানা ট্র্যাজেডি রচনা করেছেন, বা যে সমস্ত রচনায় রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়, সেই সব রচনাতেও দেখা যায় যে, জীবনের বেদনাময়তা রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তেও একটা প্রগাঢ় ছায়া ফেলেছিল।

রবীন্দ্রনাথের অল্পবয়সের রচনার মধ্যে দেখা যায় যে জীবনের বেদনাময়তাকে তিনি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতেই দেখেছেন—দার্শনিক উপলব্ধির

---

১. "What is common to all is the element of calamity and suffering".—'Tragedy' প্রবন্ধ (Oxford English Association Series—) ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের 'নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা' (১৯৬৩) পৃ. ৩৬১ থেকে উদ্ধৃত।

সোপান বেয়ে বেদনা কোনোপ্রকার শান্তিলাভের উপায় হয়ে ওঠেনি কবির কাছে। বেদনা এখানে বেদনা-ই এবং তার একটিই মাত্র লৌকিক প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ সাধারণভাবে শোক ভাবটিকে জাগিয়ে তোলা। রবীন্দ্রনাথের অপরিণত কবিজীবনে (মানসী, ১৮৯০, প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত) রচিত অন্ততঃ পনেরো খানি গ্রন্থে জীবনের বেদনাময়তায় বিশ্বস্ত কবিচিত্তের বিষণ্ণতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

রবীন্দ্র কবিজীবনের প্রারম্ভিক পর্বে কবিচিত্তের এই যে বিষণ্ণতা, এইটাই রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার ভিত্তি। সুতরাং রবীন্দ্রকবিচিত্তের এই বিষণ্ণতা প্রাক্‌মানসী পর্বের রচনাগুলিতে কি ভাবে অভিব্যক্তি লাভ করেছে,—রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করার জন্য,— তার পরিচয় সংক্ষেপে নেওয়ার দরকার।

এই পর্বে 'বনফুল' (১৮৮০)[২] কাব্যোপন্যাসটিকেই আমরা প্রথমে গ্রহণ করতে পারি। 'বনফুল' 'কবিকাহিনীর' পরে প্রকাশিত হলেও, রচিত হয়েছিল 'কবিকাহিনীর' পূর্বেই। 'বনফুল' একটি ব্যর্থ প্রণয়ের উপাখ্যান। হিমালয়ের তুষারাচ্ছন্ন অঞ্চলে এই কাব্যে 'বনফুল' কমলার বাস। কাহিনীর সুরুতে দেখা যায় মুমূর্ষু পিতার মাথা কোলে নিয়ে সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। শেষে পিতা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, চন্দ্রসূর্য প্রভৃতির কাছে তাঁর কন্যাকে সমর্পণ ক'রে প্রাণত্যাগ করলেন।

তারপর সেখানে বিজয় নামে এক পথিকের আবির্ভাব। সে পিতার মৃতদেহ তুষারের মধ্যে সমাধিস্থ ক'রে কমলাকে নিয়ে এই মানুষের জগতে—সংসারের মধ্যে চলে আসে। কমলার এই বনভূমি ত্যাগের বর্ণনার সঙ্গে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার বর্ণনার মিল আছে। সংসারের মধ্যে এসে কমলার পরিচয় ঘটল অনেকের সঙ্গে। নীরজা তার সখী, বিজয়ের বন্ধু নীরদ তার প্রেমিক। একদা নীরজার সঙ্গে কমলা তার বিগত বনবাস জীবনের কথা স্মরণ করছে। তার এই স্মৃতি-চারণার মধ্যে সখী নীরজা খুঁজে পাচ্ছে কেমন একটা শূন্যতার বেদনা, মন না ভরার বিষণ্ণতা। তাই নীরজা জিজ্ঞাসা করে, "তোর ভাই মন কে জানে কেমন, আজো বলিলি নে সকল

---

২. 'করুণা', 'বৌঠাকুরাণীর হাট', এবং 'রাজর্ষি'-কে আমরা উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গেই গ্রহণ করব, যদিও 'করুণা' 'বনফুলে'র পূর্বেই 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়।

খুলে ?" উত্তরে কথাচ্ছলেই কমলা বলে ওঠে একটি কথা যা তার জীবনের বেদনাময় পরিণতির সঙ্গে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। রবীন্দ্র কবি-চিত্তের দুঃখবোধও এই উত্তরের মধ্যদিয়ে সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করেছে :

"লভেছি জনম করিতে রোদন
রোদন করিব জীবন ভোরে।"

সে ভালোবাসত বন-প্রকৃতিকে। কিন্তু বন-প্রকৃতিকে ভালোবাসা আর মানুষকে ভালোবাসা এক নয়। যেহেতু বন আর বনের ফুল মানুষের মতো এত জটিল নয়। কিন্তু প্রকৃতিকে ভালবাসার যে সরল এবং সহজ অভিজ্ঞতা, তাই নিয়েই সে মানুষের সংসারে ভালোবাসার খেলায় মেতেছে। এই যে তার ভুল, এই ভুলেরই পরিণামে তার ট্র্যাজেডি। সে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে বনপ্রকৃতির সহজ সংস্কারকে ভুলতে। বলেছে,—

এখন মানুষে বেসেছি ভালো,
হৃদয় খুলিব মানুষ কাছে !
হাসিব কাঁদিব মানুষের তরে
মানুষের তরে বাঁধিব চুলে—

এমন সময় সে শুনল নীরদের গান। নীরদের প্রতি অনুরাগকে সে গোপন করে না,—সাগ্রহে কান পেতে শোনে নীরদের সুদীর্ঘ প্রেম সঙ্গীত—

"হৃদয়ের এই ভগন কুটীরে
প্রেমের প্রদীপ করেছে আলা—
যেন রে নিবিয়া না যায় কখনো
সহস্র কেনরে পাইনা জ্বালা।"

নীরদের এই বেদনা বিজড়িত সঙ্গীত শ্রবণে কমলা কাতর হয়ে ওঠে। ভাবতে থাকে, কাকে সে ভালোবাসে, যার ভালোবাসা সে ফিরে পায় না ? তখনি তার মনে পড়ে যায়, গতকাল তার সঙ্গে নীরদের আলাপ হয়েছিল।

তারপর একদিন কমলা নীরদকে জিজ্ঞাসা করে, সে কমলাকে ভালোবাসে কি না ? তার উত্তরে নীরদ যা বলেছিল, তার নির্গলিতার্থ, তার হৃদয়ের মধ্যে যে লেখা লুকনো আছে, তাকে কোনোদিন সে প্রকাশ করবে না—রুদ্ধ অগ্নিশিখার মতো তা তার হৃদয়কে দগ্ধ করবে। আসলে বিবাহ, পত্নী, স্বামী প্রভৃতি সম্পর্কে প্রচলিত সংস্কার বনফুল কমলার নেই। বনপ্রকৃতির মধ্যে

লৌকিক সংস্কার প্রবেশ করেনি, তাই এ সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই—

"কারে বলে পত্নী আর কারে বলে স্বামী,
কারে বলে ভালবাসা আজিও শিখিনি।"

এদিকে নীরজা বিজয়ের প্রতি অনুরক্তা, কিন্তু বিজয় সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন—কমলার প্রতি তার আকর্ষণ এবং প্রকৃতপক্ষে অধিকারের দাবী আছে। কমলার প্রতি তার প্রেমের পরিচয় কাব্যে কোথাও নেই। সে যেন কমলাকে বিজন বন থেকে উদ্ধার করে এনেছে এবং বিবাহ করেছে বলেই কমলার প্রেমের অধিকারী। কিন্তু কমলার মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন,—তার মন বিজয় অপেক্ষা নীরদের প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট,—

এ ত পাপ নয় বিধি! পাপ কেন হবে?
পাপ করেছি বলে নীরদে আমার
ভালবাসিব না? হায় এ হৃদয় তবে
বজ্র দিয়া দিক বিধি ক'রে চুরমার।

কমলার এই মনোভাব বিজয়ের অবগত। তাই সে নীরদকে দেশত্যাগের আদেশ করেছে। দেশত্যাগে উদ্যত নীরদকে পথে দেখে কমলা তাকে দেশ-ত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করেছে, এবং বিজয়ের নিষ্ঠুরতার কথা বলেছে, এমন সময় বিজয়ের ছুরিকাঘাতে নীরদের মৃত্যু হ'ল।

শ্মশানে নীরদের চিতায় আত্মবিসর্জন করার কথা ভাবছে কমলা। কিন্তু যখন আত্মবিসর্জন করল, তখন আগুন নিভে এসেছে। তাই কমলার মৃত্যু হ'ল না, কিন্তু সে আহত হ'ল, অচৈতন্য হ'ল।

চেতনা-প্রাপ্তির পর সে ফিরে গেল হিমাদ্রির বুকে—বনপ্রকৃতির মধ্যে। চেষ্টা করেছে পুরাতন জীবনের আনন্দকে ফিরে পেতে,

তবুও যাহাতে হোক নিবাতে হইবে শোক,
তবুও মুছিতে হবে নয়নের জল,
তবুও তো আপনারে ভুলিতে হইবে হারে!
তবুও নিবাতে হবে হৃদয়-অনল!

কিন্তু সে তার মনের আনন্দ যখন কিছুতেই ফিরিয়ে আনতে পারল না, তখন তটিনী গর্ভে আত্মবিসর্জন ক'রে নীরদের ভালবাসার মূল্য দিল।[৩]

কমলার জীবনের এই বেদনাময় পরিণতিই 'বনফুল' কাব্যকাহিনীর মূল আকর্ষণ। জীবনে যেটাকে সে পরম সত্য ব'লে বিশ্বাস করেছে, লৌকিক নিয়ম তাকে মঞ্জুর করে না বলেই, সে সেই সত্যকে পরিত্যাগ করেনি। নিজের বিশ্বাসের শক্তি ও নিষ্ঠা নিয়ে সেই সত্যকেই সে জীবনে কার্যকরী করতে চেয়েছে। এতে সে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু সত্যকে পরিত্যাগ করেনি, তার প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ করে নি, বরং বিশ্বাসভঙ্গের আশংকায় নিজেকেই বিনাশ করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার ট্র্যাজেডির যে কারণ, এখানে কমলার ট্র্যাজেডিরও সেই একই কারণ—অর্থাৎ বনের সহজ সংস্কারকে নিয়মবদ্ধ লোকালয়ের জটিল জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা। বনের সংস্কার বা অভ্যাস এবং সমাজের নিয়মের মধ্যে যে অসঙ্গতি, তা কখনোই দূরীভূত হতে পারে না, এবং এই দুইয়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য বিধানও করা যায় না। কিন্তু কপালকুণ্ডলা এবং কমলা উভয়েই সেই ভ্রান্ত প্রচেষ্টায় জীবন দিয়েছে। সহজবুদ্ধির এমন করুণ পরিণাম নিঃসন্দেহে শোচনীয়, এবং সেই জন্যই ট্র্যাজিক। অবশ্য একথাও স্বীকার করতে হবে যে, বঙ্কিমের অপেক্ষাকৃত পরিণত শিল্পী মন কপালকুণ্ডলার ট্র্যাজেডিকে যত সার্থকভাবে চিত্রিত করতে পেরেছে, রবীন্দ্রনাথের অপরিণত শিল্পীমন কমলার ট্র্যাজেডিকে সেইভাবে চিত্রিত করতে পারে নি।

"বাল্মীকি-প্রতিভা" (১৮৮১) নাটকটির পরিণামে 'শোক' ভাবটি তীব্র হ'য়ে ফুটে ওঠেনি, শোক ভাবোদ্দীপক কোনো ঘটনা বা বিবরণও কবি এই নাটকে উপস্থাপিত করেন নি। সেই দিক থেকে নাটকটিকে আদৌ ট্র্যাজেডির পর্যায়ভুক্ত করা চলে না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দুঃখবোধের বিশিষ্টতা এই নাটকটির মধ্য দিয়েই সুন্দর প্রকাশ লাভ করেছে।

---

৩. "নীরদের মৃত্যুর পর কমলা লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইল ; পুরাতন অরণ্য কুটিরে ফিরিয়া গেল বটে, কিন্তু সে অরণ্যে আশ্রয় পাইল না ; শিশুকালের স্বর্গ আজ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা আজ সম্পূর্ণ মনে হইল। বনভূমির এই কঠিন নিদারুণ প্রত্যাখ্যান বেদনাকাতর কমলার পক্ষে কি সাংঘাতিক সকরুণ। বনফুলের 'ট্র্যাজেডি' এইখানে চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে।"—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী, প্রথমখণ্ড, (১৩৬৭). পৃ. ৫৬।

দুঃখের অনুভূতি বা করুণা মানুষের জীবনকে কত সুন্দর করে তুলতে পারে, দস্যুরাজ বাল্মীকির জীবনের পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রনাথ তা এই নাটকে প্রদর্শন করেছেন। নিহত ক্রৌঞ্চের জন্য ক্রৌঞ্চীর শোক দেখে নিষাদের প্রতি অভিশাপ হিসেবে বাল্মীকি যে বেদনা নিয়ে শ্লোক উচ্চারণ করলেন, সেই বেদনার ভাব ক্রমশঃ তাঁর মনে কিরূপে সৃষ্টি হচ্ছিল, রবীন্দ্রনাথ তা এই নাটকে প্রকাশ করেছেন। এ সম্পর্কে প্রথম ঘটনা দ্বিতীয় দৃশ্যে কালীপূজা। বলির উদ্দেশ্যে আনীত বালিকার কাতর ক্রন্দনে বিচলিত হলেন বাল্মীকি দস্যুরাজ। নিজের করুণায় তিনি নিজেই বিস্মিত :—

"এ কেমন হল মন আমার।
কী ভাব এ যে কিছুই বঝিতে পারিনে।
পাষাণ হৃদয়ও গলিল কেন রে,
কেন আজি আঁখিজল দেখা দিল নয়নে!
কী মায়া এ জানে গো,
পাষাণের বাঁধ এ যে টুটিল,
সব ভেসে গেল গো—সব ভেসে গেল গো—
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে।"

তৃতীয় দৃশ্যেও দস্যুরা পুনরায় বালিকাকে ধরে এনে বলি দেবার উদ্যোগ করলে দস্যুরাজ বাল্মীকি বালিকাকে করুণা-কাতর হয়ে উদ্ধার করেছেন। বলেছেন—

"নয়নে ঝরিছে বারি, এ কি মা সহিতে পারি।
কোমল কাতর তনু কাঁপিতেছে বারবার।"

চতুর্থ দৃশ্যে দেখা যায় বাল্মীকি শান্তির সন্ধান করছেন,—

"কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই—
কেন প্রাণ কেন কাঁদেরে।"

এই সব ঘটনা থেকে বোঝা যায় বাল্মীকির মনের মধ্যে একটা সমবেদনা বা করুণার ধারা প্রবাহিত হয়ে চলছিল, এবং সেইজন্যই তিনি দস্যুরাজ হয়েও সাধারণ দস্যু থেকে পৃথকভাবে পরিচিত হয়েছেন। এই করুণা-ধারাই শেষ পর্যন্ত ক্রৌঞ্চের মৃত্যুতে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাব্যে পরিণতি লাভ করেছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু এখানে করুণার উদ্বোধক দুঃখজনক ঘটনার কোনো বর্ণনা এখানে নেই, সেইজন্য এই নাটকের যে শোকভাব তা দর্শক বা

পাঠকের চিত্তে সাড়া জাগায় না। এবং সেইজন্য দর্শক বা পাঠকের চিত্তে যথোচিত পরিমাণে করুণ রসেরও সৃষ্টি হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখানে দর্শক বা পাঠকের মনে করুণ রসের উদ্বোধন ঘটাবার চেষ্টা করেন নি। তিনি দেখাতে চেয়েছেন বালিকার বেদনায় বাল্মীকির মনের মধ্যে উদ্বোধিত হয়েছে যে করুণা, তা বাল্মীকিকে কি ভাবে নবতর সত্যের সঙ্গে পরিচিত করল।

এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ যা দেখাতে চেয়েছেন, তা তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন নাটকটির ভূমিকায়,—এখান থেকেই বেদনা ও করুণা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বেদনা ও করুণা মানুষের সত্যরূপকে প্রকাশ করে,—এই কথাই তিনি বলেছেন "বাল্মীকি প্রতিভা"র ভূমিকায়, "বাল্মীকিপ্রতিভাতে দস্যুর নির্মমতাকে ভেদ করে উচ্ছ্বসিত হ'ল তার অন্তর্গূঢ় করুণা। এইটেই ছিল তার স্বাভাবিক মানবত্ব, যেটা ঢাকা পড়েছিল, অভ্যাসের কঠোরতায়। একদিন দ্বন্দ্ব ঘটল, ভিতরকার মানুষ হঠাৎ এল বাইরে। প্রকৃতির প্রতিশোধেও এই দ্বন্দ্ব। সন্ন্যাসীর মধ্যে চিরকালের যে মানুষ প্রচ্ছন্ন ছিল, তার বাঁধন ছিঁড়ল। কবির মনের মধ্যে বাজছিল মানুষের জয়গান। মায়ার খেলায় গানের ভিতর দিয়ে অল্প যে একটুখানি নাট্য দেখা দিচ্ছে, সে হচ্ছে এই যে, প্রমদা আপনার স্বভাবকেই জানতে পারেনি অহংকারে, অবশেষে ভিতর থেকে বাজল বেদনা, ভাঙল মিথ্যে অহংকার, প্রকাশ পেল সত্যকার নারী।"

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য থেকেই এই ধারণা করা যায় যে, দুঃখ ও বেদনার মধ্য দিয়ে মানুষ কষ্ট পেলেও সত্যকে পায় বেশী ক'রে। এই দুঃখ ও বেদনার মধ্য দিয়েই কবি-প্রতিভার জন্ম। "ভাষা ও ছন্দ' কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথ এই একই কথা বলেছেন, "অলৌকিক আনন্দের ভার বিধাতা যাঁহারে দেন, তাঁর বক্ষে করুণা অপার।" বাল্মীকির কবি-প্রতিভা ছিল প্রচ্ছন্ন, বেদনার অনুভূতিতেই তা হয়ে উঠল জাগ্রত। স্বভাবকে হারানোর যে শাস্তি, বেদনা এখানে বাল্মীকিকে সেই শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিল।

জীবনের একটা বড় ট্র্যাজেডিই এখানে এই স্বভাব হারানোর মূঢ়তায়, ভ্রান্ত আত্মচেতনায় এবং সেই কারণে ভুলের জন্য মনস্তাপে। স্বভাবকে ফাঁকি দেওয়ার ফাঁকি যেদিন ধরা পড়ে সেদিন বাল্মীকির মতোই আত্মা আর্তনাদ করতে থাকে—

"জীবনের কিছু হল না হায়। হল না গো হল না হায় হায়
গহনে গহনে কত আর ভ্রমিব নিরাশার এ আঁধারে?
শূন্য হৃদয় আর বহিতে যে পারিনা......"

স্বভাবকে হারিয়ে মানুষ কিছুতেই অব্যাহতি পেতে পারে না। প্রকৃতি একদিন সেই ভুল ধরিয়ে দেবেই। কিন্তু তখন হয়ত জীবনের অনেকখানি অপচয়িত হয়ে গেছে। তাই তখনকার সেই শূন্য হৃদয়ের নৈরাশ্যের চাপের চেয়ে বড় শাস্তি আর কিছুই হতে পারে না। এই ধারণাটি রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডির চরিত্র সৃষ্টিতে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছে পরবর্তীকালে।

রুদ্রচণ্ড (১৮৮১) নাটকটি স্পষ্টতঃই বিষাদান্ত। এই বিষাদ নাটকটির মূল চরিত্র রুদ্রচণ্ডের জীবনে এবং তার কন্যা অমিয়ার জীবনে।

পৃথ্বীরাজ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত রুদ্রচণ্ড পৃথ্বীরাজের প্রাণ বিনাশের জন্য সুদীর্ঘকাল যাবৎ মনে মনে গভীর আশা লালন করে আসছে। একটি ছুরিকা সে সযত্নে রক্ষা করছে এই উদ্দেশ্যে। এইটিই তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, এবং এইজন্যই সে বেঁচে আছে। সে নিজে পৃথ্বীরাজকে হত্যা করার অভিলাষ পোষণ করে ব'লে সে পৃথ্বীরাজের শত্রু মোহম্মদ ঘোরীকে পর্যন্ত সাহায্য করে না—পাছে ঘোরী কর্তৃক তার শিকার নিহত হয় এবং তার সুদীঘকালের আশা ব্যর্থ হয়ে যায়।

পৃথ্বীরাজ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হয়ে বনে বাস করছে বলে নগরের নিরাপদ ও বিলাসী মানুষদের প্রতি তার নিদারুণ ঘৃণা। তার কন্যা অমিয়ার সঙ্গে পৃথ্বীরাজের সুহৃদ চাঁদকবির ভ্রাতা-ভগিনী সম্পর্ক। কিন্তু যেহেতু চাঁদকবি পৃথ্বীরাজের সভাসদ, তাই রুদ্রচণ্ড তাকেও বধ করতে দৃঢপ্রতিজ্ঞ এবং কন্যা অমিয়া আবাব এই চাঁদ কবির সঙ্গে ভ্রাতা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছে ব'লে রুদ্রচণ্ড অমিয়ার প্রতিও অসন্তুষ্ট।

রুদ্রচণ্ডের ট্র্যাজেডি এইখানে যে, তার সযত্নলালিত আশা শেষে ব্যর্থ হয়ে গেল। মহম্মদ ঘোরী যখন পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করল, তখন রুদ্রচণ্ড শিবিরে শিবিরে পৃথ্বীরাজকে অন্বেষণ করে বেড়াতে লাগল—

"পৃথ্বীরাজ আছে কোন্ শিবিরে না জানি।
ভ্রমিতেছি তার তরে প্রভাত হইতে।
আজ তার দেখা পেলে পুরাইব সাধ।" (দৃশ্য-৯)

একদিন রুদ্রচণ্ডের বনভূমিতে শেষ পর্যন্ত চাঁদকবির সঙ্গে রুদ্রচণ্ডের

মুখোমুখি দেখা হয়েছিল। এর আগে থেকে রুদ্রচণ্ডের প্রতিজ্ঞা ছিল চাঁদকবিকে হত্যা করার। তাই তাদের এই অশুভ সাক্ষাতের সময় অমিয়া পিতার চরণে পতিত হয়ে অনেক মিনতি করেছিল চাঁদকে রক্ষা করবার জন্য। কিন্তু রুদ্রচণ্ড তাতে কর্ণপাত না করে চাঁদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং পরাজিত হয়। চাঁদ তাকে ক্ষমা করে এবং সেও পৃথ্বীরাজকে হত্যা করার ব্রত সাধনের জন্য চাঁদের কাছ থেকে প্রাণ ভিক্ষা গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না। যদিও 'শিশু' চাঁদের কাছ থেকে এইভাবে অপমানিত হওয়া তার কাছে মৃত্যুর চেয়েও শোচনীয় এবং অসহ্য, তথাপি পৃথ্বীরাজকে হত্যা করার প্রয়োজনে সে এই অপমানকে বহন করে বেঁচে থাকতে বাধ্য হয়।

তাই ঘোরীর সঙ্গে পৃথ্বীরাজের যুদ্ধের সময় সে প্রায় পাগল হয়ে ওঠে পৃথ্বীরাজকে হত্যা করার জন্য, কারণ চাদের ভিক্ষা-প্রদত্ত প্রাণ তার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। তাই দ্বাদশ দৃশ্যে রুদ্রচণ্ড পাগলের মতো বলতে থাকে,—

"এখনো তো কিছু তার পেনুনা সংবাদ
পৃথ্বীরাজ মরেছে কি রয়েছে বাঁচিয়া।
হীনপ্রাণ, কবে তোর ফুরাইবে কাজ!
ঋণ করা প্রাণ আর বহিতে পারি না,
কবে তোরে ত্যাগ ক'রে বাঁচিব আবার।"

এমন সময় দূতের কাছে সে জানল, "বন্দী পৃথ্বীরাজ আজ হত হয়েছেন।" এই কথা শুনে রুদ্রচণ্ড চমকে ওঠে—

"হত? সে কি কথা? মিথ্যা বলিস নে মূঢ়!
মরেনি সে, মরেনি, মরেনি পৃথ্বীরাজ।
এখনো আছে এ ছুরি, আছে এ হৃদয়,
বল্ তুই, এখনো সে আছে পৃথ্বীরাজ,
কোথা যাস্ বল্ তুই, এখনো সে আছে।"

কিন্তু দূত একই কথার পুনরাবৃত্তি করে যখন প্রস্থান করল, তখন রুদ্রচণ্ড ছুরি নিক্ষেপ করে বলল—

"মুহূর্তে জগৎ মোর ধ্বংস হয়ে গেল।
শূন্য হয়ে গেল মোর সমস্ত জীবন!

পৃথ্বীরাজ মরে নাই, মরেছে যে জন
সে কেবল রুদ্রচণ্ড, আর কেহ নয়।
যে দুরন্ত দৈত্য শিশু দিনরাত্রি ধরে,
হৃদয় মাঝারে আমি করিনু পালন,
তারে নিয়ে খেলা শুধু এক কাজ ছিল,
পৃথিবীতে আর কিছু ছিল না আমার,
তাহারই জীবন ছিল আমার জীবন—
এ মুহূর্তে মরে গেল সেই বৎস মোর!
তারি নাম রুদ্রচণ্ড, আমি কেহ নই।
আয় ছুরি, আয় তবে, প্রভু গেছে তোর—
এ শূন্য আসন তাঁর ভেঙ্গে ফেল তবে।
(বিঁধাইয়া বিঁধাইয়া)
ভেঙ্গে ফেল, ভেঙ্গে ফেল্ ভেঙ্গে ফেল্ তবে।"

রুদ্রচণ্ডের এই উক্তির মধ্যেই তার জীবনের ট্র্যাজেডির সামগ্রিক বিশ্লেষণ রয়েছে। সে স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর নয়। তার যে ক্ষতি করেছে, সেই পৃথ্বীরাজ সম্পর্কেই সে মূলতঃ নিষ্ঠুর—এবং সেই সূত্রে সে অমিয়া এবং চাঁদকবির প্রতিও নিষ্ঠুর। এই নিষ্ঠুরতাই ছিল তার জীবনীশক্তি। পরম মমতায় সে এই নিষ্ঠুরতাকে বজায় রেখেছে এবং তাকে পরের দ্বারা সাধিত হতে দেয় নি। রুদ্রচণ্ডের অহমিকা এবং পৌরুষও এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রাণের সে ভয় করে না। যথার্থ-ই সে বীর। তাই চাঁদকবির ভিক্ষা দেওয়া প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকতে তার পরম ঘৃণা। তাড়াতাড়ি তাই সে সম্পন্ন করতে চেয়েছিল তার উদ্দেশ্যকে, কিন্তু ঘোরী কর্তৃক পৃথ্বীরাজ নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে তার সেই অহমিকা এবং পৌরুষের উপর প্রচণ্ড আঘাত লাগে। এটা তার জীবনের তৃতীয় লাঞ্ছনা। প্রথম লাঞ্ছনা ছিল পৃথ্বীরাজ কর্তৃক রাজ্যচ্যুতি এবং দ্বিতীয় লাঞ্ছনা ছিল চাঁদ কবির নিকট প্রাণভিক্ষা। প্রথম দুটি লাঞ্ছনাই সে ভুলতে পারত যদি তৃতীয় লাঞ্ছনাটি তার জীবনে না ঘটত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা হয়নি। এই তৃতীয়টিই ছিল তার জীবনের পরিণাম নির্ণয়কারী। এটি না ঘটলে তার জীবন ব্যর্থ না হতেও পারত, কিন্তু এটি ঘটে গিয়েই তার জীবনকে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ করে দিল।

রবীন্দ্রনাথ এই চরিত্রটির এই বীরত্ব এবং আত্মসম্মানজ্ঞান ছাড়া অন্য কোনো গুণাবলীর পরিচয় দেন নি। তাই ট্র্যাজেডির চরিত্রের যে মহিমা তা রুদ্রচণ্ড সম্পর্কে সার্থকভাবে যে স্পষ্ট হয়নি,—সে কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু রুদ্রচণ্ডের আত্মসম্মান ও আপোষবিহীন মনোভাবকে যদি তার দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিচার করি, তবে তার জীবনের এই দুর্ভাগ্যজনক ব্যর্থতা, এতবড় নিষ্ফল পরিণতি, করুণ এবং ভয়াবহ-ই ঠেকে। এইজন্যই রুদ্রচণ্ডের আত্মহত্যায় একটা ট্র্যাজেডির ভাব ফুটে ওঠেই।

রুদ্রচণ্ড নাটকে ট্র্যাজেডির যে পরিকল্পনা, তাতে এই নাটকটিকে 'ট্র্যাজেডি' অব্ রিভেঞ্জ বা প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির ট্র্যাজেডি বলা যেতে পারে, কিন্তু সেটা এই ট্র্যাজেডির বাইরের দিক বা রূপগত ব্যাপার। এই ট্র্যাজেডির ভিতরের দিকে বা স্বরূপে রবীন্দ্রনাথের যে বক্তব্য, তা-ই রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা প্রসঙ্গে অধিকতর প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের সেই বক্তব্য মনে হয় এই যে, রুদ্রচণ্ডের একটা 'অহম্' তার জীবাত্মার স্বভাবকে অবদমিত রেখে সমস্ত সত্তাকে যে নিযুক্ত করেছিল একটা প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির সেবায়, এবং তারই ফলে যে সে মন থেকে স্নেহমায়া-মমতাকে মুছে ফেলে দিয়েছিল, তাতে রুদ্রচণ্ডের স্বভাব হয়েছে বঞ্চিত, নিজে হয়েছে প্রবঞ্চিত। এইভাবে স্বভাবকে বঞ্চনা করার আত্ম-প্রবঞ্চনা যখন ধরা পড়ে, তখন সেই আত্মপ্রবঞ্চনার বেদনাকে, শূন্যপ্রাণের মর্ম-জ্বালাকে মৃত্যুর শীতল স্পর্শে নির্বাপিত করা ছাড়া আর কোনো উপায়ই তার থাকে না। বিকৃতিবশে এই আত্মপ্রবঞ্চকেরা শুধু যে নিজের জীবনেই শোচনীয় পরিণতি সৃষ্টি করে তা নয়, অনেক নিরপরাধ জীবনকেও শোচনীয় পরিণতির আবর্তের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। রুদ্রচণ্ডেরও প্রতিহিংসাভিত্তিক 'অহম্' যেমন তার নিজের জীবনকে ব্যর্থ করেছে, তেমনি ব্যর্থ করেছে কন্যা অমিয়া-র জীবনকেও। রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার গভীরতাই এইখানে।

অল্পবয়সেই রবীন্দ্রনাথের কবিচৈতন্যে গভীর ট্র্যাজেডির ধারণা স্পষ্ট আকার নিতে সুরু করেছিল। এর উৎস তিনি যেখানে থেকেই পেয়ে থাকুন (এর আগেই তিনি শেক্সপীয়র পড়েছেন), 'বনফুলে'র কবি জীবনের স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে জীবন-রহস্যের গভীরে যে সাহসিকতার সঙ্গে প্রবেশ করেছিলেন, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। প্রথম থেকেই কবির সুর উঁচু পর্দায় বাঁধা—কবির দৃষ্টি জীবনের বাইরের দিকে নয়, ভিতরের দিকে,- অর্থাৎ আত্মার ট্র্যাজেডির কেন্দ্রে নিবদ্ধ।

এই নাটকে রুদ্রচণ্ডের কন্যা অমিয়ার ট্র্যাজেডি কিন্তু ভালোভাবে ফোটে নি, অনেকটা অতি নাটকীয় হয়ে উঠেছে। তার অভিমান ছিল এই যে, যুদ্ধ যাত্রার সময় চাঁদকবি তার সঙ্গে দুটো কথা বলে যেতে পারেনি। এই অভিমানেই সে কাতর—"প্রাণের বন্ধন বুঝি ছিঁড়ে গেল সব।" মৃত্যুর সময়ও সে চাঁদকবির কাছে সেই অভিযোগ জানিয়ে গেল—

"ত্বরা করে বল চাঁদ সময় যে নাই,—
একবার দাঁড়ালে না চলে গেলে ভাই ?"

চাঁদের জবাব দেবার আগেই অমিয়ার মৃত্যু হয়েছে। অভিমান-ক্ষুণ্ণ মৃত্যুটি করুণ, কিন্তু এর সঙ্গে একটা অতিনাটকীয় ভাবও যুক্ত রয়েছে।[৪]

রবীন্দ্র সমালোচক টম্‌সন বলেছেন, অল্পবয়স্ক কবিদের সাধারণ-ধর্ম অনুসারেই এই বয়সটাতে রবীন্দ্রনাথের তরুণ কবিচিত্ত বিষাদ-ভারাক্রান্ত ছিল, তাঁর জীবনবোধ হয়ে উঠেছিল বিষণ্ণ এবং তাঁর এই বিষণ্ণ জীবনবোধের একটা সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায় "ভগ্নহৃদয়" (১৮৮১-৮২) নামক নাট্যকাব্যে।[৫]

রবীন্দ্রনাথের অষ্টাদশ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডে 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যটির পত্তন হয়। পরে দেশে ফিরে আসার পর কাব্যটি সমাপ্ত হয়। গ্রন্থখানির নাম শুনেই বোঝা যায় যে, এর কাহিনী বেদনা ভারাক্রান্ত। বস্তুতঃ এর মধ্যে দু'টি প্রেমের কাহিনী রয়েছে,—অনিল-ললিতার এবং কবি-মুরলার। প্রথম কাহিনীটির সুরু হয়েছে মিলনের মধ্যদিয়ে, কিন্তু একটু পরেই হয়ে উঠেছে বিষাদাত্মক, এবং মনে হয়েছে যেন এ বিষাদের শেষ নেই। প্রকৃত পক্ষেও ললিতা কোনদিন অনিলের 'মন' পেল না, এবং এই ভগ্নহৃদয় নিয়েই সে চূড়ান্ত হতাশায় মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছে। দ্বিতীয় কাহিনীতে মুরলা আশৈশব কবিকে তার সব কিছু সমর্পণ করে ধন্য হতে চেয়েছে, কিন্তু তার প্রণয় কোন দিন বুঝে উঠতে পারে নি। তাদের মধ্যকার যে বন্ধুত্ব—তা থেকে আরো

---

৪. হয়তো এই কারণেই টম্‌সন সাহেব অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ-এর উদ্ধৃতি প্রয়োগ করে এই নাটকটিকে 'মেলোড্রামা' নামে অভিহিত করেছেন।—দ্রঃ Rabindranath Tagore—His Life and Work : E. J. Thompson, Y.M.C.A (1961), p. 10.

৫. 'Young poets revel in gloom, and in these years young Rabindranath took the mournful view of life which is usual at such an age. .....This poetic gloom is summed and massed in Bhagna Hridaya.''...—Rabindranath Tagore : His Life and Work, (1961), p. 10.

গভীর প্রণয়ী-প্রণয়িনী সম্পর্কের মধ্যে যাওয়ার কথা কবি কোনদিন চিন্তা করে উঠতে পারে নি। এই কারণে মুরলার প্রণয়-ভার-নত চিত্ত দুঃখে হতাশায় শুধু অশ্রুবর্ষণ করেছে। যদিও একেবারে শেষে তাদের দুজনের মধ্যে মিলন হয়েছে, কিন্তু তা যেন বিয়োগের ব্যথাকেই আরো স্পষ্ট করে তোলে। মুরলার মৃত্যুশয্যায় তার সঙ্গে কবির মিলন হয়েছে।

কবি-মুরলার কাহিনীর সুরুতেই দেখি, মুরলা সখী চপলার প্রশ্নের জবাবে কবির প্রতি তার প্রণয়কে প্রকাশ করেছে। মুরলার শিশুকালের বন্ধু কবি মুরলাকে বিষণ্ন দেখে জিজ্ঞাসা করেছে—

"হয়ত হৃদয়ে তব কিসের যাতনা
আপনি মুরলা তাহা জানিতে পারনা!
হয়তো গো যৌবনের বসন্ত সমীরে
মানস কুসুম তব ফুটেছে সুধীরে,
প্রণয় বারির তরে তৃষ্ণায় আকুল
ম্রিয়মাণ হয়ে বুঝি পোড়েছে সে ফুল!
পেয়েছ কি যুবা কোন মনের মতন?
ভালোবাসো, ভালোবাসা করহ গ্রহণ—
তাহলে হৃদয় তব পাইবে জীবন নব,
উচ্ছাসে উচ্ছাসময় হেরিবে ভুবন।"

কবির এই কথার উত্তরে যদি মুরলা সরাসরি উত্তর দেয়, তবে হয়তো তার জীবনের বিষণ্নতার ভার কমতেও পারে। কিন্তু মুরলার জীবনের দুর্বলতা বা সবচেয়ে কোমল সৌন্দর্য হচ্ছে তার লজ্জাশীলতা। কথায় তো নয়ই, এমনকি হাব-ভাবেও সে তার প্রেমের কথা কবিকে বোঝাতে পারে না। তাই সে কবির ঐ কথার জবাব দিতে পারল না, শুধু স্বগতঃ চিন্তা করল—

"বুঝিলে না বুঝিলে না কবি গো, এখনো
বুঝিলেনা এ প্রাণের কথা!
দেবতা গো বল দাও এ হৃদয়ে বল দাও,
পারি যেন লুকাতে এ ব্যথা।"

কবি প্রায়ই তার প্রাণের শূন্যতা, প্রেমের জন্য আকুলতা মুরলার কাছে প্রকাশ করেছে, কিন্তু কখনোই মুরলা এ ব্যাপারে নিজের প্রস্তুতির কথা কবিকে

প্রকাশ্যে জানাতে পারে নি। প্রত্যেক বারই সে শুধু স্বগতঃ চিন্তা করে এ ব্যাপারে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেছে।

মুরলার ভ্রাতা অনিল বোধ হয় কবির হৃদয়ধর্ম এবং স্বভাবধর্ম সম্পর্কে সচেতন ছিল। তাই সে যখন জানল যে ভগিনী মুরলা ঐ কবির কাছেই নিবেদিত-প্রাণা, তখন সে ঠিকই বলেছিল—

"সেই এক মোহময় স্বপ্নময় কবি—
সদা যে বিহ্বল প্রাণে চাহিয়া আকাশ পানে,
আঁখি যার অনিবিষ আকাশের প্রায়,
মাটিতে চরণ তবু মাটিতে না চায়—
ভাবের আলোকে অন্ধ তারি পদতলে
অভাগিনী লুটাইয়া পড়িলি কি বোলে?
সে কিরে অবোধ মেয়ে বারেক দেখিবে চেয়ে?
জানিতেও পারিবে না, যাইবে সে চলে
যূথিকা-হৃদয় তোর ধূলি সাথে দ'লে।"

অনিল কর্তৃক কবির প্রতি এই মৃদু কটাক্ষ এবং মুরলার প্রতি মৃদু তিরস্কারের জবাবে মুরলার কিছুই বলার নেই। কবি যদি তার অতলস্পর্শী গভীর প্রণয় না জানতে পারে তাহ'লেও সে নিরুপায়। কবির প্রতি তার দেবতা-লভ্য শ্রদ্ধা, আর তার প্রেম একটা মানুষী ব্যাপার। সুতরাং এই দুই বিপরীতের মধ্যে সামঞ্জস্য কি করে টানা যায়?—এইখানেই মুরলার মূল দ্বন্দ্ব —এই দ্বন্দ্বের আবর্তেই তার প্রেমিকা জীবন নিপীড়িত। সে বলে,—

"কোথা কবি, কোথা আমি! সে যে গো দেবতা—
তারে কি কহিতে পারি প্রণয়ের কথা?
কবি যদি ভুলে কভু মোরে ভালোবাসে
তা হ'লে যে মরে যাব সঙ্কোচে উল্লাসে।"

অর্থাৎ সে নিরুপায়। কবির প্রেম না পেলেও, এবং সেইজন্য তার বেদনা থাকলেও ক্ষোভ নেই। তাই সে অনিলকে বলে,—

"যদি গো কবির পরে রোষ করে থাক
মোর কাছে কভু আর কোরো নাক নাম তাঁর—
সে নাম ঘৃণার স্বরে কভু সহিব না!
জানালেম এই মোর প্রাণের প্রার্থনা।"

অনিল ভগিনীর প্রেমের সত্যতার পরিচয় পায়, এবং সে কথা অবিলম্বে কবিকে জানাতে চলে। মুরলার এই যে আত্মপ্রকাশে-সতত-ব্যগ্র অথচ অত্যন্ত লজ্জাশীল মনোভাব,—এই দ্বন্দ্বই তার জীবন-বেদনার, এ-ক্ষেত্রে ট্র্যাজেডির কারণ।

চতুর্থ সর্গটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কবির কণ্ঠে গীত একটি সুদীর্ঘ সঙ্গীত। এই সঙ্গীতের মধ্যদিয়েই কবি বুঝিয়েছেন যে, তিনি সকলের সখী চপল স্বভাবা নলিনীর প্রেমাসক্ত।

ষষ্ঠ সর্গে কবি মুরলাকে প্রাণের একটি গোপন কথা প্রকাশ করবার বাসনা প্রকাশ করেছেন। মুরলা স্বভাবতঃই উন্মুখ হয়েছে জানতে, কী কথা? কবি বললেন, তিনি ভালোবাসেন, "মধুরনলিনী সম নলিনী বালারে।" মুরলা এতটা কখনো আশঙ্কা করে নি। তার ধারণা ছিল, কবি তার প্রেম সম্পর্কে অসচেতন, কিন্তু কবি যে প্রকৃতপক্ষে অন্যের প্রণয়াসক্ত, এ সংবাদ তার কাছে বজ্রাঘাতের সমান। তাই কবির কাছে এ দুসংবাদ শুনে সে স্বগতঃ কেঁদে উঠেছে,—

"দেবী গো করুণাময়ী,
কোথা পাই ঠাঁই মাগো—কোথা গিয়ে কাঁদি!
দুর্বল এ মন দে মা পাষাণেতে বাঁধি।"

কিন্তু প্রকাশ্যে সে কবির কাছে লজ্জায় মনের এ দুর্বলতা প্রকাশ করতে পারল না। পরন্তু বলল—

"আহা, কবি, তাই হোক্—সুখে তুমি থাক।
এ নব প্রণয়ে মন পূর্ণ করে রাখ।"

এখানেই শেষ নয়। আরো মর্মান্তিক মুহূর্ত মুরলার জীবনে এসেছে। নলিনীকে দেখে প্রণয়াসক্ত কবি ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। তিনি মুরলার কাছেই তাঁর এই মনোভাবের সমর্থন চাইছেন—নলিনীর রূপের প্রশংসা চাইছেন। কবির মনকে কোনোভাবেই আঘাত দিতে চায় না বলে মুরলাকে বিদীর্ণ হৃদয় নিয়েও নলিনীর রূপের প্রশংসা করতে হয়—

"এমন সুন্দরী আহা কভু দেখি নাই—
কবির প্রেমের যোগ্য আর কিবা চাই!
কবিতার উৎস সম ও নয়ন হতে
ঝরিবে কবিতা তব হৃদে শত শত।"

কিন্তু একথা বলতে গিয়ে বেদনায় মুরলার বুক প্রায় ফেটে যায়। স্বগতঃ প্রশ্ন করে নিজেকে "কেন এত ফাটে বুক? কিসের যন্ত্রণা মর্ম করিছে দংশন?"—এ প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই, যেমন উত্তর নেই জীবনের যে কোনো অনুচিত বা অন্যথা বেদনার কারণ কি, সেই প্রশ্নের। তাই এই প্রশ্নটাই এখানে জীবনের ট্র্যাজিক পরিণতির ইঙ্গিতবহ।

অষ্টম সর্গে চপলার সঙ্গে কথোপকথন উপলক্ষ্যে মুরলার এই হৃদয়বেদনা পুরোপুরি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সর্বত্রই তার একটি সঙ্কুচিত ভাব—পরাজিতের মনোভাব—অতি বিনীতা মূর্তি। তার মধ্যে কোথাও হিংসা-বিদ্বেষ নেই নলিনীর প্রতি—কবির প্রতিও নেই অভিমান। সে দীন মনে স্বীকার করে, কবি যদি নলিনীকে ভালোবেসে সুখী হন, তবে তো তিনি নলিনীকে ভালোবাসবেনই।

দশম সর্গে মুরলা যখন জীবনের ব্যর্থতাকে আবিষ্কার করছে, অপূর্ণ-আশার বেদনা-লাঞ্ছিত জীবনের অনাবশ্যকতার জ্বালা যখন তীব্রভাবে অনুভব করছে—

> "যার কোনো রূপ নাই, যার কোনো গুণ নাই,
> তবুও যে হতভাগ্য ভালবাসে মনে,
> দুইদিন বেঁচে থাকে, কেহ নাহি জানে তাকে,
> ভালবাসে, দুঃখ সহে, মরে গো বিজনে—"

তখন কবি পুলকিত চিত্তে তার কাছে এসে সংবাদ দিলেন, জ্যোৎস্নায় ডুবানো প্রকৃতির মধ্যে নলিনীর মন মাতানো কণ্ঠের গান তাঁর চিত্তকে কী গভীরভাবেই না আলোড়িত করেছে। তিনি নলিনীর গানের প্রতিটি কথাই গেঁথে রেখেছেন একটি একটি করে। মনের উচ্ছ্বাসে নলিনীর গাওয়া গান তিনি মুরলাকেও শোনালেন।

মুরলার প্রণয় সম্পর্কে নিঃসাড় কবি এইভাবে প্রায়ই মুরলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এবং মুরলার জীবনের বিষাদকে বাড়িয়ে তোলেন। কবির এই ব্যবহার মুরলার জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সে এখন নিজেকে নিঃশেষিত কল্পনা করে। বলে—

> "ওঠ্ লো মুরলা, ওঠ, দিন হল শেষ,
> পর্ লো মুরলা পর্ সন্ন্যাসিনী বেশ।

মুরলা ? মুরলা কোথা ? গেছে সে মরিয়া—
সেই যে দুখিনী ছিল বিষণ্ন মলিন,
সেই যে ভালবাসিত হৃদয় ভরিয়া,
সেই যে কাঁদিত বনে, আসি প্রতিদিন,
সে বালা মরিয়া গেছে, কোথায় সে আর ?"

কিন্তু কবি প্রকৃত পক্ষে চপল স্বভাবা নলিনীর প্রতি মোহগ্রস্ত। যে প্রেমের আস্বাদ তিনি অসচেতন মনে মুরলার কাছে পেয়ে থাকেন, সে প্রেম নলিনীর মধ্যে বস্তুতঃই নেই। তাই যদিও তিনি মনে করেন তিনি সব পেয়েছেন, সুতরাং খুশি এবং তৃপ্ত, তথাপি তাঁর অন্তরাত্মা যেন সে কথা মানে না। মনের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব যখন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তখন তিনি প্রসঙ্গক্রমে মুরলাকে বলেন,—

"কেহ যেন নাই মোর, রবে নাকো কেহ—
ধরায় নাইক যেন বিশ্রামের গেহ।
কিছুই হারাইনি তবু, খুঁজিয়া বেড়াই,
কিছুই চাইনা তবু কি যেন কি চাই।"

মনের এই অন্তর্দাহ নিয়েই বোধহয় কবি বারবার মুরলার কাছে আসেন, আবার অতৃপ্ত বাসনা নিয়েই মোহময়ী নলিনীর কাছে ফিরে যান। তিনি না চেনেন নিজেকে, না বোঝেন মুরলাকে।

মুরলা কবির এই অন্তর্দাহকে বুঝতে পারে, কিন্তু তা নিবারণের জন্য যা করা দরকার, তা হচ্ছে নিজেকে কবির কাছে আত্মপ্রকাশ করা। কিন্তু তাতে সে বড় ছোট হয়ে যায় কবির কাছে। তাই কবির এই অন্তর্দাহ দেখে তাঁকে সহানুভূতি দেখা, বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ে, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না,—কবিও এ সোহাগ, এ কান্নার অর্থ কিছু বুঝতে পারেন না।

মুরলা তার এই প্রণয়-বিড়ম্বিত জীবনকে নিঃশেষ করে ফেলতে পারলেই যেন বাঁচে। পঞ্চদশ সর্গে কবির সমস্ত সুখ প্রার্থনা করার পর সে মনের এই ইচ্ছাকে প্রকাশ করেছে।

সপ্তদশ সর্গে প্রান্তরের মধ্যে সন্ন্যাসিনী বেশে মুরলার চিত্ত-ভাবনাটি অত্যন্ত করুণ। তার জীবনে একটি জগৎ ভেঙ্গে গেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে জগৎ তার জন্য সৃষ্ট নয়, ভুলক্রমে যেন সে সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিল.

চেয়েছিল আদর, ভালবাসা। তাই যথারীতি সে বিড়ম্বিত হয়েছে। আজ সে প্রবেশ করতে চলেছে আর একটি জগতে, নিষ্করুণ নৈরাশ্যের জগতে, পদে পদে তার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা-প্রসূত সকরুণ সতর্কতা—

"তোর নিজ দেশে এসেছিস এবে,
কেহ নাই তোরে কহিতে কথা—
আদর কাহারো পাসনে কখনো,
আদর কাহারো চাসনে হেথা।
এখনো তো এই নূতন জীবনে
সুখ দুখ কিছু ঘটেনি তোর—
দিবসের পরে আসিছে দিবস,
রজনীর পরে রজনী ভোর।
দিবস রজনী নীরব চরণে
যেমন যেতেছে তেমনি যাক—
কাঁদিস নে তুই, হাসিস নে তুই,
যেমন আছিস তেমনি থাক্!"

সার্থকতা-ব্যর্থতা, পাওয়া-না পাওয়া—সবকিছুর অতীত এক অতিক্রান্তিক পর্বের ঔদাসীন্যের স্তরে মুরলা এখন বিরাজ করছে।

মুরলার বিহনে সকলেই কাতর। কাতর সবচেয়ে বেশী কবি। কিন্তু মুরলা ততক্ষণে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। মৃত্যু যদি খুব যন্ত্রণাময় হয়, তবে তার এই জীবনটাই ছিল তার কাছে সবচেয়ে কঠিন মৃত্যু। মৃত্যু-মুখে পতিত হলে এই জীবনের মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে সে রেহাই পায়। তাই এখন নিজেকে সম্বোধন করে সে বলছে,—

"এ সংসারে কেহ যদি তোরে ভালবাসে
সে কেবল ঐ মৃত্যু—ওই রে আকাশে!
... ...
হে মরণ! প্রিয়তম—স্বামী গো, জীবন মম,
কবে আমাদের সেই সম্মিলন হবে?
জীবনের মৃত্যুশয্যা তেয়াগিব কবে?"

এতদিনে অনিল কবির কাছে কবির প্রতি মুরলার সুগভীর প্রেমের কথা জানিয়েছে। মুরলার দেশত্যাগে কবিই সবচেয়ে শোকার্ত ছিলেন। অনিলের

সংবাদ এই বার সেই শোককে অর্থময় করে তুলল। মুরলার সান্নিধ্যে যে প্রেমকে তিনি চিনতে পারেন নি, মুরলার বিহনে এবং অনিলের সংবাদে তা তাঁকে অস্থির করে তুলল। পর্ণশয্যায় শায়িতা মুমূর্ষু মুরলার কাছে এখন তিনি ধরা দিলেন—

"এতদিনে এত কাছে ছিনু এক ঠাঁই,
মিলনের অবসর মোরা পাই নাই।
কে জানিত ভাগ্যে, সখি, ঘটিবে এমন
মরণের উপকূলে হইবে মিলন।"

এই মিলনে মুরলার প্রতি কবির সত্যনিষ্ঠার পরিচয় আছে ঠিকই। কিন্তু মুরলার কাছে এসে এখন এর বাস্তব মূল্য কতটুকু? যে জীবন পুষ্পময় স্থলভূমি, সেই জীবনকে দুঃখের সমুদ্র হিসেবে পেয়ে, তাকে অতিক্রম করে সে আজ মৃত্যুর উপকূলে এসে পরিত্রাণ পেতে চাইছে। সুতরাং জীবনের ভালমন্দ, সুখ-দুঃখ—এ সবের প্রতি তার কোনো গরজ এখন আর নেই। সুতরাং তার দিক থেকে এই মিলনের কোনো অর্থ আর অবশিষ্ট নেই। কিন্তু কবিকে সে যথার্থই ভালোবাসে এবং কবির মনোবাসনা পূরণের জন্যই যেন তার এই শ্রেষ্ঠ প্রয়াস, এবং তার মধ্যেই তার জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ। তাই সে এই আনন্দ-ঘন মুহূর্তটিকে অমর করে রাখতে চায়—

কি যে সুখ পেতেছি তা বলিব কি ক'রে—
বল সখা, এখনি কি যাব আমি ম'রে?

মৃত্যুর মুহূর্তেও যে এই মৃত্যুকে বিলম্বিত করার আগ্রহ—এইটিই সবচেয়ে ট্র্যাজিক। যতদিন জীবনের কোনো অর্থ সে খুঁজে পায়নি, ততদিন জীবনের প্রতি কোনো মায়া তার ছিল না। কিন্তু আজ প্রণয়ীকে সে জানাতে পেরেছে তার প্রণয় এবং প্রণয়ী দিয়েছে তার স্বীকৃতি। সুতরাং এই মুহূর্তটি মৃত্যুর হলেও, এই মুহূর্তেই সে নিরর্থক হিসেবে বিবেচিত জীবনের আকাঙ্ক্ষিত অর্থটিকে খুঁজে পেয়েছে। কাজেই এখন জীবনকে সে দীর্ঘায়িত করতে চাইবেই। কিন্তু বাস্তব তাকে তা মঞ্জুর করছে না,—এইখানেই এর ট্র্যাজেডি। একটা পেয়ে আরেকটা না পাওয়ায়, একটা পাওয়াও অর্থহীন হয়ে উঠছে।

কবি-মুরলার কাহিনীতে ট্র্যাজেডি কেবল মুরলার নয়, ট্র্যাজেডি কবিরও, এবং সেই ট্র্যাজেডি রুদ্রচণ্ডের ট্র্যাজেডির মতোই,—স্বভাবকে চিনতে না পারার যে ভুল, সেই ভুল ভেঙ্গে যাবার পর শূন্য জীবনের ট্র্যাজেডি। স্বভাবকে

চিনতে পারলে যে জীবন হত সার্থক, স্বভাবকে চিনতে না পারায় সেই জীবন হল ব্যর্থ এবং এই ব্যর্থতা স্পষ্ট হ'ল যখন স্বভাবকে চিনতে না পারার ভুল ভাঙল। এ ভুল এমন ভুল, যার কোনো নিরাময় নেই, এবং সে ভুল ভেঙে যাবার পরও জীবনের ক্ষতির কোনো অবসান হয় না, আর সেইখানেই এই ভুলের ট্র্যাজেডির গভীরতা।[৬] রবীন্দ্রনাথ অল্পবয়সেই এই ট্র্যাজেডি-চেতনার পরিচয় দিয়ে গেছেন তাঁর এই কাহিনীটিতে।

অনিল ও ললিতার কাহিনীটির সূত্রপাত মিলনের মধ্যদিয়ে, কিন্তু অচিরেই সে মিলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। মুরলার মত ললিতাও লজ্জাশীলা, মনের কথা গুছিয়ে প্রকাশ করতে অক্ষম। তার এই লজ্জাই চঞ্চল-স্বভাব অনিলের কাছে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। সেও ক্রমশঃ আত্মপ্রতিষ্ঠালিপ্সু চপল-স্বভাবা নলিনীর প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং ললিতা তার বিড়ম্বিত প্রেম নিয়ে ক্রমশঃ অনিলের কাছ থেকে দূরে সরে যায়, মিলন আর সম্ভব হয় না—ট্র্যাজেডির সম্ভাবনা অনিবার্য হয়ে ওঠে তার জীবনে।

পঞ্চম সর্গে দেখি অনিল ললিতার সলজ্জ, নির্বাক অবস্থাকে পরিত্যাগ করতে বলছে। সে বলে, কথা না বললে, তার প্রতি ললিতার ভালোবাসা নেই একথাই সে বুঝবে। ললিতা এর পরও প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারে না, কেবল অসহায়ের মতো নিজের মনের মধ্যে চিন্তা করে—

> "কি কহিব কথা কহিতে না জানি!
> বুদ্ধি নাই ক্ষুদ্র নারী ফুটে নাকো বাণী।
> মনে কত ভাব যুঝে, হৃদয় নিজে না বুঝে,
> প্রকাশ করিতে গিয়া কথা না যোগায়।"

সে বস্তুতঃ আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, তার মনের এই লজ্জা দূর করতে। সে অনিলকে যতটা ভালোবাসে, তার ব্যবহারের মধ্যদিয়ে সে ততটাই

---

৬. অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয় কবি-র ট্র্যাজেডি সম্পর্কে বলেছেন, কবি-র মধ্যে "যেন দুটি সত্তা বাস করিতেছে; তাহার কবিসত্তা, যাহা আর দশজন হইতে স্বতন্ত্র; আবার তাহার মানবসত্তা, যাহা আর দশজনের অনুরূপ। এই দুই পরস্পর বিরোধী সত্তার মধ্যে কবি কিছুতেই মিলন ঘটাইতে পারিতেছেন না—ইহাই তাহার ট্র্যাজেডি।"

—বিশ্বভারতী পত্রিকা, দ্বিতীয়বর্ষ, চতুর্থসংখ্যা, পৃ. ৪০২।

প্রকাশ করতে চেয়েছে এবং সেই উদ্দেশ্যে দুর্বার আত্মসংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে, কিন্তু পারেনি। অনিল তাকে যেমন চঞ্চল, বাক্‌পটু হিসেবে পেতে প্রত্যাশা করেছে, সে তেমন হয়ে উঠতে পারেনি।

কিন্তু অনিলের তৃপ্তিসাধনে ললিতার এই ব্যর্থতা তাকে এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল। অনিল নিজের মনে প্রশ্ন তুলল, এই নিষ্ফল প্রেম-মিলনের কিছু আবশ্যকতা আছে কিনা—কতদিন এই অনাবশ্যক বোঝা টানা যায়? একাদশ সর্গে সে ললিতার সম্মুখেই বলেছে,—

অনিল, কি করিবি রে লয়ে হেন মন?
তুই চাস মুখে তোর হেরিলে বিষাদ ঘোর
অশ্রুজলে অশ্রুজল করিবে বর্ষণ!
কতনা আদরে তোর মুছাবে নয়ন!
তুই কি চাসরে হেন পাষাণ মুরাত
দূরে দাঁড়াইয়া রবে—একটি কথা না কবে,
সান্ত্বনার তরে যবে তুই ব্যগ্র অতি?

এই দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে অনিল অকস্মাৎ ললিতার সম্মুখ হতে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। কিন্তু ললিতা নিজের কোনো অপরাধ খুঁজে পায় না। সেও তো প্রণয়-ভিখারিণী। অনিলের কাছ থেকে অযাচিত সোহাগ-যত্ন সেও প্রত্যাশা করে, কিন্তু পায় না। তাই অনিলের এই ব্যবহারে সে মর্মাহত হয়ে বলে,—

"গেলে তবে গেলে চলি নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর—
ললিতা যে একধারে দাঁড়ায়ে রয়েছে হা রে
একটু আদর তরে হয়ে তৃষাতুর!
কখন্ ডাকিবে ব'লে আছে মুখ চেয়ে,
একটু ইঙ্গিতে পায়ে পড়িত গো ধেয়ে—
দেখেও দেখেও তারে গেলে গো চলিয়া?
একবার ডাকিলে না ললিতা বলিয়া?"

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে উভয়েরই অভিযোগ এক, দুঃখও দু'জনের এক। তবে অনিলের চিত্ত একটু অগভীর বলে তার দুঃখ ও

হতাশার প্রকাশ অত্যধিক এবং এ ব্যাপারে ললিতার প্রতি তার নিজের কর্তব্য সম্পর্কে চেতনাশূন্য। আর ললিতার চিত্ত সুগভীর, তাই তার চিত্তের বেদনার প্রগল্‌ভ প্রকাশ নেই এবং অনিলের মানসিক তৃপ্তি বিধানে সে সমর্থ হতে পারছে না ব'লে আত্মগ্লানিতে জর্জরিত। এই পার্থক্যের জন্যই অনিলের বেদনা সকলের সহানুভূতি আকৃষ্ট করে না, আর ললিতার দুঃখ ও যন্ত্রণা সকলের সহানুভূতিগম্য হয়ে ট্র্যাজেডির উপকরণ হয়ে ওঠে।

লঘু-চিত্ত অনিল এর পরেই মোহময়ী, চপল-স্বভাবা, প্রগল্‌ভ সৌন্দর্যের অধিকারিণী নলিনীর প্রতি মুগ্ধ হয়ে উঠেছে—

নলিনীর মুখপানে যতই চাহিয়া থাকি
নূতন নূতন শোভা দেখিতে পায় যে আঁখি।
কিন্তু ললিতার মুখ কখনো এমন নয়।
এত সে কয়না কথা, এত ভাব নাই সেথা,
নহে গো এমনতর অধীর মাধুর্যময়!
নাই বা এমন হ'ল তাহাতে কি আছে হানি?
... ...
না হয় দেখিতে ভাল নলিনীর মুখখানি!
তবু ললিতারে মোর ভাল আমি বাসি ত' রে!
তবুও সৌন্দর্য তার এ হৃদি রয়েছে ভরে
... ...
ললিতা নলিনী কাছে না হয় রূপেতে হারে—
ভালবাসি—ভালবাসি—তবু আমি ললিতারে!

এখানে অনিল যদিও ললিতার প্রতি ভালোবাসার কথাই শেষ পর্যন্ত বলছে, তবু বোঝা যায়, এটা তার জোর করে বলা। যে কারণগুলির ওপর নির্ভর করে তার ভালোবাসা, সেই কারণগুলি সে খুঁজে পেয়েছে নলিনীর মধ্যেই। আর যে কারণগুলি শাশ্বতকালের নরনারীর প্রেমের মূল ভিত্তিরূপে প্রমাণিত হয়ে আসছে, যেগুলি ললিতাকে যথার্থ সুন্দর করে তুলেছে, অনিলের স্থূল দৃষ্টিভঙ্গি ললিতার মধ্যে সেগুলির পরিচয় নিতে পারে নি। তাই এখানে যদিও সে ললিতাকে ভালোবাসার কথাই বলছে, তথাপি এর মধ্যদিয়েই স্পষ্ট হয়ে উঠছে নলিনীর প্রতি তার আসক্তি।

ললিতা কিছুদিনের মধ্যেই আবিষ্কার করল (ষোড়শসর্গে):—

"কে জানে নাথের কেন হ'ল গো এমন ?
জানিনা কি ভাবিবারে যান বিপাশার ধারে,
ললিতার চেয়ে ভাল বাসেন বিজন।"

সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে জটিল হয়ে ওঠে। অনিল তাকে প্রকাশ্যে কখনোই প্রত্যাখ্যান করে না, বরং প্রেমের পোষাকী রীতিতেই সে সর্বদা ললিতার সঙ্গে ব্যবহার করে। কিন্তু তথাপি অনিলের এই শুষ্ক আচরণ ললিতার মনে নানাবিধ সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। অষ্টাদশ সর্গে সে অত্যন্ত দীন-ভাবে তার মনের অত্যন্ত ক্ষুদ্র আশাটির কথা একবার স্মরণ করেছে—

সখা, আমি অভিমান কভু করি নাই—
মনে করিতেও তাহা লাজে মরে যাই।
ধীরে ধীরে এসে কাছে মনে মনে হাস পাছে—
"দুখিনী ললিতা সেও অভিমান করিয়াছে।"
তাই অভিমান কভু মনেও না ভায়,
অশ্রুজল হেরে পাছে হাসি তব পায়—
কেঁদে গিয়ে ভিক্ষা করি করিয়া বিনয়,
"সর্বস্ব দিয়েছি ওগো—পরাণ হৃদয়—
হৃদয় দিয়েছি ব'লে হৃদয় চাহিনা ভুলে—
একটু ভালবাসিও, আর কিছু নয়।"

এই দীন আশাটিও তার চরিতার্থ না হওয়ায়, বরং অনিলের কাছে করুণার পাত্রী হয়ে ওঠায় সে এখন এই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিবাগিনী হয়ে উঠেছে—

"তবে নে মা, কোলে নে মা; কোথাও আশ্রয় দে মা—
একটু স্নেহের ঠাঁই দেখা মা আমায় !"

ঊনবিংশ সর্গটি বিশেষভাবেই জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ। অনিল নিজের মনের অশান্তিতে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। সে নিজেকে ভাগ্য বিড়ম্বিত ব্যর্থ জীবনের বাহক হিসেবে বিবেচনা করছে। সে চূড়ান্তভাবেই বিশ্বাস করেছে যে সে ললিতার ভালবাসা পেলনা, আবার আজকে একথাও বুঝেছে যে নলিনী তাকে প্রকৃতই ঘৃণা করে। এদিকে ললিতাও ধরে নিয়েছে যে, তার প্রতি অনিলের স্বতঃস্ফূর্ত প্রণয় নেই, অনিল তাকে নিতান্তই করুণা করে,

উপহাস করে প্রণয়ের ভঙ্গি দিয়ে। এই বিশ্বাস এবং অন্তর্জ্বালা লাজময়ী ললিতাকে অকস্মাৎ মুখরা করে তুলেছে। তাই আত্মযন্ত্রণা-কাতর অনিল যখন অনুরোধ করে,—

"ললিতারে, মৌন হয়ে থাকিস নে আর !
একবার দয়া করে কর তিরস্কার !
সন্ধ্যা হয়ে আসিয়াছে গেল দিনমান—
একটি রাখিবি কথা ? গাহিবি কি গান ?"

তখন ললিতা অপ্রত্যাশিতভাবে বলে ওঠে,—

"বুঝেছি বুঝেছি সখা ভেঙ্গেছে প্রণয়,
ও মিছা আদর তবে না করিলে নয় ?
ও শুধু বাড়ায় ব্যথা—সে সব পুরানো কথা
মনে করে দেয় শুধু, ভাঙ্গে এ হৃদয়।
... ...
আর কারে ভালবেসে সুখী যদি হও শেষে
তাই ভালবাসো নাথ, না করি বারণ।"

ললিতার এই কথা শুনে অনিল হতচকিত হয়ে ওঠে। কারণ, ললিতা যেমন চায়, সে ঠিক তেমনভাবে ললিতাকে ভালোবাসতে না পারলেও, সে মনে করে যে, তার মনের কম্পাস সততই ললিতামুখী হয়ে থাকে। তাই ললিতার মনে এই প্রকাশ্য তিরস্কারে সে অবশ্যই আহত হয়। সে চিন্তা করে, ললিতার এমন সন্দেহ করার কারণ কি ? যেহেতু—(তার নিজের ভাষায়),—

"করেছি ত' আমার যা ছিল করিবার,
সহিতে হয়নি কভু অনাদর তার !
তবু সে কি করে আশা ! হৃদয়ের ভালবাসা ?
আদরেই ভালবাসা বাহিরে প্রকাশ,
তবু সে করিবে কেন মোরে অবিশ্বাস ?"

অর্থাৎ প্রণয়ীর সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করা সত্ত্বেও সে তিরস্কৃত হচ্ছে বলে তার ধারণা হ'ল।

ললিতাও এরপর থেকে সতর্কতার সঙ্গেই নিজেকে অনিলের কাছ থেকে দূরে দূরে রাখতে চায়। সে অনিলকে ভালোবাসে বলেই যে সর্বদা অনিলের সঙ্গ প্রার্থনা করবে, এমন যেন আর না হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে

প্রশ্ন ওঠে, বেশীদিন কি সে এই ব্যবহার বজায় রাখতে পারবে? তার চিত্ত কি অনিলের জন্য পুনরায় উত্তাল হয়ে উঠবে না?

একবিংশ সর্গে অনিলের অন্তর্দাহ সুরু হয়েছে। নলিনীর মোহময়ী ছলনায় বিভ্রান্ত হয়ে সর্বসুখে জলাঞ্জলি দেওয়ায় এখন সে অনুতপ্ত। এই সময় অকস্মাৎ বিষণ্ণ ললিতাকে দেখেও সে বিরক্ত হয়। ললিতার বিষণ্ণতার প্রসঙ্গেই সে বলে,—

"চায় কি সে দিনরাত্রি বুকে তারে রাখি,
অবাক্ মুখেতে তার তাকাইয়া থাকি?
দিবানিশি বলি তারে শত শত বার
"ভালবাসি ভালবাসি প্রেয়সী আমার।"
... ...
এত ভাল কতজন বাসে এ ধরায়?
নিঃশব্দে সংসার তবু চ'লে কি না যায়?"

কিন্তু ললিতার পক্ষে অনিল-বিহীন দিনগুলি ইতিমধ্যেই অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাই অনিলকে দেখেই সে বলে ওঠে—

"ভালবাসা চাই না ত' সখা গো, তোমার—
একটুকু দয়া শুধু কোরো একবার।
একটুকু কোরো, সখা, সুখের যতন—
মুহূর্তের তরে সখা, দিও দরশন।"

কিন্তু অনিল এখন জীবনের প্রতি বিরক্ত। সে নলিনীর প্রেমের কোনো তল বা অর্থ খুঁজে পেল না, ললিতাকেও হাস্যময়ী করে তুলতে পারল না। তাই মৃত্যুই আজ তার একমাত্র আশ্রয়। তাই তার দিকে অগ্রসরমানা ললিতাকে সে অত্যন্ত কঠোরভাবে অগ্রসর হতে নিষেধ করে—

"মরিতে যেতেছি তবু রাহুর মতন
পদে পদে সাথে সাথে সাথে করিবি গমন?
দাঁড়া হোথা, সাথে আসিস নে আর,
এই তোর পরে শেষ আদেশ আমার।"

এই রূঢ় কথা ব'লে অনিলের স্থান ত্যাগ করার সঙ্গে-সঙ্গেই বজ্রাহতের ন্যায় ললিতা সেখানেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে।

ললিতার জীবনের দ্বন্দ্ব একটু ভিন্ন প্রকৃতির। লজ্জা এবং সঙ্কোচই তার দুর্বলতা। এই দুর্বলতাকে সে জয় করে উঠতে পারে নি। এটাকে জয় করে উঠতে পারলে, অনিলের সঙ্গে প্রগল্‌ভ আচরণ করতে পারলে, তার জীবনের সর্বনাশ হয়ত রোধ করা যেত। অনিলের ভালোবাসার প্রকৃতি, এবং তার ভালোবাসার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অনিল যেমন চায়, সে অনিলকে খুশি করার জন্ত প্রানপণ চেষ্টা করে সেরকম হ'তে, কিন্তু লজ্জা-রুচি এসে তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। সে স্বভাবতঃ এক প্রকার আছে, আরেক প্রকার প্রয়োজনের বশবর্তী হয়ে হতে চায়, কিন্তু পারে না, এই খানেই তার দ্বন্দ্ব। শেষে যখন পারল, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। অনিল প্রথমতঃ নলিনীর প্রতি মোহগ্রস্ত, পরে অনুতপ্ত এবং শেষে নলিনী-ললিতা তথা জগৎ-সংসারের প্রতিই দেখা দিল তার ঘৃণা ও বিরক্তি, সুতরাং জগৎ ও জীবনে তার আর কোন প্রয়োজন নেই। অনিলের চাহিদা পূরণের যোগ্য নিজেকে করে তুলতে গিয়ে ললিতাও সমস্ত সুকুমার সৌন্দর্য-রিক্ত হয়ে পড়ে,—বিনীতা হয়ে ওঠে প্রগল্‌ভা। তাই রূঢ় আচরণ করে বসে সে প্রণয়-বিশ্বাসঘাতী অনিলের সঙ্গে। অনিলের ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি হয়। যদিও এরপর ললিতা পুনরায় নিজেকে সামলে নিয়েছে, এবং অনিলের প্রেমই আবার চেয়েছে, কিন্তু পায়নি। অনিল আর ফেরেনি। ললিতার এই শেষ চাওয়ার মধ্যে তার চিত্তের আর্তনাদ যেন ধ্বনিত হয়ে উঠল। তার এই না পাওয়ার বেদনার মধ্যদিয়েই তার জীবনের বিশিষ্ট ট্র্যাজেডি ফুটে উঠেছে।

নাটকের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যেমন অন্তর্জীবন অথবা বহির্জীবনের দুই বিপরীত শক্তির সংঘাতের মধ্যদিয়ে জীবনের ট্র্যাজেডি সংঘটিত হয়, এখানে স্পষ্টতঃ তেমন কোনো ট্র্যাজিক সংঘাতের পরিচয় নেই। এখানে মুরলা এবং ললিতার যে ট্র্যাজেডি ঘটেছে, তা নিছক তাদের ভাগ্য বিড়ম্বনা-সঞ্জাত। সুকুমার লজ্জাশীলতাই তাদের এই ভাগ্যবিড়ম্বনার কারণ। তারা যদি লজ্জার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে নিজেদের প্রগ্‌লভ প্রেমিকারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত, তবে হয়ত তারা তাদের এই ভাগ্যবিড়ম্বনাকে পরিহার করতে পারত। তবে তাতে তাদের জীবনের সমস্ত সুকুমার সৌন্দর্যও স্খলিত হয়ে পড়ত, এবং সেই অবস্থায় যদি তাদের কোনরূপ ভাগ্য বিপর্যয় ঘটত, তবে সেই ভাগ্যবিপর্যয়ে আমরা তাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হতে পারতাম না। সুতরাং এখানে তাদের ভাগ্যবিপর্যয়ের যেটা কারণ, সেটাই তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি সম্পন্ন

করে রাখে। এবং এই লজ্জাশীলতার সৌন্দর্যেই তাদের চিত্তবেদনা আমাদের কাছে তীব্রভাবে অনুভূত হয়। তাদের এই যে সুতীব্র দুঃখ, এবং যে দুঃখের প্রতি আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি, তা নাটকীয় সংঘাতের মধ্যদিয়ে না ঘটলেও, আমাদের কাছে যথেষ্ট ট্র্যাজেডির ভাবনা-মণ্ডিত বলে মনে হয়। এখানে রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের যে বিষণ্ণতা, তা জীবনের এই ট্র্যাজেডির ভাবনা ছাড়া আর কিছু নয়। এইভাবেই আঠারো বছরের তরুণ কবিচিত্তের বিষণ্ণতা জীবনের ট্র্যাজেডির ভাবনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে গেছে।

'ভগ্নহৃদয়ে'র সমসাময়িককালেই রবীন্দ্রনাথের "সন্ধ্যাসঙ্গীত" (১৮৮১-৮২; বাং ১২৮৮) কাব্যটি রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের বিষণ্ণতা এই "সন্ধ্যাসঙ্গীত" কাব্যেও সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করেছে। 'তারকার আত্মহত্যা', 'আশার নৈরাশ্য,' 'পরিত্যক্ত', 'সুখের বিলাপ', 'হৃদয়ের গীতিধ্বনি', 'দুঃখ-আবাহন', 'অসহ্য ভালোবাসা', 'আবার', 'শিশির' প্রভৃতি কবিতায় কবির বিষাদ-ভারাক্রান্ত-চিত্ত আত্মপ্রকাশ করেছে। যদিও এইসব কবিতার অধিকাংশ স্থলেই কবিচিত্তের বিষাদ একটা রোমান্টিক ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়, তথাপি দেখা যায় যে এই বিষাদ কবিচিত্তের যথেষ্ট মমত্বলাভ করেছে এবং এর মধ্যদিয়ে জীবনের দুঃখবেদনা সম্পর্কে কবির মনোভাবটিও মোটামুটি একটা বক্তব্যের মর্যাদা লাভ করেছে। ট্র্যাজেডি-চেতনার মূলে থাকে জীবনের যে দুঃখবোধ, সেই দুঃখবোধ 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র কবির চিত্তে কত গভীর ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যাবে এই কবিতাগুলিতে।

'তারকার আত্মহত্যা' কবিতায় জ্যোতির্ময় তীর হতে আঁধার সাগরে যে একটি তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল, তার কারণ কি? তার কারণ "সে কেবল হাসির যন্ত্রণা।" এখানে তারকাটির ঔজ্জ্বল্য অর্থাৎ জীবনের সমৃদ্ধিই হল তারকাটির অন্তঃপীড়ার কারণ। সমৃদ্ধির জ্বালা এখানে তারকাটির কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

> "তাই আজ ছুটেছে সে নিতান্ত মনের ক্লেশে—
> আঁধারের তারাহীন বিজনের লাগি।"

এরপরই কবি নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলছেন—

> "হৃদয়, হৃদয় মোর, সাধ কি রে যায় তোর
> ঘুমাইতে ওই মৃত তারাটির পাশে
> ওই আঁধার সাগরে,

এই গভীর নিশীথে,
ওই অতল আকাশে।"

এখানে কবির যে দুঃখবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, তা হচ্ছে এই যে, এই সময়ে কবির জীবনে বাস্তব দুঃখ-যন্ত্রণা সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতালাভ হয়নি। রবীন্দ্রনাথের এই দুঃখবোধ প্রকৃতপক্ষে দুঃখবিলাস। যেহেতু সুখ-দুঃখ কথাটা একসঙ্গে উচ্চারিত হয়, এবং যেহেতু কবির জীবন যাত্রা সুখের ছিল বলেই আশৈশব জানতেন, তাই দুঃখ সম্পর্কে একটা রোমান্টিক আইডিয়া বা ভাববিলাস কবির মনে দানা বাঁধছিল। এই জন্যই তাঁর তারকা এবং তিনি নিজে দুঃখের আঁধারকে প্রার্থনা করেছেন। দুঃখ যেখানে কষ্টকর, সেখানে দুঃখকে পরিহার করাটাই রীতি, কিন্তু দুঃখ যদি সৌখিন হয় তবেই তা প্রার্থনীয় হয়ে ওঠে।

'আশার নৈরাশ্য' কবিতায় কবি একটা সত্যকে তাঁর 'বোধি'র দ্বারা যেন জেনেছেন। জীবনে যে দুঃখই শুধু রয়েছে, আশা যে শুধু ছলনা, একথা কবি এখানে বুঝেছেন। কবিচিত্তের 'despair and resignation'—এর ভাবটি এখানে অকস্মাৎ জ্যোতিত হয়ে উঠেছে। এখানে তিনি লক্ষ্য করেছেন, "আশা" "অতি ভয়ে ভয়ে প্রাণে" প্রবেশ করে। মানুষের প্রাণের মধ্যে এইভাবে ভীত-সন্ত্রস্তভাবে আশার প্রবেশের কারণ হচ্ছে—

"আজ আসিয়াছ দিতে যে সুখ আশ্বাস,
নিজে তাহা করনা বিশ্বাস।"

"আজ যাবে, আসিবে ত কাল, দুঃখ যাবে ঘুচিবে যাতনা"—কবি বলেছেন, এই প্রতারণার প্রয়োজন কি? কারণ "দুঃখক্লেশে আমি কি ডরাই…তারা সবে আমারি কি নয়।"

দুঃখভোগের জন্য প্রস্তুতির ভাবটি কবির মনের মধ্যে এখানে লক্ষ্য করা যায়। দুঃখকে একটি চিরন্তন বরণীয় সত্য হিসেবেই তিনি ধরে নিয়েছেন।

'পরিত্যক্ত' কবিতাটিতে প্রকাশিত হয়েছে জীবন ও পৃথিবীর সর্ব-নশ্বরতার বেদনা। কবিচিত্তের বিষাদ এখানে কোনো বিলাসিতা নয়, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত।

'সুখের বিলাপ' কবিতাটিতে ভালোবাসাহীন সুখের চেয়ে ভালোবাসাযুক্ত বিষাদ কবির কাছে অধিকতর বরণীয় হয়ে উঠেছে। সুখের নিঃসঙ্গ মেঘ হয়ে থাকার চেয়ে দুঃখের অশ্রুজলে পরিণত হয়ে গাছের পাতায় পাতায় সঙ্গ লাভ করতে পারাটাও অনেক সুখের। একাকীত্বের রোমান্টিক বেদনা এখানে মুখ্য।

'হৃদয়ের গীতিধ্বনি' কবিতাটির মধ্যে কবি সর্বদা, সর্বত্র নিরবচ্ছিন্নভাবে হৃদয়ের যে গান শুনতে পান, সে গান কবিচিত্তের সুখ বা আনন্দের দ্যোতক নয়, তা কবিচিত্তের হতাশ্বাস এবং বিষণ্ণতারই দ্যোতক—

"ঘুমাই বা জেগে থাকি মনের দ্বারের কাছে
কে যেন বিষণ্ণ প্রাণী দিনরাত বসে আছে—
চিরদিন করিতেছে বাস,
তারি শুনিতেছি যেন নিশ্বাস প্রশ্বাস।
এ প্রাণের ভাঙ্গা ভিতে স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে,
ঘুঘু এক বসে বসে গায় এক স্বরে
কে জানে কেন যে গান গায়।"

এখানে "এ প্রাণের ভাঙ্গা ভিতে" উক্তিটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—বিষণ্ণ কবিচিত্তের নৈরাশ্য অত্যন্ত তীব্রভাবে এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

'দুঃখ আবাহন' কবিতাটিতে কবি দুঃখকে সাদরে আহ্বান জানিয়েছেন। দুঃখ কবির খেলার সাথী। দুঃখের কাছে কবির আত্মনিবেদনের স্পৃহা সমগ্র কবিতাটির মধ্যেই স্পষ্ট।

'অসহ্য ভালবাসা' কবিতায় কবি ভালোবাসার সঙ্গে দুঃখকে মিশিয়ে নিয়েছেন। কবি-প্রেয়সী 'বুকফাটা-প্রাণফাটা' ভালোবাসা সহ্য করতে পারে না। সে চায় "দুঃখহীন প্রেম"। কিন্তু কবির রয়েছে "আত্মহারা প্রেম"—

"আছে যেথা অনন্ত পিয়াস,
বহে যেথা চোখের সলিল,
উঠে যেথা দুঃখের নিশ্বাস।"

'আবার' কবিতাটিতে কবি একেবারেই বিষণ্ণ-মনোভাবাপন্ন। এখানে কবির যে 'সাধের আবাস', তা তাঁর আত্মগত কবি-ভাবনার জগৎ। কোমল বিষণ্ণতা সেখানে সতত বিরাজমান। বিষণ্ণতার প্রতি অ-সহানুভূতিসম্পন্ন ভাবরাজির সেখানে প্রবেশ-নিষেধ। সেখানে যারা আসে তারা সকলেই কবির দুঃখ জানে ও বোঝে।

"ধীরে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস
প্রতিদিন আসে মোর পাশ।
দেখে আমি বাতায়নে, অশ্রুঝরে দুনয়নে,
ফেলিতেছি দুখের নিশ্বাস;

অতিধীরে আলিঙ্গন করে
কথা কহে সকরুণ স্বরে,
কানে কানে বলে "হায় হায়"।
কোমল কপোল দিয়া কপোল চুম্বন করি
অশ্রুবিন্দু সুধীরে শুকায়।
সবাই আমার মন বুঝে,
সবাই আমার দুঃখ জানে
সবাই করুণ আঁখি মেলি
চেয়ে থাকে এই মুখপানে।"

কবির বিষণ্ণতা এখানে সযত্ন পরিরক্ষিত—এটা কবিচিত্তের বিষণ্ণতার গভীরতারও পরিচায়ক হতে পারে।

'শিশির' কবিতাটিতেও কবির বিষণ্ণ মনোভাবটি ব্যক্ত হয়েছে। শিশিরের স্বল্পায়ু জীবনের প্রতি কবির মমত্ব-বোধ—"শিশিরের মরণটি কেন, আমারে করনি তবে দান।"

'উপহার' কবিতাটি প্রকৃতপক্ষে সখীর প্রতি নিবেদন। তথাপি কবিচিত্তের বিষণ্ণতা এখানে গোপন থাকে নি। এই ধরনের অনেকগুলি কবিতাতেই এই ভাবটি বিরাজমান। সন্ধ্যাসঙ্গীত কাব্যখানিতে এইভাবে একটা অস্পষ্ট দুঃখ-বোধ, একটা সকরুণ শূন্যতা প্রকাশ পাচ্ছে। উল্লেখযোগ্য এই যে, এই ভাবগুলির প্রতি কবির দরদ রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এও উল্লেখযোগ্য যে এই ভাবগুলি অভিজ্ঞতানির্ভর ক্ষতচিহ্নবাহী নয়। তাই জ্বালা-যন্ত্রণার কথা কম। সমস্তটাই যেন একটা 'আইডিয়া', এবং এই আইডিয়ার মধ্যেই কবি তাঁর মানসিক স্বাস্থ্যের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্র সমালোচক এডোয়ার্ড টমসন 'সন্ধ্যাসঙ্গীতের' বিষণ্ণতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, এত অল্পে বিষণ্ণ হওয়া বাঙালী কবিদের একটা বিশেষত্ব।[৭] এই বিশেষত্বের উপরই কিন্তু বাঙালীর ট্র্যাজেডি-চেতনা নির্ভর করে আছে। বাঙালীর রচিত

৭. "The sorrow of Evening Songs is an unreal as ever filled a young poet's mind, in love with its own opening beauty. No Muse weeps on so little provocation as the Bengali Muse; and though Rabindranath's Muse offends less than the general, she is tearful enough. It is a nation that enjoys being throughly miserable!"—p. 87. (Rabindranath Tagore—Poet and Dramatist: Edward Thompson. 1948.).

ট্র্যাজেডি যে করুণ-রস প্রধান, তার কারণও এই। রবীন্দ্র কবিচিত্তেরও এই বিষণ্ণতা বা জীবন সম্পর্কিত দুঃখবোধ, একটা পারম্পর্যবিহীন অনুভূতি নয়, এই বিষণ্ণতা এবং দুঃখবোধই তাঁর বিশিষ্ট ট্র্যাজেডি-চেতনাকে গড়ে তুলেছিল। 'ভগ্নহৃদয়' এবং 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র[৮] এই সার্বিক বিষণ্ণতা সেইজন্য রবীন্দ্র ট্র্যাজেডি-চেতনার মানসিক প্রস্তুতি হিসেবে উল্লেখযোগ্য।[৯]

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' এবং 'ভগ্নহৃদয়ে'র সঙ্গে প্রায় একই সময়ে রচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য "কালমৃগয়া" (১৮৮২)। এই কারণে স্বাভাবিকভাবেই 'ভগ্নহৃদয়', 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র বিষণ্ণতা 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যেও অব্যাহত রয়েছে।

'কালমৃগয়া' নাটকটি বিষাদাত্মক। রাজা দশরথ কর্তৃক মৃগয়া উপলক্ষে অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুকে হত্যা করার করুণ কাহিনীটিকে নিয়ে এই নাটকটি রচিত হয়েছে। অন্ধমুনির নির্দোষ পুত্র রাজা দশরথের মৃগয়া বিলাসিতার 'বলি'-তে পরিণত হ'ল, এ ঘটনাটা এমনিতেই যথেষ্ট করুণরসাত্মক। রবীন্দ্রনাথ সেই ঘটনাকে নাটকে রূপদান করার সময়ে তাকে আরো করুণ ক'রে তুলবার চেষ্টা করেছেন।

তৃতীয় দৃশ্যে তৃষ্ণার্ত অন্ধমুনি পুত্রকে জল আনতে আদেশ করলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মেঘগর্জন শুনে, তার মনের মধ্যে সংশয় দেখা দিল, তিনি নিষেধ করলেন পুত্রকে—

> "না না কাজ নাই যেও না বাছা,—
> গভীরা রজনী, ঘোর ঘন গরজে,
> তুই যে অন্ধের নয়ন-তারা।
> আর কে আমার আছে!

---

৮. "সন্ধ্যাসঙ্গীতে"র অনুভূতিকে রবীন্দ্রনাথের একটা আইডিয়া বলে মনে হলেও, এরই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের তরুণ কবিচিত্ত খুব স্বাভাবিক স্ফূর্তি লাভ করতে পেরেছিল। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র ভাবনা তাঁর কাছে আদৌ কৃত্রিম ছিলনা। এর দুঃখবাদ একটা ভাববিলাসিতা হতে পারে, কিন্তু তা কবির চিত্তে আরোপিত নয়, কবির সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং স্বতঃস্ফূর্ত। দ্রষ্টব্যঃ জীবনস্মৃতি (১৩৬৬), পৃ. ১১১।

৯. "রবীন্দ্র জীবনী"-কার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র বিষণ্ণতা সম্পর্কে বলেছেন, পরপর কয়েকটি ট্র্যাজেডি রচনা করার সূত্রে রবীন্দ্র কবিচিত্তে এই বিষাদমগ্নতা এসেছিল। তিনি বলেছেন, "পাঠক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে যে কয়টি কাব্য ও গাথা রচিত হয়, তাহার সবগুলি ট্র্যাজেডি; ইহারই অন্তে 'সন্ধ্যাসংগীতে'র সূচনা। তাহারও মধ্যে বিষাদ বিজড়িত হৃদয়ের বেদনা তীব্র।"—রবীন্দ্রজীবনী (১ম); (১৩৬৭), পৃ. ৮৪।

কেহ নাই কেহ নাই—
তুই শুধু রয়েছিলি হৃদয়-জুড়ায়ে—
তোরেও কি হারাব বাছারে,
সেও প্রাণে স'বে না!"

পুত্রের মৃত্যুর পূর্বক্ষণে পিতার মনে এরূপ সংশয়ের উদ্ভব, পুত্রের জন্য আশঙ্কা, ভয়, উৎকণ্ঠা একটা বিষাদাত্মক পরিণতির সূচনা করেছে—পাঠক-দর্শককে একটা বিষাদাত্মক পরিণতির জন্য প্রস্তুত করছে।

চতুর্থ দৃশ্যে বনদেবীগণও সিন্ধুকে গৃহে ফিরে যাবার পরামর্শ দেয়, তাদেরও আশঙ্কা সিন্ধুর জীবন সম্পর্কে—

"এই ঘোর আঁধার, কোথারে যাস!
ফিরিয়ে যা তরাসে প্রাণ কাঁপে!
স্নেহের পুতলি তুই,
কোথা যাবি একা এ নিশীথে!
কি জানি কি হবে, বনে হবি পথ হারা!"

সিন্ধুর আসন্ন বিপদ তার প্রত্যেক শুভানুধ্যায়ীর চিত্তেই আশঙ্কার কালো ছায়া প্রক্ষেপ করেছে। কিন্তু সিন্ধু কারো নিষেধ বাক্যই শুনল না। কারণ "পিতা আমার কাতর তৃষ্ণায়।" বনদেবীদের নিষেধ অমান্য ক'রে সিন্ধু যখন সরযূতীরে গেলই, তখন বনদেবীগণ আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে অসহায়ের মতো চতুর্দিকের সবকিছুর প্রতি কাতর মিনতি জানাল শিশুকে রক্ষা করার জন্য—

"অয়ি দিগঙ্গনে, রেখো গো যতনে
অভয় স্নেহ ছায়ায়।
অয়ি বিভাবরী, রাখ বুকে ধরি
ভয় অপহরি রাখ এ জনায়!
এ যে শিশুমতি, বন ঘোর অতি—
এ যে একেলা অসহায়।"

বনদেবীদের এ প্রার্থনা যতই করুণ হোক, আমরা জানি তা ব্যর্থ হবে। অনিবার্য ব্যর্থতার সম্মুখে এই আন্তরিক প্রার্থনা এইজন্যই খুব করুণ মনে হয়।

পঞ্চম দৃশ্যে দশরথের শরাহত ঋষিকুমারের মৃত্যু-দৃশ্যটি অত্যন্ত করুণ-রসাত্মক। পিতার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য মেঘাচ্ছন্ন বজ্রবিদ্যুৎসমাকীর্ণ অমানিশীথে সে জল আনতে বেরিয়েছিল। কিন্তু সেই জল নিয়ে গিয়ে পিতার

তৃষ্ণা নিবারণ করা আর তার পক্ষে সম্ভব হ'ল না। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও সে কথা তার মনে পড়েছে এবং তার ঘাতক রাজার কাছেই মিনতি করে যাচ্ছে পিতাকে সেই তৃষ্ণার জল দান করতে—

"জন্মান্ধ জনক মম
তৃষায় কাতর হয়ে
রয়েছেন পথ চেয়ে
কখন যাব বারি লয়ে—।
মরনান্তে নিয়ে যেও,
এ দেহ তাঁর কোলে দিও—
দেখো দেখো ভুলো নাকো,
কোরো তাঁরে বারি দান!
মার্জ্জনা করিবেন পিতা,
তাঁর যে দয়ার প্রাণ!"

মুমূর্ষু ঋষিকুমার পিতার তৃষ্ণার জল নিয়ে যাবার অনুরোধ করছে তার ঘাতককে, এমন কি তাকে আশ্বাস দিচ্ছে যে, পিতা তাকে ক্ষমা করবেন। তার মনের মধ্যে এতটুকু ক্রোধ নেই, প্রতিহিংসা নেই,—এইগুলিই দশরথের চিত্তকে বিদীর্ণ করেছে বেশী এবং আমাদের কাছে সিন্ধুর মৃত্যুকে করে তুলেছে মর্মান্তিক।

'কালমৃগয়া' নাটকের এই শোকাবহ ঘটনা দর্শক-পাঠকের চিত্তে যে যথেষ্ট পরিমাণে করুণ রসের উদ্বোধন ঘটাতে সক্ষম, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজেও "জীবনস্মৃতিতে" করুণরস-সৃজনে এই নাটকের সাফল্যের ইতিহাসের উল্লেখ করেছেন।[১০] লীলা চরিত্রটি এই নাটকে হিমালয়ের বুকে জাহ্নবীধারার মতো করুণরসের ধারাটিকে অব্যাহত রেখেছে। সিন্ধুর মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় সেই করুণরস অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছে নাটকের শেষের দিকে। করুণরসের চিত্ত আলোড়নকারী এই তীব্রতা এই নাটকে বজায় থাকায় ট্র্যাজেডির রসাস্বাদের সমতুল্য অভিজ্ঞতা এই নাটক থেকেও লাভ করা যায়।

---

১০. "ইহার করুণরসে শ্রোতারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন।"

—জীবনস্মৃতি (১৩৬৬), পৃ. ১০৮।

ট্র্যাজেডি এখানে বস্তুতঃ অন্ধমুনির। একমাত্র পুত্রের অপঘাত মৃত্যুতে তাঁর শোক যৎপরোনাস্তি প্রবল। কিন্তু তিনি শুধু একমাত্র পুত্রের পিতা নন, তিনি মুনিও। তাই পিতা হিসাবে তাঁর শোক-বিচলিত চিত্তকে তিনি সংযত করেছেন মুনির স্থিতধী প্রজ্ঞার দ্বারা।

'কালমৃগয়া'র দু-তিন বছরের মধ্যেই "প্রকৃতির প্রতিশোধ" (১৮৮৪-৮৫) রচিত হয়। এটি একটি নাট্যকাব্য। "রাজা ও রানী" এবং "মালিনী" নাটকদ্বয়ের ভূমিকাতেও রবীন্দ্রনাথ "প্রকৃতির প্রতিশোধে"র উল্লেখ করেছেন। এ থেকেই বোঝা যায় যে "প্রকৃতির প্রতিশোধ" অপরিণত বয়সের রচনা হলেও এর বক্তব্যবিষয় রবীন্দ্রনাথের কবি-বিশ্বাসের সঙ্গে এমন সুদৃঢ়ভাবে সংযুক্ত, যে পরিণত বয়সেও রবীন্দ্রনাথ সেই বক্তব্যকে মনে রেখেছেন এবং সেই বক্তব্যকে সমর্থন বা বিশ্লেষণ করে অন্যান্য রচনা সৃষ্টি করেছেন। 'জীবনস্মৃতিতে' প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্যে একদিকে যতসব পথের লোক, যতসব গ্রামের নরনারী— তাহারা আপনাদের ঘর-গড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আর এক দিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘর-গড়া এক অসীমের মধ্যে কোনোমতে আপনাকে ও সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন এই দুইপক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায়, অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল।......পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে-পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।"[১১]

সুতরাং 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' অপরিণত বয়সের রচনা হলেও, এই রচনাকে রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের বিভিন্ন রচনার ভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করা যায়, —অপরিণত বয়সের একটা বিচ্ছিন্ন রচনা হিসেবে এই রচনাটিকে গুরুত্ববিহীন বা পরবর্তী রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন মনে করা চলে না। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির প্রতিশোধের এই তত্ত্বটিকে উপনিষদ থেকেই লাভ করেছিলেন।

---

১১. জীবনস্মৃতি (১৩৬৬): পৃ. ১৩২-৩৩।

উপনিষদের ঋষি বলেছেন,

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

'যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা অর্থাৎ সংসারের উপাসনা করে তাহারা অন্ধতমসের মধ্যে প্রবেশ করে; তদপেক্ষাও ভূয় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে তাহারা যাহারা কেবলমাত্র ব্রহ্মবিদ্যায় নিরত।'[১২]

রবীন্দ্রনাথের মতে দুঃখের অভিজ্ঞতা না ঘটলে মানুষের সত্য লাভ হয় না। দুঃখে মানুষের চিত্ত যেদিন বিগলিত হয়ে যায়, সেইদিনই মানুষ সত্যকে লাভ করতে সমর্থ হয়। এইটিই রবীন্দ্রনাথের দুঃখতত্ত্ব।[১৩] রবীন্দ্রচেতনায় ট্র্যাজেডি এইভাবেই একটা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য লাভ করেছে,—এইজন্যই ট্র্যাজেডির মধ্যে তিনি ভূমা-র আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন। "প্রকৃতির প্রতিশোধে"ও সন্ন্যাসীর চিত্তে উদ্বোধিত দুঃখ বা করুণা তাঁকে সত্যলাভে সহায়তা করেছিল। রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের যে দুঃখতত্ত্ব, সেই দুঃখতত্ত্ব 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'ও দেখা দিয়েছিল বলেই রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার মানসিক প্রস্তুতি হিসেবে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই নাট্যকাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র সন্ন্যাসী ভাবছেন, তিনি জগতের সমস্ত-প্রকার মায়াবন্ধন ছিন্ন করতে পেরেছেন। দয়া, মায়া, প্রেম, স্নেহ প্রভৃতি প্রকৃতির যা কিছু অবদান, তা সব অস্বীকার করতে পেরে তিনি ভেবেছেন, তিনি প্রকৃতির সমস্ত ষড়যন্ত্র চূর্ণ করেছেন। তাই তিনি প্রকৃতিকে উদ্দেশ্য করে বলছেন,—

"দেখাব হৃদয় খুলে, কহিব তোমারে,
এই দেখ তোর রাজ্য মরুভূমি আজি,
তোর যারা দাস ছিল, স্নেহ, প্রেম, দয়া,
শ্মশানে পড়িয়া আছে তাদের কঙ্কাল,
প্রলয়ের রাজধানী বসেছে হেথায়।"

---

১২. ততঃ কিম্ : ধর্ম : রবীন্দ্রনাথ।

১৩. বাঁশরী, গৃহপ্রবেশ, প্রায়শ্চিত্ত, পরিত্রাণ, রাজা ও রানী, বিসর্জন প্রভৃতি সমস্ত নাটকেই প্রায় এই দুঃখতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। পরে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়েছে নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে।

কিন্তু এই সন্ন্যাসী শেষ পর্যন্ত যে প্রকৃতির অবদানগুলিকে অস্বীকার করতে পারেন নি, তা-ই নাটকে দেখানো হয়েছে। সর্বজন-লাঞ্ছিত রঘুর কন্যার প্রতি করুণা প্রকাশ তাঁকে করতেই হয়েছে, উদাসীন তিনি থাকতে পারেন নি। রঘুর কন্যার প্রতি সহানুভূতি তাঁর মনের করুণা-ধারাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের দুঃখবোধ নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে এখানে অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রঘুর কন্যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে দুঃখবোধ, সেই দুঃখবোধই সন্ন্যাসীর চিত্তে জেগেছে এবং সন্ন্যাসীর চিত্তে করুণা সৃষ্টি করেছে। এই নাটকে যে করুণার বশবর্তী হয়ে সন্ন্যাসী প্রকৃতির কাছে পরাজয় স্বীকার করেছেন, সেই করুণাই 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটকে বাল্মীকির কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। রঘুর কন্যার দুঃখ এবং ক্রৌঞ্চীর শোক যথাক্রমে এই দু'টি নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের দুঃখবোধকে প্রকাশ করেছে।

প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটকে রঘুর কন্যার প্রতি সমাজের যে অবিচার, তাকে প্রকাশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই দুঃখবোধ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নাটকের তৃতীয় দৃশ্যটি এদিক থেকে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য।

রাজপথে সকলেই তাকে দূরে সরে যেতে বলে, কারণ সে অনাচারী রঘুর কন্যা, এবং অশুচি। একজন পথিক তাকে বলে—

"হতভাগী জানিসনে রাজপথ দিয়ে
আনাগোনা করে যত নগরের লোক—
ম্লেচ্ছ কন্যা, তুই কেন চলিস এ পথে।"

দয়াপরবশ হয়ে একজন বৃদ্ধা তাকে জিজ্ঞাসা করে—

"কে তুমি গা, কার বাছা, চোখে অশ্রুজল,
ভিখারিণী বেশে কেন রয়েছ দাঁড়ায়ে
এক পাশে।"

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পথিকেরা বৃদ্ধাকে স্মরণ করিয়ে দেয়—

"ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে—
কে গো তুমি, জান না কি অনাচারী রঘু—
তাহারি দুহিতা ও যে।"

আর সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধার দয়া ও স্নেহ পরিণত হ'ল ঘৃণায়—"ছি ছি ছি, কী ঘৃণা।"

রাজপথ দিয়ে এক জননী তাঁর দুহিতাকে নিয়ে চলেছেন মন্দিরের পথে—মন্দিরের দীপ থেকে কাজল পরিয়ে দুহিতার অকল্যাণ দূর করার অভিপ্রায়ে। দুহিতা রঘুর কন্যাকে দেখে জিজ্ঞাসা করেছে—"ও কে ওমা।" জননী সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ও ঘৃণায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, যাতে রঘুর কন্যার ছোঁয়া না লাগে।

চতুর্দিকের এই ঘৃণা ও অবহেলার মধ্যেই সন্ন্যাসীর করুণা জেগে উঠেছে,—তিনি আহ্বান করলেন রঘুর কন্যাকে। রঘুর কন্যা অত্যন্ত ভয় ও সন্ত্রস্ততার সঙ্গে বলেছে, "অনার্য্যা অশুচি আমি।" কিন্তু সন্ন্যাসী তৎসত্ত্বেও তাকে গ্রহণ করছেন দেখে সে চমকে বলে উঠল,—'ছুঁয়ো না ছুয়ো না আমি রঘুর দুহিতা।" কিন্তু সন্ন্যাসী তাকে সস্নেহে গ্রহণ করলেন। এই অপরিচিত, অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক স্নেহ ও মমতার আহ্বানে হতভাগিনী রঘুর কন্যা কেঁদে ফেলল,—

"প্রভু, প্রভু, দয়াময়, তুমি পিতা মাতা,
একবার কাছে তুমি ডেকেছ যখন,
আর মোরে দূর ক'রে দিয়ো না কখনো।"

তারপর একদিন সন্ন্যাসী অকস্মাৎ বুঝতে পারলেন যে, এই কন্যাটিকে নিয়ে তিনি এক স্নেহ মায়ার সংসারে জড়িয়ে পড়ছেন, এবং তার সমস্ত সাধনার সিদ্ধি ব্যর্থ হতে বসেছে। তাই সংসারের মায়ার বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য তিনি মাঝে মাঝেই রঘুর কন্যার সংস্রব থেকে পালিয়ে গেছেন, কিন্তু কোনো সময়েই বেশীক্ষণ নিজেকে দূরে রাখতে পারেন নি। রঘুর কন্যার স্নেহ আকর্ষণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি রূঢ় আচরণও করেছেন, কিন্তু তথাপি রঘুর কন্যাকে ভুলে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। মনের যে করুণাধারা একবার নির্গত হয়েছে, তাকে আর তিনি রুদ্ধ করতে পারেন নি। তাই ত্রয়োদশ দৃশ্যে ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও তিনি রঘুর কন্যার ব্যথিত কণ্ঠের কান্নাই যেন শুনতে পেলেন—

"তবুও ঝটিকা, তোর বজ্রগীতি গেয়ে
ক্ষুদ্র এক বালিকার ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি
পারিলিনে ডুবাইতে? এখনো শুনি যে।"

চতুর্দ্দশ দৃশ্যে দেখি সন্ন্যাসী মনের শাসনকে অগ্রাহ্য করতে না পেরে সন্ন্যাস পরিত্যাগ করেছেন। এখন তার চিন্তা-ভাবনা শুধু রঘুর কন্যা—তার ব্যথা,

বেদনা। তাই এখন তিনি আর সব চিন্তা ভাবনা পরিত্যাগ করে শুধু এই কথাই ভাবছেন,—

"আহা সে অনাথ বালা কোথায় না জানি!
কে তারে আশ্রয় দেবে, কে তারে দেখিবে!
ব্যথিত হৃদয় নিয়ে কার কাছে যাবে,
কে তারে পিতার মতো বুকে নিয়ে তুলে
নয়নের অশ্রুজল দিবে মুছাইয়া!
কী করেছি, কী বলেছি, সব গেছি ভুলে,
বিস্মৃত দুঃস্বপ্ন শুধু চেপে আছে প্রাণে—
একখানি মুখ শুধু মনে পড়িতেছে,
দু'টি আঁখি চেয়ে আছে করুণ বিস্ময়ে।"

কিন্তু সন্ন্যাসী যখন রঘুকন্যার সান্নিধ্য পেলেন পুনরায়, তখন রঘুকন্যা মৃত। সন্ন্যাসীর সন্ধানে সন্ন্যাসীর গুহাদ্বারে অপেক্ষমান অবস্থায় মৃত।

সীমার মধ্যেই অসীমের সঙ্গে সীমার মিলন সাধনের সাধনাই যে মনুষ্যজীবনের সবচেয়ে বড় সাধনা,—যদিও এই বক্তব্যকে উপস্থাপিত করা-ই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য, তথাপি আমরা লক্ষ্য করি যে সেই বক্তব্যকে উপস্থাপিত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি বিষাদাত্মক বা করুণরসাত্মক কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন। জীবনে দুঃখের অনুভূতি না ঘটলে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না বলেই, করুণরসাত্মক কাহিনীর আশ্রয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সত্যের সন্ধান দিয়েছেন এবং সন্ন্যাসীও রঘুর কন্যার মৃত্যুর দুঃখে চোখের জল ফেলে সত্যকে জানলেন যে, প্রকৃতিকে অস্বীকার করতে চাইলে প্রকৃতি প্রতিশোধ নেবেই।[১৪] এই রকম দুঃখের মধ্য দিয়েই সত্যকে লাভ করেছিলেন 'বিসর্জনের' রঘুপতি, 'রাজা ও রানী'র বিক্রম, 'বাঁশরী'র

---

১৪. অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয় 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র সন্ন্যাসীর সঙ্গে মহাকবি গেটের ফাউস্টের সাদৃশ্যমূলক তুলনা করেছেন। অনন্তের সাধক ফাউস্ট সান্তকে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে গ্রহণ ক'রে জীবনটা নিষ্ফল ক'রে দিয়েছিল। সেইটাই ফাউস্ট-এর ট্র্যাজেডি। তেমনি "প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীর মনে গোড়াতে কোথাও সংশয় নাই, তাহার ধারণা অনন্তের সাধনায় সে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তাহার ফাঁকি ধরা পড়িয়া গেল—ইহাই 'সন্ন্যাসীর' জীবনের ট্র্যাজেডি।"
—রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ: পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, (১৯৬৬), পৃ. ১০২।

বাঁশরী সরকার, 'প্রায়শ্চিত্ত' 'পরিত্রাণের' বিভা। সুতরাং 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' রবীন্দ্রনাথের যে দুঃখচেতনা—তা তাঁর ট্র্যাজেডি-চেতনারই মানসিক প্রস্তুতি।

'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র সমসাময়িককালেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাট্যপ্রয়াস "নলিনী" (১৮৮৪-৮৫) রচিত হয়। এখানে রবীন্দ্রনাথ জীবনের যে ট্র্যাজেডিকে চিত্রিত করেছেন, তা প্রকৃতপক্ষে এর পূর্বেই 'কবিকাহিনী', 'বনফুল' এবং 'ভগ্নহৃদয়ে' চিত্রিত হয়েছে। আত্মার অতৃপ্ত তৃষ্ণায় দিশেহারা প্রমত্ততা ও আত্মঘাতী আচরণের ফলে জীবনে যে ট্র্যাজেডি অনিবার্য হয়ে ওঠে,—সেই ট্র্যাজেডি শুধু একটি জীবনকেই ধ্বংস করে না, আশেপাশে যতগুলি জীবন থাকে, তার প্রত্যেকটিকেই ধ্বংস করতে উদ্যত হয়,—প্রত্যেকটি জীবনের পরিণামকেই শোচনীয় করে তোলে। জীবনে মোহের ট্র্যাজেডির এই ব্যাপক রূপটিকে রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথমেই উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, মোহান্ধ আত্মার অতৃপ্তিতে শুধু মোহান্ধ জীবনটাই যে জলেপুড়ে নিঃশেষিত হয়ে যায়, তা নয়, অন্য যে জীবন তাকে পরম নির্ভয়ে আশ্রয় করে থাকে, সেই নির্দোষ, সুকুমার-জীবনকেও ট্র্যাজেডির মার খেতে হয়। সে নিজের চিত্তকে সমর্পণ করতে ব্যাকুল, কিন্তু গ্রহীতা মোহান্ধতায় সে বিষয়ে মূঢ়,—সুতরাং চিত্তের অচরিতার্থ বেদনায় তার অন্তঃকরণ শুকিয়ে যায়। তার এই তিলে তিলে আত্মক্ষয়টাই একটা মস্তবড় ট্র্যাজেডি।

'কবিকাহিনী'র নলিনী চরিত্রের মধ্যদিয়ে এমনি একটি বালিকা-হৃদয়ের শোচনীয়ভাবে অকালে শুকিয়ে যাওয়ার ট্র্যাজেডি প্রথম চিত্রিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক ট্র্যাজেডি-চেতনার সূত্রপাত এখানেই। 'বনফুল' কাব্যোপন্যাসের কমলা-র জীবনের মধ্যদিয়ে এই ট্র্যাজেডিই আরো গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 'কবিকাহিনী'তে কবি যেমন প্রকৃতির বুক থেকে বেরিয়ে আসার পরে প্রেমতপ্ত জীবনের জ্বালা জুড়াবার জন্য প্রকৃতির বুকে পুনর্বার ফিরে গিয়ে আগের মতো শান্তি পায়নি, কমলাও তেমনি বনপ্রকৃতি থেকে মানব সমাজে চলে আসার পরে ব্যর্থ হয়ে পুনরায় বনপ্রকৃতির মধ্যে ফিরেও ব্যর্থ জীবনকে সার্থক করে তুলতে পারেনি। অচরিতার্থ জীবনের নিরন্তর শূন্যতাবোধ ও বিষণ্ণতা এদের জীবনকে ট্র্যাজিক করে তুলেছে। জীবনে অতৃপ্তির কোনো অন্ধ আবেগে এরা দিশেহারা হয়নি। দিশেহারা হয়েছিল

তারা, যাদের জীবনকে এরা পরম নির্ভয়ে আশ্রয় করে চলেছিল এবং সেই দিশেহারা আবেগ-অন্ধতার ট্র্যাজেডির ব্যাপ্তি এদের (নলিনী ও কমলা) জীবনকেও রেহাই দেয়নি। 'ভগ্নহৃদয়ে'রও ললিতা ও মুরলার প্রাণে অফুরন্ত ভালোবাসা চরিতার্থতার বাসনায় স্পন্দমান: "পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া।" কিন্তু প্রকাশের আড়ম্বর-দৈন্যে আড়ম্বর-বিলাসী মূঢ় দেবতা (অনিল ও কবি) তাদের বিমুখ করে। পরে তাদের দেবতাদের ভুল ভাঙে,—কিন্তু ততদিনে মুরলার জীবনীশক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেছে, ললিতাও শায়িত মৃত্যুর কোলে। এখানে মূল ট্র্যাজেডি অনিল ও কবির, কিন্তু সেই ট্র্যাজেডি ললিতা ও মুরলার জীবনকেও গ্রাস করেছে।

"নলিনী" নাটকে আমরা যে নলিনীর সাক্ষাৎ পাই, সেই নলিনীর প্রকৃতি 'কবিকাহিনী'র নলিনীর এবং 'ভগ্নহৃদয়ে'র মুরলা ও ললিতার ধাতু দিয়ে গড়া। চপলাকন্যা এই নলিনী সংযত স্বভাব এবং দার্শনিক মনোভাবাপন্ন নীরদকে ভালোবাসে। কিন্তু নলিনী ভালোবাসার ভারে এবং প্রাবল্যে নীরদের সম্মুখে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে, তার সমস্ত চাপল্য দূরীভূত হয়ে যায়। যদিও নীরদের প্রতি নলিনীর ভালোবাসা বিভিন্নভাবেই ব্যক্ত হয়ে পড়ে, তথাপি নীরদ লক্ষণ দেখে কিছু বুঝতে চায় না। সে চায় নলিনী স্বভাবতঃ যেমন, তেমনি-ভাবেই সরাসরি তাকে ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করুক। সে দেখে নলিনী তার সখা নবীনের কাছে স্বাভাবিক। তাই সে ধরে নেয় যে, নলিনী তার প্রতি অনুরক্ত নয়, অনুরক্ত নবীনের প্রতি। এই খেদে সে দেশত্যাগ করে।

বিদেশে গিয়ে সে নীরজার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। নীরজা নিজের প্রেমকে প্রকাশ করেছে নীরদের কাছে। কিন্তু নীরদের বিগতদিনের স্মৃতিচারণার মধ্যদিয়ে নীরজার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, নলিনীর প্রতি তার আকর্ষণ ছিল এবং এখনও আছে—শুধু কোনো একটা অভিমানে সে নলিনীর সংস্রব পরিহার ক'রে বিদেশে এসেছে। তাই নীরদের ঐকান্তিক আগ্রহ সত্ত্বেও নীরজা প্রথমতঃ তাদের প্রেমকে বিবাহের মধ্যে পরিণতি দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু নীরদের প্রেমপূর্ণ আশ্বাস বাক্য এবং অকুণ্ঠ প্রেম সম্ভাষণের জন্য তাদের বিবাহ হয়।

বিবাহের পরে নীরদ নীরজাকে নিয়ে দেশে ফেরে। সেখানে একদিন নলিনীদের গৃহে বসন্তের উৎসব—নীরদেরও নিমন্ত্রণ। নীরজার আপত্তি সত্ত্বেও নীরদ নীরজাকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়।

এদিকে নীরদের দেশত্যাগে নলিনীর হৃদয় ভেঙে যায়, দূর হয়ে যায় তার সমস্ত চাপল্য। বিশীর্ণ কায়া নিয়ে যেন সে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে থাকে। নলিনীর এই অবস্থাতেই তার সঙ্গে বসন্ত উৎসবের দিনে নীরদের সাক্ষাৎ। এই প্রথম নীরদের সম্ভাষণের উত্তর দিল নলিনী। নীরদ পুলকিত হয়ে নলিনীর হাত ধরে কথা বলছে,—কেন আগে তাকে নাম ধরে এমন করে ডাকেনি নলিনী,—এমন সময়ে নলিনীর মূর্চ্ছা এবং পতন।

এর পরের দৃশ্যে মুমূর্ষু নীরজা। সে নলিনীকে ডাকিয়ে পার্শ্বস্থিত নীরদের সঙ্গে তার মিলন ঘটিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। এই নাটকে নায়িকা নলিনীর জীবনে নীরদের বিহনে যে দুঃখের কালো মেঘ জমা হচ্ছিল, পরিশেষে তা এইভাবে কেটে গেল বটে, কিন্তু সেইজন্য এখানে কমেডির অথবা মিলনের আনন্দঘন পরিবেশের সন্ধান পাওয়া যায় না। নীরজার মৃত্যুর পটভূমিকায় এই মিলনও মৃত্যু-বিষাদ-গ্রস্ত এবং তা বিয়োগান্ত পরিণতির বেদনাই বহন করে। সুতরাং এই মিলনও ট্র্যাজেডি-রসাত্মক।

নীরদ ও নলিনীর মিলনের জন্য যে নীরজা প্রাণ দিল, তার জীবনের ট্র্যাজেডিও কম গভীর নয়, এবং তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

বিদেশে নীরজা তার অকুণ্ঠিত প্রেম দিয়ে নীরদকে খুশি করার চেষ্টা করেছে, এবং নীরদও একটি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের সন্ধান পেয়ে জীবনে এতদিনের না পাওয়ার দৈন্য দূর করতে চেয়েছে নীরজার সঙ্গে তার বিবাহ বন্ধনের মধ্য-দিয়ে। সে নীরজাকে বলে, "দেখ নীরজা, যদিও আমাদের বিবাহের দিন কাছে এসেচে, তবু মনে হচ্চে যেন এখনো কতদিন বাকী আছে! সময় যেন আর কাটচে না!"

নীরজা এর উত্তরে বলে, "…দেখ ভাই, আমাদের এ বাসরঘর শ্মশানের উপর গড়া নয়ত! তার চেয়ে এস এইখান থেকেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হোক।"

নীরদ—"একি অশুভ কথা নীরজা? একি অমঙ্গল! কেঁদ না নীরজা! তোমার ও অশ্রুজল আজকে শোভা পায়না নীরজা!"

নীরজ—"কে জানে ভাই আমার মনে আজ কেন এমন আশঙ্কা হচ্চে? আমার প্রাণের ভিতর থেকে যেন কেঁদে উঠচে। আমাকে মাপ কর। ঈশ্বর জানেন আমি নিজের জন্য কিছুই ভাবচি নে। আমার মনে হচ্চে এ বিবাহে তুমি সুখী হতে পারবে না।"

বসন্ত উৎসবের দিনে নীরজার ভাগ্য বিড়ম্বনার কথা এবং তার জীবনের শেষ পরিণতির কথা স্মরণ করলে, এখানে তার সংশয়পূর্ণ এই উক্তিগুলি বড়ই করুণ হয়ে ওঠে। পরিণতির কথা মনে না রাখলেও, নীরজার এই সংশয় তার জীবনের একটা অনিবার্য ব্যর্থতারই যেন সূচনা করে।

নীরজা জানত, নীরদের সমস্ত মন জুড়ে রয়েছে নলিনী—নলিনীর সাক্ষাৎ পাওয়া মাত্র তা উত্তাল হয়ে উঠবে এবং তখন নীরদের জীবনে নীরজার ভূমিকার কোনো মূল্যই থাকবে না। একথা জেনেও সে বিশ্বাস করেছিল নীরদকে, তার প্রেমকে। এইভাবে মনের মধ্যে সংশয়ের কাঁটা রেখেই সে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে গেছে স্বেচ্ছাকৃত ট্র্যাজেডির দিকে।

তার এই সংশয়কে সে বাস্তবে রূপ নিতে দেখল বসন্ত উৎসবের দিনে নলিনী-নীরদের সাক্ষাৎকার মুহূর্তে। সমস্ত ব্যাপারটি অত্যন্ত করুণ হয়ে ওঠে যখন দেখি নলিনীর প্রতি নীরদের ভালোবাসা সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও নীরজার মধ্যে কোনো বিদ্বেষভাব না জাগতে।

নীরদের প্রণয় সম্ভাষণ শুনে শীর্ণকায়া নলিনী যখন মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল, তখন নীরজা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় নলিনীর মাথা কোলে নিয়ে শুশ্রূষা করেছে এবং নলিনীর চৈতন্য হলে বলেছে, "আমি তোর দিদি হই বোন—আর বেশীদিন তোকে দুঃখ পেতে হবে না, আমি তোদের মিলন করিয়ে দেব।"

নীরজার এই চরিত্র এবং ব্যবহার, তার মনের এই সংযম এবং আত্মত্যাগের প্রস্তুতি এত করুণ অথচ কঠোর যে পাঠকের পক্ষে করুণা প্রকাশ করার যেন সুযোগই পাওয়া যায় না—করুণা যেন শুষ্ক ও অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু মৃত্যুদৃশ্যে (৬ষ্ঠ) নীরজা যখন পার্শ্বস্থিত নীরদকে বলে, "আমি চল্লেম ভাই—আমার সঙ্গে কেন তোমার দেখা হ'ল? আমি হতভাগিনী কেন তোমাদের মাঝখানে এলেম? প্রিয়তম, আমি যেন চিরকাল তোমার দুঃখের স্মৃতির মত জেগে না থাকি! আমাকে ভুলে যেয়ো।"—তখন করুণরস উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। জীবনের সর্বস্ব এবং প্রাণ ত্যাগ করার সময়ও এই সংযত আবেগ এবং মহত্ত্ব অত্যন্ত করুণ, সুন্দর। নীরদ নলিনীর মিলনের পটভূমি হিসেবে এর কারুণ্য আরো বৃদ্ধি পায়।

ছয়টি মাত্র দৃশ্যে সমাপ্ত এই নাটকখানি আগা-গোড়াই করুণরসের নিষ্পত্তি ঘটায়, এর দু'টি কাহিনীর পরিণামও করুণরসাত্মক—দুটি কাহিনীই চিত্তের স্থায়ী শোকভাবকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। সুতরাং ট্র্যাজেডির রস-

বিশেষত্ব অনুসারে এই নাটকটিও একটি ট্র্যাজেডি। একথা স্বীকার করতে হয়। কিন্তু আবার সমালোচনায় একথাও স্বীকার করা দরকার যে, ট্র্যাজেডি-নাটকের যে পরিমাণ রূপ-বাস্তবতা থাকা আবশ্যক, যার কারণে ট্র্যাজেডি-নাটকের সমস্যাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, এই নাটকে সেই রূপ-বাস্তবতার অভাব আছে। রবীন্দ্রনাথ 'ভগ্নহৃদয়ে'র ভূমিকায় বলেছেন, "নাটক ফুলের গাছ।" কিন্তু প্রকৃত গাছ হতে হ'লে গাছের মূলকে মাটির যতগভীরে যেতে হয়, এই নাটকের পাত্র পাত্রীরা নাটকের মাটি অর্থাৎ বাস্তবের সঙ্গে তত গভীরভাবে সংযুক্ত নয়। ঘটনা-গত নাটকীয় দ্বন্দ্বের পরিবর্তে এখানে হৃদয়াবেগের তরল উচ্ছ্বাসেরই প্রাবল্য দেখা যায়। হৃদয়ের তরল রোমান্সকে নাটকে এইভাবে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়ায়, নাটকটিকে সাধারণ ট্র্যাজেডি না ব'লে তরল রোমান্সের ট্র্যাজেডি বলাই অধিকতর সঙ্গত। এই সমালোচনা কেবল "নলিনী" সম্পর্কেই নয়, 'বনফুল', 'ভগ্নহৃদয়' সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

'নলিনীর' দু'বছর পরেই 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬-৮৭) প্রকাশিত হয়। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যকে সাধারণতঃ রবীন্দ্রনাথের জীবনবাদী কাব্য নামে অভিহিত করা হয়। কবি-সুহৃদ আশুতোষ চৌধুরীও সম্ভবতঃ এই কারণেই 'কড়ি ও কোমলের' কবিতাগুলিকে যথোচিত পর্যায়ে সাজিয়ে "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে"– এই কবিতাটিকে গ্রন্থের প্রথমে সন্নিবিষ্ট করেন। তাঁর মতে এই কবিতাটির মধ্যেই সমস্ত গ্রন্থের মর্মকথাটি আছে।[১৫]

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের মধ্যে যে জীবনের আনন্দকে ধরবার চেষ্টা করেছেন, তা ঠিকই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই কাব্যের প্রথম দিকের কয়েকটি কবিতায় কবিচিত্তের বিষণ্ণতার রেশ খুঁজে পাওয়া যায়। এই বিষণ্ণতা 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র যুগের বিষণ্ণতার মতো প্রবল না হলেও তা যে সম্পূর্ণ অবসিত হয়ে যায়নি, প্রথমদিকের ঐ কবিতা কয়টিতেই তার প্রমাণ আছে।

'যোগিয়া' কবিতায় সুন্দর রবির কিরণোজ্জ্বল দিনের মধ্যেও যোগিয়া রাগিণীকে তিনি শুনেছেন—

"ভাবিতেছি মনে মনে   কোথা কোন্ উপবনে
কী ভাবে সে গাইছে না জানি,
চোখে তার অশ্রুরেখা,   একটু দেছে কি দেখা,
ছড়ায়েছে চরণ দু'খানি।

---

১৫. রবীন্দ্র জীবনী, ১ম, (১৩৬৭), পৃ. ২১৭

তার কি পায়ের কাছে বাঁশিটি পড়িয়া আছে
আলোছায়া পড়েছে কপোলে।
মলিন মালাটি তুলি ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি
ভাসাইছে সরসীর জলে।"

'কাঙালিনী' কবিতায় দুঃখী মানুষের প্রতি সহানুভূতি স্পষ্ট হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। মানুষের চোখের জলে সমস্ত উৎসব ব্যর্থ—

আজি এই উৎসবের দিনে
কত লোক ফেলে অশ্রুধার,
গেহ নাই, স্নেহ নাই আহা,
সংসারেতে কেহ নাই আর।
শূন্য হাতে গৃহে যায় কেহ
ছেলেরা ছুটিয়া আসে কাছে,
কী দিবে কিছুই নেই তার
চোখে শুধু অশ্রুজল আছে।
অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি,
জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব।

'পাষাণী মা' কবিতায় জননীর কাছে কবির জিজ্ঞাসা—

"কেন হেথা পাষাণ পরাণ,
কেন সবে নীরস নিষ্ঠুর।
কেঁদে কেঁদে দুয়ারে যে আসে
কেন তারে করে দেয় দূর।"

'বিরহীর পত্র', 'মঙ্গলগীত' কবিতা দু'টিতেও জীবনের নশ্বরতার বেদনা, তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতার জন্য ক্ষোভ এবং দুঃখ প্রকাশ পেয়েছে। জগৎ সংসারের অনেক কিছুরই অন্তরালে এইভাবে দুঃখও বেদনাকে প্রত্যক্ষ করায় কবিচিত্তে যে একটি নৈরাশ্য ও দুঃখ-সহিষ্ণুতার ভাব জেগেছিল তা 'কড়ি ও কোমলে'ও প্রকাশিত হয়েছে। জগৎ সংসার সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্দ্র-কবিজীবনের মূল দৃষ্টিভঙ্গি না হলেও, এই দৃষ্টিভঙ্গি ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনাকে গড়ে তুলেছিল।

'কড়ি ও কোমলের' একবছর পরে প্রকাশিত হয় 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮)। 'কড়ি ও কোমলে'র বেশ কিছু কবিতায় কবির প্রণয়-তৃষ্ণা এবং সৌন্দর্যপ্রিয়তা প্রকাশ পেয়েছে। সেই প্রণয়তৃষ্ণা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা যদি মোহগ্রস্ত হয়ে ওঠে, তা হলে তা জীবনে যে ট্র্যাজেডি আনয়ন করে, সেই ট্র্যাজেডি প্রকাশ পেয়েছে 'মায়ার খেলায়।' নাটকটি করুণ-রস-সিক্ত। মোহমায়ার স্বপ্নে মানুষ সুখের মরীচিকার পিছনে ছুটে বেড়ায়, এইভাবে ছুটতে ছুটতে একদিন ক্লান্ত হয়ে বুঝতে পারে, আকাঙ্ক্ষিত সুখ অনায়ত্ত রয়ে গেল, এবং এই সুখের মধ্যে খুঁজেছিল যে প্রেমকে, সেই প্রেমকেও জীবনে বরণ করা গেল না। মোহ-মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে প্রেমকে চাইলে কখনোই তা পাওয়া যায় না। যতক্ষণ মানুষের দৃষ্টি মোহমুগ্ধ, ততক্ষণ সে 'কারে ছেড়ে কারে চায়।' কিন্তু এই মোহের একটা মায়াজাল পৃথিবীতে আছেই, এবং নর-নারী তা থেকে অব্যাহতি কিছুতেই পায় না। এই মায়ার ছলনাতেই তারা যা চায় তা ভুল করে চায়, আর যা পায় তা চায় না। মানুষের জীবনের এই ট্র্যাজেডিই 'মায়ার খেলা' নাটকে দেখানো হয়েছে। 'রাজা ও রানী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ মানুষের জীবনের এই ট্র্যাজেডিকেই স্পষ্টতর করেছেন। যৌবনসৌন্দর্যের প্রতি মানুষের একটা মোহ আছেই, সে পিপাসা মানুষের অদম্য এবং অনস্বীকার্য। কিন্তু সে পিপাসার চরিতার্থতা কিসে? শান্তি কোথা? দেহের-সুন্দরী মানস-সুন্দরীতে পরিণত হয় কই?—এই আর্তি এবং এই বেদনা এই সময়ে কবিচিত্তকে ভারাক্রান্ত করেছিল। " 'কড়ি কোমলে'র যৌবন সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ ও 'মানসী'র মানস-সুন্দরীর জন্য অন্বেষণজনিত দুঃখবাদ—এই দুই-এর মাঝে যখন কবির মন দোল খাইতেছে, তখনই 'মায়ার খেলা' রচিত হয়। তাহার লিখিবার কারণ যাহাই হউক না কেন—লিখিবার সময় সে যুগের মনের প্রধানতম সুরটি কবি না প্রকাশ করিয়া থাকিতে পারেন নাই।"[১৬] বলা বাহুল্য এই সুরটি হচ্ছে মোহ ও প্রেমের দ্বন্দ্ব,—এর ট্র্যাজেডিই 'মায়ার খেলা'র উপজীব্য বিষয়।

'মায়ার খেলা' নাটকের সপ্তম দৃশ্যটিই সবচেয়ে বেশী দুঃখভারাক্রান্ত। অমর ও প্রমদার ভুল বোঝাবুঝির ফলে অমর ও শান্তার মিলন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই আপন-কারণে প্রণয়-বিড়ম্বিতা প্রমদা অমর-শান্তার মিলন-স্থলে উপস্থিত হয়। প্রমদাকে দেখে অমরের পূর্ব-প্রণয়

১৬. রবীন্দ্র জীবনী, ১ম, (১৩৬৭), পৃ. ২৪৭-৮।

উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। তাই দেখে অমরের সুখের জন্য শান্তা অমর-প্রমদার মিলন ঘটাতে চায়। কিন্তু অভিমান-ক্ষুণ্ন, বেদনা-বিধুর প্রমদা এই সদয় সৌভাগ্য গ্রহণ করতে চায় না, তার কাছে বরং বেদনাহত, অশ্রুময় জীবনই বেশী বরণীয়। তাই সে বলে—

"ফুরায়ে গিয়াছে বেলা, এখন এ মিছে খেলা,
নিশান্তে মলিন দীপ জ্বলে অকারণ।"

প্রমদার সখীরা বলে,—

"অশ্রু যবে ফুরায়েছে তখন মুছাতে এলে,
অশ্রুভরা হাসি ভরা নবীন নয়ন ফেলে।"

প্রমদা—

"এই লও এই ধরো, এ মালা তোমরা পরো,
এ খেলা তোমরা খেল, সুখে থাক অনুক্ষণ।"

শেষ পর্যন্ত অমর ও শান্তার মিলনই সাধিত হল। প্রমদা নিজেকে প্রত্যাহার করে নিল আসর থেকে। তার এই স্বেচ্ছায় পরাজয় বরণের মধ্যে যেমন মহিমা আছে, তেমনি কারুণ্যও আছে যথেষ্ট। তাই ঘটনাটি এখানে ট্র্যাজেডির স্বাদের সূচনা করে।

প্রমদার শেষ গানটি তার আকস্মিক ট্র্যাজেডিকে অত্যন্ত করুণ করে তুলেছে—

"হায় হায় এ সংসারে যদি না পুরিল
আজন্মের প্রাণের বাসনা,
চলে যাও ম্লানমুখে, ধীরে ধীরে ফিরে যাও,
থেকে যেতে কেহ বলিবে না।
তোমার ব্যথা, তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে
আর তো কেহ অশ্রু ফেলিবে না।"

'মায়ার খেলা' নাটকের প্রেমতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয় বলেছেন, "মায়ার খেলার অবসান প্রেমে, কিন্তু সে প্রেম দুঃখের সঙ্গে জড়িত। শান্তা, অমর, প্রমদা কেহই সুখী হইল না, কিন্তু প্রত্যেকেই প্রেমের স্বরূপকে চিনিতে পারিল ইহা সুখ না হইলেও মহৎ সান্ত্বনা।"[১৭]

১৭. রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ (পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ), (১৯৬৬), পৃ. ৯-১০।

'মায়ার খেলা'র কবি লিখিত বিজ্ঞাপন অনুসারে বোঝা যায় যে, 'মায়ার খেলা' পূর্বতন 'নলিনী' নাটকেরই সংশোধিত রূপ! রূপের দিক থেকে 'মায়ার খেলায়' 'নলিনী' নাটকটি সংশোধিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সুরের দিক থেকে 'নলিনী'র সুর 'মায়ার খেলা'তেও অব্যাহত আছে। এই সুর ট্র্যাজেডির সুর, যা করুণরসের উদ্বোধন ঘটায়।

'ভগ্নহৃদয়ের' মতো 'মায়ার খেলাতে'ও সকলেরই হৃদয় ভেঙেছে। দুঃখ সকলেরই। একমাত্র শান্তা ছাড়া আর সকলেই মায়ার ছলনায় সুখ-মরীচিকার পিছনে ছুটে ছুটে সুখশান্তি বিসর্জন দিয়েছে,—প্রকৃত প্রেমের সন্ধানে ভুল পথে ছুটোছুটি ক'রে জীবনের সমস্ত সুখ ও সম্ভাবনাকে করেছে নিঃশেষিত। এইটাই মানুষের জীবনের একটা ট্র্যাজেডি। কারণ, মানুষ ভুল করে প্রেমের মধ্যে ব্যর্থ অন্বেষণ করে সুখের। ফলে মানুষ দুইই হারায়—

"এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,
—শুধু সুখ চলে যায়।
—এমনি মায়ার ছলনা
এরা ভুলে যায়, কারে ছেড়ে কারে চায়।"

মানুষের এই ট্র্যাজেডি আধ্যাত্মিক। কারণ আত্মার অন্তর্নিহিত এক তৃষ্ণা থেকে যেখানে মানুষের সুখ-শান্তি নষ্ট হয়ে যায়,—তৃষ্ণায় পাগল হয়ে জীবন যেখানে কেঁদে কেঁদে মরে—মরীচিকার পিছনে ছুটে ছুটে জীবন যেখানে নিঃশেষিত হয়ে যায়, সেখানে ট্র্যাজেডির যে রূপ দেখা যায়, তা সাধারণ ট্র্যাজেডির রূপ নয়, তা আধ্যাত্মিক ট্র্যাজেডির রূপ। এবং ট্র্যাজিক ভ্রান্তি সেখানে নৈতিক নয়, আধ্যাত্মিক।[১৮] জীবনব্যাপী এক সুতীব্র তৃষ্ণার মধ্যেই এইসব ট্র্যাজেডির বীজ নিহিত।

প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক সংকটের ট্র্যাজিক রূপটি খুব স্পষ্ট আকারে ধরা পড়েছে। বাসনা ও বিবেকের মধ্যে, প্রবৃত্তির ও নিবৃত্তির মধ্যে, মোহের ও প্রেমের মধ্যে, বিশেষের ও নির্বিশেষের মধ্যে,—এককথায় সীমার ও অসীমের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত না হলে, জীবনের ভারসাম্য

---

১৮. Tragic guilt is not ethical, it is on the contrary, metaphysical that is to say, innate."

—Julius Bab: (Quoted from The Harvest of Tragedy: T. R. Henn, (1956), p. 74.

নষ্ট হয়ে যায়,—একটি বিশেষ প্রবণতার প্রাবল্যে জীবনে শোচনীয় পরিণতি দেখা দেয়। কিন্তু এই সামঞ্জস্যের পথে প্রধান অন্তরায় মোহ। মোহ সমস্তপ্রকার সামঞ্জস্যের বিরোধী। মোহের স্বভাবই এই যে সে কামনার বস্তুকে, তার সমস্ত সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে, ভোগের লালসা দিয়ে গ্রাস করে নিতে চায়। যত তীব্র এই কামনা, তত উগ্র সম্মোহ এবং তত অনিবার্য তার শোচনীয় পরিণতি। মোহ থেকেই স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশ থেকে বুদ্ধিনাশ, এবং বুদ্ধিনাশ থেকে সর্বনাশ।[১৯] তিলে তিলে গড়ে ওঠা জীবনের ট্র্যাজেডির এই রূপটি রবীন্দ্রনাথ অল্পবয়সেই উপলব্ধি করেছিলেন এবং সমকালীন রচনায় তার পরিচয়ও রেখে গেছেন।

'মায়ার খেলা'র পরের বছর "রাজা ও রানী" (১৮৮৯) এবং তার পরের বছর "বিসর্জন" (১৮৯০) প্রকাশিত হয়েছে। "বিসর্জনে"র সঙ্গে একই বছরে প্রকাশিত হয় "মানসী" (১৮৯০)। এই সমস্ত রচনায় রবীন্দ্রনাথের পরিণত কবিমানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়! বিশেষতঃ "রাজা ও রানী" এবং "বিসর্জনে" রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা একটা সুস্পষ্ট রূপ লাভ করেছে। তাই এই সব রচনাকে রবীন্দ্র ট্র্যাজেডি-চেতনার মানসিক প্রস্তুতির যুগের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। মানসিক প্রস্তুতির যুগ 'মায়ার খেলা' রচনার সঙ্গে সঙ্গেই অবসিত। এই পরিচ্ছেদের সূচনায় যাকে রবীন্দ্রকবিজীবনের প্রাক্—'মানসী' পর্ব বলা হয়েছে, রবীন্দ্র ট্র্যাজেডি-চেতনার ইতিবৃত্তে সেই পর্ব 'মায়ার খেলা' পর্যন্তই বিস্তৃত। এ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিভাবনা কঠিন বাস্তবকে পাশ কাটিয়ে চলেছে। যে সমস্ত রচনায় রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা বা চেতনার মানসিক প্রস্তুতি লক্ষ্য করা গেছে, সেই সমস্ত রচনারও স্থান-কাল-পাত্রপাত্রী কেমন যেন স্বপ্নের, কল্পনার (কেবলমাত্র 'রুদ্রচণ্ড'কেই ব্যতিক্রম হিসেবে মেনে নেওয়া যেতে পারে),—কঠিন বাস্তবের পরীক্ষিত সত্য যেন তখনও কবিমনের বাইরে অপেক্ষা করছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর মনের এই অবস্থাটা বুঝেছিলেন। তিনি তাঁর কবিজীবনের ইতিবৃত্ত প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন, 'মানসী'র পূর্ববর্তী কবিতা-গ্রন্থ 'কড়ি ও কোমল' রচনার পরে "একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া

---

১৯. "ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।" —গীতা, ২।৬৩

আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে-সমস্ত ভালোমন্দ সুখ-দুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে, তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মতো করিয়া হালকা করিয়া দেখা আর চলে না। এখানে কত ভাঙাগড়া, কত জয়-পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন।......সেই আশ্চর্য পরম রহস্যটুকুই যদি না দেখানো যায়, তবে আর যাহা কিছুই দেখাইতে যাইব তাহাতে পদে পদে কেবল ভুল বুঝানোই হইবে। ......অতএব খাসমহলের দরজার কাছে পর্যন্ত আসিয়া এইখানেই জীবনস্মৃতির পাঠকদের কাছ হইতে আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।"[২০]

'কড়ি ও কোমলে'র পরের কাব্যগ্রন্থই 'মানসী', এবং 'মানসীর' মধ্য-দিয়েই রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের 'খাসমহলে' প্রবেশ করেছেন! আবার 'মানসী'র সঙ্গে একই বছরে প্রকাশিত হয় 'বিসর্জন' এবং তার একবছর পূর্বে 'রাজা ও রানী'। 'মায়ার খেলা' প্রকাশিত হয় 'কড়ি ও কোমল' এবং 'রাজা ও রানীর' মাঝখানে। সুতরাং জীবনের খাসমহলের সত্যসমৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার পরিপূর্ণরূপকে আমরা পেতে থাকব 'রাজা ও রানী' এবং 'বিসর্জন' থেকে। কিন্তু তার পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার যে মানসিক প্রস্তুতির পর্ব, তার মধ্যে একটা বিষয় আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষণীয় যে, এই পর্বে যে সমস্ত আখ্যানের মধ্যদিয়ে তাঁর ট্র্যাজেডি-চেতনার মানসিক প্রস্তুতি গড়ে উঠেছে, সেই সমস্ত আখ্যানের ট্র্যাজেডিরসের বিভাব-অনুভাবের বাস্তবভিত্তিক বিশ্বাসযোগ্যতা কম থাকলেও তত্ত্বের দিক থেকে তিনি তাঁর ট্র্যাজেডি-চেতনার স্বরূপটিকে ঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। কেন জীবনে ট্র্যাজেডি সংঘটিত হয় আর জীবনে সেই ট্র্যাজেডির মূল্য কতখানি—এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিণত জীবনে পরিপূর্ণভাবেই পেয়েছেন এবং পরিণত-জীবনের সাহিত্যে তার পরিচয়ও প্রদান করেছেন। কিন্তু তার পূর্বের অপরিণত জীবনেও সেই উত্তরের আভাস তিনি পেয়েছিলেন। 'মায়ার খেলা' পর্যন্ত রচিত সাহিত্যে সেই আভাসের পরিচয় পাওয়া যায়। এইজন্যই 'মায়ার খেলা' পর্যন্ত পর্বকে রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার মানসিক প্রস্তুতির পর্ব বলা যেতে পারে।[২১]

---

২০. জীবনস্মৃতি (১৩৬৬) পৃ. ১৫১—২।

২১. করুণা (১৮৭৭-৭৮), 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩-৮৪) 'রাজর্ষি' (১৮৮৬-৮৭) কালের দিক থেকে এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত হলেও, এই পর্বে আলোচিত হয়নি। কারণ এই সমস্ত রচনার

রবীন্দ্রনাথও জীবনের বেদনাময়তাকে মানতেন, কিন্তু এই বেদনা যে জীবনকে ভেঙে দেয়, জীবনের সেই ভেঙে পড়াকে রবীন্দ্রনাথ চূড়ান্ত ব'লে মানেন নি। জীবনের এই ভাঙার মধ্যদিয়েও মানুষ আরও বৃহৎ সত্যকে লাভ করতে পারে বলেই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ছাব্বিশ বছর বয়সে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুজনিত যে বেদনা, সেই বেদনার মধ্যদিয়েও রবীন্দ্রনাথ এই রকম সত্যের খোঁজ পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, "তবু এই দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হইতাম। জীবন যে একেবারে অবিচলিত নিশ্চিত নহে, এই দুঃখের সংবাদেই মনের ভার লঘু হইয়া গেল। আমরা যে নিশ্চল সত্যের পাথরে-গাঁথা দেয়ালের মধ্যে চিরদিনের কয়েদি নহি, এই চিন্তায় আমি ভিতরে ভিতরে উল্লাস বোধ করিতে লাগিলাম। যাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে ছাড়িতেই হইল, এইটাকে ক্ষতির দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম তেমনি সেইক্ষণেই ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম।"[২২]

রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার এই বিশিষ্টতা শৈল্পিক পরিমণ্ডল লাভ করেছিল অনেক পরে,—রবীন্দ্রনাথের পরিণত সাহিত্য সাধনার যুগে। ধারাবাহিকভাবে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, ছোটগল্প ও নাটকের আলোচনার মাধ্যমে আমরা রবীন্দ্রনাথের সেই বিশিষ্ট ট্র্যাজেডি-চেতনার অভ্যুদয় লক্ষ্য করব

আখ্যানভাগের একটা বস্তুগত ভিত্তি আছে, এই পর্বের অন্যান্য রচনার সঙ্গে এইখানেই এই তিনটি গদ্য রচনার পার্থক্য। এইজন্য স্বপ্নকল্পনা ভিত্তিক আখ্যানের পর্বে এদের গ্রহণ করা হয়নি। এদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা নরনারীর বস্তুগত জীবনসমস্যা নিয়ে গড়ে উঠেছে ব'লে সাধারণ উপন্যাসের পর্বে এদের গ্রহণ করা হয়েছে।

২২. জীবনস্মৃতি (১৩৬৬): মৃত্যুশোক, পৃ. ১৪৫।

প্রসঙ্গ—ঘ | রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা : উপন্যাসে

রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা, বা ট্র্যাজিক জীবনবোধের পরিচয় আরো স্পষ্টভাবে পাওয়া যাবে তাঁর উপন্যাসে। উপন্যাসে তিনি বাস্তবের নারী-পুরুষকে গ্রহণ করেছেন এবং তাদের চরিত্র চিত্রায়ণের মাধ্যমে তাদের জীবনের দুঃখ, বেদনা, বঞ্চনা, হতাশা প্রভৃতি যা কিছু জীবনকে ট্র্যাজিক ক'রে তোলে, সেই সব কিছুকেই তিনি স্পষ্ট ক'রে দেখিয়েছেন। চরিত্রগুলি বাস্তব থেকে গৃহীত বলেই তাদের দুঃখে-বেদনায় আমরা সুগভীর করুণা অনুভব করি। কবিতায় বা কল্পনাশ্রয়ী রচনায় কবিচিত্তের বিষাদমগ্নতার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ট্র্যাজেডির প্রকৃত রসের স্বাদ সেখানে পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক চরিত্র ইতিহাসের দিক থেকে বাস্তব। তাই ঐতিহাসিক চরিত্রের ট্র্যাজেডিতেও আমরা গভীরভাবে অভিভূত হই। কিন্তু যে চরিত্রগুলি কোনোদিনই ধূলো-মাটির পৃথিবীতে অবস্থিত নয়, যাদের পরিবেশ বাস্তব সংসার থেকে সম্পূর্ণ-ই পৃথক এবং কাল্পনিক, দুঃখে, বেদনায় তাদের জীবনেও ট্র্যাজেডি ঘটতে পারে। কিন্তু সে ট্র্যাজেডি আমাদের ততটা অভিভূত করেনা, যতটা করে বাস্তবসংসারে আমাদের পরিচিত এবং আমাদের সমধর্মী একটি চরিত্রের ট্র্যাজেডি।

'করুণা' (১৮৭৭-৭৮) রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে যে সব রবীন্দ্ররচনার আলোচনা করা হয়েছে, তাদের সকলের পূর্বে এই উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। সুতরাং রচনাটি রবীন্দ্রনাথের নিতান্ত অল্প বয়সের। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বাস্তবের জীবন-সমস্যা এখানে আলোচিত হয়েছে, বাস্তবের নারী-পুরুষ এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রী। তাই তাদের ট্র্যাজেডির স্বাদ 'বনফুল' প্রভৃতি রোমান্টিক-কল্পনাশ্রয়ী রচনার ট্র্যাজেডির স্বাদ থেকে ভিন্নতর। এ ট্র্যাজেডি প্রকৃত রক্ত-মাংসের মানুষের জীবনের ট্র্যাজেডি। রবীন্দ্রনাথ কতদূর নৈপুণ্যের সঙ্গে এই ট্র্যাজেডিকে চিত্রিত করতে পেরেছেন, সেটা অবশ্য আলোচনার বিষয় হতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত শিক্ষিত বাবু-সমাজের দুর্নীতিগ্রস্ত, আত্ম-প্রবঞ্চক জীবনের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসকে রচনা করেছেন। যে সমস্ত মানুষ এই উপন্যাসে উপস্থিত, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সংস্কারক, কেউ কবি, কেউ শিক্ষাভিমানী। বাইরের কোনো হুজুগ-আন্দোলনের প্রতি যে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন ছিলনা, বরং বিরাগ ছিল, এই সব বাবুদের তথাকথিত সংস্কার আন্দোলনের অভ্যন্তরস্থিত দুর্নীতির দিকে অঙ্গুলি সংকেত ক'রে কিশোর বয়সের রবীন্দ্রনাথ তা জীবনের সুরুতেই প্রকাশ করেছেন।

উপন্যাসে মূলতঃ দুটি কাহিনী—নরেন্দ্র-করুণা এবং মহেন্দ্র-রজনীর। মহেন্দ্র-রজনীর গল্পের মধ্যে রজনীর জীবনে যথেষ্ট দুর্যোগ-দুর্দশা দেখা দিলেও, তা শেষ হয়েছে মিলনের মধ্য দিয়ে। এইজন্য রজনীর জীবনে ট্র্যাজেডির উপকরণ থাকা সত্ত্বেও, তার কাহিনী শেষ পর্যন্ত ট্র্যাজেডিতে পরিণত হয়নি।

মহেন্দ্র লোকটির মধ্যে অনেক গুণ ছিল। সে মেধাবী ছাত্র, ধীর-স্থির। কিন্তু পাশের বাড়ীর যুবতী বিধবা মোহিনীর প্রতি তার মোহ তাকে ক্রমশঃ বিপথগামী করে তুলল—এবং সেই সূত্র ধরেই সুরু হ'ল পত্নী রজনীর প্রতি তার অত্যাচার, ঘৃণা ও বিরক্তি। কিন্তু প্রেমময়ী রজনী সবকিছু সহ্য করে। "মহেন্দ্রের অসম্বৃত অবস্থায় রজনীর ইচ্ছা করিত তাহাকে বুক দিয়া ঢাকিয়া রাখে, যেন আর কেহ দেখিতে না পায়।···সে তাহার মহেন্দ্রের জন্য দেবতার কাছে কত প্রার্থনা করিয়াছে, কিন্তু মহেন্দ্র তাহার মত্ত অবস্থায় রজনীর মরণ ভিন্ন কিছুই প্রার্থনা করে নাই।" মহেন্দ্রের ঘৃণা মিশ্রিত অত্যাচারের পাশে রজনীর এই প্রেমপূর্ণ ব্যবহার রজনীর চরিত্রকে যেমন উজ্জ্বল করে তুলেছে. তেমনি করুণ করেও তুলেছে। মহেন্দ্র যদি রজনীর উপযুক্ত প্রেমময় স্বামী হিসেবে নিজেকে পরিচিত করত, তবে রজনীর এই গুণগুলি বিশেষ বিবেচ্য হত না, করুণ মনে তো হ'তই না। কিন্তু মানুষ তার সমস্ত আন্তরিকতা সত্ত্বেও যদি উত্তরোত্তর প্রতারিতই হয় কেবল, তবে তার প্রতি আমাদের সমবেদনা, দুঃখ জাগেই। এখানেও মহেন্দ্রের পৈশাচিক প্রতারণা ও দুর্বৃত্ততার জন্যই প্রেমময়ী রজনীর চিত্র আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে, আমরা তার জন্য দুঃখিত হই।

এই কাহিনীতে আরো অনেক স্থানেই রজনীর প্রেমপূর্ণ, সহনশীল, স্বামী-সর্বস্ব মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়—যার পাশাপাশি মহেন্দ্রের মধ্যে দেখা যায় শুধু বিবেকহীন, নীতিহীন প্রতারণা। সেইজন্য এইসব স্থানের

প্রত্যেকটিতেই রজনীর জন্য আমরা অশ্রুপাত করি। কিন্তু রজনীর প্রেম শেষ পর্যন্ত মহেন্দ্রকে জয় করেছিল, তাদের মধ্যে মিলন ঘটিয়েছিল, এইখানেই তার অবিচল স্বামীপ্রেমের সাফল্য—এবং এইখানেই তার জীবনের এতদিনকার সমস্ত দুঃখজ্বালা মিলনান্তক পরিণতির অর্থময়তা লাভ করে।

কিন্তু নরেন্দ্র-করুণার কাহিনীর পরিসমাপ্তি বিষাদের মধ্যেই। বিষাদের মধ্যেই পরিসমাপ্তি করুণার জীবনের। নরেন্দ্র করুণার পিতার পোষ্যপুত্রের মতোই। করুণার পিতা নরেন্দ্রের শিশুকাল থেকেই যথেষ্ট যত্ন নিয়েছেন, যাতে সে মানুষ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সে কোলকাতার কলেজে পড়তে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বিপথগামী হয়ে ওঠে। এই রকম সময়েই করুণার পিতার মৃত্যু হয়, এবং করুণার সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে যায়। ইতোমধ্যেই নরেন্দ্র মদ্যপান প্রভৃতি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। কাজেই গ্রামের লোকেরা তাকে জাতিচ্যুত করেছে এবং এতে সে খুশি হয়েই গ্রাম পরিত্যাগ করে কোলকাতায় বাস করতে স্নরু করল।

করুণার জীবনে অশান্তি নরেন্দ্রের সঙ্গে বিবাহের পর থেকেই ছিল, কিন্তু এখন নরেন্দ্রের কোলকাতা বাসের পর থেকে তা [illegible] পরিণত হতে থাকে। নরেন্দ্র বাড়ীতে আসে না কেন এ প্রশ্নের [illegible] সন্তোষজনক উত্তর সে কারো কাছে পায়না। আশৈশব অভিমানিনী করুণা অভিমান করারও মানুষ পায় না।

অবশেষে একদিন নরেন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করল এবং তারপর থেকে বড় একটা কোলকাতায় যায় না। এর কারণ অবশ্য এই নয় যে, সে করুণার প্রতি সদয় হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পাওনাদারদের ভয়ে সে বড় একটা কোলকাতায় যেতে চায় না। কিন্তু এতেই করুণার অনেক আহ্লাদ। স্বামী সম্পর্কে যে-সব নিন্দা সে ইতস্ততঃ শুনে থাকে, সে সব কথা আহ্লাদে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করতেও সে ভুলে যায়।

কিন্তু নরেন্দ্রর স্বভাব-চরিত্র যথাপূর্বম্ আছে। করুণার প্রতি তার বিরক্তি ঘৃণা, অশ্রদ্ধা সবই রয়েছে। করুণার সেবা ও ভালোবাসাকে সে পদাঘাতে লাঞ্ছিত করে। "সরলা সমস্তই নীরবে সহ্য করিতেছে, একটি কথা কহে নাই, নরেন্দ্রের নিকটে এক মুহূর্তের জন্য রোদনও করে নাই। একদিন কেবল অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া অনেকক্ষণ নরেন্দ্রের মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া-

ছিল, 'আমি তোমার কী করিয়াছি।'—নরেন্দ্র তাহার উত্তর না দিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়।"

নরেন্দ্র ঋণের দায়ে ধরা পড়ল এবং তার জেল হ'ল। করুণা দুশ্চিন্তায় আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে ভেবে পেলনা কি করা যায়। শেষে পণ্ডিত মহাশয়ের সাহায্যে ঘরের জিনিস-পত্র বিক্রয় ক'রে, ভিক্ষা ক'রে সে ঋণ শোধ করে দিল, এবং নরেন্দ্র মুক্তিলাভ করল কারাগার থেকে। নরেন্দ্র "কিন্তু ঋণ হইতে মুক্ত হইল না, তদভিন্ন এই ঘটনায় তাহার কিছুমাত্র শিক্ষাও হইল না। যে রকম করিয়াই হউক না কেন, এখন মদ না হইলে তাহাঁর আর চলে না। করুণার প্রতি কিছুমাত্র সদয় হয় নাই, করুণা গার্হস্থ্য দ্রব্যাদি কেন অমন করিয়া বিক্রয় করিল, তাহাই লইয়া নরেন্দ্র করুণাকে যথেষ্ট পীড়ন করিয়াছে।"

নরেন্দ্রের কোলকাতার দুই বন্ধু গদাধর এবং স্বরূপচন্দ্র নরেন্দ্রের গ্রামের বাড়ীতে বেশ কিছুদিন যাবৎ বাস করছে। এরা উভয়েই দুর্নীতিগ্রস্ত, ভণ্ড, ভদ্রসন্তানের ভেকধারী। স্বরূপচন্দ্রের নজর করুণার প্রতি। করুণাকে উদ্দেশ্য ক'রে তার কাব্য উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। কতকগুলি কাল্পনিক সূত্রকে অবলম্বন করে পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গী অতিবুদ্ধি নিধিরাম স্বরূপচন্দ্রের এই মনোভাবটি জেনে ফেলে। কিন্তু সে এর জন্য দোষী বিবেচনা করে করুণাকে এবং নিজের এই সুবিবেচনাকে সে যথারীতি নরেন্দ্রের কর্ণগোচর করে। মাথায় একবার ধারণা বদ্ধমূল হলে, কারণ খুঁজতে কষ্ট হয় না। এই রকমই একটি কল্পিত কারণকে অবলম্বন ক'রে নরেন্দ্র প্রমাণ করল, করুণা ব্যভিচারিণী। তারপর সেই মিথ্যা অভিযোগ এবং কলঙ্ক নিষ্পাপ করুণার মাথায় চাপিয়ে একদিন গভীর রাত্রিতে নরেন্দ্র করুণাকে গৃহ হ'তে বিতাড়িত করে দেয়।

করুণা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে একবার বাড়ীর দিকে ফিরে তাকাল, তারপর গ্রামের পথে চলতে সুরু করল। "কতকদূর গিয়া আর একবার ফিরিয়া চাহিল, দেখিল সেই বিজন কক্ষে একটিমাত্র মুমূর্ষু প্রদীপ জ্বলিতেছে। ছেলেবেলা যাহারা করুণাকে সুখে খেলা করিতে দেখিয়াছে, তাহারা সকলেই আপন কুটীরে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। তাহাদের সেই কুটীরের সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে করুণা চলিয়া গেল। আর একবার ফিরিয়া চাহিল, দেখিল তাহার পিতার কক্ষে এখনো সেই প্রদীপটি জ্বলিতেছে।"

ভাগ্যদোষে পরদিন পথে করুণার সঙ্গে স্বরূপচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয় এবং নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় করুণা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় স্বরূপচন্দ্রের সঙ্গেই

এলাহাবাদ যেতে রাজী হয়ে যায়। কিন্তু কাশীতে গিয়ে স্বরূপ আবিষ্কার করে, করুণা আদৌ তার প্রণয়াসক্ত নয়, বরং স্বরূপকে সে এড়িয়ে চলতে চায়।

ইতোমধ্যে পণ্ডিত মহাশয় বিবাগী হয়ে কাশীবাসী হয়েছেন। তার সঙ্গে কাশী রেল স্টেশনে স্বরূপসহ করুণার সাক্ষাৎ হয়ে যায়। করুণা পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গ নিতে চায়, কিন্তু নিধির পরামর্শে পণ্ডিত মহাশয় করুণাকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। স্বরূপও পণ্ডিত মশাইকে দেখে পলায়ন করে। ফলে কাশী স্টেশনে হতচৈতন্য করুণা একাকিনী। রবীন্দ্রনাথ করুণার জীবনের দুঃখকে এইভাবে ক্রমশঃ বাড়িয়ে তুলে, তার জীবনকে শোচনীয় ট্র্যাজেডির দিকে নিয়ে চলেছেন।

এই সময় অপর কাহিনীর নায়ক মহেন্দ্র অনুতাপে দগ্ধ হয়ে, রজনীর প্রেমের মূল্য উপলব্ধি ক'রে লাহোর থেকে বাড়ী ফিরছে। পথে কাশীতে করুণার সঙ্গে সাক্ষাৎ। সে সমস্ত বিষয়টি অবগত হয়ে দয়ার্দ্র-চিত্তে করুণাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী আসে এবং রজনীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। মহেন্দ্রের সঙ্গে ভ্রাতাভগ্নী সম্বন্ধ স্থাপন করে করুণা মোটামুটি সুখেই তাদের বাড়ীতে অবস্থান করতে লাগল।

কিন্তু এখানেও মাঝে মাঝেই আবার করুণা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে, মহেন্দ্রের কাছে নরেন্দ্রের সংবাদ জানতে চায়। এখানেই সে নিজের ঠিকানায় একখানা চিঠি পায়—নরেন্দ্রের চিঠি—তিনশত টাকার দাবী—না হলে আত্মহত্যার হুম্‌কী। নরেন্দ্রগতপ্রাণা করুণা মহেন্দ্রের মাধ্যমে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করে।

ক্রমশঃ করুণা নরেন্দ্রের কাছে যাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। নরেন্দ্রের আর্থিক দুর্দশা, অনাচার, পঙ্কিল পরিবেশ প্রভৃতিকে সে বাধা হিসেবে স্বীকার করল না।

শেষে মহেন্দ্র নরেন্দ্র-করুণার জন্য একখানি ভালো বাড়ীর ব্যবস্থা করে এবং সেখানে নরেন্দ্র-করুণা বসবাস সুরু করে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই নরেন্দ্রের অত্যাচার পুরোপুরি সুরু হ'ল। সে করুণার মাধ্যমে মহেন্দ্রের কাছে অর্থ দাবী করতে চায়। করুণা আপত্তি করে। ফলে পীড়িতা বিশীর্ণা করুণার ভাগ্যে তিরস্কার, প্রহার প্রভৃতি জোটে।

নরেন্দ্রের নিপীড়নে করুণা আজ মুমূর্ষু। কিছুদিন যাবৎই তার নরেন্দ্র সম্পর্কে ঔদাসীন্য জন্মেছে। সে সবই দেখে, কিন্তু কিছুই বলে না। জীবনের

বাকী অংশটুকু নির্লিপ্ত থেকে কাটিয়ে দিতে চায়। কিন্তু এখন মৃত্যু একেবারেই সমুপস্থিত। "আজ করুণা একবার নরেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিবার জন্য মহেন্দ্রকে অনুরোধ করিল। নরেন্দ্র যখন গৃহে আসিলেন, তাঁহার চক্ষু লাল, মুখ ফুলিয়াছে, কেশ ও বস্ত্র বিশৃঙ্খল। হতবুদ্ধিপ্রায় নরেন্দ্রকে করুণার শয্যার পার্শ্বে সকলে বসাইয়া দিল। করুণা কম্পিত হস্তে নরেন্দ্রের হাত ধরিল, কিন্তু কিছু কহিল না।"

করুণা ও নরেন্দ্রের যে কাহিনী, তা প্রেম এবং অপ্রেমের কাহিনী। তাই সেখানে প্রেম এবং অপ্রেমের দ্বন্দ্ব। এই ধরনের দ্বন্দ্বে প্রেমের যদি জয় হয়, তবে আমাদের শ্রেয়োবোধ পীড়িত হয় না, আমরা খুশি হই—পরিণতি মিলনাত্মক ও আনন্দময় হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি প্রেম পরাজিত হয়, বিড়ম্বিত হয়, প্রেমের শক্তি যদি অপ্রেমের হৃদয়-হীনতার কাছে নিষ্পেষিত হয়, তবে আমাদের শ্রেয়োবোধ পীড়িত হয়, এবং আমরা সুতীব্র দুঃখ অনুভব করি।[১] আমাদের এই সুতীব্র দুঃখানুভবই ট্র্যাজেডির প্রকৃত স্বাদ।

এই কাহিনীর পরিণতিকে এই জন্যই ট্র্যাজিক মনে হয়। এই ট্র্যাজেডি করুণার জীবনকে অবলম্বন ক'রে তিলে তিলে রচিত হয়েছে। অপ্রেমের হৃদয় হীনতার কাছে করুণা নিজে বিড়ম্বিত হয়েছে, পুত্রের বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয়েছে, স্বচক্ষে স্বামীকে কুলটার বশীভূত দেখতে হয়েছে। এ সব কিছুর মধ্য দিয়ে তার প্রেম আগাগোড়াই পরাজয়ের পথ ধরে এগিয়েছে, এবং মৃত্যুর মধ্যেই তার একমাত্র লাভজনক অবসান খুঁজে পেয়েছে।

প্রেমের এই পরাজয় যে করুণার কাছে কত অসহনীয় হয়ে উঠেছিল, তা বোঝা যায় তার একটি প্রার্থনাতে। সন্তান সম্ভাবনায় সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছে, "এবার তাহার যে সন্তান হইবে সে যেন পুত্র হয়, নারী জন্মের যন্ত্রণা যেন আর কেহ ভোগ না করে।"

---

১. রবীন্দ্র সমসাময়িক বয়োজ্যেষ্ঠ এবং শ্রদ্ধেয় সাহিত্যরসিক এবং বিশিষ্ট লেখক চন্দ্রনাথ বসু-র কাছে করুণার চেয়ে রজনীর দুঃখের তীব্রতাই বেশী অনুভূত হয়েছিল। একটি পত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন, "রজনীর দুঃখে আমার হৃদয় যত গলিয়াছে, করুণার দুঃখে তত গলে নাই।...যখন মহেন্দ্র চলিয়া গেল আর রজনী 'আমি কাছে আসিয়াছিলাম বলিয়া বুঝি তিনি চলিয়া গেলেন' এই ভাবিয়া জানালায় বসিয়া কাঁদিতে লাগিল, তখন, রবীন্দ্রনাথ, আমি যথার্থই ঝর ঝর ধারায় কাঁদিয়াছি।"

তাং ১৭ আশ্বিন (১২৯১)

[দ্রঃ বিশ্বভারতী পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, পৃঃ ৪২২]

এই প্রার্থনা করুণায় মৃত্যুর, এমনকি গৃহ-বিতাড়িত হওয়ারও অনেক পূর্বের। তখনই জীবন সম্পর্কে যে কী অপরিসীম তিক্ততা তার নিজ মনে স্পষ্ট হয়েছিল, এই প্রার্থনাই তার প্রমাণ। নিজের সমগ্র জীবনের ট্র্যাজেডি সে যেন অদৃশ্য দর্পণে ইতোমধ্যেই দেখে ফেলেছে। তাই এই ট্র্যাজিক প্রার্থনা। এই ভাবেই অপ্রেমের কাছে প্রেমের পরাজয়ের ট্র্যাজেডি রবীন্দ্রনাথ এখানে চিত্রিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩-৮৪)। 'বৌঠাকুরাণীর হাট' লিখিত হবার পঞ্চাশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের যে ভূমিকা লিখেছিলেন, তাতে বলেছেন, "প্রাচীর ঘেরা মন বেরিয়ে পড়ল বাইরে, তখন সংসারের বিচিত্র পথে তার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে। এই সময়টাতে তাঁর লেখনী গদ্যরাজ্যে নূতন ছবি, নূতন নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজতে চাইলে। তারি প্রথম প্রয়াস দেখা দিল 'বৌঠাকুরাণীর হাট' গল্পে—একটা রোম্যান্টিক ভূমিকায় মানব চরিত্র নিয়ে খেলার ব্যাপারে, সে-ও অল্প বয়সেরই খেলা।..."

ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের উক্তি থেকে এটাই বোঝা যায় যে, এই উপন্যাসের শিল্প-সাফল্য সম্পর্কে তিনি সন্দিহান, সুতরাং এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে শিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয় পাওয়া যায়, সেই পরিচয়কে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত পরিচয় হিসেবে গ্রহণ না করাই উচিত। কিন্তু ঐ ভূমিকা থেকেই জানা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থটির প্রশংসা করেছিলেন। বস্তুতঃ বঙ্কিমের উপন্যাসের প্রভাবও 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' নানাভাবে পরিলক্ষিত হয়। রুক্মিণী চরিত্র কল্পনা বঙ্কিমের প্রভাবেই সম্ভবতঃ হয়েছে। উপন্যাসের বর্ণনা ভঙ্গিতেও বঙ্কিমের প্রভাব অনুসৃত।

এই উপন্যাসের যে ট্র্যাজেডি-পরিকল্পনা, তার মধ্যেও বঙ্কিমের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের বিভা বঙ্কিমের উপন্যাসের ট্র্যাজেডির দুর্ভাগিনী নায়িকাদের মতোই। সুরমার আকস্মিক এবং শোচনীয় অপমৃত্যু আমাদের যেন বঙ্কিমের উপন্যাসের আবহাওয়ার মধ্যেই নিয়ে যায়।

সুরমার মৃত্যু এই উপন্যাসে যথার্থ-ই ট্র্যাজিক। নিরপরাধা এই পুত্রবধূ অকারণেই শ্বশুর যশোররাজ প্রতাপাদিত্যের রোষের পাত্রী হয়ে উঠেছে, শ্বশ্রূ-র কাছে সাংসারিক অমঙ্গলের হেতুরূপে বিবেচিত হয়েছে, এবং পরিণামে তাকে শ্বশ্রূ-র ষড়যন্ত্রে পরিচারিকার হাতে বিষ-পানে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। উদার প্রাণ স্বামী উদয়াদিত্যের মহানুভবতার সে-ই ছিল একমাত্র সমর্থক।

সুতরাং পারিবারিক ষড়যন্ত্রে তার এই শোচনীয় অপমৃত্যু শুধু একটি নারীর জীবনের অবসান নয়, যে সৌন্দর্য ও মহত্ত্বকে মানুষ চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনা করে এসেছে, সেই সৌন্দর্যের ও মহত্ত্বের অবমাননা, লাঞ্ছনা এবং অনুচিত পরাভব। এইখানেই প্রকৃত ট্র্যাজেডি। সুতরাং সুরমার অপমৃত্যুতে একটা ট্র্যাজেডির ভাব অবশ্যই ফুটে উঠেছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসের যে ট্র্যাজেডিকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন, সেই ট্র্যাজেডির নায়িকা বিভা। রবীন্দ্রনাথ বিভার জীবন-ট্র্যাজেডিকেই যেন মুখ্যতঃ এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। বিভাকে প্রথম যখন দেখি, তখন সে ঠিক স্বামী-পরিত্যক্তা নয়, কিন্তু পিতৃগৃহে স্বামীসঙ্গ বিহীন এক করুণ অবস্থার মধ্যে সে জীবন যাপন করছে। সদ্য যৌবন-প্রাপ্তা বিভার এই অবস্থাটা সুরুতেই তার জীবনের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের সূচনা করেছে। পিতা তার স্বামীকে যথোচিত আদর আহ্বান ক'রে আনার ব্যবস্থা করেন না। সুতরাং স্বামী-প্রণয়-বঞ্চিতা বিভার মনে এ সম্পর্কে অভিমানও কিছু কম নয়।

বিভার জীবনের ট্র্যাজেডি ঘনীভূত হয়েছে তার স্বামীর নির্বুদ্ধিতার জন্যই। যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের অমানবিক নিষ্ঠুরতা, অন্যকে কষ্ট দেওয়ার পৈশাচিক আনন্দপ্রিয়তা, বিভার জীবননাট্যকে অকারণে অথচ অনিবার্যভাবে জটিল ও ভয়াবহ করে তুলেছে ঠিকই,—যশোহরের ক্রূর রাজনীতির বলি বিভা কখনোই হতে পারে না, কিন্তু তবু তাকে হতে হয়েছে। কিন্তু তার স্বামী রামচন্দ্র রায়ের বুদ্ধিমত্তা, সাহস, ধৈর্য এবং পত্নী-প্রেমেরও প্রয়োজন ছিল, এবং তা হলে বিভার জীবনের এই শোচনীয় পরিণতি অনেক পরিমাণে পরিহার করা যেত।

কিন্তু নবম পরিচ্ছেদে দেখি, সে শ্বশুরালয়ে এসে যেন এই কথাই বিভার কাছে মিথ্যা দম্ভে জানাতে চায় যে, "তুমি তো যশোহরের প্রতাপাদিত্যের মেয়ে, চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা রামচন্দ্র রায়ের পাশে কি তোমাকে সাজে?"—"এই স্থির করিয়া সেই যে পাশ ফিরিয়া শুইয়াছেন, আর পার্শ্ব পরিবর্তন করেন নাই।" রবীন্দ্রনাথ বিভার এই প্রণয়বঞ্চনাকে বর্ণনা করেছেন, "বিভার শয়ন কক্ষের মুক্ত বাতায়ন ভেদ করিয়া জ্যোৎস্নার আলো বিছানায় আসিয়া পড়িয়াছে, রামচন্দ্র রায় নিদ্রায় মগ্ন। বিভা উঠিয়া বসিয়া চুপ করিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে। জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া তাহার চোখ দিয়া দুই

এক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। বুঝি যেমনটি কল্পনা করিয়াছিল, ঠিক তেমনটি হয় নাই। তাহার প্রাণের মধ্যে কাঁদিতেছিল। এতদিন যাহার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল, সেদিন তো আজ আসিয়াছে।"

স্বামীর প্রেম এবং তাকে অবলম্বন ক'রে স্বামীর সঙ্গে ঘর করাই যদি বিবাহিত জীবনে নারীর একমাত্র সুখের প্রার্থনা হয়, তবে বলতে হয় যে, বিভার জীবনে সে প্রার্থনা কোনোদিনই মঞ্জুর হয়নি। বিবাহের পর থেকেই স্বামী সঙ্গ সুখ থেকে সে বঞ্চিতা। আর এই ঘটনায় দেখা গেল, স্বামীর করুণাও তার জন্য নেই।

এর মধ্যে রামচন্দ্র রায়ের ভাঁড় রমাই ঠাকুরের প্রগল্‌ভতায় মনিব হিসেবে রামচন্দ্র রায় প্রতাপাদিত্যের কোপে পড়েছেন। সুতরাং সেই রাত্রিতেই রামচন্দ্র রায়কে যশোহর থেকে পলায়ন ক'রে আত্মরক্ষা করতে হোল। এ পর্যায়ে বিভারও দাম্পত্যসুখের সঙ্গে সঙ্গে অবসান হোল।

এর পরেই যশোহর রাজপুরীর কুটিল রাজনীতির শিকার হিসেবে সুরমার বিষপানে মৃত্যু হয়েছে। সুরমার মৃত্যুতে উদয়াদিত্যের জীবনের যেন সর্বস্ব অপহৃত হয়ে গেল। তার চারিত্রিক দৃঢ়তাও অনেক পরিমাণে কমে গেল। বিভা দাদার পত্নীবিয়োগ ব্যথাতুর এই অবস্থা সহ্য করতে পারে না,—তার নিয়ত প্রচেষ্টা কিভাবে দাদাকে সান্ত্বনা দেওয়া যায়। তাই তার শ্বশুরালয় চন্দ্রদ্বীপ থেকে রামমোহন তাকে নিতে এলে সে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েও শেষ পর্যন্ত রওনা হতে পারল না, বলল,—"না আমি যাইতে পারিব না। দাদাকে আমি এখন একলা ফেলিয়া যাইতে পারিব না। আমা হইতে দাদার এত কষ্ট, এত দুঃখ—আর আমি আজ তাঁহাকে এখানে ফেলিয়া রাখিয়া সুখ ভোগ করিতে যাইব?"

এই ঘটনার ঠিক পূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি, বিভা তার দাম্পত্য জীবনের সুখ সম্পর্কে আশঙ্কান্বিত। ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বিভার প্রাণের মধ্যে আঁধার করিয়া আসিয়াছে। ভবিষ্যতে কী যেন একটা মর্মভেদী দুঃখ, একটা মরুময়ী নিরাশা, জীবনের সমস্ত সুখের জলাঞ্জলি তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, প্রতি মুহূর্তে তাহার কাছে কাছে সরিয়া আসিতেছে। সেই যে জীবন-শূন্যকারী চরাচরগ্রাসী শুষ্কসীমাহীন ভবিষ্যৎ অদৃষ্টের আশঙ্কা, তাহারই একটা ছায়া আসিয়া যেন বিভার প্রাণের মধ্যে পড়িয়াছে।"

এই সময়কার বিভার মনের গোপন কামনাটিকেও রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন। বিছানায় ক্রন্দনরতা একাকিনী বিভার আত্মজিজ্ঞাসা—"আমাকে কি তবে পরিত্যাগ করিলে? আমি তোমার নিকট কী অপরাধ করিয়াছি'—কাঁদিয়া কহিতে লাগিল, 'আমি কী অপরাধ করিয়াছি?' দুটি হাতে মুখ ঢাকিয়া বালিশ বুকে লইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বার বার কহিল, 'আমি কি করিয়াছি। একখানি পত্র না, একটি লোকও আসিল না, কাহারো মুখে সংবাদ শুনিতে পাই না। আমি কী করিব? বুক ফাটিয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়া সমস্ত দিন ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কেহ তোমার সংবাদ বলে না, কাহারও মুখে তোমার নাম শুনিতে পাই না। মা গো মা, দিন কী করিয়া কাটিবে।"

বিভার এই তীব্র জীবন লিপ্সা দেখেই বোঝা যায় যে, স্বামীগৃহ থেকে আহ্বান তার কাছে কী পরম বরণীয়। এ আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করা তো দূরের কথা, এ আহ্বানে সাড়া দিতে ইতস্ততঃ করাও বিভার পক্ষে প্রচণ্ড আত্মপ্রবঞ্চনা। কিন্তু তথাপি দাদার শোক-করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে যাত্রার প্রাক্ মুহূর্তে বলতে হ'ল, "না, আমি যাইতে পারিব না।', একথা নিঃসন্দেহ যে, এই কথা বলতে গিয়ে তার অন্তরাত্মা নিষ্পেষিত হয়ে গিয়েছিল, বাসনার বিপরীত ধর্মী কথা বলতে গিয়ে গোপন হৃদয়ে অনেক মোচড় সহ্য করতে হয়েছিল। ব্যক্তিমনের আকাঙ্ক্ষা এবং ভদ্রতাবোধ—এই দুই শক্তির টানাপোড়েনের মধ্যে সে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল।

বাসনাকে চরিতার্থ করার সুযোগটি এইভাবে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া নিয়তির সংঘটনাও হতে পারে, কিন্তু মনে রাখতে হবে, মৃত্যুর ঠিক পূর্বে সুরমা বিভাকে বলেছিল, "বিভা, তোর কাছে আমার সমস্ত রাখিয়া গেলাম।" মৃত বৌদিদির শেষ অনুরোধটিই কি বিভার কাছে অবশ্য পালনীয় হয়ে উঠেছিল? বিভা-সুরমার যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল, তাতে একথাও চিন্তা করা চলে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে অন্তঃপুরের বাগানের মধ্যে ঘনায়মান অন্ধকারের নীচে বিভার আত্ম চিন্তার মাধ্যমে তার আনন্দ উৎসব মুখরিত একটি পরিপূর্ণ সংসার জীবনের আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছে। যতই সে নিজেকে পিতৃগৃহে কর্তব্যমগ্ন করে রাখতে চায়, ততই তার মনে নিজস্ব সংসার জীবনের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতা লাভ করেছে। পূর্বে এই আকাঙ্ক্ষার যে পরিচয় আমরা পেয়েছি,

এখানে সেই পরিচয় আরো স্পষ্ট, জীবন্ত এবং রক্তমাংসের জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে উঠেছে,—" তাহার মনে হইতে লাগিল যেন একটু একটু করিয়া তাহার সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান আকাশের দিকে উঠিতেছে। তাহার ওপারে কত কী পড়িয়া রহিল। প্রাণ যেন আকুল হইয়া উঠিল। যেন ওপারে সকলই দেখা যাইতেছে, সেখানকার সূর্যালোক, খেলাধূলা, উৎসব সকলই দেখা যাইতেছে; কে যেন নিষ্ঠুর ভাবে, কঠোর হস্তে তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহার কাছে বুকের শিরা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেও সে যেন সে দিকে যাইতে দিবে না।...বাতাস অতি দূরে, হুহু করিয়া শিশুর কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। বিভার মনে হইতে লাগিল, যেন দূর দূরান্তরে সমুদ্রের তীরে বসিয়া বিভার সাধের স্নেহের প্রেমের শিশুগুলি দুই হাত বাড়াইয়া কাঁদিতেছে, আকুল হইয়া তাহারা বিভাকে ডাকিতেছে, তাহারা কোলে আসিতে চায়, সম্মুখে তাহারা পথ দেখিতে পাইতেছে না, যেন তাহাদের ক্রন্দন এই শত যোজন, লক্ষ যোজন গাঢ় স্তব্ধ অন্ধকার ভেদ করিয়া বিভার কানে আসিয়া পৌছিল।"

বিভার জীবনতৃষ্ণা এদিকে যতই প্রবল হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তাকে বঞ্চনার আয়োজনও ততই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। বিভার জীবনের ট্র্যাজেডির এইটিই ধারা।

মাঝে মাঝে বিভার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। পারিষদের কুপরামর্শে রামচন্দ্র রায় বিভাকে চিরকালের মতো পরিত্যাগ করেছেন, যশোহর রাজমহিষী এই সংবাদ পাওয়ার পর থেকেই বিভাকে পতিগৃহে পাঠাবার চেষ্টা করছেন। শেষে গৃহে অগ্নিসংযোগের সুযোগে উদয়াদিত্য রায়গড়ে বসন্ত রায়ের সঙ্গে পালিয়ে গেলে যখন মহিষী ভাবলেন, এবার রাজা প্রতাপাদিত্য বুঝি নিশ্চিন্ত হয়েছেন, তখন তিনি বস্তুতঃই রাষ্ট্র করে দিলেন যে, পতিগৃহ থেকে বিভার আহ্বান এসেছে। "মহিষীর কথা শুনিয়া বিভার কী অপরিসীম আনন্দ হইল, তাহার মন হইতে কী ভয়ানক একটা গুরুভার তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া গেল। বিভা যখন মনে করিল, তাহার স্বামী তাহাকে ভুল বুঝেন নাই, তাহার মনের কথা ঠিক বুঝিয়াছেন—তখন তাহার চক্ষে সমস্ত জগত নন্দন কানন হইয়া উঠিল। তাহার স্বামীর হৃদয়কে কী প্রশান্ত বলিয়াই মনে হইল। তাহার স্বামীর ভালোবাসার উপর কতখানি বিশ্বাস, কতখানি আস্থা জন্মিল। সে মনে করিল, তাহার স্বামীর ভালোবাসা

এ জগতে তাহার অটল আশ্রয়। সে যে এক বলিষ্ঠ মহাপুরুষের বিশাল স্কন্ধে তাহার ক্ষুদ্র সুকুমার লতাটির মতো বাহু জড়াইয়া নির্ভয়ে অসীম বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া রহিয়াছে, সে নির্ভর হইতে কিছুতেই সে বিচ্ছিন্ন হইবে না। বিভা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।"

নিজ ভাগ্যাকাশের নিকষকালো অন্ধকারকে বিদীর্ণ ক'রে আশার আলো কোনো দিন ফুটে উঠবে, এ আশা বিভা কখনো করেনি। তাই মনে মনে সে তার জীবনের শেষ শোচনীয় পরিণতির জন্যই যেন প্রস্তুত হচ্ছিল। স্বামী সম্পর্কেও তার মনে কোনো স্পষ্ট ধারণা জন্মেনি। তাই স্বামীর প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস এবং অপরিসীম নির্ভর। তার বিবেকবুদ্ধিবিহীন স্বামীই যে তাকে বঞ্চনার শেষ শরটি নিক্ষেপ ক'রে তার আশায় ভরপুর বক্ষ বিদীর্ণ করে দেবে, একথা চিন্তা করারও কোনো কারণ ঘটেনি তার জীবনে। তার জীবনের সুখশান্তির বিঘ্ন হিসেবে সে পিতাকেই বিবেচনা করে এসেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার স্বামীই যে তার জীবনের যাবতীয় দুঃখের কারণ, এটা স্বাভাবিক ভাবেই তার বিবেচনার বাইরে ছিল। তাই তার মায়ের কাছে সে যখন শুনল যে স্বামী তাকে পত্রযোগে আহ্বান করেছেন, তখন সে স্বাভাবিক কারণেই উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

উদয়াদিত্যের সঙ্গে যখন সে পতিগৃহে যাত্রা করল, তখন পতির রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করা মাত্র, তার মনের মধ্যে অপূর্ব আনন্দ জেগে উঠল। প্রজাদিগকে দেখে তার মনের মধ্যে অপূর্ব স্নেহের উদয় হতে সুরু করল। অর্থাৎ মনে মনে সে এই রাজ্য ও প্রজার রক্ষাকর্ত্রী রানী হিসেবে নিজেকে বিশ্বাস করে অপূর্ব পুলক অনুভব করতে লাগল।

শীঘ্রই যার জীবনে শোচনীয়তম পরিণতি ঘটতে চলেছে, তার এরূপ আনন্দ-উৎসাহ-আহ্লাদ পরিপূর্ণ মনোভাব একটি চমৎকার নাটকীয় বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে। ট্র্যাজেডির বিপরীতধর্মী এই মনোভাবটি বিভার জীবনের ট্র্যাজিক পরিণতিকে অনেক আকর্ষনীয় করে তুলেছে।

পতিগৃহের দ্বারপ্রান্তে এসে বিভা শুনল যে, মহারাজ রামচন্দ্র রায় পুনরায় বিবাহ করছেন। শুনে তার মুখ একেবারে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেল, তার হাত পা হিম হয়ে গেল—"এক আঘাতে বিভার সমস্ত জগৎ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। স্বামীর রাজ্যের মধ্যে আসিয়া, রাজধানীর কাছে পৌঁছিয়া, রাজপুরীর দুয়ারে আসিয়া তৃষার্ত হৃদয় বিভার সমস্ত সুখের আশা মরীচিকার মতো মিলাইয়া গেল।"

কিন্তু তৎসত্ত্বেও বিভা আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেছে। সে রাজার কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে। রাজা জিজ্ঞাসা করেছেন, "কে তুই? ভিখারিনী? ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছিস?"

"বিভা নতমুখ তুলিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে রাজার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, না, মহারাজ, আমার সর্বস্ব দান করিতে আসিয়াছি। আমি তোমাকে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

এরপর সপারিষদ রাজার কিছু উপহাস বর্ষিত হ'ল বিভার প্রতি। এবং তারপরে আশার ইন্দ্রধনু আঁকা আকাশের বজ্রাহত নিজ দেহখানিকে সে টেনে নিয়ে গেল—সবরাজ্য রাজধানী থেকে অনেক দূরে—কাশীতে।

ক্ষমতার দম্ভ এবং আত্মাভিমানের খড়্গের নীচে মানুষের সুকুমার চাওয়া-পাওয়ার বৃত্তিগুলি কীভাবে বিড়ম্বিত ও নির্যাতিত হয়, রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে তাই দেখাতে চেয়েছেন। এইজন্যই তাঁর প্রতাপাদিত্য বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম হয়ে ওঠেননি। মানবতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে মমতা, তাই মুখ্যতঃ এখানে ফুটে উঠেছে। কিন্তু এই উদ্দেশ্যকে সাধন করতে গিয়ে তিনি যে কাহিনী-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন,—সেই কাহিনী পরিকল্পনার সূত্রেই বিভার জীবনের ট্র্যাজেডি-পরিকল্পনা রচিত হয়ে গেছে।

বিভার মতো একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর সুকুমার—চরিত্রের এত করুণ পরিণতির কোনো নীতিগত কারণ ছিল না। রামচন্দ্ররায়ের মতো ব্যক্তি তার স্বামী হওয়াতেই তার জীবনে বঞ্চনা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। তাঁর জীবনের কোন ট্র্যাজিক ত্রুটি যদি খুঁজতেই হয়, তবে বলতে হবে, জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি সহানুভূতিই তার চরিত্রের এই ট্র্যাজিক ত্রুটি। সদ্য পত্নী-বিয়োগ-ব্যথাতুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চোখের উপর দিয়ে স্বামীগৃহে সুখভোগ করতে যাওয়াটা বোধহয় তার রুচিতেই বেধেছিল। তাই সে অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠেই ভৃত্য রামমোহনকে বিদায় করে দিয়েছিল। আর এইটিই তার জীবনের শোচনীয়তম দুঃখের কারণ হয়ে থাকল।

রোমান্টিক ট্র্যাজেডির নায়ক-নায়িকার মতো বিভা অবশ্য এখানে তার দুর্ভাগ্যকে পরিহার করবার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম করতে করতে নিঃশেষিত হয়নি। কিন্তু সেটা ট্র্যাজেডির বহিরঙ্গগত বিচার। অন্তরঙ্গগত বিচারে একথা বলা যায় যে, বিভার জীবনের এই শোচনীয়তম পরিণতি নিতান্ত অকারণেই বিভার জীবনে বর্তেছে—এবং তা আমাদের মনের সুতীব্র

করুণা (Pity ভাব) কে উদ্রিক্ত করে। এখানেই এই উপন্যাসের ট্র্যাজেডির ভিত্তি।

'বউঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসটি 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৮৮-র কার্তিক থেকে ১২৮৯-এর আশ্বিন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১২৮৯-এরই ভাদ্র সংখ্যার 'ভারতী'তে (যে সংখ্যায় বৌঠাকুরাণীর হাট সমাপ্ত হয়, তার পূর্ববর্তী সংখ্যায়) রবীন্দ্রনাথ 'মেঘনাদবধ কাব্যের' দ্বিতীয়বার সমালোচনা করেন। এই সমালোচনা প্রবন্ধের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। 'রবীন্দ্রজীবনী'-কার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "আমাদের মনে হয় তাঁহার উপন্যাস 'বউঠাকুরাণীর হাট' ট্র্যাজেডিধর্মী কিনা সে বিষয়ে মনের মধ্যে আন্দোলন চলিতেছে, তাই (রবীন্দ্রনাথ) পরোক্ষভাবে তাহার সমর্থন খুঁজিতেছেন।'[২]

ট্র্যাজেডি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই আলোচনার আলোকে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার 'বউঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসের ট্র্যাজেডি কোন্‌খানে তা বিশ্লেষণ করেছেন: 'বউঠাকুরাণীর হাটে সুরমার মৃত্যু ও বসন্ত রায়ের হত্যাকাণ্ডের দ্বারা ট্র্যাজেডি হয় নাই, ইহা ট্র্যাজেডি তখনই, যখন উদয়াদিত্য পিতৃসিংহাসন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বিজয়দম্ভের মধ্যে যে অসীম শূন্যতা সৃষ্ট হইল ট্র্যাজেডি সেইখানে। আর নির্বোধ রামচন্দ্ররায়ের দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহের মহোৎসব ক্ষেত্র হইতে সাধ্বী বিভা ফিরিয়া গেলে রামচন্দ্র রায়ের অন্তরের মধ্যে যে গভীর রেখাপাত করিল, তাহাই হইতেছে উপন্যাসের যথার্থ ট্র্যাজেডি। 'মেঘনাদবধ কাব্য' উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে যে আলোচনা করিলেন তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল 'বউঠাকুরাণীর হাট' যে ট্র্যাজেডি তাহারই প্রমাণ সমর্থন।[৩]

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমারের এই বিশ্লেষণে অবশ্য সুরমা ও বিভার ট্র্যাজেডি যথেষ্ট স্বীকৃতি পায়নি। কারণ রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি চেতনায় ট্র্যাজেডি তখনই হয়, যখন অজানিত ভুলের প্রকোপে জীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্য দেওয়ার পর সেই মারাত্মক ভুল ভাঙ্গে, তখন। সেই হিসেবে বাৎসল্যরস-রিক্ত প্রতাপাদিত্য এবং

---

২. রবীন্দ্রজীবনী ১ম, (১৩৬৭) : পৃঃ ১৪৬।

৩. ঐ, পৃঃ ১৪৬।

প্রেম-রিক্ত রামচন্দ্র রায়ের ট্র্যাজেডিই এই উপন্যাসে মর্মভেদী হয়ে উঠবে, এইটিই রবীন্দ্র ট্র্যাজেডি-চেতনা অনুসারে প্রত্যাশিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'বউঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসের স্তরে (১৮৮৩-৮৪) রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি সম্পর্কিত এই ভাবনা রচনায় সার্থকতার সঙ্গে ফুটে উঠতে পারেনি। তাই আপাততঃ এই উপন্যাসে আমরা প্রতাপাদিত্য বা রামচন্দ্র রায়ের ট্র্যাজেডির চেয়ে সুরমা ও বিভার ট্র্যাজেডিতেই বেশী বিচলিত হই, এবং তাদের ট্র্যাজেডিকেই এই উপন্যাসের প্রকৃত ট্র্যাজেডি হিসেবে মনে করি। উপন্যাসের নাম 'বউঠাকুরাণীর হাট'—'বউঠাকুরাণী' অর্থাৎ বিভার প্রত্যাখ্যাত প্রেমের মর্মন্তুদ বেদনাই এখানে লেখকের প্রধান উপস্থাপ্য বিষয়।

'বউঠাকুরাণীর হাট'-এর পর রচিত হয় রাজর্ষি (১৮৮৬-৮৭)। এই উপন্যাসটি চুয়াল্লিশটি পরিচ্ছেদ এবং একটি উপসংহার পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় বলেছেন, "বস্তুতঃ উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়েছে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে,"—অর্থাৎ ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে জয়সিংহের আত্মহত্যার ঘটনায়। প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনার পরে এই উপন্যাস যতখানি অগ্রসর হয়েছে তার কোনোখানেই উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে এই ঘটনার পূর্বের মতো হৃদয়দ্বন্দ্বে ভুগতে দেখা যায় না। সমগ্র উপন্যাসখানিই এই ঘটনার পরে একটা রাষ্ট্র-নৈতিক সংঘাতের আবর্তে গিয়ে পড়েছে—যেখানে মানুষের ছোটখাট সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার প্রতি কেউ ভ্রুক্ষেপও করে না। তাই রাজর্ষি উপন্যাসের যে মূল সৌন্দর্য, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদেই প্রকৃতপক্ষে তার অবসান। হয়ত এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ তার বিসর্জন নাটকও প্রধানতঃ এই পনেরোটি পরিচ্ছেদকে অবলম্বন করেই রচনা করেছেন।

এই উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে যার জীবনে সবচেয়ে বেশী দুঃখজনক পরিণতি বা ট্র্যাজেডি ঘটেছে, সে জয়সিংহ। ট্র্যাজেডির বহু বিখ্যাত চরিত্রের মতোই সে কর্তব্য ও অকর্তব্য, ন্যায় এবং অন্যায় এই দুই বিপরীত শক্তির টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তার জীবনে রঘুপতির প্রভাব যেমন সংস্কারের মতো বদ্ধমূল হয়ে আছে, তেমনি গোবিন্দমাণিক্যের সত্য, ন্যায় এবং মানবতার আদর্শও তার চিত্তকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। কোন্‌টিকে সে চূড়ান্তরূপে গ্রহণ করবে, সে সম্পর্কে সে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না, কারণ তার চরিত্রে দৃঢ়তার অভাব। নিজের উপরে নিজের কোনো আস্থা নেই। রঘুপতি অথবা গোবিন্দমাণিক্য একজনের ছত্রচ্ছায়া পেলেই তার সুবিধে হয়।

জয়সিংহ দেবী ভুবনেশ্বরীকে মা বলে জেনে এসেছে এবং রঘুপতির প্রতি তার পিতৃসম শ্রদ্ধা। তার হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য রঘুপতি এবং রঘুপতির আয়োজিত আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি নিবেদিত। এ সবের প্রতি তার অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও সমর্থন। এর মধ্যে যে মানবতা বিরোধী কিছু আছে, তা সে কোনোদিনই খুঁজে পায়নি। যেদিন রঘুপতি নক্ষত্র রায়কে ভ্রাতৃ হত্যায় প্ররোচনা দিলেন, সেদিনই জয়সিংহের নিশ্চিন্ত বিশ্বাসী হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত লাগল। সেদিনই রঘুপতির আচার ধর্মের প্রতি তার সন্দেহ জাগল। দেবীকে উদ্দেশ্য করে সে বলল, "এই জন্যই কি তোকে সকলে মা বলে, মা! তুই এমন পাষাণী। রাক্ষসী, সমস্ত জগৎ হইতে রক্ত নিষ্পেষণ করিয়া লইয়া উদরে পুরিবার জন্য তুই ঐ লোল জিহ্বা বাহির করিয়াছিস। স্নেহ, প্রেম, মমতা, সৌন্দর্য, ধর্ম সমস্তই মিথ্যা, সত্য কেবল তোর ঐ অনন্ত রক্ত-তৃষা। তোরই উদর পুরণের জন্য মানুষ মানুষের গলায় ছুরি বসাইবে, ভাই ভাইকে খুন করিবে, পিতাপুত্রে কাটাকাটি করিবে।...না না মা, তুই সত্য করিয়া বল এ শিক্ষা মিথ্যা—আমার মাকে মা বলে না, সন্তান রক্তপিপাসু রাক্ষসী বলে—একথা আমি সহিতে পারিব না।"

এটা জগৎসিংহের নিজস্ব আত্মোপলব্ধি। মানবতার প্রতি—নিত্য ধর্মের প্রতি তার যে সহজাত সমর্থন এবং শ্রদ্ধা আছে, রঘুপতির প্রথাধর্মের মধ্যে তার ঘোরতম ব্যত্যয় দেখে তার মানবতাবাদী চিত্ত আলোড়িত হয়ে উঠেছে, তাই এই প্রশ্ন জেগেছে তার মনে। সে শুধু এইটুকুই জেনে খুশি হতে চায় যে দেবী রক্তপিপাসু নয়, সেটা মিথ্যা কথা।

কিন্তু গোবিন্দমাণিক্য যখন জয়সিংহকে বুঝিয়ে দিলেন, সমস্ত ব্যাপারটাই রঘুপতির চক্রান্ত—রক্ত দেবী চান না, চান রঘুপতি। তখনও জয়সিংহ এতদিনকার অভ্যস্ত বিশ্বাসের গোড়ায় কুঠারাঘাত করতে সাহসী হ'ল না। রঘুপতিকে সরাসরি অস্বীকার করা তার সাধ্যায়ত্ত হল না। তাই সে রাজাকে বলল, "না মহারাজ, আমাকে ক্রমাগত সংশয় হইতে সংশয়ান্তরে লইয়া যাইবেন না—আমাকে তীর হইতে ঠেলিয়া সমুদ্রে ফেলিবেন না—আপনার কথায় আমার চারিদিকের অন্ধকার কেবল বাড়িতেছে। আমার যে বিশ্বাস, যে ভক্তি ছিল, তাই থাক্—তাহার পরিবর্তে এ কুয়াশা আমি চাই না। মায়ের আদেশই হউক আর গুরুর আদেশই হউক, সে একই কথা—আমি পালন করিব।"

কিন্তু রাজরক্ত আনয়নের জন্য মায়ের আদেশ বা গুরুর আদেশ,—যার আদেশই হোক না কেন, তাকে কার্যকরী করা জয়সিংহের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ তা হ'লে এ সম্পর্কে জয়সিংহের মনের মধ্যে যে নিজস্ব মানব-ধর্ম আছে, তার বিরুদ্ধাচরণ করতে হয়। এই মানব-ধর্মই ছিল জয়সিংহেব জীবনের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তি থেকে বিচ্যুত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে রঘুপতিকে অস্বীকার না করলেও রঘুপতিব আদর্শকে কার্যকরী করতে পারছে না। এতবড নৃশংস কাজটিকে সম্পন্ন করার মতো মানবতা বিরোধী মানসিকতা সে কিছুতেই তৈরী করতে পাবছে না, তাই অসহায়ের মতো গোবিন্দ-মাণিক্যের কাছেই সে বলে, "আমি গুরুতর অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়াছি। আমার কিসে ভালো হইবে, কিসে মন্দ হইবে কিছুই জানি না। আমি একবার বামে যাইতেছি, একবাব দক্ষিণে যাইতেছি, আমার কর্ণধার বলিতে কেহ নাই।"

রঘুপতির আদেশ কার্যকরী কবতে জয়সিংহের এই দোদুল্যমানতা এবং দুর্বলচিত্ততা রঘুপতির দৃষ্টি এড়ায় না। তাই তিনি স্বমূর্তি প্রকাশ ক'রে সরাসরি জয়সিংহকে বলেন, "তুমি অল্পে অল্পে আমাব কাছ হইতে সরিয়া যাইতেছ।' জয়সিংহ রঘুপতিব আদেশেব ন্যায্যতা নিয়ে অনেক তর্ক করল, কিন্তু রঘুপতি তাঁর শেষ অস্ত্র হিসেবে জয়সিংহেব সঙ্গে তাঁব পিতাপুত্রের সম্পর্ককে যখন প্রত্যাহার কবে নিতে চাইলেন, তখন জয়সিংহ রঘুপতির পা ধবে বললেন, "না না না প্রভু, আপনি আমাকে ত্যাগ কবিলেও আমি আপনাকে ত্যাগ কবিতে পারি না। আমি রহিলাম, আপনার পদতলেই রহিলাম, আপনি যাহা ইচ্ছা করিবেন। আপনার পথ ছাড়া আমার অন্য পথ নাই।"

জয়সিংহ যে আশৈশব রঘুপতিকে পিতা হিসেবে জেনেছে এবং সেই সূত্রে সে যে পিতাকে ধর্মতঃ মান্য করতে বাধ্য,—এর কোন অন্যথা জয়সিংহের কাছে অচিন্তনীয় ছিল। তাই সে অন্যায় জেনেও রঘুপতিব আদেশ কার্যকরী করার জন্য প্রস্তুত হ'ল।

কিন্তু তার জীবন-নাট্যের চূড়ান্ত সংকট এর পরেই। একদিকে পিতা হিসেবে রঘুপতিব আদেশ শিরোধার্য, অন্যদিকে এই আদেশের বিবোধী তার অন্তরের বিশ্বাস-নির্ভর মানবতাবাদ (বা নিত্যধর্মবোধ)—যাকে অবলম্বন করে জগৎ সম্পর্কে তার সমস্ত মূল্যবোধ গডে উঠেছে,—আবার এর সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে তার পরম শ্রদ্ধেয় গোবিন্দমাণিক্যের প্রভাব।—এর মধ্যে কোন্ শক্তিকে

সে বরণ ক'রে নেবে, রঘুপতির আদেশকে সে কার্যকরী করবে—কি করবে না, এই সংকটের আবর্তে সে শোচনীয়ভাবে নিমজ্জমান। এই দুটি শক্তিই তার কাছে এমন অমোঘ যে, কোনোটিকেই সে অস্বীকার করতে পারল না। এই সংকট থেকে মুক্তির পথ সে খুঁজে পেল তাই আত্মহত্যার মধ্যে। এইটিই ছিল অনন্যোপায় জয়সিংহের একমাত্র সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত। চতুর্দশ পরিচ্ছেদে চতুর্দশ দেবতার পূজার দিনে, রাজরক্ত আনয়ন করার দিনে মন্দিরের পার্শ্বে গোমতী তীরে প্রভাতী প্রকৃতির মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য তার প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও তার মন বলছে, "আমি যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি, আমি বিদায় লইয়াছি, আমি আর ফিরিব না।"

জয়সিংহের এই অপমৃত্যু একটি অত্যন্ত শোচনীয় ঘটনা। এর প্রতি আমাদের প্রবল সহানুভূতি জাগে—আমাদের চিত্তের সুতীব্র করুণা উদ্রিক্ত হয়। জয়সিংহের যে চিত্তবৃত্তি তা তাকে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরায় না, বরং কাছে টানে। তাই তার জীবন-সংকট এবং সেখান থেকে মুক্তির পথ আমাদের কাছে এক শোকাবহ হয়ে ওঠে,—আমরা একটি পরিপূর্ণ ট্র্যাজেডির ভাব উপলব্ধি করি।

পক্ষান্তরে গোবিন্দমাণিক্যের জীবনে যে দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছিল, তার জন্য আমরা দুঃখ পাই বটে, কিন্তু জয়সিংহের জন্য যেমন কাতর হই, তেমন হই না। কারণ জয়সিংহ যেমন আমাদের নিকটতর, গোবিন্দমাণিক্য তেমন নন। গোবিন্দমাণিক্যের ত্যাগ, ভ্রাতৃপ্রেম, ক্ষমা, পরহিতব্রত প্রভৃতি গোবিন্দ-মাণিক্যকে জয়সিংহের থেকেও মহৎ করেছে, কিন্তু সংকটাপন্ন করেনি। গোবিন্দমাণিক্যের কোনো সংকট ছিল না। ত্যাগ, ক্ষমা, কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণাবলী নিয়ে তিনি সংকটকে পরিহার করতে পেরেছেন। এতে তাঁর কষ্ট বা দুর্যোগ বেড়েছে, কিন্তু কাতর হননি। তাঁর অন্তরাত্মা কখনো পরস্পর-বিপরীতমুখী শক্তিদ্বয়ের দ্বন্দ্বে পড়ে অসহায়ের মতো কেঁদে ওঠেনি। সমস্ত রকম দুঃখ দুর্দশার মধ্য দিয়েও তিনি জীবনের ধর্মকে (মানবধর্ম বা নিত্যধর্ম) রক্ষা ক'রে গেছেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে কোনো মূল্যবোধকেই বলি দিতে হয়নি। এখানেই তাঁর জীবনের প্রকৃত জয়লাভ। তাই তাঁর দুর্দশায় আমাদের মধ্যে সহানুভূতির ভাব উদ্রিক্ত করলেও ঠিক ট্র্যাজেডিরসের স্বাদ আমরা লাভ করতে পারিনা।

কিন্তু রঘুপতির জীবনে ট্র্যাজেডির উপাদান আছে। তিনি জানতেন,

ভুবনেশ্বরীদেবী এবং তাঁকে কেন্দ্র করে যাবতীয় আচার অনুষ্ঠানের উপরই তাঁর জীবনের সব কিছু দাঁড়িয়ে আছে। দেবতা এবং তাঁর আচার অনুষ্ঠানকে অব্যাহত রাখাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কর্তব্য এবং ব্রত হয়ে উঠেছিল, এ ছাড়া তাঁর জীবনকে শূন্য বলে তিনি কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সব যে মিথ্যা, তা তিনি জানতেন না। তিনি জানতেন না যে, দেবতা এবং আচার অনুষ্ঠান তাঁর জীবনের মূল অবলম্বন নয়, তাঁর জীবনের মূল অবলম্বন ছিল স্নেহ,—পুত্রস্নেহ। জয়সিংহের প্রতি বাৎসল্যই ছিল তাঁর জীবনের সমস্ত প্রেরণার মূলে।

জয়সিংহের আত্মহত্যার পরও, কেবলমাত্র প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়েই, আত্মদম্ভকে চরিতার্থ করার উৎসাহে এবং স্বীয় ব্রাহ্মণ্যকে রাজশক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করার প্রেরণায় তিনি কিছু দিন গোবিন্দমাণিক্যের সর্বনাশ করার ষড়যন্ত্রে সোৎসাহে লিপ্ত ছিলেন এবং তার মধ্যে যথেষ্ট পরিমানে আত্মপ্রসাদ লাভ করছিলেন। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্যের রাজ্যত্যাগের পর, অর্থাৎ রঘুপতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার পর, যখন তাঁর হাতে আর এমন কোনো কাজ অবশিষ্ট রইল না,—যার মধ্যে নিমগ্ন থেকে তিনি হৃদয়কে আচ্ছন্ন রাখতে পারেন,—মনের সুকুমার বৃত্তিগুলির সক্রিয়তাকে রুদ্ধ রাখতে পারেন, তখনই তিনি রুদ্রচণ্ডের মতোই আবিষ্কার করলেন যে, তিনি বৃথা মরীচিকার পিছনে ছুটেছেন এতদিন।

মন্দিরে ফিরে এসে তিনি চতুর্দিক শূন্য দেখলেন। যে পুত্রস্নেহকে অবলম্বন ক'রে জীবন-উৎসাহ তাঁর মধ্যে সদা জাগ্রত থাকত, জয়সিংহের মৃত্যুর পর এবং সমস্ত আত্মবিস্মরণকারী কার্যক্রমের অবসানে, সেই পুত্রস্নেহের অবলম্বনটি তাঁর কাছ থেকে অপহৃত হওয়ায় তিনি মন্দির, দেবতা, আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি সব কিছুকেই একটা অনাবশ্যক শ্রদ্ধাভক্তির উপায়, নিদারুণ বুদ্ধি-ভ্রমের নিদর্শন বলে মনে করলেন। পুত্রের তুলনায় দেবতাও তাঁর কাছে তুচ্ছ—এই সত্যের পরিচয় তিনি পেলেন। তাই তিনি চীৎকার করে উঠলেন, "মিথ্যা কথা। সমস্ত মিথ্যা!…এখানে কোন দেবতা নাই, কোন দেবতা নাই। পিশাচ রঘুপতি সে রক্ত পান করিয়াছে।"—এই বলে তিনি মন্দিরের প্রতিমাকে গোমতীর জলে বিসর্জন দিলেন, এবং মন্দির ছেড়ে চলে গেলেন।

যে মন্দিরকে কেন্দ্র করে রঘুপতির এত কর্মোদ্দীপনা—শূন্যহৃদয়ে সেই মন্দির ত্যাগ করে যাওয়াটাই রঘুপতির জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি,

ট্র্যাজেডি এই জন্য যে, তাঁর জীবনের সত্যকে যখন তিনি সঠিক ভাবে বুঝলেন, তখন তা তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেছে। তখন এই সর্বস্ব-রিক্ততার বেদনায় তাঁর পক্ষে বুকফাটা আর্তনাদ ক'রে ওঠাই স্বাভাবিক। সেই নীরব আর্তনাদকেই যেন আমরা শুনতে পাই তাঁর মন্দির পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার মধ্যে।

'রাজর্ষি' উপন্যাস রচনার চারবছর পূর্বে 'ভারতী'তে (১২৮৯) রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা করেছিলেন। সেখানে মহাভারতের ট্র্যাজেডি কোথায়, তা বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যথার্থ ট্র্যাজেডি আরম্ভ হইল। তাঁহারা দেখিলেন জয়ের মধ্যেই পরাজয়। এত দুঃখ, এত যুদ্ধ, এত রক্তপাতের পর দেখিলেন হাতে পাইয়া কোন সুখ নাই, পাইবার জন্য উদ্যমেই সমস্ত সুখ; যতটা করিয়াছেন তাহার তুলনায় যাহা পাইলেন তাহা অতি সামান্য; এতদিন যুঝাযুঝি করিয়া হৃদয়ের মধ্যে একটা বেগবান অনিবার উদ্যমের সৃষ্টি হইয়াছে, যখনি ফললাভ হইল, তখনি সে উদ্যমের কার্য্যক্ষেত্র মরুময় হইয়া গেল, হৃদয়ের মধ্যে সেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত উদ্যমের হাহাকার উঠিতে লাগিল। কয়েক হস্ত ভূমি মিলিল বটে, কিন্তু হৃদয়ের দাঁড়াইবার স্থান পদতল হইতে ধসিয়া গেল, বিশাল জগতে এমন স্থান সে দেখিতে পাইল না যেখানে সে তাহার উপার্জিত উদ্যম নিক্ষেপ করিয়া সুস্থ হইতে পারে। ইহাকেই বলে ট্র্যাজেডি।"[৪] লক্ষনীয়, রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনায় হৃদয়ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাচ্ছে।

মহাভারতের ট্র্যাজেডি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা তাঁর নিজের সৃষ্টি রঘুপতির ট্র্যাজেডি সম্পর্কেও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। আত্মীয় বিনাশের মধ্য দিয়ে জয়লাভেই যেমন পাণ্ডবপক্ষের ট্র্যাজেডি, তেমনি পুত্রকে হারিয়ে প্রতিপত্তিলাভ করার মধ্যেই রঘুপতিরও ট্র্যাজেডি। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ট্র্যাজেডি-চেতনা এই উপন্যাসে সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের পাকা হাতের পরিচয় পাওয়া যায় 'চোখের বালি'তে (১৯০৩)। বাস্তব সংসারের একটি অত্যন্ত জীবন্ত সমস্যাকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাস রচনা করেছেন। একটি বালবিধবার জীবন পিপাসা এই উপন্যাসের বিষয় এবং সেই জীবন-পিপাসার অচরিতার্থতা-

---

৪. মেঘনাদবধকাব্য' সমালোচনা। দ্রঃ রবীন্দ্রবচনাবলী (প, ব, সরকার) ত্রয়োদশখণ্ড পৃ—৫৯৯-৬০০।

জনিত ট্র্যাজেডি এই উপন্যাসের পরিণাম। 'চোখের বালি'র বিনোদিনী 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এর রোহিনীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যদিও বালবিধবার জীবন-সমস্যা সম্পর্কে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্যও আছে। বঙ্কিম রোহিণীর তীব্র জীবন-পিপাসা ও প্রণয়-বাসনাকে স্বীকার করতে পারেননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর হৃদয়ধর্মকে অস্বীকার করতে পারেননি, বালবিধবা হলেও নারী হিসেবে তার জীবন-পিপাসা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে যথাসম্ভব স্বীকৃতি দিতে রবীন্দ্রনাথ কুণ্ঠা প্রকাশ করেননি। তথাপি রবীন্দ্রনাথের কাছে বিনোদিনী পরিপূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠা পায়নি, এবং সেইখানেই এর ট্র্যাজেডি। দুটি নারীর জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাসের কাহিনী,—একটি জীবনের পরিণতি ট্র্যাজেডিতে,—আর একটি জীবনের সমাপ্তি মিলনের মধ্যে।

বিনোদিনীর জীবন ও চরিত্রকে অবলম্বন করেই এই উপন্যাসের ট্র্যাজেডির দিকটা গড়ে উঠেছে। দরিদ্রকন্যা বিনোদিনী বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই মনের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে গভীরভাবে পোষণ করতে শিখেছে। স্বামী-পুত্র, ঘর-সংসার, বৈভব-প্রাচুর্য প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে। জমিদার-পুত্র মহেন্দ্রের সঙ্গে বিবাহের মধ্য দিয়ে তার সেই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হতেও পারত। কিন্তু নিয়তির বিরুদ্ধাচরণে তার অন্যত্র দরিদ্র ঘরে বিবাহ হয়, এবং অচিরেই বৈধব্য-বরণ ক'রে জীর্ণ পিতৃগৃহে নিরালম্ব ও নিঃসীম শূন্যতায় পরিত্যক্ত হয়। সৌভাগ্য তো দূরের কথা,—একটা কাজ, একটা দায়িত্ব হাতে পেলেই সে এখন বাঁচে,—তার তৃষিত-যৌবন এবং অতৃপ্ত-আকাঙ্ক্ষাকে সে ভুলতে পারে। এমন সময় পুত্রের উপর বিরক্ত হয়ে রাজলক্ষ্মীর সেখানে আগমন। বিনোদিনী এই দূর সম্পর্কের পিসিমার সেবা-শুশ্রূষার ভার নিয়ে কোনোক্রমে বেঁচে উঠবার চেষ্টা করল।

রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর এই দুঃখের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার মুহূর্তগুলিকে সযত্নে উল্লেখ করেছেন এবং তার মধ্য দিয়েই বিনোদিনীর জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার একটা দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা সূচিত হয়েছে। একদিকে তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা এবং তাকে চরিতার্থ করার জন্য আত্মশক্তি, আর একদিকে নিয়তি,—এই দুইয়ের অবিরাম সংঘাত ঘটেছে তার জীবনে। শেষ পর্যন্ত নিয়তির কাছে পরাভব স্বীকার ক'রে তাকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে জীবনের বাসনা।

একদিন রাজলক্ষ্মীর কাছে মহেন্দ্রের চিঠি এল। চিঠিতে মায়ের কথা অল্পই,—বেশীর ভাগই নিজেদের দাম্পত্য-প্রেমের কথা, যা মায়ের কাছে লিখে জানাবার কথা নয়। তাই বিহারী বা বিনোদিনী কেউই সেকথা রাজলক্ষ্মীকে প'ড়ে শোনাতে পারেনি।

কিন্তু চিঠিতে লিখিত আশা-মহেন্দ্রের দাম্পত্য-প্রণয়ের এই প্রসঙ্গটিই বিনোদিনীর কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। যে দাম্পত্য-প্রণয় তার জীবনে কোনোদিন ঘটেনি, যার স্বাদ তার কাছে অজানা,—এবং যে স্বাদ লাভ করার কথা তার পক্ষে চিন্তা করাও পাপ, সেই স্বাদ বহন করে এনেছে এই চিঠি একটি দম্পতির দাম্পত্য-প্রণয় বর্ণনার মাধ্যমে। সে তার সমস্ত তৃষ্ণার্ত সত্তা নিয়ে এক পরম পুলকে দরজা বন্ধ ক'রে এই চিঠি পড়তে লাগল। "চিঠির মধ্যে বিনোদিনী কী রস পাইল, তাহা বিনোদিনীই জানে। কিন্তু তাহা কৌতুক-রস নহে। বারবার করিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার দুই চক্ষু মধ্যাহ্নের বালুকার মতো জ্বলিতে লাগিল, তাহার নিঃশ্বাস মরুভূমির বাতাসের মতো উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।"

"মহেন্দ্র কেমন, আশা কেমন, মহেন্দ্র-আশার প্রণয় কেমন, ইহাই তাহার মনের মধ্যে কেবলি পাক খাইতে লাগিল। চিঠিখানা কোলের উপর চাপিয়া ধরিয়া পা ছড়াইয়া দেয়ালের উপর হেলান দিয়া অনেকক্ষণ সম্মুখে চাহিয়া বসিয়া রহিল।"

দাম্পত্য-সুখ বঞ্চিত বিনোদিনীর সুগভীর অন্তর্বেদনা, অতৃপ্ত প্রণয়ের যন্ত্রণা, অনাস্বাদিত জীবনের স্বাদগ্রহণের সুতীব্র আগ্রহ এখানে লক্ষণীয়। সমগ্র উপন্যাসেই যৌবনসুখভোগের জন্য বিনোদিনীর একটা তীব্র আগ্রহ তার চরিত্রের আচার-ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে,—এর জন্য সে প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে,—নীতি ও সামাজিক মূল্যবোধের মানদণ্ডে অনেক মূল্য দিতে প্রস্তুত থেকেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তার জীবনের প্রার্থিত সার্থকতালাভ করতে পারেনি, সমগ্র জীবন-সংগ্রামের ভালোমন্দের স্মৃতিকে বুকের মধ্যে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সে কাশীবাসিনী হয়ে এক ভিন্ন প্রকার আত্ম-প্রবঞ্চক-সান্ত্বনা লাভ করতে চেয়েছে। তার পরম আকাঙ্ক্ষার জগৎ থেকে এইভাবে তার স্বেচ্ছায় পশ্চাদপসরণ বড়ই করুণ,—এইখানেই তার ট্র্যাজেডি।

অনাস্বাদিত দাম্পত্য-জীবনের স্বাদলাভ করবার জন্য অকাল-বিধবা বিনোদিনীর সুপ্ত ও গোপন আকাঙ্ক্ষা এক সর্বজনীন বেদনার সৃষ্টি করেছে এই

উপন্যাসে। শুধু মহেন্দ্রর লিখিত চিঠি পড়ার মাধ্যমেই নয়, আরো নানা প্রসঙ্গেই তার এই গোপন আকাঙ্ক্ষাটি প্রকাশ পেয়েছে। এর মধ্য দিয়েই সে প্রকারান্তরে অচরিতার্থ জীবন-সুখকে চরিতার্থ করতে চেয়েছে খানিকটা।

রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে মহেন্দ্রের বাড়ীতে আসার পর থেকেই আশা-মহেন্দ্রের দাম্পত্যলীলা তার কাছে এক পরম উপভোগের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর করুণ প্রচেষ্টার মতো আশা-মহেন্দ্রের দাম্পত্য-জীবন পর্যবেক্ষণ করার মধ্য দিয়ে সে অনাস্বাদিত দাম্পত্য-সুখের স্বাদলাভ করার চেষ্টা করেছে।…"ক্ষুধিত-হৃদয়া বিনোদিনীও নববধূর নবপ্রেমের ইতিহাস মাতালের জ্বালাময় মদের মতো কান পাতিয়া পান করিতে লাগিল। তাহার মস্তিষ্ক মাতিয়া শরীরের রক্ত জ্বলিয়া উঠিল।"

"নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে মা যখন ঘুমাইতেছেন, দাসদাসীরা একতলার বিশ্রাম-শালায় অদৃশ্য, মহেন্দ্র বিহারীর তাড়নায় ক্ষণকালের জন্য কলেজে গেছে এবং রৌদ্রতপ্ত নীলিমার শেষ প্রান্ত হইতে চিলের তীব্র কণ্ঠ অতিক্ষীণস্বরে কদাচিৎ শুনা যাইতেছে, তখন নির্জন শয়নগৃহে নিচের বিছানার বালিশের উপর আশা তাহার খোলা চুল ছড়াইয়া শুইত, এবং বিনোদিনী বুকের বালিশ টানিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া গুন্‌গুন্‌ গুঞ্জরিত কাহিনীর মধ্যে আবিষ্ট হইয়া রহিত, তাহার কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিত, নিশ্বাস বেগে প্রবাহিত হইতে থাকিত।"

"বিনোদিনী প্রশ্ন করিয়া তুচ্ছতম কথাটি পর্যন্ত বাহির করিত, এক কথা বারবার করিয়া শুনিত, ঘটনা নিঃশেষ হইয়া গেলে কল্পনার অবতারণা করিত—কহিত, 'আচ্ছা ভাই, যদি এমন হইত তো কী হইত, যদি অমন হইত কী করিতে।'…"

"অপরাহ্নে বিনোদিনী নিজে উদ্‌যোগী হইয়া অপরূপ নৈপুণ্যের সহিত আশার চুল বাঁধিয়া সাজাইয়া তাহাকে স্বামীর সম্মিলনে পাঠাইয়া দিত। তাহার কল্পনা যেন অবগুণ্ঠিত হইয়া এই সজ্জিতা বধূর পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুগ্ধ যুবকের অভিসারে জনহীন কক্ষে গমন করিত।"

কখনো বা বিনোদিনী আশাকে দেরী করিয়ে দিত, যাতে মহেন্দ্র আশার দেরী করার জন্য একটু রাগ করে। বিনোদিনী বলত, "আহা একটু রাগ করলইবা। সোহাগের সঙ্গে রাগ না মিশিলে ভালোবাসার স্বাদ থাকে না—তরকারিতে লঙ্কা মরিচের মতো।" বিনোদিনীর এই উক্তিটির তাৎপর্য গভীরভাবে অনুধাবন-যোগ্য। এই উক্তিটি থেকেই বোঝা যায় যে দাম্পত্য-

জীবনের লীলা-খেলা, মান-অভিমান এবং ধরাছোঁয়ার চোরাগলির পথে বিচরণের প্রণালী বিদুষী বিনোদিনীর ভালোভাবেই জানা আছে এবং এ ব্যাপারে সে আশার চেয়ে অনেক পটু। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য যে সে তার এই পটুত্বকে কাজে লাগানোর সুযোগ পেল না এবং তাতেই এই পটুত্ব বা কুশলতা তার কাছে আরো বেশী যন্ত্রণার কারণ হয়েছে। সে যদি এ সম্পর্কে নির্বোধ হত, তবে বেঁচে যেত, কিন্তু তা নয়, সে শিক্ষিতা এবং অনুভূতি-প্রবণা এবং সেইজন্তই দাম্পত্য-সুখ সম্পর্কে তার জ্ঞান তার কাছে যন্ত্রণারই কারণ।

বিনোদিনী আশার সঙ্গে কথায় কথায় 'লঙ্কা-মরিচ' কথাটা ব্যবহার করেছে। কথাটা তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু লঙ্কা মরিচের স্বাদ মোটেই প্রীতিকর নয়, কিন্তু ব্যঞ্জনের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে সংযুক্ত হলে ব্যঞ্জনটি উপাদেয় হয়ে ওঠে। শুধু লঙ্কা মরিচটি প্রীতিকর নয় বলে যে তাকে সরিয়ে রাখে, সে তার ব্যঞ্জনকে উপাদেয় করে তুলতে পারে না। আশা এই ধরনের অপটু রাঁধুনী বা নায়িকা। কিন্তু বিনোদিনী তার বিপরীত। সে লঙ্কা মরিচ সংযোগে ব্যঞ্জনকে উপাদেয় করতে জানে। কিন্তু তার ট্র্যাজেডি এই যে ব্যঞ্জনের অভাবে তার সুতীব্র স্বাদ-বোধের জন্য সে কেবল লঙ্কা মরিচের যন্ত্রণাটিই ভোগ করছিল। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, "কিন্তু লঙ্কা মরিচের স্বাদটা যে কী, তাহা বিনোদিনীই বুঝিতেছিল—কেবল সঙ্গে তাহার তরকারি ছিল না। তাহার শিরায়-শিরায় যেন আগুন ধরিয়া গেল। সে যে দিকে চায়, তাহার চোখে যেন স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ হইতে থাকে।" আশার দাম্পত্য-জীবনকে অবলোকন করে সে নিজের মনের মধ্যে এই অগ্নিদাহ নিয়ে চিন্তা করতে থাকে, "এমন সুখের ঘরকন্না—এমন সোহাগের স্বামী। এ ঘরকে যে আমি রাজার রাজত্ব, এ স্বামীকে যে আমি পায়ের দাস করিয়া রাখিতে পারিতাম। তখন কি এ ঘরের এই দশা, এ মানুষের এই ছিরি থাকিত। আমার যায়গায় কিনা এই কচি খুকি, এই খেলার পুতুল।" তারপরই আশার গলা জড়িয়ে ধরে সে জিজ্ঞাসা করে, "ভাই চোখের বালি, বলো না ভাই, কাল তোমাদের কী কথা হইল ভাই। আমি তোমাকে যাহা শিখাইয়া দিয়াছিলাম, তাহা বলিয়াছিলে? তোমাদের ভালোবাসার কথা শুনিলে আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে না ভাই।"

এই উপন্যাসের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে একটি বনভোজনের প্রসঙ্গ আছে। সেখানে দ্বিপ্রহরে সমস্ত কর্মের অবসানে সকলের অলক্ষ্যে এক বৃক্ষচ্ছায়ায় বিহারী বিনোদিনীকে ফরমায়েশ ক'রে বহুক্ষণ ধরে বিনোদিনীর নিজের ও

তার দেশের গল্প শুনেছে। "বিনোদিনী এ সকল কথা এ পর্যন্ত এমন করিয়া শোনাইবার লোক পায় নাই—বিশেষতঃ কোনো পুরুষের কাছে সে এমন আত্মবিস্মৃত হইয়া স্বাভাবিকভাবে কথা কহে নাই—আজ অজস্র কলকণ্ঠে নিতান্ত সহজে হৃদয়ের কথা বলিয়া তাহার সমস্ত প্রকৃতি যেন নব বারিধারায় স্নাত, স্নিগ্ধ এবং পরিতৃপ্ত হইয়া গেল।"

এই ধরনের একটা তৃপ্তিও বিনোদিনীর কাছে অনাস্বাদিত-পূর্ব। খুশির আবেগে সে আশাকে জড়িয়ে ধরে—দু'চোখে তার আনন্দাশ্রু। সে বলে, "আজ দিনটা আমার বড় ভালো লাগিল।" আশা কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, "আমার মনে হইতেছে, আমি যেন মরিয়া গেছি, যেন পরলোকে আসিয়াছি, এখানে যেন আমার সমস্তই মিলিতে পারে।"

বস্তুতঃ এই বনভোজনের আসরে সে এমন কোনো ইঙ্গিতই পায়নি, যাতে সে এতবড় প্রত্যাশা করতে পারে। কিন্তু যারা বঞ্চিত ও হতভাগ্য, তারা প্রত্যাশালাভ করতেই সতত উন্মুখ। অল্প কারণে বা বিনা কারণেই তারা প্রত্যাশালাভ ক'রে কৃতার্থ হতে চায়। বিনোদিনীর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি তাই। ইহজন্মে তার জীবনের সাধ মিটবার কোনো সম্ভাবনাই সে দেখেনি। বিহারী যখন তার কথা মন দিয়ে শুনল, তার সঙ্গে দুটো কথা বলল, তখন সে এক অনাস্বাদিত-পূর্ব পুলক অনুভব করল। সে মনে করতে চাইল, তার অভিশপ্ত, বিড়ম্বিত, অগ্নিদগ্ধ হতভাগ্যের জীবনের বুঝি মৃত্যু ঘটেছে,—সে ব্যর্থ-ইহজীবনকে অতিক্রম ক'রে বুঝি এক সম্ভাবনাময় পর-জন্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে।

দুঃখের জীবনের মধ্যে পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখে এইভাবে ক্ষণিকের পুলক লাভ করা—এ-ও যথেষ্ট করুণাঘন। বিনোদিনীর জীবনের দুঃখ যে কত গাঢ় এবং গভীরভাবে স্থায়ী, তা এই ঘটনার মধ্য দিয়ে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়। সেজন্য বিনোদিনীর এই ক্ষণিকের আনন্দ তার জীবনের ভয়াবহ ট্র্যাজেডিরই অনুপূরক।

ইতোমধ্যে মহেন্দ্র-বিনোদিনীর ঘনিষ্ঠতার সুযোগে, মহেন্দ্র খানিকটা অসচেতনভাবে, আর বিনোদিনী সচেতনভাবে পরস্পরের অভিমুখে বেশ কিছু অগ্রসর হয়ে গেছে। প্রণয়-বঞ্চিত, অথচ আত্মপ্রতিষ্ঠা-লিপ্সু বিনোদিনীর মধ্যে প্রণয়-সফল প্রতিষ্ঠিত নায়ক মহেন্দ্র সম্পর্কে আকর্ষণ এবং আক্রোশ দুই-ই আছে। মহেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর যে বিবাহের কথা উঠেছিল, এবং মহেন্দ্র

যে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল, সে-কথাও বিনোদিনী অনেক জ্বালার একটি জ্বালা হিসেবে মনে রেখেছে। বিনোদিনী মহেন্দ্র সম্পর্কে নিজের এই আকর্ষণ ও আক্রোশকে বুঝতে পারে তখনই যখন মহেন্দ্র কলেজের কাজ উপলক্ষ্যে বাড়ী ছেড়ে কলেজের কাছাকাছি এক বাসাবাড়ীতে গিয়ে উঠল। মহেন্দ্রের এই অনুপস্থিতিতে সে নিজের মনের অবস্থাটিকে অনেক স্পষ্ট করে জানল। "মহেন্দ্রকে সে প্রতিদিন নানা পাশে বদ্ধ ও নানা পাশে বিদ্ধ করিতেছিল, সে কাজ গিয়া বিনোদিনী যেন এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিল। বাড়ী হইতে তাহার সমস্ত নেশা চলিয়া গেল। মহেন্দ্র বর্জিত আশা তাহার কাছে নিতান্তই স্বাদহীন। আশার প্রতি মহেন্দ্রের সোহাগ-যত্ন বিনোদিনীর প্রণয়-বঞ্চিত চিত্তকে সর্বদাই আলোড়িত করিয়া তুলিত—তাহাতে বিনোদিনীর বিরহিনী কল্পনাকে যে বেদনায় জাগরূক করিয়া রাখিত তাহার মধ্যে উগ্র উত্তেজনা ছিল। যে মহেন্দ্র তাহাকে তাহার সমস্ত জীবনের সার্থকতা হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে, যে মহেন্দ্র তাহার মতো স্ত্রী-রত্নকে উপেক্ষা করিয়া আশার মতো ক্ষীণবুদ্ধি দীনপ্রকৃতি বালিকাকে বরণ করিয়াছে, তাহাকে বিনোদিনী ভালোবাসে, কি বিদ্বেষ করে, তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবে, না তাহাকে হৃদয় সমর্পণ করিবে, তাহা বিনোদিনী ঠিক করিয়া বুঝিতে পারে নাই। একটা জ্বালা মহেন্দ্র তাহার অন্তরের মধ্যে জ্বালাইয়াছে, তাহা হিংসার না প্রেমের, না দুইয়েরই মিশ্রণ, বিনোদিনী তাহা ভাবিয়া পায় না; মনে মনে তীব্র হাসি হাসিয়া বলে, 'কোনো নারীর কি আমার মতো এমন দশা হইয়াছে। আমি মরিতে চাই কি মরিতে চাই না, তাহা বুঝিতেই পারি না।' কিন্তু যে কারণেই বল, দগ্ধ হইতেই হউক বা দগ্ধ করিতেই হউক, মহেন্দ্রকে তাহার একান্ত প্রয়োজন।"

শেষ পর্যন্ত বিনোদিনী নিজের ভাবনা এবং কামনা অনুসারে আশার জবানীতে মহেন্দ্রকে পর পর চিঠি দিয়েছে। আশার চিঠিতে বিনোদিনীর ভাষা লক্ষ্য ক'রে কিংকর্তব্যবিমূঢ় মহেন্দ্র বাড়ী ফিরে এসেছে শেষ পর্যন্ত। এবং তারপর থেকে মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। এই সম্পর্ক যখন চরমে পৌঁছেছে, যখন এরই সূত্র ধরে মহেন্দ্র বিনোদিনীকে নিয়ে গৃহত্যাগে উদ্যত তখন বিনোদিনী যেন সম্বিত ফিরে পায়। মহেন্দ্রের প্রতি তার যে আক্রোশ রয়েছে, ভালোবাসা নেই, এই সত্যটি তখন তার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। তৎক্ষণাৎ বিহারীর বাড়ীতে এসে সে স্বীকার করল,

"আমি মন্দ হই, যা হই, একবার আমার মতো হইয়া আমার অন্তরের কথা বুঝিবার চেষ্টা করো। আমার বুকের জ্বালা লইয়া আমি মহেন্দ্রের ঘর জ্বালাইয়াছি। একবার মনে হইয়াছিল, আমি মহেন্দ্রকে ভালোবাসি, কিন্তু তাহা ভুল।"

বস্তুতঃ বিনোদিনী মহেন্দ্রকে কপট ভালোবাসা দিয়ে এসেছে আশার সর্বনাশ করার জন্য। কারণ—তার ধারণা, তার শ্রদ্ধাস্পদ এবং প্রণয়াস্পদ বিহারী আশার প্রতি আসক্ত। দুটি আক্রোশের বশবর্তী হয়ে সে মহেন্দ্রকে তার প্রতি ভালোবাসায় লিপ্ত করেছে,—(এক) মহেন্দ্র তাকে উপেক্ষা কোরে তার প্রথমবার সর্বনাশ করেছে, তাই মহেন্দ্রের প্রতি আক্রোশ, (দুই) তার প্রণয়াস্পদ বিহারী আশার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার সম্ভাবনার (স্বপ্নের) সুখকে বিনষ্ট করেছে ব'লে আশার প্রতি আক্রোশ। মহেন্দ্রকে কপট ভালোবাসায় বিভ্রান্ত এবং বিপথগামী করতে পারলে, দু'টি আক্রোশই চরিতার্থ হয়, তাই সে মহেন্দ্রকে কপট ভালোবাসা প্রদান ক'রে এসেছে—এবং আশা-মহেন্দ্রকে সর্বনাশের কিনারায় এনে দাঁড় করিয়েছে।

জগতে সমস্ত সৌভাগ্য থেকে যে বঞ্চিত, তার মধ্যে আর কোনো উদ্যম যদি না থাকে, তবে অন্ততঃ প্রতিহিংসার উদ্যম থাকেই। বিনোদিনীর অন্যান্য অনেক গুণপনার মধ্যেও এই প্রতিহিংসার উদ্যম সর্বদা বিদ্যমান ছিল,—সে সাধ্যমত সবকিছুকে জ্বালিয়েই দিতে চায়। মানুষ যাকে ভালো বা সুন্দর বলে, তার প্রতি বিনোদিনীর কোনো দয়া বা মমতা নেই, কারণ সে সব তাকে কোনোদিন শান্তি দিতে পারেনি। বিহারী যখন তাকে উপদেশের ছলে বলল যে, সে মহেন্দ্র-আশাকে রক্ষা করতে পারত, তখন বিনোদিনী ফণিনীর মতো গর্জন ক'রে উঠল—"আমার নিজের সুখ দুঃখ কিছুই নাই? তোমার আশার ভালো হউক, মহেন্দ্রের সংসার ভালো হউক, এই বলিয়া ইহকালে আমার সকল দাবী মুছিয়া ফেলিব, এত ভালো আমি নই—ধর্ম শাস্ত্রের পুঁথি এত করিয়া আমি পড়ি নাই। আমি যাহা ছাড়িব তাহার বদলে আমি কী পাইব।"

এই রকম একটি প্রতিহিংসাপরায়ণ আত্মশক্তি নিয়ে সে সংগ্রাম কারে চলেছিল নিজেকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করতে,—জগৎসংসার যা কিছু থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে, সেই সব কিছুকে পুনরায় আয়ত্ত করতে নির্দ্বিধায় অকরুণ হস্তে সে চেয়েছে পথের কাঁটা উপড়ে ফেলতে। যখন দেখল, আশাও তার লক্ষ্যের পথে কাঁটা, তখন আশার ক্ষতিসাধন করতেও সে দ্বিধা করেনি। তার

লক্ষ্য বিহারী। মহেন্দ্রের সঙ্গে কপট প্রণয়ের সংকট ক্ষণে সে বিহারীর কাছে এসেছে চিরকালের জন্য রক্ষা পেতে।

কিন্তু তার এত প্রচেষ্টার প্রথম পরাভব এই যে, বিহারী তাকে সরাসরি গ্রহণ করার পরিবর্তে গ্রামে ফিরে যাবার পরামর্শ দিল। নিরুপায় বিনোদিনীকে সেই পরামর্শই গ্রহণ করতে হল। আত্মপ্রতিষ্ঠায় কলঙ্কিত এবং ক্লিন্ন সংগ্রামে সে মেতেছিল উৎসাহে, কারণ স্বপ্ন দেখেছিল সাফল্যের। কিন্তু এখন সাফল্যের বরমাল্যের পরিবর্তে কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে তাকে গ্রামে ফিরে যেতে হচ্ছে—এইটিই ট্র্যাজেডি।

তারপর গ্রামের অভিমুখে যাত্রিশূন্য ট্রেণ-কামরায় তার নিঃসঙ্গ প্রত্যাবর্তন দৃশ্যটিও যথেষ্ট করুণ। আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ক্ষেত্র থেকে এইভাবে নিঃসঙ্গ এবং নিঃশব্দ পশ্চাদপসরণ সে বোধহয় চিন্তাও করেনি কোনোদিন। কিন্তু সেটাই আজকে একটা রূঢ় বাস্তব হয়ে তাকে যেন ব্যঙ্গ করছে। সে এরই মধ্যে নিতান্ত দীনের মতো সান্ত্বনা খুঁজে পেতে চেষ্টা করতে থাকে। "গ্রীষ্মের শস্যশূন্য দিগন্ত প্রসারিত ধূসর মাঠের মধ্যে সূর্যাস্ত দৃশ্য দেখিয়া বিনোদিনী ভাবিতে লাগিল, আর যেন কিছুর দরকার নাই—মন যেন সেইরূপ স্বর্ণ-রঞ্জিত শুদ্ধ বিস্তীর্ণ শান্তির মধ্যে সমস্ত ভুলিয়া দুই চক্ষু মুদ্রিত করিতে চায়, তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সুখ দুঃখ সাগর হইতে জীবন তরীটি তীরে ভিড়াইয়া নিঃশব্দ সন্ধ্যায় একটি নিষ্পত্র বটবৃক্ষের তলায় বাঁধিয়া রাখিতে চায়, আর কিছুতেই কিছু প্রয়োজন নাই।"

প্রয়োজন হয়তো বিনোদিনীর আর কিছুতেই সামান্যও ছিল না। গ্রামের প্রতিবেশিনীদের কুৎসা এবং তাকে উপলক্ষ্য করে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চায়ি প্রভৃতির মর্মান্তিক লজ্জার মধ্যেই সে সময় কাটাতে পারত, যদি তার শ্রদ্ধাস্পদ এবং প্রণয়াস্পদ বিহারী তার সঙ্গে কোনোরকমে একটা যোগাযোগ রক্ষা করত। আশায় ভর ক'রে সে বিহারীকে পত্রও দিয়েছে, কিন্তু কোনো উত্তর পায় না, বিহারীও বিনোদিনীকে বিদায় দিয়ে ততদিনে পশ্চিমে চলে গেছে। কিন্তু বিহারীর কাছ থেকে পত্রের কোনো উত্তর না পাওয়ায় বিনোদিনী নিজেকে অত্যন্ত বিড়ম্বিত এবং অপমানিত বোধ করতে লাগল। "অন্তরে বাহিরে চারিদিকে আঘাত ও অপমানের মন্থনে তাহার হৃদয়ের অন্ধকার তলদেশ হইতে নিষ্ঠুর সংহার শক্তি মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিল।"

একদিন বিভ্রান্ত এবং মতিচ্ছন্ন মহেন্দ্র বিনোদিনীকে লাভ করার মোহে বিনোদিনীর পল্লীকুটীরের দ্বারে এসে দেখা দিল। বিনোদিনী তাকে ফিরিয়ে দিল। কিন্তু ইতোমধ্যেই বিনোদিনীর অন্তর্জ্বালা তীব্র হয়ে উঠেছে। একদিকে গ্রামের লোক-নিন্দা,—অপরদিকে বিহারীর বিরহ,—এই দুইয়ের মূল কারণ তার যে গ্রামে আগমন, তা তো বিহারীরই আদেশে। কিন্তু বিহারী তার কি মূল্য দিল? এই অন্তর্জ্বালা যখন চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে, তখনই (পরের দিন) মহেন্দ্রের বিনোদিনীকে নিয়ে যাওয়ার দ্বিতীয় চেষ্টা। বিনোদিনী এই সুযোগ গ্রহণ করল। আত্মপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব সে নিজের হাতেই পুনরায় গ্রহণ করল—পরের উপদেশে তার জ্বালা একটুও জুড়োয় না। তাই বিহারীর সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে সে মহেন্দ্রের সঙ্গেই গ্রাম ত্যাগ করে চলল।

মহেন্দ্রের সঙ্গে কোলকাতায় এসে বিনোদিনী এক অত্যন্ত বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়েছে এবং নিজের অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে বিনোদিনীর আর ভালোমন্দ বিচারের অবস্থা ও অবকাশ নেই। “যেদিন বিহারীর কাছে বিনোদিনী নিজের প্রেম নিবেদন করিয়াছে, সেদিন হইতে তাহার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেছে। যে উদ্যত চুম্বন বিহারীর মুখের কাছ হইতে সে ফিরাইয়া লইয়া আসিয়াছে, জগতে তাহা কোথাও আর নামাইয়া রাখিতে পারিতেছে না, পূজার অর্ঘ্যের ন্যায় দেবতার উদ্দেশে তাহা রাত্রিদিন বহন করিয়াই রাখিয়াছে। বিনোদিনীর হৃদয় কোনো অবস্থাতেই সম্পূর্ণ হাল ছাড়িয়া দিতে জানে না—নৈরাশ্যকে সে স্বীকার করে না। তাহার মন অহরহ প্রাণপণে বলিতেছে, আমার এ পূজা বিহারীকে গ্রহণ করিতেই হইবে।’...”

বস্তুতঃই এই আত্মবিশ্বাস বিনোদিনীর মূল শক্তি হয়ে দেখা দিল। মহেন্দ্র বিনোদিনীর সঙ্গে এর পর থেকে মিথ্যাচার সুরু করেছে। পাছে বিহারীর সঙ্গে বিনোদিনীর সাক্ষাৎ ঘটে, এই ভয়ে সে বিনোদিনীকে নিয়ে পশ্চিমে রওয়ানা হয়ে যায়,—বিনোদিনী রাজী হয় এই কারণে যে পশ্চিমে তার সঙ্গে বিহারীর দেখা হতে পারে। কিন্তু ততদিনে বিহারী পশ্চিম থেকে ফিরে এসেছে।

মহেন্দ্রের সঙ্গে বিনোদিনীর এই পশ্চিম যাত্রার সংবাদ যখন বিহারী পেল, তখন বিনোদিনীর প্রতি বিহারীর মনও বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল, কারণ বিনোদিনীর অভিসন্ধির কথা সে আদৌ জানে না। এই বিতৃষ্ণা নিয়েই সে

কাকিমার অনুরোধে মহেন্দ্রের অন্বেষণে নির্গত হয়ে এলাহাবাদে বিনোদিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। কিন্তু তখন আর বিনোদিনী কোনো প্রকার মান অভিমান বা ঠুন্‌কো আত্মমর্যাদার কথা চিন্তা ক'রে বিহারীর বিতৃষ্ণাকে স্থায়ী করতে দেয়নি,—সে সমস্ত কথা বিহারীকে স্পষ্ট করে বলল। বলল, 'যদি বিশ্বাস কর তো ভাগ্য মানিব, যদি না কর তো তোমাকে দোষ দিব না, আমাকে বিশ্বাস করা কঠিন।'

বিগলিত চিত্ত বিহারী বিনোদিনীকে বিশ্বাস করল। এমন সময়ে অকস্মাৎ সেই স্থানে মহেন্দ্র এসে বিহারী-বিনোদিনীর এই সাক্ষাৎকারকে বিদ্রূপ করলে বিহারী যা বলেছিল, তা শুনে বিনোদিনীর জীবনে যেন নতুন রক্তস্রোত বইতে সুরু করল। বিহারী বলেছিল, 'বিনোদিনীকে আমি বিবাহ করিব, তোমাকে জানাইলাম, অতএব এখন হইতে সংযত ভাবে কথা কও।'

"বিনোদিনী চমকিয়া উঠিল—বুকের মধ্যে তাহার সমস্ত রক্ত তোলপাড় করিতে লাগিল।"

কিন্তু বিনোদিনী বিধবা, তদুপরি অনেক কলঙ্কে কলঙ্কিনী—নিজের সম্পর্কে বিনোদিনীর এই সংস্কার তাকে বিহারীর জীবন-সঙ্গিনীর সৌভাগ্যলাভ করার পথে বাধা হয়ে দেখা দিল। "বিনোদিনী হাত যোড় করিয়া কহিল, ভুল করিয়ো না—আমাকে বিবাহ করলে তুমি সুখী হইবে না, তোমার গৌরব যাইবে—আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব। তুমি চিরদিন নির্লিপ্ত প্রসন্ন। আজও তুমি তাই থাকো—আমি দূরে থাকিয়া তোমার কর্ম করি। তুমি প্রসন্ন হও, তুমি সুখী হও।"

বিনোদিনী বিহারীর সঙ্গে দাম্পত্য সুখলাভের ভরসা করার সাহস পায় না সত্য, কিন্তু বিহারীর কাছাকাছি থেকে সে তার অভীষ্ট দেবপূজাটি সাঙ্গ করতে চায়। এইজন্য সে, বিহারী দুঃস্থদের জন্য গঙ্গার ধারে যে বাগান করেছে, সেখানে একটা প্রয়োজনীয় কাজের মধ্য দিয়ে বিহারীকে সহায়তা দিতে চায়। নিজের প্রণয়-বিড়ম্বিত জীবনকে সে এইভাবে কোনো প্রকারে প্রণয়-সিঞ্চিত কোয়ে কৃতার্থ হতে চায়।

কিন্তু বিবেচক বিহারী বিনোদিনীর এই প্রস্তাবের উত্তরে বলল, "বৌঠান, আমি অনেক ভাবিয়াছি। নানান হাঙ্গামে আমাদের জীবনের জালে অনেক জট পড়িয়া গেছে। এখন নিভৃতে বসিয়া বসিয়া তাহারই একটি একটি গ্রন্থি মোচন করিবার দিন আসিয়াছে।....যদি সমস্ত অতীতকাল অনুকূল হইত,

তবে সংসারে একমাত্র তোমার দ্বারাই আমার জীবন সম্পূর্ণ হইতে পারিত,—এখন তোমা হইতে আমাকে বঞ্চিত হইতেই হইবে। এখন আর সুখের জন্য চেষ্টা করা বৃথা, এখন কেবল আস্তে আস্তে ভাঙ্গচুর সারিয়া লইতে হইবে।"

মানুষ যদি এইভাবে বিবেচনা করতে সুরু করে, তবে বিনোদিনীর মতো ভাগ্য বিড়ম্বিতা অথচ সৌভাগ্যলিপ্সু নারীর জীবনে কিছু পাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। অকাল বৈধব্য যাকে জীবনের সুরুতেই সমস্ত বিবেচনার বাইরে ফেলে রেখেছে, সে কখনো মানুষের বিবেচনার কাছে প্রত্যাশী হতে পারে না। এইজন্য অবিবেচক মহেন্দ্রের কাছে সে যদিও বা কিছু লাভ করতে পারত, বিবেচক বিহারীর কাছে সে কিছুই লাভ করতে পারে না। এই জন্যই বিহারী বিনোদিনীর শেষ মিনতি প্রত্যাখ্যান করতে পারল। "এই সময়ে অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিতেই বিনোদিনী কহিল, 'মা, আমাকে তুমি ঠেলিয়ো না।' অন্নপূর্ণা কহিলেন, 'মা, চলো, আমার সঙ্গেই চলো।"

এই অংশটি গাম্ভীর্যে এবং কারুণ্যে থমথমে হয়ে উঠেছে। বিহারীর এই উক্তির সারবত্তা এবং যৌক্তিকতা অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু তাতে বিনোদিনীর এলো গেল কি? পুরুষের প্রেমলাভ করবার জন্য তার যে এত প্রবল সংগ্রাম—সেই সংগ্রামের শেষে সে বস্তুগত কিছুই পেল না। বিহারীর প্রেম সে আগেই পেয়েছিল, এবং সেই স্মৃতিকে নিয়ে সে গ্রামেই থাকতে পারত। কিন্তু বিহারীর সান্নিধ্যলাভের আতীব্র বাসনাই তাকে মহেন্দ্রের সঙ্গে যত্রতত্র ঘুরিয়েছে, এবং পরিশেষে সে এসে দেখল, সে নতুন করে কিছুই পেল না। বিহারীর যে আদেশ মাথায় নিয়ে তাকে গ্রামে চলে যেতে হয়েছিল, সেই আদেশ মাথায় নিয়েই তাকে কাশী চলে যেতে হচ্ছে। তার এই কাশী চলে যাওয়াই হচ্ছে তার এই প্রার্থিত চাওয়া-পাওয়ার জগতের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ। যদিও বিহারীর প্রেম এখন তার মনের মধ্যে একটা পরিপূর্ণ প্রশান্তি এনে দিয়েছে, তবুও বিদায়কালীন বিনোদিনীর এই অপরিসীম স্থৈর্য এবং বিনম্রতা বুঝিয়ে দিচ্ছে যে মনের মধ্যে একটা বেদনাকে সে চূড়ান্ত করে স্বীকার করে নিয়ে যাচ্ছে,—এরজন্য সে কোনো অভিযোগ করবে না, একে দূর করার জন্য সে কোনো সংগ্রামেও আর লিপ্ত হবে না,—এটা তার নিয়তি—জগতে তার প্রার্থিতকে চূড়ান্ত ক'রে না পাওয়াই তার নিয়তি।

নিয়তির অনুশাসন যে এমন অমোঘ হয়ে তার জীবনে দেখা দেবে, এটা সে বুঝতেই পারেনি—এখানেই তার ট্র্যাজেডির বীজটি নিহিত। বুঝলে হয়ত

সে নিয়তির সঙ্গে সংগ্রাম করত না। কিন্তু রোমান্টিক চৈতন্য কোনো অস্বীকৃতিকেই চূড়ান্ত বলে মানতে চায় না। সে সংগ্রামে লিপ্ত হয়,—মাথা কুটে মরে,—ক্ষতবিক্ষত হয়ে শেষে নিয়তির কাছে পরাভব স্বীকার করে। বিনোদিনীর চরিত্রেও রোমান্টিক ট্র্যাজেডির নায়িকার এই লক্ষণগুলি স্পষ্ট।

*　　*　　*

আশা এই উপন্যাসের নায়িকা, মহেন্দ্রের পত্নী। এই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি হয়েছে আশা-মহেন্দ্রের মিলনের মধ্য দিয়ে। সেই অর্থে হয়তো আশার চরিত্রটিকে ট্র্যাজেডির চরিত্র হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু মহেন্দ্র-বিনোদিনীর প্রণয় ঘনিষ্ঠতার ফলস্বরূপ আশার ভাগ্যাকাশে যে দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছিল, এবং সেই দুর্যোগকে আশা যে ভাবে ভোগ করেছে, সহ্য করেছে, তা এই উপন্যাসে যথেষ্ট কারুণ্যের সৃষ্টি করেছে। অসহায়ের প্রতিবাদ-বিহীন দুঃখভোগের মধ্যে যে একটি ট্র্যাজেডির রস নিহিত থাকে, আশার দুঃখ-কষ্টের মধ্যে সেই প্রকারের একটি ট্র্যাজেডির রস নিহিত রয়েছে। সেইজন্য অন্তিমে মিলন থাকলেও তার পূর্বের এই দুঃখভোগের দিকটায় আমরা যথেষ্ট বিষণ্ণতা বোধ করি। শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজি-কমিডির ভাব এখানে অনেকটা পাওয়া যায়।

নৌকাডুবি (১৯০৬)—'নৌকাডুবি' উপন্যাসে বিয়োগান্ত পরিণতি ঘটেছে দুটি চরিত্রের,—রমেশ এবং হেমনলিনী। এরাই কাহিনীর নায়ক-নায়িকা; এদের ভালোবাসাকে কেন্দ্র করেই কাহিনীটি গড়ে উঠেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ নিজগ্রামে রমেশের ডাক পড়ে, তার বিবাহের বন্দোবস্ত হয়। বিবাহের পর ফিরবার পথে নৌকাডুবিতে তার স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজন নিখোঁজ হয়। কিন্তু রমেশ বেঁচে যায়। অনেক অন্বেষণের পর নদীর চরে অচৈতন্য-অবস্থায় পতিতা নব-বিবাহিতা একটি বধূকে সে নিজের স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই রমেশ বুঝতে পারে, যাকে সে ঘরে এনেছে, সে তার আসল স্ত্রী নয়, অন্যের স্ত্রী এবং তার নাম কমলা। তখন সে আত্মধিক্কারে জর্জরিত হতে থাকে। শেষে সে কমলাকে একটা বোর্ডিংএ রেখে নিজে পৃথকভাবে বসবাস আরম্ভ করে।

রমেশ জানে যে কমলা তার বিবাহিতা স্ত্রী নয়, কিন্তু কমলা মনে করে রমেশ তার স্বামী। তাই রমেশ যতই নিজেকে স্বামীর অধিকার থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, কমলার অভিমান, বেদনা ও লজ্জা ততই রমেশের কাছে পত্নীত্ব

দাবী করতে থাকে। সমস্ত কথা কমলার কাছে স্পষ্ট ক'রে বলা যেমন রমেশের পক্ষে অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব হেমনলিনীর কাছে এটাকে 'বিবাহ' ব'লে স্বীকার ক'রে অব্যাহতি পাওয়া। যেটা যথার্থ বিবাহ নয়, সেটাকে স্বীকার ক'রে সে যেমন কমলার সতীত্বের মর্যাদা-হানি করতে পারে না, তেমনি হেমনলিনীর সঙ্গে তার যথার্থ প্রণয়ের সম্পর্ককেও ভুলতে পারে না। এই দ্বৈততা বা দ্বিবিধ শক্তির টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েই রমেশের চরিত্র এগিয়ে গেছে এক ব্যর্থ পরিণতির দিকে।

কমলা সম্পর্কে রমেশের মনে যে রোমান্সের সৃষ্টি হয়েছে, তা নয়। কমলার প্রতি পরিচয় জানার পর থেকে, সে যে কমলার প্রতি প্রেমে মুগ্ধ, এমন প্রমাণও নিঃসংশয়ভাবে পাওয়া যায় না। তবু সে যে মনে মনে কমলার প্রতি আকৃষ্ট, তার কারণ কমলার প্রতি তার দয়া! এই দয়াই তাকে ঘটনাসমূহের ট্র্যাজিক জটিলতার মধ্যে নিয়ে গেছে! যে ঘটনায় কমলা রমেশের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, তার মধ্যে কমলার কোনো দায়িত্ব নেই। সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত-ভাবেই সে জীবনের চরমতম দুর্দশার মধ্যে পতিত হয়েছে। এটা যে প্রকৃত দুর্দশা, তা কমলা জানেও না। তাই সেটা কমলাকে জানানোই সবচেয়ে নিষ্ঠুর কাজ। যে এক ভুলের স্বর্গে সে সুখে দুঃখে মোটামুটি আছে, সেখান থেকে ভ্রষ্ট করে নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখী ক'রে দেওয়ার মধ্যে ন্যায্যতা থাকলেও মানবতা নেই। এইজন্যই রমেশ অক্ষয়ের জেরার উত্তরে বলে, "কমলা সম্বন্ধে তোমাদের সঙ্গে সকল কথা আলোচনা করিবার গুরুতর বাধা আছে—তোমরা আমাকে সন্দেহ করিলেও সে অন্যায় আমি কিছুতে করিতে পারিব না। আমার নিজের সুখ-দুঃখ, মান-অপমানের বিষয় হইলে আমি তোমাদের কাছে গোপন করিতাম না—কিন্তু অন্যের প্রতি অন্যায় করিতে পারি না।"

কমলার প্রতি এই দয়ার বশবর্তী হয়েই রমেশ কথায়-বার্তায় এবং খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কমলার মনে খুশি-ভাবের সৃষ্টি করেছে মাঝে মাঝে। অক্ষয়ের গোয়েন্দাগিরি থেকে রক্ষা পাবার জন্য রমেশ কমলাকে দেশে রেখে আসতে গিয়ে পশ্চিমে রওয়ানা হয়ে পড়ে স্টীমারে ক'রে। স্টীমারের মধ্যেও রমেশের একই আচরণ। সে যে প্রকৃত স্বামী নয়, সেইজন্য প্রকৃত দূরত্বটি বজায় রেখে অন্য সর্ব-প্রকারে সে কমলার সঙ্গে হৃদ্যতা বজায় রেখে চলে। কিন্তু দাম্পত্য-জীবনের মৌল ঘনিষ্ঠতাকে রমেশ মোটেই প্রশ্রয় দিচ্ছে না বলে, ক্রমশঃই কমলার চোখে রমেশ রহস্যময় হয়ে উঠতে থাকে।

রমেশের ব্যবহারে দাম্পত্যধর্মের যথার্থ স্বীকৃতি কিছু থাক আর না থাক, কমলাকে নিয়ে তার একটা ঘরকন্নার সম্পর্ক স্টীমারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। কমলা পত্নীত্বের অধিকারের অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে তার গৃহিণীপনা চালিয়ে যেতে থাকে। রমেশ লক্ষ্য করে সমস্যা ক্রমশঃ জটিল হচ্ছে, পরিত্রাণ পাবার পথ ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।—"রমেশ তাহার করতলের উপর হাত রাখিয়া ভাবিতে লাগিল, সম্মুখে সমস্ত জীবনই তো পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার ক্ষুধিত উপবাসী জীবন দুশ্ছেদ্য সংকটকালে বিজড়িত। এ জাল কি সে সবলে দুই হাত দিয়া ছিন্ন করিয়া ফেলিবেনা?"

বস্তুতঃ রমেশের মনে হয়, তার জীবনের যেন কোনো নিয়ামন নেই। এক কর্তব্যের তাড়নায় সে যেন জীবনের সবকিছু হারিয়ে এক অনির্দেশ্য দুঃস্বপ্নের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। সে নিজেও যেন নিজের বুদ্ধি এবং কার্যকুশলতা হারিয়ে ফেলেছে। এখন কেউ যদি তার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা কেড়ে নিয়ে একটা ছোটো অথচ নির্দিষ্ট কাজের মধ্যে বেঁধে রাখে, তবে সে বেঁচে যায়। তাই কিছুদিন আগেই সে একটি স্টীমার-স্টেশনের কেরাণীবাবুকে লক্ষ্য ক'রে প্রলুব্ধের মতো ভেবেছিল, "আমার ভাগ্য যদি আমাকে ওই কেরাণীটির মতো একটি সংকীর্ণ অথচ সুস্পষ্ট জীবন-যাত্রার মধ্যে বাঁধিয়া দিত—হিসাব লিখিতাম, কাজ করিতাম, কাজে ত্রুটি হইলে প্রভুর বকুনি খাইতাম, কাজ সারিয়া রাত্রে বাসায় যাইতাম—তবে আমি বাঁচিতাম, আমি বাঁচিতাম।"

হেমনলিনীর সঙ্গে রমেশের সম্পর্ক যতই পাকা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাক না কেন, কমলা আজ তাকে ভিন্নতর পথে এতদূর অগ্রসর ক'রে নিয়ে গেছে যে, হেমনলিনীর সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ককে সে আর যেন নিজের ব্যাপার বলে মনে করতে পারছে না। কমলার অসহায় অবস্থা, তার সঙ্গে স্টীমার ভ্রমণ, চক্রবর্তী খুড়ো প্রভৃতি পাঁচজনের জানাজানি তার অনিচ্ছা এবং ভদ্রতাবোধের উপর এমনভাবে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে, যে সে চাপের কাছে নতি স্বীকার ক'রে স্বস্তি পেতে চায়। তাই সে ভাবে, "হেমনলিনী ও রমেশের মাঝখানে একটা যুদ্ধক্ষেত্র পড়িয়া আছে। বাধা—অপমান—অবিশ্বাস কাটিয়া যদি রমেশ জয়ী হইতে পারে তবেই সে মাথা তুলিয়া হেমনলিনীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। সেই যুদ্ধের কথা মনে হইলে তাহার ভয় হয়, জিতিবার কোনো আশা থাকে না। কেমন করিয়া প্রমাণ করিবে? এবং প্রমাণ করিতে হইলে সমস্ত ব্যাপারটা লোক সাধারণের কাছে এমন কদর্য

এবং কমলার পক্ষে এমন সাংঘাতিক আঘাতকর হইয়া উঠিবে যে, সে সংকল্প মনে স্থান দেওয়া কঠিন।

অতএব দুর্বলের মতো আর দ্বিধা না করিয়া কমলাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিলেই সকল দিক শ্রেয় হইবে। হেমনলিনী তো রমেশকে ঘৃণা করিতেছে—এই ঘৃণাই তাহাকে উপযুক্ত সৎপাত্রে চিত্ত সমর্পণ করিতে আনুকূল্য করিবে। এই ভাবিয়া রমেশ একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের দ্বারা সেই দিককার আশাটাকে ভূমিসাৎ করিয়া দিল।"

কমলাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে ঘর-সংসার করার এই রকম একটা অস্পষ্ট সংকল্প মনে নিয়ে তারা সকলে গাজিপুরে এল। প্রথমটা চক্রবর্তী খুড়োর বাড়ীতে আশ্রয় নিলেও অচিরেই বাড়ী ঠিক করে নিয়ে সেখানে কমলাকে নিয়ে সংসার পাতবে ভাবল। কিন্তু তার জন্য কমলার সঙ্গে যে প্রকারের ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করা দরকার, তা রমেশ কিছুতেই সুরু করতে পারছে না। "কল্পনায় কমলাকে গৃহিণীপদে অভিষিক্ত করিয়া সে মনকে নানা প্রকার ভাবী সুখের আশ্বাসে উত্তেজিত করিয়াও তুলিয়াছে, কিন্তু প্রথম আরম্ভটাই দুরূহ। কিছুদিন হইতে কমলার প্রতি যেটুকু দূরত্ব রক্ষা করা তাহার অভ্যস্ত হইয়া গেছে, হঠাৎ একদিন কেমন করিয়া সেটা ভাঙিয়া ফেলিবে, তাহা সে ভাবিয়া পাইতেছিল না।"

অবশ্য রমেশের মন যে কমলার প্রতি ক্রমশঃ অনুকূল হয়ে আসছে তার প্রমাণও আমরা পাই। চক্রবর্তীর কন্যা শৈলজার ষড়যন্ত্রে রমেশ যখন নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কমলার সঙ্গে অন্তঃপুরে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছে। তখন "এই মধুকর গুঞ্জরিত কার্তিকের আলস্যদীর্ঘ জনহীন মধ্যাহ্নে একটা অভিসারের আভাস তাহার চিত্তকে একটুখানি চঞ্চল করিল।"

অর্থাৎ কমলার প্রতি রমেশের দয়া ও কর্তব্যবোধ ক্রমে একটা রোমান্টিক আকর্ষণেই পরিণতি পেতে চলেছে। এবং এই রোমান্টিক আকর্ষণটাই যেন তার স্থাণু জীবনকে অকস্মাৎ গতি প্রদান করল। হেমনলিনীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে সে কলকাতায় এল। সেখানে শুনল, হেমনলিনী পিতার সঙ্গে পশ্চিমে বেড়াতে গেছে, সঙ্গে নলিনাক্ষ নামে এক যুবক।

হেমনলিনীর আসরে এই নূতন যুবকটির আবির্ভাব রমেশের কাছে খুব ভালো লাগেনি। হেমনলিনীর সঙ্গে তার প্রণয়-ঘন ঘটনার স্মৃতিগুলি তার সামনে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। কিন্তু হেমনলিনীর সঙ্গে তার সম্পর্ক চুকিয়ে

ফেলারই দরকার। তাই সমস্ত কথা প্রকাশ করে হেমনলিনীকে লিখিত একটি চিঠি সে সঙ্গে ক'রে হেমনলিনীর বাড়ী নিয়েও এসেছিল, কিন্তু হেমের অনুপস্থিতে তা আর দেওয়া হ'ল না।

যদিও কলকাতায় রমেশের কোনো সুস্পষ্ট আকর্ষণ ছিল না, তথাপি কিসের আকর্ষণে কে জানে রমেশ কলকাতায় এক মাস কাটিয়ে গাজিপুরে ফিরল। এবং তার পরেই গাজিপুরে একটা বাড়ী ভাড়া নিয়ে তা পরিষ্কার করার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল—যদিও সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করল কমলা। সর্বক্ষণ পরিশ্রম ক'রে তার নিজের আবাসস্থলকে নিজের মতো করে নিতে লাগল—সে যেন একটা কাজ পেয়ে বেঁচে গেল—"তাহার প্রফুল্ল মুখ, তাহার সুনিপুণ পটুত্ব, রমেশের মনে এক নূতন বিস্ময় ও আনন্দের উদ্রেক করিয়া দিল।"

রমেশের মনের রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষার সম্মুখে কমলার এইভাবে গৃহিণীর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ রমেশকে গৃহসুখকাতর করে তুলল। তাই নির্দিষ্ট দিনে গৃহপ্রবেশ হল না বলে রমেশের মনে একটু বেদনাই জাগল—"আজ তাহাদের নিজের নিভৃত ঘরটিতে সন্ধ্যা-প্রদীপটি জ্বলিবে এবং কমলার সলজ্জ স্মিত-হাস্যটির সম্মুখে রমেশ আপনার পরিপূর্ণ হৃদয় নিবেদন করিয়া দিবে, ইহা সে সমস্ত দিন থাকিয়া থাকিয়া কল্পনা করিতেছিল।"

গৃহপ্রবেশের বিলম্ব দেখে রমেশ এলাহাবাদে একটা কাজ সেরে আসতে গেল। রমেশের এই সাময়িক অনুপস্থিতিতে ঘটনাচক্রে হেমনলিনীকে লিখিত কমলা সম্পর্কে রমেশের অপ্রদত্ত চিঠি কমলার হাতে পড়ে গেল। এই চিঠির সূত্র থেকেই কমলা সর্ব প্রথম জানল যে রমেশ তার স্বামী নয়। "ইহার লজ্জা কমলাকে বার-বার করিয়া তপ্ত শেলে বিঁধিতে থাকিল। প্রতিদিনের বিচিত্র ঘটনা মনে পড়িয়া সে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল। এ লজ্জা তাহার জীবনে একেবারে মাখা হইয়া গেছে, ইহা হইতে কিছুতেই আর উদ্ধার নাই।" সুতরাং কমলার পক্ষে রমেশের সঙ্গে সংসার করা অসম্ভব হয়ে উঠল—সে গোপনে গৃহত্যাগ করে, এবং অজানা ভবিষ্যতের মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করে এবং শেষে কাশীতে একটি পরিবারে পাচিকার কাজে নিযুক্ত হল।

রমেশ এলাহাবাদ থেকে পুলকিত চিত্তে ফিরে এসে শূন্য গৃহ দেখে বিচলিত হল। খোঁজাখুঁজি করে সকলেই স্থির সিদ্ধান্ত করল, কমলা গঙ্গায় আত্মহত্যা

করেছে। কারণটা কেউই বুঝল না। রমেশও জানল না যে হেমকে লেখা তার চিঠি কমলার হাতে পড়েছে। একদিন রমেশ হয়তো কমলার আত্ম-হত্যার সংবাদে এত বিচলিত হত না—একটা সাধারণ শোকের ঘটনা হিসেবে এটাকে গ্রহণ করত। কিন্তু আজ "রমেশের বুকের ভিতরটা যেন শুকাইয়া গেল; তাহার মধ্যে অশ্রুর বাষ্পটুকুও ছিল না। সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—'একদিন এই কমলা এই গঙ্গার জল হইতে উঠিয়া আমার পাশে আসিয়াছিল, আবার পূজার পবিত্র ফুলটুকুর মতো আর একদিন এই গঙ্গার জলের মধ্যেই অন্তর্হিত হইল'।" সে কমলার জন্য এলাহাবাদ থেকে আনা নেকলেসটা গঙ্গার জলেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গাজিপুর ছেড়ে চলে গেল।

রমেশ মনে করল তার জীবনের সমস্ত অধ্যায়ের এই শেষ। তাই সে মনে মনে বলেছে, "আমার জীবনে যে নিদারুণ ঘটনা আঘাত করিল, তাহাতে আমাকে চিরদিনের জন্য সংসারের অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। বজ্রাহত গাছ প্রফুল্ল উপবনের মধ্যে স্থান পাইবার আশা কেন করিবে?"

অর্থাৎ, একটা প্রচণ্ড নৈরাশ্য এখন রমেশকে পেয়ে বসেছে। নিজের জীবনকে একটা বিরাট অপচয় বলে সে মনে করছে—। এই শূন্য মন নিয়ে সে অনেক যায়গা ভ্রমণ করল। "অবশেষে এই ভ্রমণশ্রান্ত যুবকটির অন্তঃকরণ কেবল ঘর চাহিয়া হা হা করিতে লাগল। তাহার মনে একটি শান্তিময় ঘরের অতীত স্মৃতি ও একটি সম্ভবপর ঘরের সুখময় কল্পনা কেবলই আঘাত দিতেছে।"

কলকাতায় এসে রমেশ হেমনলিনীর প্রতিবেশী চন্দ্রমোহনের কাছে নলিনাক্ষের বৃত্তান্ত স্পষ্ট করে জানল এবং বুঝল সে-ই প্রকৃতপক্ষে কমলার স্বামী। সে ভাবল নলিনাক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে মিলন হতে চলেছিল তার, আবার তার প্রেয়সী হেমের সঙ্গে বুঝি মিলন হতে চলেছে নলিনাক্ষের। এই উল্টো-পাল্টা মিলনের মধ্যে রমেশ কোন কারণ খুঁজে পেল বলা যায় না, কিন্তু সে ভাবল, "এবার সে যখন তাহার জীবনের সমস্যাজাল হইতে মুক্ত হইয়াছে, তখন খুব সম্ভব, অদৃষ্ট এই জটিল উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে রমেশের মধ্যে নিদারুণ উপসংহার লিখিবে না।"

হেমনলিনীর প্রতিবেশী চন্দ্রমোহনের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে রমেশ হেমের দাদা যোগেন্দ্রের কাছে গেল তার নিজের সম্বন্ধে সমস্ত মিথ্যা ধারণার অবসান ঘটাতে। সত্যের প্রতি, নীতির প্রতি রমেশের একটা নিষ্ঠা ছিল। তাই সে চাইত, আর সকলেও তার সত্যতায় বিশ্বাস করুক। একদিন

যোগেন্দ্র এবং অক্ষয় রমেশের কাছে, কমলার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি—সে সম্পর্কে সত্য সংবাদ জানতে চেয়েছিল। কমলার স্বার্থে সেদিন রমেশ কিছু বলতে পারেনি। আজ তাই বিবেকের দংশন নিবারণ করার জন্য যোগেন্দ্রের কাছে সে এসেছে। যোগেন্দ্র রমেশের এই কথা সেদিন বিশ্বাস করত না নিশ্চয়ই, কিন্তু আজ বিশ্বাস করল। সমস্ত ঘটনা বলার পর রমেশ নিজেকে মুক্ত মনে করল, "আমি কোথা হইতে ভাগ্য রচিত এমন একটা দুশ্ছেদ্য মিথ্যার জালে জড়াইয়া পড়িয়াছিলাম যে, তাহার মধ্যেই সম্পূর্ণ ধরা দেওয়া ছাড়া আমি কোনো দিকেই কোনো উপায় দেখিতে পাই নাই। আজ যে আমি তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছি, আর যে আমার কাহারও কাছে কিছুই গোপন করিবার নাই, ইহাতে আমি প্রাণ পাইয়াছি। কমলা কী জানিয়া, কী ভাবিয়া আত্মহত্যা করিল, তাহা আমি আজ পর্যন্ত বুঝিতে পারি নাই, আর বুঝিবার কোনো সম্ভাবনাও নাই—কিন্তু ইহা নিশ্চয়, মৃত্যু যদি এমন করিয়া আমাদের দুই জীবনের এই কঠিন গ্রন্থি কাটিয়া না দিত, তবে শেষকালে আমরা দুজনে যে কোন্ দুর্গতির মধ্যে গিয়া দাঁড়াইতাম তাহা মনে করিলে এখনো আমার হৃৎকম্প হয়।"

রমেশের এই প্রবল নীতি নিষ্ঠা দেখে যোগেন্দ্র রমেশের সব কথাই বিশ্বাস করল এবং তার প্রতি যোগেন্দ্রের বহু পূর্বের অনুরক্তি ফিরে এল। নলিনাক্ষকে যোগেন্দ্রের কখনো পছন্দ হয়নি। তাই সে চাইল রমেশকে পুনরায় হেম-নলিনীর সামনে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং রমেশ সম্পর্কে সমস্ত মিথ্যা জনশ্রুতির অবসান ঘটাতে। যোগেন্দ্রের এই প্রস্তাবে রমেশও রাজী হয়ে গেল, এবং সুরু হল তার ট্র্যাজেডির উপসংহারটুকু,—যেটা সে ভেবেছিল খুব করুণ হবে না।

অন্নদাবাবু সপরিবারে কাশীতেই বাস করছিলেন। সেখানে অক্ষয় ও চক্রবর্তী মহাশয়ের দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই রমেশ-কমলার প্রকাশ্য ইতিবৃত্তটি হেমনলিনীর গোচর হয়ে গেল। একে নলিনাক্ষের প্রতি হেমনলিনীর অনুরাগ জেগেছে, তদুপরি রমেশের বিবাহিত জীবনের কথাও শোনা গেল। এই কারণে রমেশ সম্পর্কে হেমের মনে একটা বিদ্বেষের ভাব জেগে উঠল। নলিনাক্ষ রমেশের চেয়ে যোগ্যতর বিবেচিত হওয়ায় অন্নদাবাবুর মনেও রমেশ সম্পর্কে আর কোনো দুর্বলতা ছিল না। এই রকম যেখানে মনোভাব, সেখানে আশায় বুক বেঁধে রমেশের আত্মপ্রকাশ। কিন্তু রমেশের ভাগ্যে অপমানই

লিখিত ছিল, তাই তাকে দেখে হেমনলিনী 'যেন কোন্ প্রেত-মূর্তির অনুসরণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য দ্রুতবেগে চলিল।'

"অন্নদাবাবু কোনোমতেই রমেশের প্রতি কোনো প্রকার শিষ্ট সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না। তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করাও তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। রমেশও এতক্ষণ নীরবে থাকিয়া যাইবার সময় অন্নদাবাবুকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।"

হেমনলিনী ও অন্নদাবাবু কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবার পর যখন রমেশের মন থেকে সমস্ত আশা ভরসা অন্তর্হিত হয়ে গেল, তখন তার মন এক অপরিসীম শূন্যতার নৈরাশ্যে ভরে উঠল। এই নৈরাশ্য তার মনে বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। অচিরেই তা তার সর্বস্ব পরিত্যাগীর পরিতৃপ্তি এনেদিল। হেমনলিনীকে রমেশ কমলা সম্বন্ধে যে শেষ চিঠি দিয়ে গেল, তার মধ্যে রমেশের এই মনোভাবটিরই পরিচয় পাওয়া যায়—"আজ প্রাতে যখন তোমার সহিত ক্ষণিক সাক্ষাতের বিদ্যুদ্‌বৎ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, তখন একবার মনে মনে বলিলাম, আমি হতভাগ্য! কিন্তু আর আমি সে কথা স্বীকার করি না। আমি সরল চিত্তে আনন্দের সহিত তোমার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছি—আমি পরিপূর্ণ হৃদয়ে তোমার নিকট হইতে প্রস্থান করিব—তোমাদের কল্যাণে, বিধাতার কল্যাণে আমি অন্তরের মধ্যে এই বিদায়কালে যেন কিছুমাত্র দীনতা অনুভব না করি। তুমি সুখী হও, তোমার মঙ্গল হউক।"

এ চিঠির মধ্যে রমেশ নিজে কোনো প্রকার বেদনা ও ব্যর্থতার পরিচয় না দিলেও, তার এইভাবে খালি হাতে ফিরে যাওয়ায় এবং নীরবে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ায় এখানে তার প্রতি আমাদের সহানুভূতি জাগে এবং তার সমস্ত ব্যক্তিত্বটি অনেক মহনীয় হয়ে ওঠে। ট্র্যাজেডির যে বোধ তা জাগে মহৎ বা অন্ততঃ সদ্‌গুণসম্পন্ন মানুষের দুর্ভাগ্য দেখে। এখানে রমেশের মধ্যে সেই সদ্‌গুণাবলীর পরিচয় পাওয়ায়, তার দুর্ভাগ্য সম্পর্কেও আমাদের মনের মধ্যে একটি ট্র্যাজেডির বোধ জাগে।

রমেশ কাশীতে তার স্বল্পকালীন অবস্থিতির মধ্যে কমলার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছে চক্রবর্তীর পরামর্শে। যে কমলার প্রতি রমেশের মন অত্যন্ত প্রবলভাবে ঝুঁকেছিল একদিন, সেই কমলার হিতার্থে সেখান থেকেও রমেশ নিজেকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। কমলার অসহায় অবস্থা দেখেই তার মন কমলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং তারই পরিণামে সে হারিয়েছে হেমনলিনীকে।

এখন সেই কমলা পত্নীর অমোঘ সংস্কারের বলে শক্তিমতী হয়ে রমেশের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। সুতরাং রমেশের পাওয়া ঘটল না কিছুই। তথাপি রমেশ এখানে শান্ত, বিনীত। প্রবল সংগ্রামের পর জয়-পরাজয় সম্পর্কে যোদ্ধার মনে যে ঔদাসীন্য জন্মে, শক্তিটাই যেমন প্রার্থনীয় হয়ে ওঠে, রমেশেরও তাই। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি সম্পর্কে তার আর কোনো উদ্বেগ নেই।

রমেশের উদ্দেশ্য ছিল কমলার স্বামী নলিনাক্ষকে সমস্ত কথা খুলে বলা, বোঝানো যে, কমলাকে কোনো পাপ স্পর্শ করেনি, যাতে কমলার মৃত্যু হয়ে থাকলেও, তার স্মৃতিকে স্বামী হিসেবে নলিনাক্ষ সম্মান করতে পারে। কিন্তু কমলার সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে রমেশ বুঝল যে কমলা জীবিত। সঙ্গে সঙ্গে সে আরও বুঝল যে, সে আর কমলার কাছে আবশ্যকীয় নয়—সুতরাং তাকে দ্রুত বিদায় নিতেই হবে। তাই সে কমলার শেষ মিনতি 'আমার কথা কাহারো কাছে বলিবেন না'—রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেখান থেকে বিদায় নেয়।

"রমেশ পথে বাহির হইয়া স্বপ্নাবিষ্টের মতো চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল, 'কমলার সঙ্গে দেখা হইল, ভালোই হইল; দেখা না হইলে এ পালাটা ভালো করিয়া শেষ হইত না।·· ইহা বুঝা গেছে, আমি এখন সম্পূর্ণই অনাবশ্যক। এখন আমার আবশ্যক কেবল নিজের জীবনটুকু লইয়া, এখন তাহাকেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে বাহির হইলাম—আমার আর পিছনে ফিরিয়া তাকাইবার কোনো প্রয়োজন নাই।"

চাওয়া-পাওয়ার সংসার থেকে এইভাবে শূন্যহাতে রমেশের প্রস্থান। মহৎ চরিত্রের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে রমেশের চরিত্রে আরোপিত করেননি। কিন্তু এটা খুব স্পষ্ট করেই বুঝিয়েছেন যে, নীচতা রমেশের চরিত্রে ছিল না। চরিত্রে গভীরতার অভাবটাই তার সম্বন্ধে আমাদের মাঝে মাঝে বিরূপ ক'রে তোলে। নলিনাক্ষের সঙ্গে তুলনাতেই তার চরিত্রের গভীরতার অভাবটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। পত্নী কমলা জীবিত থাকতেও পারে, কেবল এই একটি অতি ক্ষীণ সম্ভাবনায়ই নলিনাক্ষ নিজেকে সংযত রেখেছে, কোনো নারীর সঙ্গেই হৃদয়ের সংযোগ স্থাপন করেনি। কিন্তু রমেশ কমলার সমস্যার কিভাবে সমাধান করবে, তাদের দু'জনের মধ্যকার এই দুর্ঘটনার সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কমলা যে তার স্ত্রী নয়—একথা তাকে জানিয়ে কিভাবে তাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া যাবে, আর তা যদি

অসম্ভব হয়, তবে কি ভাবেই বা তাকে আজীবন গ্রহণ করে রাখবে, এ সমস্ত বিষয় আনুপূর্বিক চিন্তা ভাবনা না করেই সে হেমনলিনীকে বিবাহ করার মস্ত ঝুঁকি নিতে চলেছে। কোনো কিছু আনুপূর্বিক চিন্তা করতে পারার অক্ষমতা এবং অতি দ্রুত অপরের দ্বারা প্রভাবিত হওয়াই রমেশের চরিত্রের বড় দুর্বলতা। আবার তার সবচেয়ে বড় গুণও তার সহানুভূতি এবং কর্তব্যবোধ। কমলার প্রতি মমতা এবং কর্তব্যবোধের জন্যই তাকে তার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা (অর্থাৎ হেমনলিনীর প্রেম)-কে বিসর্জন দিতে হয়েছে। কমলাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে যাওয়া নিশ্চয়ই তার পক্ষে খুব সহজ হয়নি। একদিকে হেম, আর একদিকে কমলা; একদিকে প্রেম, আর একদিকে কর্তব্য;—এই দুই-এর টানা-পোড়েনের মধ্যে নিশ্চয়ই তার মন ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রমেশের এই জীবন-যন্ত্রণাকে বিশদভাবে চিত্রিত করেননি। রমেশের সমস্ত জীবনটাই যে পরিণামে অপচয়িত হ'ল, এবং তা যে একটা মহৎ দুঃখের ব্যাপরে, তা রবীন্দ্রনাথের লেখনীর দ্বারা আমাদের মনের মধ্যে স্বতঃই জেগে ওঠে না। চোখের বালির বিনোদিনীর কাহিনী শুনে আমাদের মনে যে ট্র্যাজেডির অনুভূতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেগে ওঠে, রমেশ সম্পর্কে তা হয় না। কিন্তু তার জন্য রবীন্দ্রনাথের উপেক্ষাই দায়ী। আসলে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ স্তরের পুরুষদের চরিত্র উপন্যাসে খুব সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেননি। পুরুষকে তিনি অতিরিক্ত বুদ্ধিমান, হাস্যরসিক, উচ্চ-শিক্ষিত মানুষরূপে যেখানে চিত্রিত করেছেন, সেখানে পুরুষের চরিত্র চিত্রণে তিনি সফল হয়েছেন। কিন্তু সাধারণ স্তরের পুরুষের মনের কোমল হৃদয়ানু-ভূতিকে তিনি সযত্নে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি।

কমলার সঙ্গে রমেশের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে রমেশকে যে কী গভীর ত্যাগ ও দুঃখ স্বীকার করতে হয়েছে, তা সহজেই বোঝা যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাকে যথাযথ চিত্রিত করেন নি। একবার মাত্র চক্রবর্তী খুড়োর মুখে এ সম্পর্কে কিছু শোনা যায়—'আপনি তাহাকে পরম সংকটের সময় যেমন রক্ষা করিয়াছেন, তাহার জন্য যে বিষম দুঃখ আপনাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহাতে আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ ছেদনের সময় কোনো কথা না বলিয়া কমলা বিদায় লইতে পারে না। আপনার কাছে ও আজ আশীর্বাদ লইতে আসিয়াছে।'

রমেশের জীবন-যন্ত্রনার বর্ণনার অভাবেই তার ট্র্যাজেডি আমাদের চিত্তে

কোনো গভীর দাগ রেখে যেতে পারে না। কেবল ঘটনাজালের দুর্মোচ্য-জটিলতাতেই যেন রমেশের জীবনে ট্র্যাজেডি নেমে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বোধ হয় এ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। গ্রন্থের সূচনায় (রচনাবলী সংস্করণ) তিনি এ সম্পর্কে বলেছেন, "ট্র্যাজেডির সর্বপ্রধান বাহন হয়ে রইল হতভাগ্য রমেশ—তার দুঃখকাতরতা প্রতিমুখী মনোভাবের বিরুদ্ধতা নিয়ে তেমন নয়, যেমন ঘটনাজালের দুর্মোচ্য জটিলতা নিয়ে। এই কারণে বিচারক যদি রচয়িতাকে অপরাধী করেন আমি উত্তর দেব না।"

রমেশের চরিত্র বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায় যে ঘটনাসমূহের দুর্মোচ্য জটিলতাই রমেশের জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটিয়েছে। ঘটনাসমূহের এই জটিলতা থেকে পরিত্রাণ পাবার মতো মানসিক শক্তি এবং চিত্তের গভীরতা রমেশের ছিল না। তা থাকলেও যদি সে পরিত্রাণ না পেত, তবে তার ট্র্যাজেডি হয়ে উঠত স্বয়ং বিকশিত। লেখকের সহায়তার খুব বেশী প্রয়োজন তখন থাকত না। কিন্তু সেই মানসিক শক্তি এবং চিত্তের গভীরতা না থাকা সত্ত্বেও ট্র্যাজেডি হতে পারে, এবং রমেশের জীবনে তা হয়েছেও। এক প্রবল ধর্মজ্ঞান এবং সুকঠোর আত্মসংযম নিয়ে সে যে আগাগোড়াই জীবনে সুখ থেকে বঞ্চিত থেকেছে,—এর সুগভীর দুঃখ, জ্বালা এবং মর্মবেদনাকে প্রকাশ করবার জন্য লেখকের সহায়তার প্রয়োজন। জীবনব্যাপী ধর্মজ্ঞান ও আত্মসংযমের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও যে সে শেষ পরিণামে ভোগসুখের সংসার থেকে শূন্য হাতে বিদায় নিল, এতে তার অন্তরাত্মা অবশ্যই কেঁদে উঠেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাও আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশ করেন নি। তিনি রমেশের ট্র্যাজেডিকে কেবল ঘটনা সমূহের দুর্মোচ্য জটিলতার মধ্য দিয়েই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এই কারণে রমেশের ট্র্যাজেডি গভীর ও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি, যদিও তার সম্ভাবনা ছিল।

* * * *

পক্ষান্তরে হেমনলিনীর ট্র্যাজেডি এই উপন্যাসে অনেক গভীর এবং স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ আন্তরিকতার সঙ্গে চরিত্রটিকে ফুটিয়েছেন বলেই এটা হয়েছে।

হেমনলিনীর চরিত্রে দেখা যায় যে, তার জীবন-বোধ যথেষ্ট গাঢ়। যাকে সে চিত্তনিবেদন করেছে,—সমস্ত সংশয়-সন্দেহের মধ্যেও তার মন কম্পাসের কাঁটার মতোই সেই প্রেমিকের দিকে চেয়ে থেকেছে। তার এত বড় বিশ্বাসের কোনো পুরস্কার যখন ভাগ্য তার জন্য মঞ্জুর করল না, তখনই তার জীবনের

শোচনীয় অপচয়ে আমরা ব্যথিত হই, আমাদের মধ্যে ট্র্যাজিডির বোধ জাগে।

রমেশ-হেমনলিনীর ভালোবাসায় রবীন্দ্রনাথ রমেশের ভালোবাসার নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু গভীরতার পরিচয় দেন নি। বরং হেমনলিনীর ক্ষেত্রে তিনি নিষ্ঠা এবং গভীরতা দুইয়েরই পরিচয় দিয়েছেন। এই জন্যই পরিণামে হেমনলিনীর বঞ্চনায় এত বেদনা জাগে।

একদিন বৃষ্টির রাত্রিতে হেমনলিনীর গৃহে গানের আসর বসেছিল, "বায়ু বহী পুরবৈঞা, নীদ নহিঁ বিন সৈঞা।" গানের শেষে বিদায় নেবার সময় রমেশ হেমনলিনীর মুখের দিকে চাইল। "হেমনলিনীও চকিতের মতো একবার চাহিল, তাহার দৃষ্টির উপরেও গানের ছায়া।" পরে সবাই চলে যাওয়ার পর গভীর রাত্রিতে—"হেমনলিনীও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া গভীর অন্ধকারের মধ্যে বৃষ্টি পতনের অবিরাম শব্দ শুনিতেছিল। তাহার কানে বাজিতেছিল,—বায়ু বহী পুরবৈঞা, নীদ নহিঁ বিন সৈঞা।"

হেমনলিনীর হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি কত সূক্ষ্ম ছিল এবং তা অনুকূল আহ্বানে সাড়া দিয়ে কী গভীরভাবে বাজত,—তারই পরিচয় তার মনের এরূপ অবস্থা।

রমেশের প্রতি হেমনলিনীর প্রেম এতই প্রগাঢ় যে, অক্ষয় যেদিন ভগিনী শরতের কাছে শোনা "রমেশবাবুর স্ত্রীর" স্কুলে পড়ার গল্প বলল, তখন সত্য ঘটনা বলেই বিচলিত হয়ে রমেশ সে স্থান ত্যাগ করেছিল। কিন্তু হেমনলিনী ভাবল, বুঝি বা অক্ষয় ঈর্ষায় রমেশকে অপমানিত করল। তাই সে দুঃখে কেঁদে ফেলেছিল।

রমেশের প্রতি হেমনলিনীর আস্থার আরো প্রমাণ আছে। রমেশের সঙ্গে তার স্থিরীকৃত বিবাহের প্রাক্-মুহূর্তে রমেশ কর্তৃক বিবাহ স্থগিত রাখার এক অভাবিত-পূর্ব, অসম্ভব, সন্দেহজনক এবং বিভ্রান্তিকর প্রস্তাব উত্থাপিত হলেও হেমনলিনী বিশেষ উদ্বিগ্ন বোধ করেন নি। কেবল বহুবাঞ্ছিত মিলন বিলম্বিত হওয়ায় একটু অভিমানই বোধ হয় জেগেছিল। অভিমানিনী হেমনলিনীর কাছে গিয়ে রমেশ বলল, "তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিয়ো না।...এই কথা আমাকে বলো যে, তুমি আমাকে কখনো অবিশ্বাস করিবে না। আমিও অন্তর্যামীকে অন্তরে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, তোমার কাছে আমি কখনো অবিশ্বাসী হইব না।"

"রমেশের আর কথা বাহির হইল না, তাহার চোখের প্রান্তে জল দেখা দিল। তখন হেমনলিনী তাহার স্নিগ্ধ করুণ দুই চক্ষু তুলিয়া রমেশের মুখের দিকে স্থির করিয়া রাখিল। তাহার পরে সহসা বিগলিত অশ্রুধারা হেমনলিনীর দুই কপোল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই নিভৃত বাতায়ন তলে দুইজনের মধ্যে একটি বাক্যবিহীন শান্তি ও সান্ত্বনার স্বর্গখণ্ড সৃজিত হইয়া গেল।"

"কিছুক্ষণ এই অশ্রুজল-প্লাবিত সুগভীর মৌনের মধ্যে হৃদয়-মন নিমগ্ন রাখিয়া একটি আরামের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া রমেশ কহিল, 'কেন আমি এক সপ্তাহের জন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছি, তাহার কারণ কি তুমি জানিতে চাও?"

"হেমনলিনী নীরবে মাথা নাড়িল—সে জানিতে চায় না।"

"রমেশ কহিল, বিবাহের পর তোমাকে আমি সব কথা খুলিয়া বলিব।"

"এই কথায় হেমনলিনীর কপোলের কাছটা একটুখানি রাঙা হইয়া উঠিল।"

রমেশকে সে একটুও অবিশ্বাস করে না। তাই বিবাহ স্থগিত রাখার কারণ জানার তার কোনো প্রয়োজনই নেই। সে শুধু রমেশকে বিশ্বাস করেই নিশ্চিন্ত এবং বিলম্বিত হলেও ভবিষ্যতের বিবাহের সুনিশ্চিত সম্ভাবনায় সে পুলকিত। এই ধরনের শান্ত, সুগভীর, বিশ্বাসনিষ্ঠ, সরল চরিত্রে বেদনাও খুব গভীরভাবে অনুভূত হয়। আমরা প্রথম থেকেই যেন বুঝতে পারি যে একটা বিষাদান্ত পরিণতি তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ট্র্যাজিক চরিত্রের এই সর্বজনীন লক্ষণগুলি প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ হেমনলিনীর চরিত্রে আরোপ করেছেন, এবং সেই কারণেই হেমনলিনীর প্রতি আমাদের ট্র্যাজিক সমবেদনা সহজেই জাগে।

অক্ষয় যখন বিবাহ স্থগিত রাখার ব্যাপারটা নিয়ে হেমনলিনীর পক্ষ অবলম্বন ক'রে একটু কৌতুক করবার চেষ্টা করে, তখন বিরক্ত হয়েই হেমনলিনী বলে, "এই বিষয় লইয়া আমি বাহিরের লোকের কাছে কোনো কথাই শুনিতে চাইনা। যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে আমার মনে কোনো ক্ষোভ নাই।" শুধু অক্ষয় কেন, এই ব্যাপার নিয়ে সে তার দাদা যোগেন্দ্রের সঙ্গেও লড়াই করেছে। রমেশের সম্মান রক্ষার জন্ত তাকে 'কারণ' জানার উদ্দেশ্তে পীড়াপীড়ি না করতে সর্বপ্রকার চেষ্টা চালিয়েছে।

যোগেন্দ্র যখন রমেশের দর্জিপাড়ার বাসায় কমলাকে প্রত্যক্ষ দেখে এসে তাদের ঘরকন্নার কথা হেমনলিনীর সম্মুখে বিবৃত করছিল, তখন হেমনলিনী তার সর্বশক্তি দিয়ে সেই বিবরণকে অস্বীকার করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে চালিত এই স্নায়ুযুদ্ধে সে দুর্বল হয়ে পড়েছে, 'তাহার মুখ অস্বাভাবিক বিবর্ণ হইয়া গেছে, এবং তাহার যতটা জোর আছে, দুইহাতে চৌকির হাতা চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। মুহূর্তকাল পরেই সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মূর্ছিত হইয়া চৌকি হইতে সে নীচে পড়িয়া গেল।' চতুর্দিক থেকে তার বিশ্বাসের উপর আঘাত এসে পড়ছে, এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে তার পক্ষে বিশ্বাসকে জাগিয়ে রেখে সকলের বিরুদ্ধাচরণ করা কষ্টকর হচ্ছে, কিন্তু তথাপি সে বলেছে, 'যতক্ষণ তাঁহার নিজের মুখ হইতে না শুনিব, ততক্ষণ আমি কোনো মতেই বিশ্বাস করিব না, ইহা নিশ্চয় জানিয়ো।'

রমেশের প্রতি এই বিশ্বাসকে বজায় রাখা হেমনলিনীর পক্ষে যে খুব সহজ ছিল, তা নয়। তার মনের মধ্যে এ সম্পর্কে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল। পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য দ্বারা যা প্রমাণিত হয়, তা রমেশের বিরুদ্ধে যায়, এবং তাতে রমেশের প্রতি তার বিশ্বাসকে বজায় রাখা যায় না। কিন্তু সে রমেশের প্রতি বিশ্বাসটাকেই বজায় রাখতে চায়। সুতরাং একদিকে যুক্তি, আর একদিকে বিশ্বাস—এই দুই-এর দ্বন্দ্বে তার মন অবসন্ন হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ হেমনলিনীর এই দুর্দশার চিত্রটি সুন্দরভাবে এঁকেছেন, "ভালোবাসায় যদিও হেমনলিনীর বিশ্বাসকে আগলাইয়া রাখিয়াছিল, তবু যুক্তিকে একেবারেই ঠেকাইয়া রাখা চলে না। যোগেন্দ্রের সম্মুখে হেমনলিনী কাল আপনার বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখাইয়া চলিয়া গেলো। কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে শয়নঘরের মধ্যে একলা সেই বল সম্পূর্ণ থাকে না। বস্তুতঃই প্রথম হইতে রমেশের ব্যবহারের কোনো অর্থ পাওয়া যায় না। সন্দেহের কারণগুলিকে হেমনলিনী যত প্রাণপণ বলে তাহার বিশ্বাসের দুর্গের মধ্যে ঢুকিতে দেয় না—তাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া ততই সবলে আঘাত করিতে থাকে। সাংঘাতিক আঘাত হইতে মা যেমন ছেলেকে বুকের মধ্যে দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া রক্ষা করে, রমেশের প্রতি বিশ্বাসকে হেমনলিনী সমস্ত প্রমাণের বিরুদ্ধে তেমনি জোর করিয়া হৃদয়ে আঁকড়াইয়া রহিল। কিন্তু হায়, জোর কি সকল সময় সমান থাকে।"

এই জোরের অভাব হওয়ায় মাঝে মাঝে হেমনলিনীর মন একটু বিচলিত

নিশ্চয়ই হোতো। তদুপরি রমেশের অনুপস্থিতি তার মনের উপর একটু বিরহের যন্ত্রণাও এনে দিত মাঝে মাঝে। কিন্তু এ সব কিছুর মধ্যেই সে তার মনকে রমেশের প্রতি বিরূপ হতে দেয়নি, সে তার মনকে ঋজু এবং সুদৃঢ় রেখেছে। যোগেন্দ্রের মুখের উপর সে স্পষ্টই বলেছে, "বিবাহের কথা কে বলিতেছে? তোমরা ভাঙ্গিয়া দিতে চাও, ভাঙ্গিয়া দাও—সে তোমাদের ইচ্ছা। কিন্তু আমার মন ভাঙ্গাইবার জন্য মিথ্যা চেষ্টা করিতেছ।" নিজের মনকে এরূপ ভাবে নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করতে গিয়ে তার বোধহয় অভিমান এবং আত্মসম্মানে প্রবল আঘাত লাগে, তাই একথা বলার পরেই সে কেঁদে ফেলে।

রমেশ কমলাকে নিয়ে কলকাতা পরিত্যাগ করলে এবং তার এই তথা-কথিত পলায়ন সম্পর্কে অক্ষয়ের সমস্ত বিবৃতির কিছুদিন পর ব্রাহ্মসমাজের যুবক নলিনাক্ষের সঙ্গে অন্নদাবাবু ও হেমনলিনীর পরিচয় হয়। অচিরেই তারা সকলে নলিনাক্ষের গুণমুগ্ধ হয়ে ওঠে এবং যোগেন্দ্রের উদ্যোগে রমেশের পরিত্যক্ত বাসায় নলিনাক্ষবাবুর বাসস্থান হয়। এই সংবাদে অন্নদাবাবু বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁর কন্যার এই সংবাদে একটুও আনন্দ হ'ল না। অন্নদাবাবু যদি লক্ষ্য করতেন, তবে দেখতে পেতেন যে, 'কথাটা শুনিবামাত্র হেমনলিনীর মুখ ক্ষণকালের জন্য বেদনায় বিবর্ণ হইয়া গেল। ওই পাশের বাসাতেই রমেশ ছিল।'

রমেশের অনুপস্থিতিতেও যেন হেমনলিনীর চতুর্দিকে রমেশ বিদ্যমান রয়েছে, রমেশ যা কিছু ব্যবহার করত, রমেশ যে গৃহে বাস করত, সে সবই যেন কেবল রমেশের জন্য নির্দিষ্ট, সেখানে অন্য কারো হস্তক্ষেপ তার কাছে অসহনীয়। রমেশের ঘরে নলিনাক্ষের থাকার ব্যবস্থা রমেশের অনুপস্থিতিকে তার সম্মুখে যেন এক বাস্তব সত্য বলে উদ্‌ঘাটিত করে দিল। তাই বুঝি ঐ কথা শুনে তার মুখ বেদনায় বিবর্ণ হয়ে গেল।

হেমনলিনীর মনের একঘেঁয়েমিকে কাটাবার উদ্দেশ্যে অন্নদাবাবু সপরিবারে কাশী আসেন। সেখানে নলিনাক্ষের জননী ক্ষেমংকরীর সঙ্গে অন্নদাবাবুদের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। সেই সূত্রেই হেমনলিনীর সঙ্গে নলিনাক্ষের বিবাহের প্রস্তাব হয়।

কলকাতা থেকে রমেশের অজ্ঞাত স্থানে যাত্রা এবং তার সঙ্গে কমলার তথাকথিত বিবাহিত জীবনের সম্পর্ক বহুদিন থেকেই হেমনলিনীর চিত্তকে বেদনার্ত ক'রে রেখেছে—এক অপরিসীম বিষন্নতা তাকে যেন সব সময়ই ভর

করে রয়েছে, নির্বিকল্প সুখ, অনাবিল আনন্দ, এবং সদাপ্রসন্ন জীবন-উৎসাহ তার কাছ থেকে যেন বিদায় নিয়ে চলে গেছে। সে সদাসর্বদা চেষ্টা করেছে তার মনের এই বিষন্নতাকে চাপা দিতে। বেদনার্ত হৃদয়ে সে যে রমেশের স্মৃতিকে মনের মধ্যে নিঃস্বার্থভাবে নীরবে লালন ক'রে চলেছে, তা সে কাউকেই বুঝতে দিতে চায়নি। রমেশের প্রসঙ্গ এবং সেই কারণে তার দুঃখ কোনোটাকেই সে কারো আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠতে দিতে চায়নি। তাই নিজেকে সে ব্যস্ত করেছে পিতার পরিচর্যায় এবং নলিনাক্ষের দার্শনিক তত্ত্বোপলব্ধিতে। পাছে রমেশের কথা চিন্তা করলে তার এই সমস্ত কাজে শৈথিল্য ঘটে, এবং তার গোপন মনোভাবটি প্রকাশ হ'য়ে পড়ে, এই ভয়ে সে রমেশের কথা চিন্তা কোরে সেই আস্বাদটুকু নেবারও সুযোগ পেত না। 'পাছে তাহার কর্তব্যের ক্ষতি হয় বলিয়া হেমনলিনী রমেশের কথা মনে মনে আন্দোলন করিয়া নিজেকে পীড়িত হইতে দেয়না। এজন্য এ পর্যন্ত সে নিজের সঙ্গে অনেক লড়াই করিয়া আসিতেছে। কিন্তু বাহির হইতে যখন টান পড়ে, তখন ক্ষতস্থানের সমস্ত বেদনা জাগিয়া উঠে। হেমনলিনীর ভবিষ্যৎ জীবনটা যে কীভাবে চলিবে তাহা এ পর্যন্ত সে পরিষ্কার কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না, এই কারণেই একটা সুদৃঢ় কোনো অবলম্বন খুঁজিয়া অবশেষে নলিনাক্ষকে গুরু মানিয়া তাহার উপদেশ অনুসারে চলিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু যখনি বিবাহের প্রস্তাবে তাহাকে তাহার হৃদয়ের গভীরতম দেশের আশ্রয় সূত্র হইতে টানিয়া আনিতে চাহে তখনি সে বুঝিতে পারে, সে বন্ধন কী কঠিন। তাহাকে কেহ ছিন্ন করিতে আসিলেই হেমনলিনীর সমস্ত মন ব্যাকুল হইয়া সেই বন্ধনকে দ্বিগুণ বলে আঁকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করে।'

এখানেই বোঝা যায় যে রমেশের প্রতি তার ভালোবাসা কত গভীর। এবং তার জন্য সে কী গভীর জীবন-যন্ত্রণা ভোগ করে। সে নিজেও এই গভীর জীবন-যন্ত্রণা সম্বন্ধে খুব সচেতন নয়, নলিনাক্ষের সঙ্গে বিবাহের কথাতেই সেখানে গিয়ে টান পড়ল, এবং যন্ত্রণার কাতর ধ্বনি সঙ্গীত হয়ে শরীরের প্রতিটি স্নায়ুতে গিয়ে যেন ঘা দিতে লাগল।

এর কিছুদিন পরেই অক্ষয় চক্রবর্তীখুড়োকে সঙ্গে নিয়ে অন্নদাবাবুর বাড়ীতে রমেশের খোঁজে এসেছে (এর আগের ঘটনা কমলার গাজিপুর থেকে গৃহত্যাগ, অনেকের ধারণা আত্মহত্যা, এবং রমেশের অন্তর্ধান)। চক্রবর্তী

অন্নদাবাবুর কাছে সরল মনেই রমেশের এবং কমলার সমস্ত ঘটনা বললেন,. অক্ষয় তাকে বিস্তারিত করল,—'তাহার বর্ণনায় রমেশের চরিত্রটি রমনীয় হইয়া ফুটিয়া উঠিল না।' অক্ষয় আবার চক্রবর্তীকে নানা প্রশ্নের মাধ্যমে সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ করল যে কমলা রমেশের স্ত্রী।

এই ঘটনায় হেমনলিনীর মনে রমেশের সুদৃঢ় আসন আল্‌গা হয়ে গেল। হয়তো আগে থেকেই আলগা হয়ে আসছিল, কিন্তু সে সর্বশক্তি দিয়ে তাকে রক্ষা করছিল। তার চিত্তের একটা অবলম্বন চাই। যতক্ষণ নলিনাক্ষের সঙ্গে তার বিবাহ অসম্ভব বিবেচিত হচ্ছিল ততক্ষণ সে রমেশের স্মৃতিকেই মনের মধ্যে আ'কড়ে ধরে রেখেছিল, ততক্ষণ রমেশের প্রতি তার বিশ্বাস ছিল অসীম এবং প্রশ্নাতীত। কিন্তু নলিনাক্ষ হেমনলিনীর অন্তরের মধ্যে ক্রমশঃ প্রবেশ করতে সুরু করেছে। তার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব যতই অসম্ভব বিবেচিত হ'ক, সেটাই নলিনাক্ষ ও তার মায়ের প্রতি হেমনলিনীর চিন্তাকে আকৃষ্ট করেছে। "নলিনাক্ষের প্রতি হেমনলিনীর একান্ত নির্ভরপর ভক্তি ক্রমেই বাড়িয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ইহার মধ্যে ভালোবাসার বিদ্যুৎসঞ্চারা বেদনা নাই—তা নাই থাকিল। ওই আত্মপ্রতিষ্ঠ নলিনাক্ষ যে কোন স্ত্রী-লোকের ভালোবাসার অপেক্ষা রাখে, তাতো মনেই হয় না। তবু সেবার প্রয়োজন তো সকলেরই আছে। নলিনাক্ষের মাতা পীড়িত এবং প্রাচীন, নলিনাক্ষকে কে দেখিবে। এ সংসারে নলিনাক্ষের জীবন তো অনাদরের সামগ্রী নহে; এমন লোকের সেবা, ভক্তির সেবাই হওয়া চাই।"

এই সব চিন্তা স্পষ্টতঃই হেমনলিনীকে নলিনাক্ষের প্রতি আকৃষ্ট করেছে—নলিনাক্ষ তার চিত্তের একটা অবলম্বন হয়ে উঠেছে, তাই রমেশের স্মৃতি তার মন থেকে আল্‌গা হয়ে উঠে যাবার পথে আর বাধা কোথায়। "আজ প্রভাতে হেমনলিনী রমেশের জীবন-ইতিবৃত্তের যে একাংশ শুনিয়াছে, তাহাতে তাহার মর্মের মাঝখানে এমন একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে যে, এই নিদারুণ আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহার সমস্ত মনের সমগ্র শক্তি আজ উদ্যত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ এমন অবস্থা আসিয়াছে যে, রমেশের জন্য বেদনাবোধ করা তাহার পক্ষে লজ্জাকর। সে রমেশকে বিচার করিয়া অপরাধী করিতেও চায় না। পৃথিবীতে কত শত সহস্রলোক ভালোমন্দ কত কী কাজে লিপ্ত রহিয়াছে, সংসার চক্র চলিতেছে—হেমনলিনী তার বিচার-ভার লয় নাই। রমেশের কথা হেমনলিনী মনেও আনিতে ইচ্ছা করে না।"

হেমনলিনীর মনোভাবের এই পরিবর্তন খুবই স্বাভাবিক। যাকে সে পূজা করছে, তার মূর্তি যদি ক্রমশঃ কলঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং সে কলঙ্ককে যখন বাস্তব সত্য বলে মনে করা ছাড়া উপায় থাকে না, তখন সেই কলঙ্কিত মূর্তির পূজাতেই নিযুক্ত থাকা হেমনলিনীর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ সে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা। তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করছে। মহত্তের জন্য ত্যাগ-স্বীকার সে করে যেতে পারে সারা জীবন। কিন্তু যা মহৎ নয়, বরং নীচ বলে মনে হয়, তার স্থান মনে জীইয়ে রাখার মতো প্রাচীন সংস্কার হেমনলিনীর নেই। না থাকারই কথা। উপরন্তু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জন্য সে আত্ম-প্রতিষ্ঠাও চায়—নিজের জীবনকে ও তার চারদিকের পৃথিবীকে সে সবরকমভাবে আস্বাদ করে দেখতে চায়। একটি কলঙ্কিত চরিত্রের প্রতি একদিনকার ভালোবাসার কথা স্মরণ ক'রে সে এই সবকিছু থেকে বঞ্চিত থাকার কোনো অর্থ-ই খুঁজে পায় না। তাই নলিনাক্ষের প্রতি তার আকর্ষণে কোনো ভালোবাসার উত্তাপ না থাকলেও, কেবল ভক্তির মনোভাব নিয়েই সে স্বাভাবিকভাবে নলিনাক্ষকে মনের মধ্যে বরণ করতে পারছে, এবং সেই জন্যই সে পিতার কাছে নলিনাক্ষের সঙ্গে বিবাহে সম্মতি দিয়েছে।

"হেমনলিনী নলিনাক্ষের সঙ্গে বিবাহে সম্মতি দিয়া মনকে বুঝাইতে লাগিল, 'আমার পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় হইয়াছে।' মনে মনে সহস্রবার করিয়া বলিল, 'আমার পুরাতন বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেছে, আমার জীবনের আকাশকে বেষ্টন করিয়া যে ঝড়ের মেঘ জমিয়া উঠিয়াছিল তাহা একেবারে কাটিয়া গেছে। এখন আমি স্বাধীন।—আমার অতীতকালের অবিশ্রাম আক্রমণ হইতে নির্মুক্ত।' এই কথা বারংবার বলিয়া সে একটা বৃহৎ বৈরাগ্যের আনন্দ অনুভব করিল।···সে নিজের জীবনের একাংশের নিঃশেষ অবসানজনিত শান্তিলাভ করিল।"

হেমনলিনী নিজেকে অত্যন্ত আনন্দিত মনে করতে লাগল। সে একখানি খাতায় লিখতে লাগল, "আমি মৃত্যু-জালে জড়াইয়া পড়িয়া সমস্ত সংসার হইতে বিযুক্ত হইয়াছিলাম। তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া ঈশ্বর আবার যে একদিন আমাকে নূতন জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তাহা আমি কখনো মনেও করিতে পারিতাম না। আজ তাঁহার চরণে সহস্রবার প্রণাম করিয়া নূতন কর্তব্যক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমি কোন মতেই যে সৌভাগ্যের

উপযুক্ত নই, তাহাই লাভ করিতেছি। ঈশ্বর আমাকে তাহাই চিরজীবন রক্ষা করিবার জন্ত বলদান করুন।"

রমেশকে ভালোবাসা এবং তার সঙ্গে ঘরবাঁধার বাসনার মধ্যে হেমনলিনীর যে একটা রোমান্টিক উচ্ছ্বাস ছিল, যে একটা স্বতঃপ্রণোদিত প্রেরণা ছিল, এখন যেন তা নেই। নলিনাক্ষের সঙ্গে বিবাহ ও তৎপরবর্তী জীবনের সুখ সৌভাগ্যকে সে যেন একটা তত্ত্বের মধ্যদিয়ে লাভ করছে। রমেশের স্মৃতি-বিজড়িত যে জীবন তার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে, অথচ যার ভার এখনও তাকে বহন করে যেতে হচ্ছে, সেই অসহনীয় ভারের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্তই সে একটা তাত্ত্বিক উপলব্ধির মধ্যদিয়ে নলিনাক্ষের সঙ্গে দাম্পত্য-জীবনের সৌভাগ্যকে চিন্তা করছে।

মানুষ প্রায়ই নিজের মনকে জানে না, তাই ভুল করে ও ভুল পথে গিয়ে কণ্টকবিদ্ধ হয়—দিশেহারা হয়। হেমনলিনীর জীবনের একটা অধ্যায়ের বিয়োগান্ত পরিণতিকে অগ্রাহ্য করবার জন্তই সে আরেকটা সৌভাগ্য পরিপূর্ণ জীবনে প্রবেশ করবার জন্ত প্রস্তুত হচ্ছে,—এতে তার মনের কতটা প্রকৃত সায় আছে, তা সে জানে না,—কেউই জানতে পারে না—সেই কারণেই সদৃশ পরিস্থিতিতে সকলের জীবনেই ট্র্যাজেডি ঘনিয়ে আসে।

নলিনাক্ষের সঙ্গে বিবাহের কথা পাকা হয়ে গেল। ক্ষেমংকরী হেমনলিনীকে আশীর্বাদ করেও গেলেন। কিন্তু নলিনাক্ষ তার স্ত্রী কমলার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাসী, তাই তার এ বিবাহে আপত্তি আছে এবং তার আপত্তিতেই ক্ষেমংকরী এ বিবাহ প্রায় ভেঙ্গে দিলেন। হেমনলিনীকে নিয়ে তার পিতা নলিনাক্ষর বাড়ীতেই গিয়েছিলেন নলিনাক্ষকে আশীবাদ করতে, সেখানেই বিবাহ ভাঙ্গার সংবাদ তাদের শুনতে হল। "হেমনলিনী আজ এখানে আসিবার সময় খুব একটা চেষ্টাকৃত উৎসাহ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছিল"…"যে নূতন জীবনযাত্রার পথে সে পদক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা তাহার সম্মুখে অতিদূর বিসর্পিত দুর্গম শৈলপথের মতো প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল।" "সমস্ত শিষ্টালাপের মধ্যে নিজের প্রতি অবিশ্বাস হেমনলিনীর মনকে আজ ভিতরে ভিতরে ব্যথিত করিতে লাগিল।"

"এই অবস্থায় যখন ক্ষেমংকরী বিবাহের প্রস্তাবটাকে কতকটা প্রত্যাখ্যান করিয়া লইলেন, তখন হেমনলিনীর মনে দুই বিপরীত ভাবের উদয় হইল। বিবাহ বন্ধনের মধ্যে শীঘ্র ধরা দিয়া নিজের সংশয় দোলায়িত দুর্বল অবস্থা

হইতে শীঘ্র নিষ্কৃতি পাইবার ইচ্ছা তাহার থাকাতে প্রস্তাবটাকে অনতিবিলম্বে সে পাকা করিয়া ফেলিতে চায়, অথচ প্রস্তাবটা চাপা পড়িবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়া উপস্থিত মতো সে একটা আরামও পাইল।"

আসলে হেমনলিনী মনের দিক থেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হতে পারেনি। পারিপার্শ্বিকের চাপে সে নলিনাক্ষকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে,—কিন্তু এই প্রস্তুতি তার কাছে খুবই কষ্টকর। এরপর হেমনলিনী রমেশের লেখা কমলা সম্বন্ধীয় একখানি সুদীর্ঘ চিঠি পেল, তার দ্বারা হয়তো রমেশের চরিত্র সম্পর্কে যত কলঙ্ক আরোপ করা হয়েছিল, তা হেমনলিনীর সম্মুখ থেকে ধুয়ে গেল, কিন্তু রমেশকে সে আর পাবে কোথায়? রমেশ চিঠি রেখে চলে গেছে। অব্যবহিত পরেই নলিনাক্ষ, তার স্ত্রী বেঁচে আছে বিশ্বাসে বিবাহ করতে অসম্মতি প্রকাশ করল। কমলার বেঁচে থাকা সম্পর্কে নলিনাক্ষের বিশ্বাসকে হেমনলিনী সুদৃঢ় করল রমেশের পত্রখানা দেখিয়ে। এইভাবে হেমনলিনী জোর ক'রে নলিনাক্ষের সঙ্গে যে দাম্পত্যজীবনের সৌভাগ্যের কথা চিন্তা করছিল, সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল। এখন তার জীবনে কেউ নেই—রমেশ এবং নলিনাক্ষ উভয়েই অন্তর্হিত।

যে কমলাকে হেমনলিনী রমেশের অঙ্কশায়িনী বিবেচনা ক'রে রমেশের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়েছিল, আজ সমস্ত কুয়াশা পরিষ্কার হয়ে যাবার পর সেই কমলাকে সে তার পরবর্তী জীবনের আকাঙ্ক্ষিত দয়িত নলিনাক্ষের সমস্ত সোহাগের অধিকারিণী হওয়ায় শুভেচ্ছা জানিয়ে আবার কোলকাতায় ফিরে এল।

রমেশের সঙ্গে কমলার তথাকথিত বিবাহের কথা শোনার পর থেকেই হেমনলিনীর যে জীবন-যন্ত্রণা সুরু হয়েছে, তার মধ্যে একটা মহত্ত্ব আছে। নারী হিসেবে সে পুরুষের ভালোবাসা আকাঙ্ক্ষা করেছে—প্রথমে রমেশের এবং পরে নলিনাক্ষের—কিন্তু কখনোই সে ভালোবাসা তার পাওয়া হ'লনা। অবশ্য নলিনাক্ষের সঙ্গে ভালোবাসার কোনো অধ্যায়ই গড়ে ওঠেনি। কিন্তু রমেশের সঙ্গে যা গড়ে উঠেছিল, চতুর্দিকের চাপে তা ভেঙে গিয়েছিল। রমেশ সম্পর্কে তার বিশ্বাস পরিণামে জয়ী হল, কিন্তু তথাপি সে ফিরল শূন্য হাতে। রমেশকে যদি সে সুরুতেই অবিশ্বাস করত, তবে তার এই শূন্য হাতে ফেরাকে একটা অপরাধের শাস্তিস্বরূপ বিবেচনা করা চলত। সুদীর্ঘকাল সে সেই বিশ্বাসকে বজায় রেখেছে। পরিশেষে সমস্ত ঘটনাজাল এমনভাবে ঘনিয়ে

এল, যে নিজের ভালো-মন্দের কথা চিন্তা ক'রে সে রমেশের স্মৃতির প্রতি বিরূপ না হ'য়ে পারল না। সম্মুখে নলিনাক্ষ—পশ্চাতে রমেশের কলঙ্কিত ইতিবৃত্ত, এরূপ পরিস্থিতিতে আধুনিক শিক্ষিতা নারী হিসেবে, রমেশকে মনে মনে পরিত্যাগ করার মধ্যে তার কোনো অপরাধ হয়নি। তথাপি পরিণামে সে কিছুই পেল না,—তার জীবন একটা বিরাট অপচয়, এইজন্যই তা ট্র্যাজেডির বিষয় হ'তে পেরেছে। রমেশের প্রতি বিশ্বাসকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য হেমনলিনী প্রবল সংগ্রাম করেছে, অশেষ জীবন-যন্ত্রণা সহ্য করেছে, কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হ'ল এই যে, যখন নিজের সৌভাগ্যের আশায় সে সেই সংগ্রামে পরাজিত হল, অতীতের স্মৃতিদংশনের কাছে আত্মসমর্পণ করল, তখন দেখল, সে ভুলই করেছে,—তারজন্য যে সৌভাগ্যের গৃহ সে প্রত্যাশা ক'রে আছে, তা অগ্নিদগ্ধ।

রমেশ যদি সুরুতেই তাকে পত্র দিয়ে সব জানাতে পারত, তবে হয়তো হেমনলিনীর এই ট্র্যাজেডিকে প্রতিরোধ করা যেত। কিন্তু হেমনলিনীর এই ট্র্যাজেডি যেন অনিবার্য ছিল, তাই রমেশ গাজিপুর থেকে কলকাতা গিয়ে তাকে চিঠি দিয়ে গেল, কিন্তু সে চিঠি পড়া হ'ল না। দ্বিতীয়বার বাগানে যখন রমেশ সেই সব কথা জানিয়ে দ্বিতীয় চিঠি দিল, তখন হেমনলিনী সব কথাই বুঝল, কিন্তু বুঝে আর লাভ তখন কিছু নেই—ট্র্যাজেডির সমস্তটাই তখন ঘটে গেছে। রমেশও তখন অন্তর্হিত আর নলিনাক্ষের সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাবও বাতিল। তখন কমলার জন্য সুখ প্রার্থনা ক'রে নিজের জন্য চাপা দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করা ছাড়া, তার জন্য আর কিছুই থাকল না।

রমেশের জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটেছিল ঘটনাজালের দুর্মোচ্য জটিলতায়, তার সমস্যা তার শক্তিকে অতিক্রম ক'রে গিয়েছিল,[৫] হেমনলিনীর ট্র্যাজেডিও ঘটেছে অনেকটাই ঘটনাগত জটিলতায়, কিন্তু তার সমস্যা তার শক্তিকে অতিক্রম করতে পারেনি। সুদীর্ঘকাল সে অপরিসীম মানসিক শক্তি নিয়ে রমেশের প্রতি ভালোবাসাকে বজায় রেখেছে। তারপর একদিন অনিবার্য স্বাভাবিকতার সঙ্গে যখন রমেশের প্রতি তার বিশ্বাস ভাঙলো, তখনও সে আরেক প্রকারের মানসিক শক্তি নিয়ে (বা জীবন সম্পর্কিত বাস্তববোধ নিয়ে) নলিনাক্ষের দিকে এগিয়েছে, কিন্তু তাকে ফিরতেই হ'ল। অপরিসীম

৫. ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (১৩৭২), পৃ. ১৪২।

মানসিক শক্তি নিয়ে সে তার জীবনের দু'টি স্তরেরই সমস্যার সমাধান করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। তবু তাকে ব্যর্থ হতে হ'ল। এইজন্যই রমেশের ট্র্যাজেডির তুলনায় হেমনলিনীর ট্র্যাজেডি বেশী শোচনীয় মনে হয়। হেমনলিনীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এবং অনুভূতি প্রবণতার জন্য তার প্রতি আমাদের সহানুভূতি সব সময়ই বেশী।

'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ট্র্যাজেডি-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। সন্দীপের উক্তিতে এই উপন্যাসের এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'জীবনের ট্র্যাজেডি এইখানেই। সে ছোট হয়ে হৃদয়ের একতলায় লুকিয়ে থাকে, তার পরে বড়োকে এক মুহূর্তে কাত করে দেয়। মানুষ আপনাকে যা বলে জানে, মানুষ তা নয়, সেই জন্যেই এত অঘটন ঘটে।'

উক্তিটি সন্দীপের। সুতরাং জীবন সম্পর্কে সন্দীপের একটা বিশেষ মূল্যবোধ এর মধ্যে মিশ্রিত হ'য়ে আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর মধ্যদিয়েই জীবনের ট্র্যাজেডি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির একটা অস্পষ্ট পরিচয় ফুটে বেরিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বোধহয় ব'লতে চেয়েছেন, মানুষ নিজেকে নিজের একটা আইডিয়া অনুসারে গড়ে তোলে, এবং সেই আইডিয়ার আলোকে নিজেকে পর্যবেক্ষণ ক'রে নিজের একটা বিশেষ রূপকে সত্য ব'লে বিশ্বাস করতে থাকে। নিজের সম্বন্ধে এই পরিচয়টাই তার কাছে বড় পরিচয় হ'য়ে ওঠে। কিন্তু তার যে আসল পরিচয়টি তার এই আইডিয়ার চাপে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠতে পারেনি, সেটি হ'য়ে থাকে তার ছোট পরিচয়। কিন্তু ছোট হলেও, যেহেতু সেটা সত্য, সেই হেতু, সে যে ভাবেই হোক, কোনো একটা সুযোগে নিজেকে বিস্ফোরিত ক'রে এবং আইডিয়ালব্ধ ভ্রান্ত পরিচয়টিকে ধূলিসাৎ ক'রে দেয়। নিজের কাছে নিজের এই পরিচয়-বিপর্যয় দেখে মানুষ বিভ্রান্ত হয়; ঠিক-বেঠিক, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে সে শাশ্বত নীতিবোধকে আর বজায় রাখতে পারে না। এই কারণেই নিজেকে সঠিকভাবে পেতে গিয়ে সে নিজেকে হারাতে বসে এবং অনেক সময় হারায়। এইখানেই ঘটে মানুষের জীবনের ট্র্যাজেডি।

এই উপন্যাসের বিমলা প্রথমতঃ নিজেকে যেভাবে জেনে নিশ্চিন্ত ছিল, সে জানা তার স্বভাবকে আবিষ্কার করার মধ্যদিয়ে জানা নয়। সে জানা ছিল তার একটা বিশেষ সংস্কারের মধ্যদিয়ে জানা। তার মায়ের সতী-সাধ্বী

হিসেবে খ্যাতি ছিল। মায়ের এই খ্যাতি ও পুণ্যের দীপ্তি বিমলার কাছে একটা পরম প্রার্থনীয় বিষয় ছিল। সে নিজেই লিখেছে—"সুন্দরী তো নই, কিন্তু মায়ের মতো যেন সতীর যশঃ পাই, দেবতার কাছে একমনে এই বর চাইতুম। বিবাহের সম্বন্ধ হবার সময় আমার শ্বশুর-বাড়ি থেকে দৈবজ্ঞ এসে আমার হাত দেখে বলেছিল, এ মেয়েটি সুলক্ষণা, সতীলক্ষ্মী হবে। মেয়েরা সবাই বললে, হবেই তো, বিমলা যে ওর মায়ের মতো দেখতে।"

ওকে ওর মায়ের মতো দেখতে। সুতরাং সে একান্ত পতিগতপ্রাণা—এটা ছিল বিমলার একটা সংস্কার, তাই কারণে-অকারণে স্বামীকে দেবতা মেনে নিয়ে তাঁকে বন্দনা করার এক অত্যুগ্র ব্যগ্রতা তার মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে দেখা দিয়েছিল। সে নিজেও বলেছে, "মেয়ে মানুষের মন সবই যে এক ছাঁচে ঢালা তা আমি মনে করিনে। কিন্তু এটুকু জানি, আমার মনের মধ্যে আমার মায়ের সেই জিনিসটি ছিল, সেই ভক্তি করবার ব্যগ্রতা। সে যে আমার সহজভাব, তা আজকে স্পষ্ট বুঝতে পারছি যখন সেটা বাইরের দিক থেকে আর সহজ নেই।"

একদিকে বিমলার এই সংস্কারলব্ধ পতিপ্রাণতার পরিচয়—আর একদিকে তার স্বভাব,—এই দুই-এর দ্বন্দ্ব যতদিন দেখা দেয়নি, ততদিন বিমলার জীবনে কোনো সংকট দেখা দেয়নি। সেই সংকট ঘনিয়ে উঠল যেদিন সন্দীপ তার ঝাঁঝালো ব্যক্তিত্ব নিয়ে বিমলার স্বভাবের কাছে এসে হাজির হোল। সন্দীপের প্রতি বিমলা তার সংস্কারলব্ধ স্বামীভক্তি থাকা সত্ত্বেও যে এত সহজে আকৃষ্ট হ'ল, তার কারণ, এর বীজ তার স্বভাবের মধ্যেই নিহিত ছিল।

বিমলার স্বামী সাধারণের থেকে যে পৃথক্ বিশেষত্বে পরিপূর্ণ, সেই বিশেষত্বের মূল্য বিমলা ঠিক অনুধাবন করতে পারত না। সে চাইত, তার স্বামী পাঁচজনের মতো সহজ এবং স্পষ্টবোধ্য হোক। পাঁচজনে যেমন স্বার্থ সচেতন, দণ্ডধারী, আত্মপ্রতিষ্ঠালিপ্সু, আত্মপ্রচার ও প্রশংসা-প্রিয়, বিমলা চায়, তার স্বামী সাধারণভাবে তেমনি হয়েই যেন অসাধারণ হয়। এইজন্যই জায়েদের প্রতি স্বামীর মমতা-দৃষ্টি, মিস্-গিল্‌বির প্রতি ভদ্রতা প্রভৃতিকে সে দুর্বলচিত্ততা বলে মনে ক'রেছিল—স্বামীর এইসব কাজের প্রতি তার আন্তরিক সমর্থন ছিল না। কিন্তু তথাপি প্রেমে ভক্তিতে মিশ্রিত তাদের দাম্পত্যে এ নিয়ে কোনো বিরোধ দেখা দেয়নি। সেই বিরোধ দেখা দিল-

স্বদেশীর হুজুগে। বিমলা চেয়েছিল, তার স্বামী সাধারণের থেকে অনেক বেশী পরিমাণে হুজুগে মাতুক। কিন্তু নিখিলেশ এই হুজুগে স্বদেশীকে কিছুতেই শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারত না। তাই বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে ফেলার জন্য বিমলার প্রস্তাব নিখিলেশের কাছ থেকে ফিরে এল। যে স্বদেশীর জন্য সমস্ত মানুষ পাগল হ'য়ে উঠেছে, তার মধ্যে তার স্বামীর কোনো অংশ প্রকাশ্যতঃ নেই দেখে বিমলার মন ভিতরে ভিতরে স্বামীর প্রতি বিরক্ত হ'তে সুরু ক'রল। তাই মিস গিল্‌বি-র প্রতি নিখিলেশের ভদ্রতা নিয়ে যখন কাগজে কাগজে নিন্দা বেরুল, তখন বিমলা মনে ক'রল, "এই শাস্তি ওঁর পাওনা ছিল।" "ইতিপূর্বে আমি আমার স্বামীর জন্যে অনেকবার উদ্বিগ্ন হ'য়েছি, কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর জন্য একদিনও লজ্জাবোধ করিনি। এবার লজ্জা হোল।"

স্বদেশীর হুজুগ নিখিলেশের কাছে কোনো আবেদন আনতে ব্যর্থ হ'লেও, তা বিমলার বক্ষে খানিকটা তুফান এনে দিয়েছিল। কারণ যুগের হাওয়ার অনুকূলে পাল তুলে দেওয়ার মধ্যেই নারী নিরাপত্তা অনুভব করে। তাই নারী হিসেবে বিমলাও যুগের হুজুগকে স্বভাবধর্ম অনুসারে প্রশ্রয় না দিয়ে পারেনি। এই বিমলা একদিন বিকেলে নিজেদের বাড়ীর নাটমন্দিরে স্বদেশী-র নায়ক সন্দীপের বক্তৃতা শুনে এবং নিজের নারীশক্তির দৃষ্টির প্রভাবে সন্দীপের ভাষার আগুনকে বাড়িয়ে দিতে পেরেছে ভেবে অত্যন্ত পুলকিত এবং অহমিকাগ্রস্ত হ'য়ে উঠল। ভাবল: "আমি কি তখন রাজবাড়ীর বৌ? আমি তখন বাংলাদেশের সমস্ত নারীর একমাত্র প্রতিনিধি আর তিনি (সন্দীপ) বাংলাদেশের বীর। যেমন আকাশের সূর্যের আলো তাঁর ঐ ললাটের উপর পড়েছে, তেমনি দেশের নারীচিত্তের অভিষেক যে চাই। নইলে তাঁর রণযাত্রার মাঙ্গল্য পূর্ণ হবে কি করে?"

পুলক ও অহমিকার প্রবলতায় তখন তার কাছে স্বদেশীভাববর্জিত নিখিলেশ নিষ্প্রভ হ'য়ে গেছে। নিজেই বলেছে, "সন্ধ্যাবেলায় আমার স্বামী যখন ঘরে এলেন, আমার ভয় হতে লাগল পাছে তিনি সেদিনকার বক্তৃতার দীপক রাগিণীর সঙ্গে তান না মিলিয়ে কোনো কথা বলেন, পাছে তাঁর সত্যপ্রিয়তায় কোনো জায়গায় ঘা লাগাতে তিনি একটুও অসম্মতি প্রকাশ করেন—তাহলে সেদিন আমি তাঁকে স্পষ্ট অবজ্ঞা করতে পারতুম।"

যে স্বামীকে বিমলা দেবতার মতো ভক্তি ক'রত, তাঁকে স্পষ্ট অবজ্ঞা ক'রতে পারার এই যে চিন্তা, এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, সন্দীপের প্রতি

আকৃষ্ট হবার বীজ তার স্বভাবের মধ্যেই ছিল। তার স্বামীর অসাধারণত্বের প্রকৃত অর্থ সে ঠিক অনুধাবন করতে পারেনি। তাই নিখিলেশের মহত্ত্বকে সে মনে মনে দুর্বলতা বা পৌরুষের অভাব বলেই মনে করে এসেছে। নিখিলেশের ঠিক বিপরীত ধরনের ব্যক্তিত্ব যতদিন বিমলার মনের সম্মুখে এসে না হাজির হয়েছে ততদিন নিখিলেশের প্রতি বিমলার এই অন্তর্নিহিত বিরূপতা মূর্তিলাভ ক'রে উঠবার সুযোগ পায়নি। কিন্তু স্বদেশীর তথাকথিত গৌরবোজ্জ্বল পটভূমিকায় এবং সন্দীপের কৃত্রিম এবং নাটুকে বীরত্বের মোহে পড়ে এই বিরূপতা একটা স্পষ্ট রূপলাভ করতে শুরু করল।

সন্দীপ সম্পর্কে কিছু সংবাদ বিমলা আগেও রাখত। তার ছবি দেখে তখন বিমলার মনে শ্রদ্ধা জাগেনি: '·কেন আমার মনে হয়েছিল উজ্জ্বলতা আছে বটে, কিন্তু চেহারাটা অনেকখানি খাদে মিশিয়ে গড়া।—চোখে আর ঠোঁটে কী একটা আছে যেটা খাঁটি নয়। সেইজন্যই আমার স্বামী যখন বিনা দ্বিধায় তাঁর সকল দাবী পূরণ ক'রতেন, আমার ভালো লাগত না।"

সন্দীপ সম্পর্কে এটা বিমলার একটা আন্দাজ হ'লেও সে তার সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যদিয়ে সন্দীপ সম্পর্কে এই মূল্যায়ণই শেষ পর্যন্ত ক'রেছে। কিন্তু তবু সন্দীপের আকর্ষণকে সে ফিরিয়ে দিতে পারে নি, যখন চাক্ষুষ দেখা হ'ল। নিখিলেশের মধ্যে যে একটি প্রবল ব্যক্তিত্বের আকাঙ্ক্ষা বিমলা ক'রত, তা যখন সে সন্দীপের মধ্যে প্রত্যক্ষ করল, তখন তার অপেক্ষিত বরমাল্য নিজের অজ্ঞাতেই সন্দীপের কণ্ঠে পরিয়ে দিতে চলল। সন্দীপের আত্মপ্রতিষ্ঠাপ্রয়াস তাকে চমৎকৃত ক'রল আরো বেশী: "যেমন জোর তাঁর বক্তৃতায় তেমনি ব্যবহারে। একটুও দ্বিধা নেই। সব জায়গাতেই আপন আসনটি অবিলম্বে জিতে নেওয়াই যেন তার অভ্যাস। কেউ কিছু মনে ক'রতে পারে, এ-সব তর্ক তাঁর নয়। খুব কাছে এসে বসবার স্বাভাবিক দাবি যেন তাঁর আছে, অতএব এতে যে দোষ দিতে পারে দোষ তারই।"

স্বার্থ-লোলুপ সন্দীপ বিমলার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারেই বুঝে নেয় যে, সে বিমলাকে আকৃষ্ট করেছে, সুতরাং এই আকর্ষণকে অবলম্বন ক'রে সে তার সর্বপ্রকার স্বার্থকে চরিতার্থ করতে প্রবৃত্ত হ'ল। শুধুমাত্র বিমলাকে মুগ্ধ করার জন্যই সে বিমলার সঙ্গে চালাতে লাগল স্বদেশীর পরামর্শ। এবং এইভাবে সে ক্রমশঃ বিমলার এক ভ্রান্ত অহমিকাবোধকে ক্ষেপিয়ে তুলল। বিমলা নিজেই লিখেছে, "··ক্রমেই আমার বিশ্বাস পাকা হতে লাগল যে, সেদিন সমস্ত দেশে

যা-কিছু কাজ চলছিল, তার মূলে ছিলেন সন্দীপবাবু, আর তারও মূলে ছিল একজন সামান্য স্ত্রীলোকের সহজ বুদ্ধি। প্রকাণ্ড একটা দায়িত্বের গৌরবে আমার মন ভরে রইল।"

আত্মগৌরবে অভিভূত বিমলা এইভাবে নিজেকে সন্দীপের চিন্তাভাবনার অংশীদার করে নিল। সে জানে তাদের এইসব কাজকর্মের মধ্যে তার স্বামীর কোনো সমর্থন নেই, তবু সে নিজেকে সামলাতে পারল না। এইভাবে মনের দিক থেকে সে নিজেকে স্বামীর সোহাগ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিল। কি করে এমন ব্যাপারটি ঘটল, সে সম্বন্ধে বিমলা নিজেই বলেছে, "আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্বন্ধের মধ্যে যখন ছুরি চলছিল, তখন আমার মন একটা তীব্র আবেগের গ্যাসে আগাগোড়া আচ্ছন্ন হয়ে রইল যে আমি টেরই পেলুম না কত বড় নিষ্ঠুর একটা কাণ্ড ঘটছে। এই বুঝি মেয়েদেরই স্বভাব, তাদের হৃদয়াবেগ যখন একদিকে প্রবল হয়ে জেগে ওঠে, অন্যদিকে তাদের আর কিছুই সাড় থাকে না। এইজন্যই আমরা প্রলয়ংকরী, আমরা আমাদের অন্ধ প্রকৃতি দিয়ে প্রলয় করি, কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়ে নয়। আমরা নদীর মতো, কূলের মধ্য দিয়ে যখন বয়ে যাই, তখন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা পালন করি, যখন কূল ছাপিয়ে বইতে থাকি, তখন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা বিনাশ করি।"

ভ্রান্ত আত্মগৌরবের মোহে বিমলা আত্মবিনাশের পথে চলল,—সে বুঝতে পারে এ চলা তার ঠিক নয়, কিন্তু এতদূর সে এগিয়েছে যে, এখন ফেরাও কঠিন। এই আত্মবঞ্চনার স্বরূপটি বিমলা নিজেই প্রকাশ করেছে, "গোড়ায় কিছুই সন্দেহ করিনি, ভয় করিনি, আমি জানতুম দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করছি। পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে কি প্রচণ্ড উল্লাস। নিজের সর্বনাশ করাই নিজের সবচেয়ে আনন্দ এই কথা সেদিন প্রথম আবিষ্কার করেছিলুম।"

"জানিনে হয়তো এমনি করেই একটা অস্পষ্ট আবেগের ভিতর দিয়ে এই নেশাটা একদিন আপনিই কেটে যেত। কিন্তু সন্দীপবাবু যে থাকতে পারলেন না, তিনি যে নিজেকে স্পষ্ট করে তুললেন। তাঁর কথার সুর যেন স্পর্শ হয়ে আমাকে ছুঁয়ে যায়। চোখের চাহনি যেন ভিক্ষা হয়ে আমার পায়ে ধরে। অথচ তার মধ্যে এমন একটা ইচ্ছার জোর, যেন সে নিষ্ঠুর ডাকাতের মতো আমার চুলের মুঠি ধরে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চায়।

"আমি সত্যকথা বলব, এই দুর্দান্ত ইচ্ছার প্রলয় মূর্তি দিনরাত আমার

মনকে টেনেছে। মনে হতে লাগল বড়ো মনোহর নিজেকে একেবারে ছারখার করে দেওয়া। তাতে কত লজ্জা, কত ভয়, কিন্তু বড় তীব্র মধুর সে।"

বিমলা আবার লিখেছে, "আমি গোড়ায় সন্দীপবাবুকে ভক্তি করতে আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু সে ভক্তি গেল ভেসে। তাঁকে শ্রদ্ধাও করিনে, এমন কি তাঁকে অশ্রদ্ধাই করি। আমি খুব স্পষ্ট করেই বুঝেছি, আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর তুলনাই হয় না। এও আমি, প্রথমে না হোক ক্রমে ক্রমে জানতে পেরেছি যে, সন্দীপের মধ্যে যে জিনিসটাকে পৌরুষ বলে ভ্রম হয়, সেটা চাঞ্চল্য মাত্র।

তবু আমার এই রক্তে মাংসে, এই ভাবে-ভাবনায় গড়া বীণাটা ওঁরই হাতে বাজতে লাগল। সেই হাতটাকে আমি ঘৃণা করতে চাই এবং এই বীণাটাকে— কিন্তু বীণা তো বাজল! আর সেই সুরে যখন আমার দিন রাত্রি ভরে উঠল তখন আমার আর দয়ামায়া রইল না। এই সুরের রসাতলে তুমিও মজো, আর তোমার যা কিছু আছে সব মজিয়ে দাও, এই কথা আমার শিরার প্রত্যেক কম্পন আমার রক্তের প্রত্যেক ঢেউ আমাকে বলতে লাগল।"

বিমলা এক সময়ে তার স্বামীর ছবিকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে পূজো করত। স্বামীর আপত্তি সে গ্রাহ্য করত না, তর্ক করত। কিন্তু তর্কে পরাজিত হ'য়ে অভিমানে কাঁদত। সেই সেদিনের বিমলার সঙ্গে আজকের বিমলার কী প্রভেদ। এই প্রভেদের কথা চিন্তা করেই বিমলা আজ তার স্বামীর সেই অনাদরক্লিষ্ট ছবির দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। অথচ সন্দীপের একখানা ছবি সে অন্যায় জেনেও নিজের গয়নার বাক্সের মধ্যে সযত্নে রেখে দিয়েছে। সন্দীপের ছবি সে কেরোসিনের আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে চায়, কিন্তু পারে না। আবার স্বামীর ছবির দিকেও পূর্বের মত তাকাতে পারে না, কারণ পূর্বের বিমলার সঙ্গে তার আর এখন কোনো যোগাযোগ নেই। এমন দুরবস্থায় বিমলার মরণ প্রার্থনা করা ছাড়া কোনো গতি থাকে না। এইটিই বিমলার কঠিন জীবন-যন্ত্রণা—এখান থেকেই তার জীবনের ট্র্যাজেডি ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পরবর্তী প্রত্যেকটি ঘটনাতেই বা বিমলার বিবৃতিতেই আমরা লক্ষ্য করব এই ট্র্যাজেডি কত গভীরভাবে তার জীবনে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। যতই এই অসহনীয় ট্র্যাজিক জীবন-যন্ত্রণা থেকে সে অব্যাহতি পেতে চেয়েছে, ততই তার এই ট্র্যাজেডি তার জীবনকে শোচনীয় ক'রে তুলেছে।

সন্দীপের বাণী তার চিত্তের মধ্যে ডমরু বাজাতে থাকে সব সময়। নিজের মনোভাবের জন্য সে নিজেই যখন নিজের কাছে লজ্জিত হয়ে ওঠে, তখন সন্দীপের বাণী থেকে সে শক্তি পায়। তখন তার মনে হয়, এ লজ্জা কেবল লোক-লজ্জা—তার ছোট জায়ের মূর্তি ধ'রে বাইরে ব'সে সুপুরি কাটতে কাটতে কটাক্ষপাত ক'রছে। তাকে সে কিসের গ্রাহ্য করে! তার পরে তার নিজেরই ভাষায়—"এই বলে তখনই ইচ্ছে হল, ওই পরগাছাটাকে (স্বামীর উপহার) জানলার বাইরে ফেলে দিই, ছবিটাকে (স্বামীর) কুলুঙ্গি থেকে নামিয়ে আনি, প্রলয় শক্তির লজ্জাহীন উলঙ্গতা প্রকাশ হোক। হাত উঠেছিল, কিন্তু বুকের মধ্যে বিঁধল, চোখে জল এল—মেজের উপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলুম! কী হবে, আমার কী হবে! আমার কপালে কী আছে।" যে ভুলটা তার কাছে সোনার হরিণের মতো, যার প্রতি সে মুগ্ধভাবে আকৃষ্ট, যা তার জীবনে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করেছে, সেই ভুলের কাছে নিজেকে ষোল আনায় সঁপে দিয়ে সে ভুলটাকেই সত্য করে তুলতে চায়, এবং এইভাবে সে এক পরিবর্তিত মূল্যবোধকে অবলম্বন ক'রে ট্র্যাজেডির আবর্ত থেকে বেঁচে উঠতে চায়, কিন্তু পারে না, পুরানো মূল্যবোধের বাঁধন বড় কঠিন, আবার সোনার হরিণের মোহটাও দুর্নিবার। বিমলার জীবনের এই ট্র্যাজিক অন্তর্দ্বন্দ্ব বড় মারাত্মক।

বিমলার আশঙ্কা, সে তার স্বখাত-সলিলে নিমজ্জমান, উঠবার ইচ্ছে থাকলেও শক্তি নেই—সুতরাং এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুঃস্বপ্নে তার চিত্ত হাহাকার ক'রে ওঠে।

বিমলার বিশ্বাস ছিল, তার মধ্যে অফুরন্ত শক্তির উৎস আছে, সেই শক্তি নিয়েই সে সন্দীপকে নিরন্তর এত কাজের প্রেরণা যোগাচ্ছে। এই বিশ্বাসের মত্ততায় সে একদিন সন্দীপকে প্রতিশ্রুতি দেয়, স্বামীকে ব'লে সে তাদের জমিদারীর বাজারে বিদেশী মাল বিক্রী বন্ধ করাবে। বিমলার যে মিথ্যা আত্মবিশ্বাসকে সন্দীপ উসকিয়ে দিয়েছে, তা বস্তুতঃ নিখিলেশের কাছে কোনো মর্যাদাই পেল না। এই মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার কথা বিমলা নিজের কথায় লিখেছে, "তাই সেদিন নিজের পরে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে, বজ্রবাহিনী বিদ্যুৎশিখার মতো আমার স্বামীর কাছে গিয়েছিলুম। কিন্তু, হ'ল কী? আজ ন' বছরে একদিনও স্বামীর চোখে এমন উদাস দৃষ্টি দেখিনি। সে যেন মরুভূমির আকাশের মতো, তার নিজের মধ্যেও একটুখানি রসের বাষ্প নেই, আর যেদিকে তাকিয়ে

আছে, তার মধ্যেও যেন কোথাও কিছুমাত্র রঙ দেখা যাচ্ছে না। একটু যদি রাগও করতেন তা হলেও বাঁচতুম। কোথাও তাকে ছুঁতেও পারলুম না। মনে হল আমি মিথ্যে। যেন আমি স্বপ্ন; স্বপ্নটা যেই ভেঙ্গে গেল, অমনি কেবল অন্ধকার রাত্রি।"

তার রূপ ছিল না—সেদিক থেকে সে ছিল দুর্বল। কিন্তু তার শক্তি ছিল স্বামীর ভালোবাসা। আজ সেই শক্তি সে হারিয়েছে এবং সন্দীপের বাণীলব্ধ এক নতুন শক্তির মদ পেয়ালা ভরে পান ক'রেছে। নেশাও ক্রমে উঠেছে, নিজেকে শক্তিমতীও ভেবেছে। কিন্তু স্বামীর কাছে এসে সেই পেয়ালা ভেঙ্গে পড়ে গেল। তাই তার খেদোক্তি—"এখন বাঁচি কি ক'রে।" স্বামীর কাছে ফিরবার পথ রুদ্ধ, আবার স্বামীর কাছ থেকে নিজেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে নিতেও তার সংস্কারের বা অভ্যাসগত ধর্মের বাধা। নারীজীবনে এ এক অস্তিত্বের সংকট। বিমলার ট্র্যাজেডি বিমলাকে এই সংকটের মধ্যে দাঁড় করিয়েছে।

স্বামী যখন বিমলাকে স্পষ্টই ছুটি দিয়ে দিয়েছে, তখন সে স্পষ্টই বুঝল, স্বামীর সঙ্গে আদরের সম্পর্কটি তারজন্য আর অবশিষ্ট নেই। তাই শোবার ঘরে ঢুকে সে দেখে, "শুধু আল্‌না, শুধু আয়না, শুধু খাট। এর উপরে সেই সর্বব্যাপী হৃদয়টি নেই। রয়েছে ছুটি, কেবল ছুটি, একটা ফাঁক। ঝর্ণা একেবারে শুকিয়ে গেল, পাথর আর নুড়িগুলো বেরিয়ে পড়েছে। আদর নেই; আসবাব।" এ সমস্তই বিমলার ট্র্যাজেডি-নিপীড়িত জীবনের সত্যোপলব্ধি।

নিজের অহমিকা এবং গৌরবকে রক্ষা করবার জন্য বিমলা স্বামীর সিন্দুক থেকে ছ'হাজার টাকার গিনি চুরি ক'রে এনে সন্দীপকে দিয়েছে। তাতে সন্দীপ এবং তার ভক্ত অমূল্য তার জয়ধ্বনি করে উঠল, বন্দে মাতরম্ ধ্বনি তুলল তার সামনে জোড় হাত ক'রে। এই স্তবই এখন স্বামী-কক্ষচ্যুতা বিমলার কাছে একমাত্র সঞ্জীবনী মন্ত্র। এ ছাড়া তার বেঁচে থাকার উপায় আর কিছুই নেই। তার এই ট্র্যাজিক দুরবস্থার কথা সে নিজেই বলেছে, "নিজের মনের ভিতর থেকে নিজের পরে নিজের শ্রদ্ধাকে বাঁচিয়ে রাখবার সম্বল আমার যে কিছুই নেই। আমার শোবার ঘরে ঢুকতে পারিনে। সেই লোহার সিন্দুক আমার দিকে ভ্রূকুটি ক'রে থাকে। আমাদের পালংক আমার দিকে যেন নিষেধের হাত বাড়ায়। আপনার ভিতরে আপনার এই অপমান থেকে ছুটে পালাতে ইচ্ছে করে, কেবলই মনে হয় সন্দীপের কাছে গিয়ে

আপনার স্তব শুনিগে। আমার অতলস্পর্শ গ্লানির গহ্বর থেকে জগতে সেই একটুমাত্র পূজার বেদী জেগে আছে; সেখান থেকে যেখানেই পা বাড়াই সেইখানেই শূন্য। তাই দিনরাত্রি ওই বেদী আঁকড়ে পড়ে থাকতে চাই। স্তব চাই, স্তব চাই, দিনরাত্রি স্তব চাই! ওই মদের পেয়ালা একটুমাত্র খালি হ'তে থাকলেই আমি আর বাঁচিনে। তাই সমস্ত দিনই সন্দীপের কাছে গিয়ে তার কথা শোনবার জন্য আমার প্রাণ কাঁদছে; আমার অস্তিত্বের মূল্যটুকু পাবার জন্যে আজ পৃথিবীর মধ্যে সন্দীপকে আমার এত দরকার।"

ঘটনাক্রমে সন্দীপের এক ভক্ত অমূল্যকে বিমলা ছোট ভাইয়ের মতো নিজের অন্তরের মধ্যে ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ জানিয়ে গ্রহণ করে নিয়েছে। নিঃসহায় বিমলার এখন সহায় এই অমূল্য। তার প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে তাই এখন অমূল্যেরই ডাক পড়ে। স্বার্থলোলুপ সন্দীপ এতে ঈর্ষান্বিত হয় এবং ফলে তার বক্তৃতার শক্তির মুখোস খসে গিয়ে তার দুর্বল কাপুরুষতা প্রকাশ হয়ে পড়ে বিমলার কাছে। তখন বিমলাও স্পষ্টই উপেক্ষা করতে থাকে সন্দীপকে। কিন্তু সন্দীপ শেষবারের মতো তার বক্তৃতা-ভিত্তিক স্বরূপটিকে প্রকাশিত করে বিমলার সম্মুখে তাকে মুগ্ধ করার জন্য। বিমলাও মুগ্ধ হয়ে যায়। এবং যে সন্দীপকে সে যাত্রার দলের রাজা বলে পরিহাস ক'রেছিল,—সেই সন্দীপ সম্পর্কেই সে আবার ভাবল, "যাত্রার দলের পোশাকের মধ্যেও এক এক সময়ে রাজা লুকিয়ে থেকে যায়। এর মধ্যে অনেক লোভ, অনেক স্থূল, অনেক ফাঁকি আছে, স্তরে স্তরে মাংসের মধ্যে এ ঢাকা, কিন্তু তবুও—আমরা জানিনে, আমরা শেষ কথাটাকে জানিনে। মানুষ বড়ো আশ্চর্য; তাকে নিয়ে কী প্রচণ্ড রহস্যই তৈরি হ'চ্ছে তা সেই রুদ্র দেবতাই জানেন। মাঝের থেকে দগ্ধ হয়ে গেলুম! প্রলয়! প্রলয়ের দেবতাই শিব, তিনিই আনন্দময়, তিনি বন্ধন মোচন ক'রবেন।"

এই দগ্ধ হয়ে যাওয়াটাই বিমলার ট্র্যাজেডি। সন্দীপ শেষবারের মতো বিমলাকে মুগ্ধ ক'রে স্থান-ত্যাগ ক'রল। এখন আর বিমলার সম্মুখে সন্দীপ নেই—সন্দীপের আবির্ভাব তার চিত্তকে দগ্ধ ক'রে গেছে—তার সুখের সংসারে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি ক'রে গেছে, তাকে নিজের কাছে নিজেকে অকিঞ্চিৎকর ক'রে রেখে গেছে। সে (বিমলা) এখন আছে, কিন্তু স্থিতি নেই যেন। সে বেঁচে আছে, "একটা বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদের উপরে যেন পদ্মপাতার উপরকার শিশিরবিন্দুর মতো।" হৃদয়ের দিকে তাকালে সে অবশ্য দেখতে পায়—"যা

ছিল, তা সবই আছে, কেবল নড়ে চড়ে গিয়েছে। যা সাজানো ছিল, আজ তা এলোমেলো, যা কণ্ঠের হারে গাঁথা ছিল, আজ তা ধূলোয়। সেই জন্যেই তো বুক ফেটে যাচ্ছে। ইচ্ছা করে মরি, কিন্তু সবই যে হৃদয়ের মধ্যে বেঁচে আছে, মরার ভিতরে তো শেষ দেখতে পাচ্ছিনে। আমার মনে হচ্ছে যেন মরার মধ্যে আরও ভয়ানক কান্না। যা কিছু চুকিয়ে দেবার তা বাঁচার ভিতর দিয়েই চুকোতে পারি—অন্য উপায় নেই।"

সুতরাং তাকে বেঁচে উঠতে হবে। তাই সে তার প্রভুর কাছে ক্ষমা চায় —প্রার্থনা করে, "সেই বাঁশির সুরে আমার সংসারকে তুমি নতুন করে সৃষ্টি করো। নইলে আমি আর কোনো উপায় দেখিনে।"

নিজের প্রার্থনাকে বুকের মধ্যে নিয়ে সে রাত্রিতে গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদতে থাকে। এমন সময়ে—"আমার শিয়রের কাছে এসে বসলেন। কে? আমার স্বামী! আমার স্বামীর হৃদয়ের মধ্যে আমার সেই দেবতারই সিংহাসন নড়ে উঠেছে, যিনি আমার কান্না আর সইতে পারলেন না।···বুকের মধ্যে তার পা চেপে ধরলুম; ওই পায়ের চিহ্ন চিরজীবনের মতো ওইখানে আঁকা হয়ে যায় না কি?"

এই হ'ল নিজ সংসারে বিমলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। যদিও তার পরিপূর্ণ সুখ আবার এখন থেকেই অনিশ্চিত হয়ে উঠল। সন্দীপের কারণে সংঘটিত দাঙ্গা থামাতে গিয়ে অমূল্য হ'ল নিহত এবং নিখিলেশ মুমূর্ষু। এইখানেই বিমলার জীবনে তার নিয়তির আনাগোনা লক্ষ্য করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে[৬] মানুষের পাওয়ার জন্য সাধনার আবশ্যকীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে সেই-কথারই রূপায়ণ দেখা যায়। বিমলার যা কিছু সৌভাগ্য, সব বিমলা না চাইতেই পেয়েছিল, এবং সে নিজেও ভেবেছিল, তার প্রাপ্তিটা বড় বেশী—এবং এই প্রাপ্তির গৌরবে সে অকারণে অপরকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেছে। এই কৃতার্থম্মন্যতাই তার মধ্যে একটা অহমিকার জন্ম দিয়েছে যা কালক্রমে সন্দীপের

৬. "লাভ করিবার প্রকৃষ্ট প্রণালী সাধনা, তপস্যা। যাহা অনায়াসেই হস্তগত হইয়াছিল, তাহা অনায়াসেই হারাইয়া গেল। যাহা আবেশের মুষ্টিতে আহৃত হয়, তাহা শিথিলভাবেই স্খলিত হইয়া পড়ে।" শকুন্তলা: প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী (প. ব. সরকার), ১৩শ, পৃঃ ৬৬২, (২৬)

স্তব-জলসিঞ্চনে মহীরুহে পরিণত হয়ে উঠেছে এবং নিজেকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে ফেলেছে। যে স্বামী-সৌভাগ্যের সিঁড়ি ধরে সে অহমিকা মদমত্ত হয়ে উঠেছিল, পরিণামে সে সেই স্বামী সৌভাগ্য থেকেই স্খলিত হয়ে পড়বে, এ ছিল বিমলার চিন্তারও অতীত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা-ই ঘটতে চলেছিল বিমলার জীবনে। সন্দীপের আবির্ভাব ধূমকেতুর মতো এক অশুভ সঙ্কেত নিয়ে এসেছিল তার জীবনে, অশুভ এবং অনিশ্চিত জেনেও সে তাকে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছে, কারণ সেখানে সে নিজে যা নয়, তার থেকেও নিজেকে বড় হিসেবে ভাবতে পারত। সন্দীপের স্তব এবং লোভকে প্রশ্রয় দিয়েও কিন্তু সে সংজ্ঞা হারায়নি। সামাজিক নিয়মে তার অবস্থান কোথায়, তা সে ঠিকই খেয়াল রেখেছিল। সেই কারণেই সে যন্ত্রণা পেয়েছে অনেক বেশী। সুনিশ্চিত ভাবে নিখিলেশ বা সন্দীপকে অবলম্বন করলে হয়তো বিবেক-দংশন কিছু কমত। কিন্তু তা সে পারেনি। একদিকে নিখিলেশের সুনিশ্চিত মহত্ব, আর একদিকে সন্দীপের তথাকথিত পৌরুষ— এই দুয়ের দ্বন্দ্বে সে শুধু বিক্ষুব্ধ হয়েছে, তার জীবন শোচনীয় হয়ে উঠেছে। নিজের কাছে নিজের জীবন ট্র্যাজিক হয়ে উঠেছে। কিন্তু পরিপূর্ণ ট্র্যাজেডি বলতে আমরা যা বুঝি, তা বিমলার জীবনে শেষ পর্যন্ত না ঘটতেও পারত। কারণ বিমলার আকাঙ্ক্ষিত পৌরুষ আরও স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ হয়ে নিতান্ত প্রয়োজনের সময় নিখিলেশের মধ্যেই দেখা গেল এবং তখন অবশ্যই সন্দীপকে সরে যেতে হ'ল। এখন বিমলা যেভাবে নিখিলেশকে পাচ্ছে—এই পাওয়ার পথে তাকে অনেক কান্না—অনেক অশ্রু—এবং অনেক দুঃখের মধ্যদিয়ে আসতে হয়েছে। তাই হয়তো এই পাওয়াই চূড়ান্ত ক'রে পাওয়া—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সাধনার মধ্যদিয়ে পাওয়া।

কিন্তু বিমলার ট্র্যাজেডি এখানে যে, এমন চূড়ান্ত করে পাওয়া স্বামী-সৌভাগ্য তার কাছে অনিশ্চিত হ'য়ে উঠল। বিমলার প্রশ্রয়ে থাকাকালীন সন্দীপ যে দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটিয়েছে,—তারই শিকার হ'তে হ'ল নিখিলেশকে। নিজকৃত ভুলের এতবড় মাশুল দেওয়ার ইঙ্গিত এই উপন্যাসের শেষে ব্যক্ত হয়েছে—এর ফলেই বিমলার মধ্যে ট্র্যাজেডির সম্ভাবনা দেখা গেছে।

দাঙ্গার দুর্ঘটনার পর নিখিলেশ যদি সুস্থ হয়েও ওঠে, এবং তাদের সংসার-জীবন যদি অভ্যাস অনুসারে আগেকার ছকে পরিচালিত হয়ও, তথাপি এটা সহজেই বুঝি যে, পূর্বের স্বতঃস্ফূর্ত জীবন-মাধুর্য এবং দাম্পত্য-সম্প্রীতি তাদের সংসারজীবনে কিছুতেই পূর্বের মতো বিরাজ ক'রবে না। নিখিলেশের তো

বটেই, বিমলার পক্ষেও এটাই সবচেয়ে বড়ো লোকসান,—এখানেই তার আসল ট্র্যাজেডি। পতিগতপ্রাণা নারীর পক্ষে স্বামীকে হারানো আর স্বামীর প্রেমকে হারানো একই কথা। যে নারী নিজের ভ্রান্তিতেই এর একটি বা দুটিই হারায়, তার ট্র্যাজেডি তার নিজের কাছে হয় অসহনীয়। রবীন্দ্রনাথ বিমলার চরিত্রকে যেভাবে এঁকেছেন, তাতে বিমলার জীবনে আমরা সেই ট্র্যাজেডির ছায়াপাত লক্ষ্য করি।[৭]

নিখিলেশের প্রতি আমাদের করুণা এবং সহানুভূতি আরো প্রবলভাবে উদ্রিক্ত হয়। যে সমুচ্চ মহত্ত্ব তার জীবনের মূলধন—তা যখন সবচেয়ে বড়ো প্রত্যাশিত সমঝদারের কাছেই উচিত মূল্য পায় না, তখন ব্যাপারটা দুঃখেরই হয়। নিখিলেশের যেটা মহত্ত্ব, সেটাকে বিমলা ভাবে দুর্বলতা বা পৌরুষের অভাব। বিমলার এই ভুল ধারণাই নিখিলেশের জীবনে সমস্ত দুঃখের এবং প্রতারণার মেঘকে সঞ্চিত করেছে। দাম্পত্য জীবনের পরম নিশ্চিন্ততা এইভাবে একজনের ভুল বোঝার কারণে ভেঙ্গে যাওয়া, তা কিছুকালের জন্য হলেও, পরম শোচনীয়। সুতরাং নিখিলেশের ভাগ্যবিড়ম্বনার জন্য স্বাভাবিক কারণেই আমাদের মধ্যে সহানুভূতি জাগে।

তদুপরি নিখিলেশের চারিত্রিক মহত্ত্ব তাকে আমাদের কাছে আরো বেশী সহানুভূতির যোগ্য করে তুলেছে। পাছে বিমলা তাকে আরো ভুল বোঝে, পাছে সে অন্তরের ক্ষুদ্রতার পরিচয় দেয়, এইজন্য সে কখনো বিমলার সন্দীপ-মুখিতার পথরোধ করে দাড়ায় নি, বা বিমলাকে এ সম্পর্কে কিছু বলতেও যায় নি। কেবল নিজে এইসব ভাঙ্গাগড়া, লাভ-ক্ষতির মধ্যদিয়ে পরম সত্যকে পাওয়ার জন্য প্রস্তুত হবার চেষ্টা করেছে। সীমার দুঃখের বিনিময়ে সে অসীমের সত্যকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেছে।

৭. দাঙ্গায় নিখিলেশ আহত হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ বিমলার চরিত্রকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তাতে বিমলার ট্র্যাজেডি অস্পষ্ট থেকে যেতে বাধ্য। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "নিখিলেশের সাংঘাতিক আঘাত ও মুমূর্ষু অবস্থা তাহার মনে যে কিরূপ বিপ্লব উপস্থিত করিল, সে সম্বন্ধেও কোন আলোকপাতের চেষ্টা নাই। সুতরাং স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, গ্রন্থারম্ভে বিমলার খেদোক্তি কতদূর পর্যন্ত ভবিষ্যদ্‌জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত—ইহাতে সামান্য রকমের অবিমৃষ্য-কারিতার জন্য মৃদু অনুতাপের সুর আছে, স্বামীর রক্তাপ্লুত দেহদর্শনে আর্তদীর্ণ শিহরণ নাই। বিমলার চরিত্র সংকলনে ইহা একটি প্রধান দোষ বলিয়া মনে হয়।"

—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা: (১৩৭২) পৃঃ ১৬৯।

কিন্তু সীমার দুঃখটা অত্যন্ত বাস্তব, সেই দুঃখ যে পায় এবং যে অন্য কোনো ব্যক্তিকে ভোগ করতে দেখে, তাদের উভয়েরই তাতে দুঃখ হয়। এই কারণেই নিখিলেশের প্রতি আমাদের সহানুভূতি প্রবল।

নিখিলেশের চিরকালের ইচ্ছা ঘরের বাইরের সত্যের সঙ্গে বিমলার পরিচয় হোক, এবং সত্যের সঙ্গে পরিচিত বিমলার সঙ্গেই তার পরিচয় গভীর হোক। বিমলা তখন একমাত্র স্বামীকেই জানে—এবং আর কিছু জানতে তার কোনো আগ্রহও নেই। কিন্তু নিখিলেশ ভাবে, বিমলার জীবনে পরম পদার্থ কি, তা তার কাছে যাচাই হয়ে যায়নি—সে যেটাকে পরম বলে জানে, সেটা হয়ত প্রকৃতপক্ষে তার কাছে পরম নয়, কিন্তু সেটা বুঝতে গেলে সংসারের (দাম্পত্য জীবনে) বাইরের সঙ্গেও তার পরিচয় দরকার। এইজন্যই সে বিমলাকে বলে, "এই ঘরগড়া ফাঁকির মধ্যে কেবল মাত্র ঘরকর্নাটুকু করে যাওয়ার জন্যে তুমিও হওনি, আমিও হইনি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয়, তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে।"

তারপর সন্দীপের সঙ্গে পরিচয়ের মধ্য দিয়ে নিখিলেশ-ব্যতিরিক্ত জগতের সঙ্গে বিমলার পরিচয় হতে থাকল। এই পরিচয়ের মধ্য দিয়েই বিমলা যেমন নিজের পরিচয় পেতে লাগল, নিখিলেশও তেমনি তার সঙ্গে বিমলার সম্পর্কের ভিত্তিটাকে ভালো করে দেখতে পেল: "আজ একথা স্পষ্ট বুঝেছি, বিমলের জীবনে আমি আকস্মিক মাত্র, বিমলের সমস্ত প্রকৃতি যার সঙ্গে সত্য মিলতে পারে, সে হচ্ছে সন্দীপ। এইটুকু জানাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

কিন্তু এই সত্যকে জানতে গিয়ে নিখিলেশ ভেঙে পড়েনি। যেখানে যার যতটুকু মূল্য দেওয়ার আছে, তা দিতেই হবে, সেজন্য নিখিলেশ প্রস্তুত। কিন্তু নিজের সম্পর্কে নিজের ধারণা তার এত সঠিক এবং সুদৃঢ় যে, দুঃখ যদিও সে পায়, তাতে সে বিধ্বস্ত হয় না। তারপর সে নিজেই এ সম্পর্কে ভেবেছে: "অতএব আজ সমস্ত অসহ্য দুঃখের ভিতর দিয়েও আমার মনের মধ্যে একটা মুক্তির আনন্দ জাগুক। চেনা শোনা হোল, বাহিরকেও বুঝলুম, অন্তরকেও বুঝলুম। সমস্ত লাভ-লোকসান মিটিয়ে যা বাকি রইল তাই আমি। সে তো পঙ্গু আমি নয়, দরিদ্র আমি নয়, সে অন্তঃপুরের রোগীর পথ্যে মানুষ করা রোগা আমি নয়, সে বিধাতার শক্ত হাতের তৈরী আমি। যা তার হবার তা হয়ে গেছে, আর তার কিছুতে মার নেই।"

বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হওয়া মাত্র বিমলা কেন যে সন্দীপের প্রতি

এত আকৃষ্ট হল, আত্মানুসন্ধিৎসু নিখিলেশ তাও বুঝতে পারে "আজ পর্যন্ত বিমল এক জায়গায় আমাকে কোনোমতেই বুঝতে পারেনি। জবরদস্তিকে আমি বরাবর দুর্বলতা বলেই জানি। যে দুর্বল সে সুবিচার করতে সাহস করে না। ন্যায়পরতার দায়িত্ব এড়িয়ে অন্যায়ের দ্বারা সে তাড়াতাড়ি ফল পেতে চায়। ধৈর্য্যের পরে বিমলের ধৈর্য্য নেই। পুরুষের মধ্যে সে দুর্দান্ত, ক্রুদ্ধ, এমন কি অন্যায়কারীকে দেখতে ভালোবাসে। শ্রদ্ধার সঙ্গে একটা ভয়ের আকাঙ্ক্ষা যেন তার আছে।"

কিন্তু নিখিলেশের ভদ্রতাজ্ঞান এত তীব্র যে সন্দীপকে সে হীন জেনেও সে সম্পর্কে বিমলার ভুল ভাঙ্গিয়ে দিতে সে পারে না। পরিচিতা হবার আগে একসময়ে বিমলাই সন্দীপ সম্পর্কে কটূক্তি করেছে। সুতরাং সে কথা স্মরণ করিয়ে নিখিলেশের পক্ষে বিমলার ভুল ভাঙ্গিয়ে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু নিখিলেশের ভয়, যে সন্দীপের সমালোচনা সে পূর্বে করেনি, আজ সেই সন্দীপের সমালোচনা করতে গেলে বোধ হয় স্বার্থসচেতন হীনম্মন্যতার পরিচয় বেরিয়ে পড়বে। আবার সে এও আশঙ্কা করছে যে, সন্দীপ তার স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছে ব'লে সন্দীপ সম্পর্কে কিছু অকারণ বিদ্বেষও তার মনে জাগতে পারে। নিখিলেশ নিজেই তার এই মানসিক অবস্থাটির বর্ণনা করেছে, "টাকা সম্বন্ধে সন্দীপের একটা লোলুপতা আছে সে কথা বিমল এর পূর্বে আমাকে অনেকবার বলেছে। আমি যে তা বুঝিনি তা নয়, কিন্তু সন্দীপের সঙ্গে টাকা সম্বন্ধে কৃপণতা করতে পারতুম না। ও যে আমাকে ফাঁকি দিচ্ছে, একথা আমাকে মনে করতেও লজ্জা হত। আমি যে ওকে টাকার সাহায্য করছি, সেটা পাছে কুশ্রী হয়ে দেখা দেয় এই জন্যে ও সম্বন্ধে ওকে আমি কোনো রকম তক্‌রার করতে চাইতুম না। আজ কিন্তু বিমলকে একথা বোঝানো শক্ত হবে যে, দেশের সম্বন্ধে সন্দীপের মনের ভাবের অনেকখানিই সেই স্থূল লোলুপতার রূপান্তর। সন্দীপকে বিমল মনে মনে পূজা করছে; তাই আজ সন্দীপের সম্বন্ধে বিমলের কাছে কিছু বলতে আমার মন ছোট হয়ে যায়। কী জানি হয়তো তার মধ্যে মনের ঈর্ষা এসে বেঁধে—হয়তো অত্যুক্তি এসে পড়ে। সন্দীপের যে ছবি আমার মনে জাগছে তার রেখা হয়তো আমার বেদনার তীব্র তাপে বেঁকে চুরে গিয়েছে।"

সন্দীপের এই ভদ্রতাবোধ এবং আত্মমর্যাদা-বোধ তাকে পরম দুঃখের সময়ে এক পরম সহিষ্ণুতা প্রদান করেছে। সে সমস্ত দুঃখ সহ্য করতে প্রস্তুত—সমস্ত

ক্ষতি সে স্বীকার করতে প্রস্তুত,—শুধুমাত্র নিজের মর্যাদা এবং সৌজন্য রক্ষা করার জন্য। সে বুঝতে পারে এই পরম দুঃখের আবর্তের মধ্যদিয়েই তার সত্যলাভ হবে। সুতরাং সমস্ত বেদনা তাকে সহ্য করতেই হবে। তার নিজের ভাষায়ঃ "আমি বিশ্বাস হারাব না, আমি অপেক্ষা করব। ছোটো জায়গা থেকে বড়ো যায়গায় যাবার মাঝখানকার রাস্তা ঝোড়ো রাস্তা; ঘরের চতুঃসীমানায় যে ব্যবস্থাটুকুর মধ্যে বিমলের জীবন বাসা বেঁধেছিল, ঘরের বাইরে এসে হঠাৎ সে ব্যবস্থায় কুলোচ্ছে না। অচেনা বাইরের সঙ্গে চেনাশুনো সম্পূর্ণ হয়ে যখন একটা বোঝাপড়া পাকা হয়ে যাবে তখন দেখব আমার স্থান কোথায়। যদি দেখি এই বৃহৎ জীবনের ব্যবস্থার মধ্যে কোথাও আমি আর খাপ খাইনে, তা হলে বুঝব এতদিন যা নিয়ে ছিলুম তা একেবারে ফাঁকি। সে ফাঁকিতে কোনো দরকার নেই। সেদিন যদি আসে তো ঝগড়া করব না, আস্তে আস্তে বিদায় হয়ে যাব। জোর জবরদস্তি? কিসের জন্য? সত্যের সঙ্গে কি জোর খাটে!"

নিজের ক্ষতিকে ঠেকানোর জন্য, দুঃখকে পরিহার করার জন্য, সত্যের প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করতে নিখিলেশ পরাঙ্মুখ। সে যদি জানতেও পারে যে তার জীবনের যাবতীয় সুখ একটা ভুলের উপরে প্রতিষ্ঠিত, তবু সেই ভুলকে সংশোধন করার জন্য সে সমস্ত সুখকে বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। এইখানেই তার পৌরুষ। আর সন্দীপের মতে ভুলকে ভুল বলে স্বীকার করাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো ভুল। এখানেই সন্দীপের সঙ্গে নিখিলেশের পার্থক্য।

এ সমস্তই নিখিলেশের তত্ত্ব হলেও এটি তার জীবনের অঙ্গীভূত। যদি এমন হোত যে, নিখিলেশ তার জীবনের এই বিড়ম্বনাকে এই তত্ত্ব দিয়ে প্রতিরোধ করতে চাইছে, বা তত্ত্বের জাল বিস্তার ক'রে নিজেকে ভুলিয়ে রাখছে, বা দাম্পত্যসুখ সম্পর্কে তার কোনো অনুভূতি নেই বলেই সে এমন তাত্ত্বিক হতে পেরেছে, তা হ'লে নিখিলেশ সম্পর্কে এই সহানুভূতি, বেদনাবোধ আমাদের মধ্যে সৃষ্টি না হতেও পারত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্যাপারটা তা নয়। নিখিলেশ তার জীবনে একাকীত্বের বেদনা মর্মান্তিকভাবে উপলব্ধি করছে। দাম্পত্যপ্রণয়ের সমস্ত স্মৃতিই তার উপযুক্ত মুহূর্তগুলিতে তার চিত্তকে ভারাক্রান্ত করেছে। সব আছে, তবু যেন তার মনে করুণ সুরে বেদনার বীণা বাজছেঃ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর। দাম্পত্য জীবনের এই আকস্মিক শূন্যতার সে যত ব্যাখ্যাই দিক, নিজের মনের মধ্যে সে তার বুক-

ফাটা কান্নাকে লুকোতে পারছে না। তার ট্র্যাজেডির মর্মান্তিকতা এইখানেই যে, সে তার এই কান্নাকে প্রশ্রয় দিতেও পারছে না। কারণ এ তার বিচ্ছেদের বেদনা। বিচ্ছেদে মিলনের কোনো আশা থাকে না। বিরহে তবু আশা থাকে। সুতরাং বিরহের দুঃখকে যদি কান্নায় প্রকাশ করা হয়, তবে বিচ্ছেদের দুঃখকে প্রকাশ করা হবে কিসে? যে বিচ্ছেদকে স্বীকার করতেই হবে, বিমলকে মুক্তি দিতেই হবে—কান্না দিয়ে শুধু সেই অবশ্যম্ভাবীর কাছে নিজের দীনতা প্রকাশ করে লাভ কি? তাই সে বলছে,—"এ কান্না আমার থামাতেই হবে। আমার এই কান্না দিয়ে বিমলকে আমি বন্দী করে রাখব এমন কাপুরুষ যেন না হই। ভালোবাসা যেখানে একেবারে মিথ্যা হয়ে গেছে সেখানে কান্না যেন সেই মিথ্যাকে বাঁধতে না চায়। যতক্ষণ আমার বেদনা প্রকাশ পাবে, ততক্ষণ বিমল একেবারে মুক্তি পাবে না।" যে বিমলার স্বগৃহে মন নেই, সেই বিমলার গৃহবিমুখতাকে পরিণতি দেবার জন্য নিজের কান্নাকেও গোপন করা যেমন শক্তিমত্তার পরিচায়ক, তেমনি এক সুগভীর ট্র্যাজেডিরও বিষয়। সত্যকে নিতে হবে সহজেই, সুতরাং ভালোমন্দ যাই ঘটুক, তার জন্য তৈরী হতে হবে, একথা বলা সহজ, কিন্তু যে পালন করে, তার পক্ষে মর্মান্তিক-ভাবে নিষ্করুণ।

নিখিলেশের ট্র্যাজেডি আরো মহিমালাভ করেছে, যখন সে নিজের দুঃখকেই শুধুমাত্র বড় করে দেখেনি। এই দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ আবর্তের মধ্যে পড়ে বিমলার দুঃখও যে কত তীব্র হয়ে উঠেছে—তাও সে অনুভব করার চেষ্টা করেছে, এবং বিমলার দুঃখকে দূর করবার জন্য সে নিজে উত্তরোত্তর দুঃখভোগের প্রস্তুতি নিয়েছে। অপরাহ্ণে নিজ উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করেছে নিখিলেশ,—যেখানে তাদের প্রণয়ঘন অনেক মুহূর্ত কেটেছে। সেখানে বিশ্রাম করছিল বিমলা। নিখিলেশকে দেখেই সে বাড়ীর দিকে চলতে থাকে। তারপরে নিখিলেশ বলছে: "সেই একটুখানি সময়ের মধ্যেই বিমলার দুর্বিষহ দুঃখ আমার কাছে যেন মূর্তিমান হয়ে দেখা দিল। সেই মুহূর্তে আমার নিজের জীবনের নালিশ কোথায় দূরে ভেসে গেল।" এর পরেই নিখিলেশ বিমলাকে "ছুটি" দিয়ে দেয় প্রকাশ্যভাবেই। বিমলার বেদনা দূর করবার জন্য সমস্ত বেদনার বোঝা নিজেই বরণ করে নিল। তারপর সে রুদ্ধকণ্ঠেই যেন বলছে, "না না, এ আমার ঔদার্য নয়, এ আমার ঔদাসীন্য তো নয়ই। আমি যে ছাড়তে না পারলে কিছুতেই ছাড়া পাব না। যাকে আমার হৃদয়ের হার

করব তাকে চিরদিন আমার হৃদয়ের বোঝা করে রেখে দিতে পারব না। অন্তর্যামীর কাছে আমি জোড় হাতে কেবল এই প্রার্থনাই করছি আমি সুখ না পাই নাই পেলুম, দুঃখ পাই সেও স্বীকার, কিন্তু আমাকে বেঁধে রেখে দিয়ো না। মিথ্যাকে সত্য ব'লে ধরে রাখার চেষ্টা যে নিজেরই গলা চেপে ধরা। আমার সেই আত্মহত্যা থেকে আমাকে বাঁচাও।"

নিখিলেশের যেখানে ক্ষতি হচ্ছে, যেখানে তার বেদনা বাজছে, সেটা তার বাইরের জীবন, সেটা বাস্তব। আর যেখানে সে সত্যকে লাভ করার জন্য এত ক্ষতি ও বেদনা স্বীকার করছে, সেটা অন্তরের আদর্শ। এই আদর্শকে রক্ষা করার জন্য বাস্তবের বেদনাকে সহ্য করা, তারজন্য নিজেকে নিঃশেষিত করাই নিখিলেশের জীবনের ট্র্যাজেডির স্বরূপ। সে বলছে, "দাম্পত্য আমার ভিতরের জিনিস, সে তো কেবল আমার গৃহস্থ আশ্রম বা সংসার যাত্রা নয়। সে আমার জীবনের বিকাশ। সেইজন্যেই বাইরের দিক থেকে ওর উপরে একটুও জোর দিতে পারলুম না; দিতে গেলেই মনে হয়, আমার দেবতাকে অপমান করছি। এ কথা কাউকে বোঝাতে পারব না। আমি হয়তো অদ্ভুত। সেই জন্যেই হয়তো ঠকলুম। কিন্তু আমার বাইরেকে ঠকা থেকে বাঁচাতে গিয়ে ভিতরকে ঠকাই কি ক'রে?" নিখিলেশ ভাবছে, সে বাইরে ঠকছে, কিন্তু ভিতরে লাভ করছে। কিন্তু ভিতরে লাভ করতে পারলেও বাইরের অর্থাৎ বাস্তবের ঠকাটাও মস্তবড় ব্যাপার, এবং তাও জীবনকে ভেঙ্গে ফেলতে পারে। শক্তিমান আদর্শবাদী সেটা মানতে চায় না, কিন্তু তার রুদ্ধ অশ্রু সেটা জানিয়ে দেয়। আদর্শবাদী মানুষ মৃত্যুর উপরেও জয়লাভ করে। কিন্তু তার বাস্তব মৃত্যুটা বাস্তব জীবনের বিনাশকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। আদর্শবাদীদের ট্র্যাজেডি এখানেই।

নিখিলেশের ট্র্যাজেডিও এখানে যে তার বাস্তব দাম্পত্যজীবনের বিনাশের আশঙ্কাও মর্মন্তুদভাবে স্পষ্ট হয়ে গেছে, এবং সে তার সমস্ত আদর্শ নিয়েও তারজন্য দীর্ঘশ্বাস না ফেলে পারছে না—"আমার জীবনের সাজানো বাতি আর জ্বললো না।"

নিখিলেশের দীর্ঘশ্বাস আরও মর্মন্তুদ হয়ে উঠেছে এখানে: "একদিন এমন হবে যে এই ক্ষতর চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। কিন্তু, আর কি সময় আছে? এতদিন গেল ভুল বুঝতে, আজকের দিন এল ভুল ভাঙতে, কতদিন লাগবে

ভুল শোধরাতে! তারপরে? তারপরে ক্ষত শুকোতেও পারে, কিন্তু ক্ষতিপূরণ কি আর কোনো কালে হবে?"

নিখিলেশের এই ভাবনার ঠিক পূর্বেই তাদের দাম্পত্য-জীবনের বিপদটা আপাততঃ কেটে গেছে। সন্দীপের প্রগল্‌ভ মূঢ়তা এবং বাস্তবক্ষেত্রে নিখিলেশের আত্মঘোষণা (কলিকাতা যাওয়া এবং সন্দীপকে স্থানত্যাগ করতে বলা) নিখিলেশের দাম্পত্য জীবনের আকাশের কালো মেঘকে কাটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তবু যে ক্ষতি ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে,—তারই যে প্রতিক্রিয়া কী গভীর, সেই দুর্ভাবনাই নিখিলেশের সমস্ত সুখ কেড়ে নিয়েছে।

সন্দীপ নিখিলেশের বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার পরমুহূর্তেই নিখিলেশকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিবারণে নিষ্ক্রান্ত হতে হোল। সেখান থেকে মরণাপন্ন অবস্থায় সে গভীর রাত্রিতে ফিরল। চিকিৎসক তার জীবন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত নয়। এক মুহূর্ত আগেই সে বিমলার হাত বহুদিন পরে ধরে বলেছিল, "আর তো সময় বেশি নেই, এখন কাজগুলো সেরে নেওয়া যাক (কলকাতা যাওয়ার জন্য), আর তারপরের ঘটনাই এই।

দাম্পত্য জীবনের যে মাধুর্যকে চিরকালের জন্য হারিয়েছে ভেবে নিখিলেশ আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল, তা এই মুহূর্তে এই ভাবেই এক গভীর কালো রেখাঙ্কিত বিপদের রূপে দেখা দিল।

নিখিলেশের মৃত্যুর উপর তার ট্র্যাজেডির কিছুই নির্ভর করছে না। তার জীবনের এটাই সবচেয়ে সুন্দর, শৈল্পিক সমাপ্তি। যে ঘটনা তার জীবনে ঘটে গেল, তারপরে তার বাঁচা এবং মৃত্যু সমার্থক। কারণ যে ক্ষতি হয়ে গেছে, তা আর কোনোকালেই পূরণ হবে না ভেবে যে দীর্ঘ নিশ্বাস,—সেইখানেই প্রকৃতপক্ষে তার দাম্পত্যজীবনের শেষ। এখন বাস্তবজীবনের জন্য একটা মৃত্যু দরকার, এবং তার ইঙ্গিত ঐ দাঙ্গার ঘটনায়।

নিখিলেশের জীবনের ট্র্যাজেডি হচ্ছে সত্যকে আবিষ্কার করার জন্য জীবনের সর্বস্বমূল্য দেওয়ার ট্র্যাজেডি।[৮]

---

৮. ই. এম. ফরস্টার সম্ভবতঃ 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের ট্র্যাজেডির এই ভাবগত তাৎপর্যটি ঠিক অনুধাবন করতে পারেন নি। অবশ্য লেখকের রচনাগত ত্রুটিও এর কারণ হ'তে পারে। যে কারণেই হোক এই প্রসিদ্ধ সমালোচক বলেছেন, "The tragedy is skillfully told, but it all seems to be about nothing, and this is because the contrast, does not work out as the writer intends."—'Two Books by Tagore,' Collected in 'Abinger Harvest,' (1936), p. 321.

যোগাযোগ (১৯২৯) উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ এক বৃহত্তর সামাজিক সমস্যার পটভূমিকায় একটি নারীর জীবনের সমস্যাকে চিত্রিত করেছেন। একদিকে বাণিজ্যভিত্তিক উদীয়মান ধনতন্ত্র, অপরদিকে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র। ধনতন্ত্রের সংস্কৃতি-রিক্ত ধন-সর্বস্বতার আগ্রাসী রূপ, আর সামন্ততন্ত্রের সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আভিজাত্য এবং রুচিবোধের অভিমানীরূপ। এই দুইয়ের বিরোধ এই উপন্যাসের পটভূমি : একদিকে উদীয়মান ধনিক ব্যবসায়ী মধুসূদন, আর একদিকে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বিপ্রদাস। বিপ্রদাসের ভগিনী কুমুদিনীর সঙ্গে মধুসূদনের বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যদিয়ে উপরিউক্ত সামাজিক সমস্যাটি একটি পারিবারিক সমস্যা হিসেবে এই উপন্যাসে দেখা দিয়েছে। এবং সেই সমস্যায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে কুমুদিনীর জীবন, ভেঙ্গেচুরে গেছে তার যৌবন-স্বপ্ন, বিরুদ্ধ রুচি এবং জীবনাদর্শের প্রবলচাপে লাঞ্ছিত হয়েছে তার সুকুমার মূল্যবোধ এবং সূক্ষ্ম চিত্তবৃত্তি সমূহ। পরস্পর বিপরীত দুই বিরুদ্ধ জীবনাদর্শের মধ্যে 'যোগাযোগ' সাধন করতে গিয়ে কুমুদিনীকে বরণ করতে হয়েছে এই ট্র্যাজেডি। কুমুদিনীর জীবনের মূল্যবোধের এবং চিত্তবৃত্তির এই নিদারুণ লাঞ্ছনার ইতিবৃত্ত, রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন, এবং তার মধ্য থেকেই আমরা কুমুদিনীর জীবনের শোচনীয় ট্র্যাজেডির পরিচয় পাই।

কুমুদিনী জমিদারের কন্যা। কিন্তু তার শৈশবেই তার পিতার মৃত্যু হয় এবং তারপর থেকেই তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। সুতরাং অপরিমিত স্বচ্ছলতার মধ্যে কুমুদিনী অভ্যস্ত হতে পারে নি। সে কেবল অভ্যস্ত হয়েছে তাদের পরিবারে সুদীর্ঘকাল ধরে মেনে আসা কতকগুলি মূল্যবোধের মধ্যে। তাই ঈশ্বরভক্তি, দয়া, মায়া, সেবা, পাতিব্রত্য, সঙ্গীতানুরাগ প্রভৃতি কতকগুলি সুকুমার চিত্তবৃত্তি কুমুদিনীর মধ্যে ঐতিহ্যগত সূত্রে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিদ্যমান ছিল।

রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজিক-চরিত্রগুলির দু'টি পরিচিত বিশেষত্ব কুমুদিনীর মধ্যে প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা যায়,—একটা তার অন্তরগত বিষণ্ণতা, আর একটা তার স্বভাবগত নিঃসঙ্গতা।

প্রথম বিশেষত্বটির পরিচয় দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "কুমুদিনী নিজের জন্যে নিজে সংকুচিত। তার বিশ্বাস সে অপয়া। সে জানে পুরুষরা সংসার চালায় নিজের শক্তি দিয়ে, মেয়েরা লক্ষ্মীকে ঘরে আনে-নিজের ভাগ্যের জোরে। ওর দ্বারা তা হ'ল না। যখন থেকে ওর বোঝবার বয়স হয়েছে

তখন থেকে চারদিকে দেখেছে দুর্ভাগ্যের পাপদৃষ্টি। আর সংসারের উপর চেপে আছে ওর নিজের আইবুড়ো দশা, জগদ্দল পাথর, তার যত বড়ো দুঃখ তত বড়ো অপমান। কিছু করবার নেই, কপালে করাঘাত ছাড়া। উপায় পাবার পথ বিধাতা মেয়েদের দিলেন না, দিলেন কেবল ব্যথা পাবার শক্তি।"

কুমুদিনীর এই আন্তরিক বিষণ্ণতাকে দূর করবার জন্য তার ভ্রাতা সর্বদা সচেষ্ট থাকত। পিতা-মাতার স্নেহবঞ্চিত ভগিনীর চিত্তকে আনন্দে ভরিয়ে তুলবার জন্য ভ্রাতার চেষ্টার বিরাম ছিল না। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও কুমুদিনী যেন দৈবেই বিশ্বাসী হয়ে পড়েছে। সে বুঝেছে, এ জগতে দৈবের ক্ষেত্রে যুক্তির সুসংগতি, বুদ্ধির কর্তৃত্ব, ভালো মন্দর নিত্যতত্ত্ব নেই। তাই তার মুখে সর্বদাই একটা করুণা। "ও জানে, বিনা অপরাধেই ও লাঞ্ছিত। আট বছর হল সেই লাঞ্ছনাকে একান্ত সে নিজের বলেই গ্রহণ করেছিল।"

অন্তরের মধ্যে এই নিরবচ্ছিন্ন বিষণ্ণতা চিত্তকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং অভিমানী করে তোলে, ফলে সামান্য আঘাতেই চিত্ত ব্যথিত হয় এবং জীবনে দুঃখভোগের অনেক উপলক্ষ্য সৃষ্টি হয়ে যায়। কুমু-র জীবনেও তাই ঘটেছিল এবং সেই দুঃখভোগের মধ্যদিয়েই ঘটেছিল তার জীবনের ট্র্যাজেডি।

কুমু-র এই আন্তরিক বিষণ্ণতার সঙ্গেই যুক্ত হয়েছিল তার চরিত্রের স্বভাবগত নিঃসঙ্গতা। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, "কুমু স্বভাবতঃই মনের মধ্যে একলা। পর্বতবাসিনী উমার মতোই ও যেন এক কল্পতপোবনে বাস করে, মানস সরোবরের কূলে। এই রকম জন্ম-একলা মানুষদের জন্যে দরকার মুক্ত আকাশ, বিস্তৃত নির্জনতা এবং তারই মধ্যে এমন একজন কেউ, যাকে নিজের সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে ভক্তি করতে পারে। নিকটের সংসার থেকে এই দূরবর্তিতা মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ নয় বলে মেয়েরা এটা একেবারেই পছন্দ করে না। তারা এটাকে হয় অহংকার, নয় হৃদয়-হীনতা বলে মনে করে। তাই দেশে থাকতেও সঙ্গিনীদের মহলে কুমুদিনীর বন্ধুত্ব জমে ওঠেনি।"

কুমু-র জীবনের ট্র্যাজেডির অনেকটাই তার এই নিঃসঙ্গতার বিশেষত্বের কারণে সংঘটিত হয়েছে। সংসারের মধ্যে থেকেও যে সে সংসার থেকে দূরবর্তী, এটা তার স্বামীগৃহে শেষ পর্যন্ত কেউই আর অনুমোদন করতে পারেনি। অন্যদের সঙ্গে তার স্বামীও তাকে ভুল বুঝলো, তাকে অহংকারী ও হৃদয়হীন বিবেচনা করল। তার এই বিশিষ্টতার জন্য তার পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল "এমন একজন কেউ যাকে নিজের সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে ভক্তি

করতে পারে।" মন-প্রাণ দিয়ে ভক্তি করতে পারার মতো সেই একজন কুমু-র বিবাহ পূর্ববর্তী জীবনে ছিলেন বিপ্রদাস। কিন্তু বিবাহের পরে তার স্বামীর মধ্যে সে মন-প্রাণ দিয়ে ভক্তি করতে পারার মতো প্রত্যাশিত গুণাবলী খুঁজে পেল না। সুতরাং তার নৈবেদ্য ভক্তি তার কাছে হয়ে উঠল বোঝার মতো, এবং তা তার নিঃসঙ্গতাকে ক'রে তুলল অসহনীয়। মানুষ তার সমস্ত প্রকার নিঃসঙ্গতার মধ্যেও তার চিত্তবৃত্তিকে চরিতার্থ করার জন্য একটা না একটা অবলম্বন খুঁজবেই। সেই অবলম্বন খুঁজে না পেলে বিড়ম্বিত চিত্তবৃত্তির যন্ত্রণায় তার অন্তরাত্মা কেঁদে উঠবেই। কুমুদিনীর জীবনে এইটাই হয়েছিল। বিবাহের পরে সে তার ভক্তিকে অর্পণ করবার কোনো অবলম্বন খুঁজে পেল না, এবং তাতেই তার জীবনের শোচনীয় শূন্যতা তার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল, ব্যর্থ-জীবনের মর্মান্তিক হাহাকারধ্বনির মধ্য দিয়ে তার জীবনের ট্র্যাজেডির রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

আকস্মিক ধনগৌরবে প্রমত্ত মধুসূদনের জীবনাদর্শ ও রুচিবোধের সঙ্গে কুমুদিনীর জীবনাদর্শ ও রুচিবোধের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী জেনে বিপ্রদাস মধুসূদনের সঙ্গে কুমুদিনীর বিবাহ প্রস্তাবে প্রথমতঃ সায় দিতে পারেননি। এবং কুমুদিনীকেও তিনি ঝোঁকের মাথায় সিদ্ধান্ত না নিতেই পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু অনেক ভাবনা চিন্তার পর এবং কুমুদিনীর মধ্যে অনুকূল ভাবাবেগ লক্ষ্য করে তিনি শেষ পর্যন্ত এই বিবাহ প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন। কুমুদিনীর এই সময়কার ভাবাবেগকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, "আপন মনগড়া মানুষের সঙ্গে মিলনের আনন্দ ওকে অহরহ পুলকিত করে রাখে। শরৎকালের সোনার আলো ওর সঙ্গে চোখে চোখে কথা কইছে, কোন্ এক অনাদিকালের মনের কথা। শোবার ঘরের সামনের বারান্দায় কুমু মুড়ি ছড়িয়ে দেয়, পাখিরা এসে খায়; রুটির টুক্‌রো রাখে, কাঠবিড়ালি চঞ্চল চোখে চারিদিকে চেয়ে দ্রুত ছুটে এসে লেজের ভর দিয়ে দাঁড়ায়, সামনের দুই পায়ে রুটি তুলে ধরে কুটুর কুটুর করে খেতে থাকে। কুমুদিনী আড়াল থেকে আনন্দিত হয়ে বসে দেখে। বিশ্বের প্রতি ওর অন্তর আজ দাক্ষিণ্যে ভরা।...ওর যৌবনমন্দিরে আজ যে দেবতার বরণ হচ্ছে ভাবঘন রসের রূপটি তার, কৃষ্ণ রাধিকার যুগল রূপের মাধুর্য তার সঙ্গে মিশেছে। বাড়ির ছাদের উপর এসরাজটি নিয়ে ধীরে ধীরে বাজায়, ওর দাদার সেই ভূপালী সুরের গানটি :

আজু মোর ঘরে আইল পিয়রওয়া
রোমে রোমে হরখীলা।"

স্বামীর সংসারে সফল প্রতিষ্ঠালাভের জন্য এইভাবে কুমুদিনী মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত হয়ে উঠছে, এ বিষয়ে কোনো ভুল যাতে সে করে না বসে সে সম্পর্কে তার কঠোর সতর্কতা। সে নিজের আদর্শে কল্পনা করছে তার স্বামী-গৃহ, তার মাঝে স্বামীর প্রতি ভক্তি, পূজা, সেবা নিয়ে সতীলক্ষ্মীরূপে তার প্রতিষ্ঠা। তার বিবেচনায় তার মায়ের পুণ্যচরিতও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন ছিল না, কারণ তিনি স্বামীর অপরাধে কিছুকালের জন্যও ধৈর্য হারিয়ে ছিলেন। কুমুদিনীর প্রতিজ্ঞা সে কখনোও সে ভুল করবে না।

স্বামীগৃহে সফল প্রতিষ্ঠার জন্য এমন সুন্দর প্রস্তুতি যে কোনো কাজেই লাগবে না, তা বোঝা গেল বিবাহ অনুষ্ঠান থেকেই, এবং সেই থেকেই সুরু হল কুমুদিনীর ট্র্যাজিক মর্মযন্ত্রণা।

বিবাহ-অনুষ্ঠানের কয়েকদিন পূর্ব থেকেই মধুসূদনের অর্থপ্রাবল্যের যে স্থূল বিলসন স্পৃহা নুরনগরে (কুমুদিনীদের পৈতৃক গ্রাম) উৎকটভাবে প্রকাশিত হ'ল তাতেই কুমুদিনীর স্বামীগৃহমুখী অনুকূল চিত্ত অনেকখানি দমে গেল। স্বামী সম্পর্কে নিজের অভিরুচি অনুসারে কুমুদিনী যে একটি মূর্তি কল্পনা করেছিল, সেই মূর্তিটিকে সে আপাততঃ মধুসূদনের আয়োজিত অর্থপ্রাচুর্যের নিদর্শন স্বরূপ, বিলাতী ব্যাণ্ডের বাজনা, গোরানাচ এবং বিপ্রদাসের প্রতি বিদ্রূপাত্মক তথাকথিত শিষ্টাচারের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেল না। ফুল যেমন তার বিকাশোন্মুখ সমগ্র হৃদয় নিয়ে বসন্ত পবনের প্রতীক্ষা করে, বাঁশি যেমন করে তার সমস্ত রন্ধ্রপথে ব্যাকুল আবেগ সঞ্চারিত ক'রে বাদকের ওষ্ঠস্পর্শের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে, তেমনি সেও তার হৃদয়ের পবিত্রতম, মধুরতম অর্ঘ্য নিয়ে আদর্শ দয়িতের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু যা প্রকৃত পক্ষে ঘটল, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। সুতরাং এর পর কুমুদিনীর জন্য এক আশঙ্কাজড়িত প্রতীক্ষা ও অন্তর্গূঢ় ভাব-বিপর্যয় নীরবে স্তব্ধ হয়ে থাকল।

মধুসূদনের স্থূল জীবনবোধ, অনুভূতিবিহীনতা, প্রশ্নাতীত-প্রভুত্ব-লালসার পরিচয় কুমুদিনী মধুসূদনের সঙ্গে স্বামীগৃহে যাত্রাপথেই পেল। কুমুদিনীর আঙুলে বিপ্রদাসের উপহার একটি নীলার আংটির উপর মধুসূদনের কোপদৃষ্টি পড়ল। নীলা সম্পর্কে মধুসূদনের একটা আক্রোশ ছিল। কিন্তু দাদার উপহার হিসেবে এটার প্রতি কুমুর ছিল বিশেষ একটা মমতা এবং দুর্বলতা। মধুসূদন তা বুঝবে না। সে প্রায় জোর করেই কুমুর হাত থেকে আংটিটি

খুলিয়ে ফেলল। কুমু আরো শুনল মধুসূদনের প্রভুত্বকামী কণ্ঠের তিরস্কার: "এই সামান্য জিনিসটার উপরে এত দরদ কেন? তোমার তো জেদ কম নয়।" আর কুমুদিনী গভীর দুঃখে অনুভব করল, "মধুসূদনের আওয়াজটা খরখরে; কানে বাজে, যেন বেলে-কাগজের ঘর্ষণ। কুমুদিনীর সমস্ত শরীরটা রী রী করে উঠল।"

কুমুদিনী মধুসূদনের মধ্যে তার শ্রদ্ধেয় দয়িতকে খুঁজে পাচ্ছে না এবং স্বামীগৃহের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কোথাও তার কল্পনা ও প্রার্থনার লেশ মাত্রও চোখে পড়ছে না। ফলে তার চতুর্দিকে সে যা কিছু দেখছে, তার মন সে সব কিছুর বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। এতকাল ধরে সে যা কিছু সংকল্প ক'রে এসেছে, তার বিদ্রোহী মন সম্পূর্ণ তার উল্টো দিকে চলে যাচ্ছে। কিন্তু এটা যেন তার নিজের কাছেই নিজের অপমান। তার মনকে শাসন করা দরকার, যাতে সে স্বামীগৃহে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, তার যৌবনের সমস্ত স্বপ্ন ও ব্রত যেন ব্যর্থ হয়ে না যায়। তাই সে আকুল হয়ে তার ভাগ্যদেবতার কাছে অসহায়ের মতো প্রার্থনা করতে থাকে: ঠাকুর, বল দাও, বল দাও, আমার জীবন কালি করে দিয়ো না। আমি তোমার দাসী, আমাকে জয়ী করো; সে জয় তোমারই।

কুমুদিনীর বিধবা বড়ো জা শ্যামাসুন্দরী কুমুদিনীর মনে এই সময় মধুসূদনের বেশী বয়স এবং রূঢ় স্বভাব সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে তার মনকে বিষিয়ে দিতে চাইল। কুমুদিনী একথা শুনে খুব জোর করে নিজেকে যেন বলতে লাগল, স্বামীর বয়স বেশি বলে তাঁকে ভালো বাসিনে, একথা কখনোই সত্য নয়— লজ্জা লজ্জা! এযে ইতর মেয়েদের মতো কথা।' তার মনে পড়ে শিবের সঙ্গে সতীর বিয়ের কথা। শিবনিন্দুকেরা শিবের বয়স নিয়ে খোঁটা দিয়েছিল, কিন্তু সে কথা সতী কানে নেন নি। কুমুদিনী এই সতী হয়েই উঠতে চায়। কিন্তু তার শিব কোথায়?

আর তাছাড়া এখানেই কুমুদিনীর সবচেয়ে বড়ো ভুল। তার ট্র্যাজেডির সমস্ত কারণ এখানেই নিহিত। "সাধারণতঃ যে ভালোবাসা নিয়ে স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ সত্য হয়, যার মধ্যে রূপগুণ দেহমন সমস্তই মিলে আছে, তার যে প্রয়োজন আছে, এ কথা কুমু ভাবেও নি।" তাই মধুসূদনের সঙ্গে কুমুদিনীর বিবাহে এই গুরুতর অসঙ্গতির প্রশ্নটা বিপ্রদাস কুমুদিনীর সম্মুখে বারবার তুলে ধরা সত্ত্বেও কুমু তাতে কর্ণপাত করে নি। আজ সেই ভুলের পরিণাম তাকে সমস্ত জীবন দিয়ে ভুগতে হচ্ছে।

স্বামীগৃহে এসে তার এই ভুলটা যতই তার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল, ততই সে তার 'সতী'ত্বের তত্ত্বকে আরো কঠিন এবং জীবন-সম্পর্ক-শূন্য করে তুলতে লাগল। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, "মধুসূদনকে যতই সে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করতে বাধা পায়, ততই তার দেবতাকে দিয়ে সে তার স্বামীকে আবৃত করতে চায়। স্বামীকে উপলক্ষ্য করে আপনাকে সে দান করছে তার দেবতাকে। দেবতা তাঁর পূজাকে বড়ো কঠিন করেছেন, এ প্রতিমা স্বচ্ছ নয়, কিন্তু এই তো ভক্তির পরীক্ষা।—মধুসূদনের অত্যন্ত রূঢ় যে পরিচয় সে পেয়েছে তাকে কিছুই নয় বলে জলের উপরকার বুদ্‌বুদ্‌ বলে উড়িয়ে দিতে চায়—চির-কালের যিনি সত্য, সমস্ত আবৃত করে তিনিই আছেন, ওর নাহি কোহি, ওর নাহি কোহি।"

কিন্তু কুমুদিনী ভেবে দেখল না, তার এই জীবন-সম্পর্ক-শূন্য স্বামীভক্তি এবং সতীব্রত মধুসূদনের স্থূল লালসা এবং রূঢ় প্রভুত্ব কামনার কাছে রক্ষা পাবে কি না। এবং বস্তুতঃ সেইখানেই কুমুদিনীর যাবতীয় জীবনযন্ত্রণা। মধুসূদন যদি এ ব্যাপারে কুমুদিনীর চিত্তবৃত্তির অনুকূল হ'ত তবে কুমুদিনীর কোনো সমস্যাই দানা বাঁধত না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের কাছে কুমুদিনী সুকুমার চিত্তবৃত্তির কোনো মূল্যই ছিল না। সে কুমুদিনীকে চেয়েছে, কুমুদিনী যে জমিদার বংশের মেয়ে, সেই চাটুজ্যে পরিবারকে অপদস্থ করতেই প্রথমতঃ, এবং দ্বিতীয়তঃ তার ধনস্ফীত মর্যাদাকে বংশানুক্রমিক ক'রে যাবার আকাঙ্ক্ষায়। স্ত্রীর বিশিষ্ট ভালোবাসা, দাম্পত্য জীবনের সূক্ষ্ম মাধুর্য—এ সবের প্রতি মধুসূদনের কোনো আগ্রহ ছিল না। তাই কুমুদিনীর মধ্যে সে তার স্থূল লালসার উপযুক্ত সাড়া এবং প্রভুত্বের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি না পাওয়ায়, সহজেই বিধবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ শ্যামাসুন্দরীর মধ্যে নিজের ঈপ্সিত বিকল্পকে পেয়ে যায়। এইখানেই কুমুদিনীর সবচেয়ে বড়ো মার,—এইখানেই তার ভাগ্যদেবতার নিষ্করুণ পরিহাস। তাই যে দেবতার কাছে কুমুদিনীর আকুল প্রার্থনা, সেই দেবতা সম্পর্কে মোতির মা-র কথাই ঠিক : "দেবতার মুখে ছাই! যে-দেবতা ওর বিপদ ঘটিয়েছে সেই নাকি ওকে উদ্ধার করবে! হায় রে!"

সাংসারিক জীবনে মানুষকে অনেক ক্ষেত্রেই বাধ্য হয়ে সঙ্কীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিতে হয়, কিন্তু সেজন্য মানুষকে সাধারণভাবে সঙ্কীর্ণ-চিত্ত মনে করে নিন্দা করা চলে না। কিন্তু মধুসূদনের সঙ্কীর্ণ চিত্ততার পরিচয় কুমুদিনী এমন সব

ক্ষেত্রে পেল, যা অভাবনীয়। মনে হ'ল, এই সঙ্কীর্ণ চিত্ততা মধুসূদনের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কিন্তু কুমুদিনীর পক্ষে নিরতিশয় লজ্জার। কুমুদিনীর দাদার দেওয়া যে নীলার আংটিটি কুমুদিনী মধুসূদনের নির্বন্ধাতিশয্যে আঙুল থেকে খুলে একটি থলির মধ্যে রেখে দিয়েছিল, সেই আংটিটি মধুসূদন গোপনে অপহরণ করে নিল, কারণ এ বাড়িতে কুমুদিনীর স্বতন্ত্র জিনিস বলে কিছুই নেই, সবকিছুই মধুসূদনের মালিকানা-ভুক্ত। মধুসূদনের এই মালিকী ব্যবস্থায় কোনো শিশুর পক্ষেও কোনো আকর্ষনীয় জিনিস সম্পর্কে লোভ করা চলে না। কুমুদিনী একটা কাঁচের কাগজ চাপা হাবলুকে দিয়েছিল আদর ক'রে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মধুসূদন হাবলু-র হাতে সেটা দেখতে পেয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল, এবং স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, এ বাড়িতে কুমুদিনীর স্বাতন্ত্র্য বলেও কিছু নেই। মধুসূদনের এই সঙ্কীর্ণ-চিত্ততা কুমুদিনীর মনকে বিতৃষ্ণায় ভরে দিল, সে বুঝল, এখানে তরে স্থান সম্মানের নয়, বরং নিরতিশয় অসম্মানের এবং লজ্জার। তাই নিজের সম্মান নিজের কাছে রক্ষা করবার জন্য সে নিজেকে নির্বাসিত করল মধুসূদনের শয়ন কক্ষ থেকে ফরাশখানায়। কুমুদিনীর এই আত্মমর্যাদা মধুসূদনের কাছে অপ্রত্যাশিত। ক্রোধে-আক্রোশে নিঃসঙ্গ শয়নকক্ষে সে দগ্ধ হতে থাকল। সে কুমুদিনীর অনুপস্থিতিতে তার পুঁতি গাঁথা থলিটি খুলল, প্রথমে বেরুল বিপ্রদাসের আশীর্বাদী টেলিগ্রাম, তারপর কুমুর দুই দাদার ছবি, এবং তারপর বিপ্রদাসের হাতে লেখা গীতার একটি শ্লোক। বস্তু সামান্য। এর বাজার মূল্য কিছুই নেই, কিন্তু কুমুদিনীর কাছে এগুলো যে অপরিমিত ঐশ্বর্য, তা এগুলির সযত্ন রক্ষণের মধ্য দিয়েই মধুসূদন বুঝল। ঈর্ষায় তার মন ক্ষত বিক্ষত হতে লাগল। "দাঁতে দাঁত লাগিয়ে বিপ্রদাসকে মনে মনে লোপ করে দিলে। সেই লুপ্তির দিন একদা আসবে ও নিশ্চয় জানে—অল্প অল্প করে স্ক্রু আঁটতে হবে ; কিন্তু কুমুদিনীর যে উনিশটা বছর মধুসূদনের আয়ত্তের বাইরে, সেইটে বিপ্রদাসের হাত থেকে এই মুহূর্তেই ছিনিয়ে নিতে পারলে তবেই ও মনে শান্তি পায়।"

কুমুদিনীর এই উনিশটা বছরের শিক্ষা, রুচি ও মূল্যবোধের সঙ্গেই মধুসূদনের বিরোধ—উনিশটা বছরের শিক্ষা, রুচি ও মূল্যবোধকে সঙ্গে নিয়ে কুমুদিনী কিছুতেই নিজেকে মধুসূদনের সঙ্গে সমতালে চালাতে পারছে না। অন্তরের এতদিনের এত আয়োজন তার ব্যর্থ হল,—তার জীবনতরীকে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে সে জলে ভাসিয়েছিল। মধুসূদনের স্বভাব ও চরিত্রের কঠিন

পাথরে আঘাত খেয়ে সেই জীবনতরীর ভরাডুবি হল অতি দ্রুত। স্বামীকে দেয় জীবনভরা তার যে অর্ঘ্য, তা হয়ে উঠল তাঁর জীবনের বোঝা। এ বোঝাকে সে নামাবে কোথায়? কোথায় সে সমর্পণ করবে তার জীবনের অর্ঘ্য? এ অর্ঘ্য নেবার জন্য তার কাছে এখন ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ নেই। "তাই আজ এমন প্রাণপণে গাইছে, মেরে গিরিধর গোপাল, ঔর নাহি কোহি।" কিন্তু আজ যেন এ গানও তার শূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পৌঁছোচ্ছে না কোথাও। এই শূন্যতায় কুমুর মন ভয়ে ভরে উঠল। তার ভীত সন্ত্রস্ত আত্মজিজ্ঞাসা, "আজ থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনের গভীর আকাঙ্ক্ষা কি ওই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতোই কেবল সঙ্গিহীন নিঃশ্বসিত হয়ে উঠবে?'

কুমুদিনীর নিজের অবস্থা নিজের কাছে যতই অসহনীয় হয়ে উঠেছে, ততই সে চেষ্টা করেছে নিজের সম্পর্কে নিজের ভাবনার মাত্রাকে কমিয়ে দিতে। সে চেয়েছে নিজের চারিদিকে এমন একটা আবরণ তৈরী করতে, যাতে নিজের কাছে নিজের ভালোলাগা, মন্দলাগার সত্যতাটা লুপ্ত হয়ে যায়, অর্থাৎ নিজের সম্পর্কে নিজের চৈতন্য যাতে কমে যায়। কিন্তু এ বিধান চিরকালের জন্য বিধেয় হতে পারে না। তাই এই অবস্থায় মেয়েদের জন্য চাই একজন গুরু, অথবা একটি মন্ত্র। এইজন্যই কুমুদিনী তার একটি মন্ত্রকে এই সময় সর্বক্ষণই বাজিয়ে রাখতে চেষ্টা করল,—যার অর্থ,—"হে আমার পূজনীয়, তোমার কাছে আমার সমস্ত শরীর প্রণতঃ করে এই প্রসাদটি চাই যে, পিতা যেমন করে পুত্রকে, সখা যেমন ক'রে সখাকে, প্রিয় যেমন করে প্রিয়াকে সহ্ করতে পারেন, হে দেব, তুমিও যেন আমাকে তেমনি ক'রে সইতে পার। তুমি যে তোমার ভালোবাসায় আমাকে সহ্য করতে পার, তার প্রমাণ এ ছাড়া আর কিছু নয় যে, তোমার ভালোবাসায় আমিও সমস্ত ক্ষমা করতে পারি।" "কুমু চোখ বুজে মনে মনে তাঁকে ডেকে বলে, তুমি তো বলেছ, যে মানুষ আমাকে সব যায়গায় দেখে, সেও আমাকে ত্যাগ করে না, আমিও তাকে ত্যাগ করিনে। এই সাধনায় আমার যেন একটুও শৈথিল্য না হয়।"

এর পর থেকে কুমুদিনী সকলের সঙ্গে কথায় ও কাজে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, তার এই সাধনাকে অব্যাহত রাখতে। কিন্তু তার কাছে লিখিত তার দাদার যে চিঠি মধুসূদন এতদিন লুকিয়ে রেখেছিল, সেই চিঠি উদ্ধার করতে গিয়েই ঘটল বিপত্তি। চিঠি সে চুরি করে পড়বে না, এই ছিল তার

পণ, আর সেই পণকে চিরকালের জন্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে অভিমান-বিক্ষোভে চিঠিখানি ছিঁড়ে ফেলল মধুসূদনের সম্মুখেই। সুতরাং ব্যর্থ হল তার সাধনা, এবং প্রমাণিত হল যে, একতরফাভাবে এই সাধনা বজায় থাকতে পারে না।

৩৭ পরিচ্ছেদে কুমুদিনীর জন্য মধুসূদনের চিত্ত অবনত হ'ল। তার "ধৈর্য্য সবুর মানছিল না। আজ রাত্রিরেই কুমুর মনকে ফেরাবার জন্যে উপায় প্রয়োগ করতে কার্পণ্য বা সংকোচ করতে পারলে না। এমন করে নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ সে জীবনে কখনো করেনি। সে যা চেয়েছিল তা পাবার জন্যে তার পক্ষে সবচেয়ে দুঃসাধ্য মূল্য সে দিলে। তার ভাষায় সে কুমুকে বুঝিয়ে দিলে, তোমার কাছে আমি অসংকোচে হার মানছি।"

কিন্তু এতেই কুমুদিনীর বিপদ হ'ল সবচেয়ে বেশী। কারণ সে মধুসূদনের কঠোরতার সঙ্গে পরিচিত, নম্রতার সঙ্গে নয়। কঠোরতার উত্তর সে অনেক ভাবে দিয়েছে, কিন্তু আজ এই নম্রতার উত্তর সে কি ভাবে দেবে, তা ভেবে পেল না। নম্রতার উত্তর যা দিয়ে দেওয়ার কথা, তা সে হৃদয় ভরে নিয়ে এসেছিল মধুসূদনের সম্মুখে। কিন্তু হৃদয়ের সে দান তো সবটাই স্খলিত হয়ে পড়ে গেছে, তাকে আর ধুলো থেকে কুড়িয়ে নেওয়া যায় না, আর সেই ধূলি-মলিন দান সে নিবেদনই বা করবে কি করে তার স্বামীকে? সুতরাং তার কাছে মধুসূদনের আজকের এই নম্রতা নিদারুণভাবে ট্র্যাজিক।

কিন্তু এখানেই কুমুদিনীর ট্র্যাজিক মুহূর্তটির শেষ নয়, বরং আরম্ভ। স্ত্রীর কাছে মধুসূদনের নম্রতা এই প্রথম, এবং এই শেষ। সুতরাং আজই কুমুদিনীর কাছ থেকে তার যা আদায় করবার, তা সে অবশ্যই আদায় করে নিতে নিতান্ত স্থূলভাবেই বদ্ধপরিকর। সে যদি তার উদ্দেশ্যকে কুমুদিনীর মতামত ব্যতিরেকেই চরিতার্থ করতে চায়, তবে তাতে কুমুদিনীর দুঃখ হোত কম। কিন্তু কুমুদিনীর দুর্ভাগ্য এই যে, মধুসূদনের কৃত্রিম এবং উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নম্রতা কুমুদিনীকে বাধ্য করে মধুসূদনকে শয্যায় আহ্বান করতে। জীবনের চরমতম সংকটের এই পরিস্থিতিতে "কুমুর সমস্ত গা এল ঝিম ঝিম করে—এ কী পরীক্ষা তার। কার দরজায় সে আজ মাথা কুটবে? দেবতা তো তাকে সাড়া দিলেন না। যে পথ দিয়ে সে এখানে এল সে তো একেবারেই ভুল পথ। বিছানায় বসে বসে মনে মনে সে বললে, ঠাকুর, তুমি আমাকে কখনোও ভোলাতে পার না, এখনও তোমাকে বিশ্বাস করব। ধ্রুবকে তুমিই বনে এনেছিলে, বনের মধ্যে তাকে দেখা দেবে বলে।" কিন্তু কোনো দেবতাই সহায় হলেন

না কুমুদিনীর, তার নারীজীবনের যে লজ্জাটুকু ছিল এই মুহূর্তে তার শেষ সম্বল, অদৃষ্টের প্রতিকূলতায় সেই লজ্জাকেও রক্ষা করা তারপক্ষে সম্ভব হল না। শেষ পর্যন্ত তারপক্ষে আহ্বান জানাতেই হ'ল মধুসূদনকে। মধুসূদন ভাবল, তার জিত হ'ল। মধুসূদনের দৃষ্টিতে সেটাই ঠিক, কিন্তু তার এই 'জিত'-এর বিনিময়ে কুমুদিনীকে বরণ করে নিতে হল যে কী অপরিসীম দুঃখ ও আত্মধিক্কার, তা একমাত্র কুমুদিনীর নারীজীবনই জানে। এইভাবে স্বামীগৃহে এসে কুমুদিনীর তিলে তিলে ঘটছে অসম্মান এবং নৈতিক লাঞ্ছনা। এই নৈতিক লাঞ্ছনাই কুমুদিনীর পক্ষে সবচেয়ে বেশী কষ্টকর এবং ট্র্যাজিক। অন্য সমস্ত রকম প্রতিকূলতার মধ্যেও সে প্রাণমনে প্রার্থনা করেছে, চেষ্টা করেছে নিজের রুচি ও মূল্যবোধকে বজায় রাখতে। এই রুচি ও মূল্যবোধের উপরই কেবল নির্ভর করেছে কুমুদিনীর কোনোক্রমে বেঁচে থাকা। কিন্তু সেই রুচি ও মূল্যবোধকেও নিপীড়িত করতে হচ্ছে স্ত্রীর উপর স্বামীর তথাকথিত জয়লাভ ও প্রভুত্বকে স্বীকার করতে গিয়ে। এর পর কুমুদিনীর বেঁচে থাকাটাই একটা যন্ত্রণা, বেঁচে থাকার আনন্দ তার কাছে আর কিছুই থাকল না।

মধুসূদনের পরিবারে কুমুদিনীর যা কিছু সূক্ষ্ম আনন্দ, তা সে পায় একমাত্র হাবলু-র কাছে—তার ছোট জায়ের শিশু পুত্র। তার কাছ থেকে কুমুদিনী তুচ্ছ উপহার দেওয়া নেওয়া করে পরম আনন্দে, হাবলুকে সে দেয় পূজা-পূজা খেলার ফুল সিল্কের রুমালে বেঁধে, গ্রহণ করে গুটি কয়েক তুচ্ছ এলাচ দানা। এর সূক্ষ্ম আনন্দ মধুসূদনের বোধগম্য হয় না। সে তার স্থূল আনন্দবোধ নিয়ে কদর্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয় হাবলুর সঙ্গেই, হাবলুর কাছ থেকে রুমাল কেড়ে নেয়, কুমুদিনীকে উপহার দেয় বহুমূল্য ফলদানি ভরা এলাচদানা—যার মধ্যে ধনপ্রাচুর্যের সাক্ষ্য রয়েছে, কিন্তু প্রেম নেই,—অন্তরের পরম সম্প্রীতি ও অকারণ প্রসন্নতা নেই। হাবলুর কাছে কুমুদিনীর যে আনন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কুমুদিনীর মধ্যে ফুটে ওঠে, মধুসূদন তা কুমুদিনীর কাছ থেকে কৃত্রিম উপায়ে ছিনিয়ে নিতে চায়। কিন্তু মধুসূদন কুমুদিনীর কাছ থেকে এই আনন্দ এমনিতেই পেতে পারে, পায় না যে তার কারণ, বাধা রয়েছে তার নিজের স্বভাবের মধ্যেই। মধুসূদনের স্বভাব যেমন মধুসূদনকে দাম্পত্যজীবনের সমস্ত মাধুর্য থেকে বঞ্চিত রেখেছে, তেমনি অবরুদ্ধ করে দিয়েছে কুমুদিনীরও স্বামীকে প্রকৃত আনন্দ দেওয়ার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণাকে। এই বঞ্চনা হয়তো মধুসূদনের পক্ষে যন্ত্রণার নয়, কারণ মধুসূদন দাম্পত্যজীবনের মাধুর্য সম্পর্কে

প্রচলিত সংস্কার-শূন্য, অনুভূতিহীন এবং মূঢ়। কিন্তু কুমুদিনীর পক্ষে তা শ্বাসরুদ্ধকর, অসহনীয়। সে যেন তার সমস্যার কোনো কূল-কিনারা পায় না। মধুসূদনের সঙ্গে তার প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি কথাই যেন তার সমস্যার সমুদ্রকে কেবল বিস্তৃত করছে। আকুল হয়ে সে ভাবে, "চির জীবন ধরে এমন সমুদ্রে কি তাকে সাঁতার কাটতে হবে যার কূল কোথাও নেই?" মধুসূদন ঠিকই বলেছে, তাদের সঙ্গে কুমুদিনীর চালচলনের তফাত। কিন্তু সে তফাৎ কুমুদিনীর কাছে ততটা দুঃসহ নয়। তার কাছে সবচেয়ে দুঃসহ হচ্ছে এই অসীম সমস্যার সমুদ্রে নিঃসহায়ভাবে অনন্তকাল ধরে সাঁতার কাটার শোচনীয় ভয়াবহতা। এর কোনো উপায় সে কোনো দিকে খুঁজে পায় না।

এর মাঝে একদিন ছোট-ভাই নবীনের চক্রান্তে কুমুদিনীর প্রতি মধুসূদনের মনোভাবের পরিবর্তন হয়ে গেল, তার সমস্ত চিত্ত অনুকূল হয়ে উঠল কুমুদিনীর আনন্দ বিধানে। কুমুদিনীর যে নীলার আংটিটি মধুসূদন এতদিন মূর্খের মতো লুকিয়ে রেখেছিল, আজ সেটা সানন্দে সে কুমুদিনীর হাতে পরিয়ে দিল, বলল, "ভুল করেছিলুম তোমার হাতের আংটি খুলে নিয়ে।" শুধু তাই নয়, কুমুদিনীদের গ্রামের কালুদা বা কালু মুখুজ্জে এসেছিল সেখানে কোনো একটা কাজে। মধুসূদন তার সঙ্গে কুমুদিনার দেখা করবারও ব্যবস্থা করেছিল। এই সমস্ত অপ্রত্যাশিত ঘটনায় কুমুদিনীর মন খুশিতে ভরে উঠল। কিন্তু এই খুশিভাবের অবদান আজ কুমুদিনীর জীবনে কতটুকু? আজ তার এই মরুভূমিজীবনে খুশিভাবের এক পশলা মাত্র বৃষ্টি তার জীবনের জ্বালাকে কতটুকু দূর করবে? সুতরাং তার জীবনের অসীম দুঃখের পরিপ্রেক্ষিতে আজকের এই খুশিভাবটা যেন তার দুঃখের গভীরতা এবং অনিবার্যতাকেই প্রকারান্তরে তার মনের মধ্যে ঘনিয়ে তুলছে,—তাকে নিষ্করুণভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে, জীবনের কত সহজ আনন্দ থেকে সে কত কঠিনভাবে দূরে অপসৃত হয়েছে,—কি হ'তে পারত, আর কি হল না!

কুমুদিনীর এই ট্র্যাজেডিকে খুব নিপুণভাবে অল্প ক'টি কথায় বর্ণনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, "আজ মনটা বাপের বাড়ির স্মৃতিতে ভরা। এতদিনে নূর নগরে খিড়কির বাগানে আমের বোল ধরেছে। কুসুমিত জামরুল গাছের তলায় পুকুরধারের পাতালে কত নিভৃত মধ্যাহ্নে কুমু হাতের উপর মাথা রেখে এলোচুল ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে কাটিয়েছে—মৌমাছির গুঞ্জনে মুখরিত, ছায়ায় আলোয় খচিত সেই দুপুর বেলা। বুকের মধ্যে একটা অকারণ ব্যথা লাগত,

জানত না তার অর্থ কী। সেই ব্যথায় সন্ধ্যেবেলাকার ব্রজের পথের গোখুর-ধূলিতে ওর স্বপ্ন রাঙা হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারে নি যে, ওর যৌবনের অপ্রাপ্ত দোসর জলে স্থলে দিয়েছে মায়া মেলে, ওর যুগল রূপের উপাসনায় সেই করেছে লুকোচুরি, তাকেই টেনে এনেছে ওর চিত্তের অলক্ষ্য পুরে এসরাজে মুলতানের মিড়ে-মূর্ছনায়। ওর প্রথম যৌবনের সেই না-পাওয়া মনের মানুষের কত আভাস ছিল ওদের সেখানকার বাড়ির কত জায়গায়, সেখানকার চিলে কোঠায়, যেখান থেকে দেখা যেত গ্রামের বাঁকা রাস্তার ধারে ফুলের আগুন-লাগা সরষে খেত, খিড়কির পাঁচিলের ধারের সেই ঢিবিটা যেখানে বসে পাঁচিলের ছ্যাতলা পড়া সবুজে-কালোয় মেশা নানা রেখায় যেন কোন্ পুরাতন বিস্মৃত কাহিনীর অস্পষ্ট ছবি—দোতালায় ওর শোবার ঘরের জানালায় সকালে ঘুম থেকে উঠেই দূরের রাঙা আকাশের দিকে সাদা পালগুলো দেখতে পেত দিগন্তের গায়ে গায়ে চলেছে যেন মনের নিরুদ্দেশ-কামনার মতো। প্রথম-যৌবনের সেই মরীচিকাই সঙ্গে সঙ্গে এসেছে কলকাতায় ওর পূজার মধ্যে, ওর গানের মধ্যে। সেই তো দৈবের বাণীর ভান করে ওকে অন্ধভাবে এই বিবাহের ফাঁসের মধ্যে টেনে আনলে। অথচ প্রখর রৌদ্রে নিজে গেল মিলিয়ে।"

এইটেই কুমুদিনীর ট্র্যাজেডি। যৌবনের মায়া দৃষ্টিতে যে মরীচিকাকে সে দেখেছিল, সেই মরীচিকা আজ তার দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিত, কিন্তু সেই মরীচিকার টানে সে নিজে এসে পড়েছে এক বিরাট মরুভূমির মধ্যে, যেখান থেকে তার আর উদ্ধার নেই। এই মরুভূমির দাম্পত্য-জীবনে স্বামীর নম্রভাবের আজ এক পশলা বৃষ্টিতে সে কতখানি আশ্বস্ত হতে পারে? এটা কি তার পক্ষে এক নবতর মায়ার-বিড়ম্বনা নয়? তাই সে কিছুতেই পরিপূর্ণ প্রসন্নতা নিয়ে স্বামীর সম্মুখে আত্মাবিকাশ করতে পারছেনা। দ্বিধা এবং সংকোচ তাকে টেনে রাখছেই। তাই মধুসূদন যখন কুমুদিনীর হাতে এসরাজের বাজনা শুনে পুলকিত চিত্তে নিতান্ত অনুনয় করেই বলল, "বড়ো বউ তুমি আমার কাছে কিছু চাও। যা চাও তাই পাবে,"—তখন এমন কিছু চাইতে কিছুতেই কুমুদিনীর মন উঠল না, যাতে মধুসূদন খুশি হয়ে যায়। সে শুধু বলল, "মুরলী বেয়ারাকে একখানা শীতের কাপড় দিতে চাই।"

মাথার মুকুট যে দিতে এসেছে, তার কাছে এই তুচ্ছ প্রার্থনায় দাতা নিজেকে অপমানিত বোধ করল। "যে স্রোতে কুমুর মন ভেসেছিল সে গেল

হঠাৎ বন্ধ হয়ে, মধুসূদনের মনে আত্মত্যাগের যে ঢেউ চিত্তসংকীর্ণতার কূল ছাপিয়ে উঠেছিল, তাও সামান্য বেহারার জন্য তুচ্ছ প্রার্থনায় ঠেকে গিয়ে আবার তলায় গেল নেমে। এর পরে সহজে কথাবার্তা কওয়া দুই পক্ষেই অসাধ্য।" এইভাবে একটি একটি করে ট্র্যাজিক দুর্ঘটনা ঘটছে কুমুদিনীর জীবনে তার দুর্ভাগ্য-ক্রমে।

কুমুদিনীর মনের মধ্যে একটা নৈতিক সততাবোধ ছিল। সেই সততা-বোধের জন্যই মধুসূদনের নম্রতায়, অনুকূলতায় তার এত সংকট। সংকট এইখানে যে, মধুসূদন তার নম্রতা এবং অনুকূলতার বদলে কুমুদিনীর কাছে যা চায়, তা কুমুদিনী ইচ্ছে করলেও দিতে পারে না। তার হৃদয় হয়ে গেছে দেউলে। তাই মধুসূদনের কাছে দান গ্রহণ ক'রে ঋণ বাড়াতে তার এত দ্বিধা এবং সংকোচ। এবং এই সংকোচের জন্যই মধুসূদনের নম্রতা তার কাছে সংকট সৃষ্টি করে। নিজের এই অবস্থা সম্পর্কে কুমুদিনী নিজেও যথেষ্ট সচেতন। ছোট জা মোতির মা-র কাছে সে স্পষ্ট করেই বলে, "আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছি আমার ভিতরটা শূন্য। সেই ফাঁকটাই দিনে দিনে ধরা পড়বে। সেই জন্যেই হঠাৎ যখন দেখি উনি (স্বামী) খুশি হয়েছেন, আমার মনে হয়, উনি বুঝি ঠকেছেন।" এইখানেই কুমুদিনীর সততা-বোধ। স্বামীর প্রতি তার কোনো স্বাভাবিক প্রসন্নতা নেই, তাই কোনো কৃত্রিম প্রসন্নতা বা অভিনয়ের দ্বারা সে স্বামীকে খুশি করতে পারে না, কারণ তা হ'লে স্বামীকে প্রবঞ্চনা করা হবে। কুমুদিনীর এই সততাবোধ একদিক থেকে যেমন প্রশংসনীয়, তেমনি অন্যদিক থেকে তারপক্ষে ক্ষতিকারক, কারণ এর জন্যই তার দাম্পত্য সুখ একেবারেই অনায়ত্ত থেকে গেল।

এই সততাবোধের জন্যই কুমুদিনী মোতির মার কাছে স্বীকার করতে পেরেছে স্বামীকে ভালোবাসতে না পারার কথা। মোতির মা যখন তাকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি বড়ো ঠাকুরকে ভালোবাসতে পারবে না মনে কর?" তখন কুমুদিনী সখেদে বলল, "পারতুম ভালোবাসতে। মনের মধ্যে এমন কিছু এনেছিলুম যাতে সবই পছন্দমত করে নেওয়া সহজ হত। গোড়াতেই সেইটেকে তোমার বড়ো ঠাকুর ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। আজ সব জিনিস কড়া হয়ে আমাকে বাজছে। আমার শরীরের উপরকার নরম ছালটাকে কে যেন ঘষড়ে তুলে দিল, তাই চারিদিকে সবই আমার লাগছে, কেবলই লাগছে, যা কিছু ছুঁই তাতেই চমকে উঠি, এর পরে কড়া পড়ে

গেলে কোনো একদিন হয়তো সয়ে যাবে, কিন্তু জীবনে কোনোদিন আর আনন্দ পাব না তো।"

জীবনে কোনোদিন আর আনন্দ না পাবার এই যে আশঙ্কা, এটা কুমুদিনীর সমস্ত গুণাবলী এবং দুঃখ কষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে বড়োই করুণ এবং তার জীবনের ট্র্যাজেডির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

স্বামীর প্রতি স্বাভাবিক ভালোবাসার উৎসমুখ যখন স্বামীর ব্যবহারেই কুমুদিনীর চিত্তে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে চিরকালের মতো, তখন কুমুদিনী আর মধুসূদনের ভালোবাসার স্ত্রী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতে পারে না। এখন তার একমাত্র সাধনা, স্বামীকে স্বাভাবিকভাবে ভালো না বেসেও কিভাবে ভালো স্ত্রী হওয়া যায়,—সতীব্রত পালন করে চলা যায়, তাই। কিন্তু ভালোবাসা বাদ দিয়ে সতীব্রত পালন করা এক দুঃসাধ্য কঠিন ব্যাপার। যে কোনো সময়ই তার অন্তঃসারশূন্য বীভৎসতা প্রকাশিত হয়ে পড়তে পারে এবং তা দাম্পত্য জীবনের সমস্ত আব্রুকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই এক চরম বিপর্যয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারে। কুমুদিনীর জীবনেও ঠিক তাই ঘটল।

মধুসূদন কুমুদিনীর প্রতি আন্তরিক করুণা ও সহানুভূতি নিয়ে শয়নগৃহে এসেছে কুমুদিনীকে তার দাদার শুশ্রূষা উপলক্ষ্যে কয়েকদিনের জন্য পিতৃগৃহে যাবার অনুমতি দিতে। ঐ রাত্রিতে মধুসূদনের অফিস ঘরে শয়নের কথা ছিল। তাই কুমুদিনী আগে থেকেই নিদ্রামগ্ন। মধুসূদনের আগমনেও তার ঘুম ভাঙলো না। মধুসূদন সশব্দে বিছানার উপর উঠে বসল। তখন কুমুদিনী চমকে উঠে বসল—এবং তার মুখে এমন একটা ভাব প্রকাশিত হল, যা মধুসূদনের বুকের মধ্যে যেন একেবারে শেল বিঁধিয়ে দিল। তার মাথায় রক্ত চড়ে গেল, বলে উঠল, "আমাকে কোনোমতেই সইতে পারছ না, না?"

ভালোবাসা বিহীন সতীব্রত উদ্‌যাপনে এইভাবে শোচনীয় ব্যর্থতার সম্মুখীন হ'ল কুমুদিনী। তার ভাগ্যদেবতা তার দাম্পত্যসাধনার কোনো অংশকেই সফল হতে দিল না। এখন মধুসূদনের কাছ থেকে তার জন্য শুধু এক ক্ষমাহীন প্রত্যাখ্যান অবশিষ্ট রইল। রূঢ় ভর্ৎসনা তাকে শুনতে হল মধুসূদনের কর্কশ কণ্ঠে, "যোগ্য নও তুমি এখানকার। অনুগ্রহ করেছিলাম, মর্যাদা বুঝলে না। এখন অনুতাপ করতে হবে।" এর পরের ঘটনাই মধুসূদনের গৃহ থেকে কুমুদিনীর অনির্দিষ্টকালের জন্য বিদায়।

শত দুঃখের মধ্যেও এই বিদায়ে কুমুদিনীর পক্ষে একটা সান্ত্বনার বিষয় ছিল। কারণ, "যতবার মধুসূদন তাকে ভালোবাসা দেখিয়েছে, ততবারই কুমুর মনে একটা টানাটানি এসেছে, ভালবাসার মূল্যেই এর প্রতিশোধ করা চাই, এই কর্তব্যবোধে ওকে অত্যন্ত অস্থির করেছে। এ লড়াইয়ে কুমুর জেতবার কোনো আশা ছিল না। কিন্তু পরাভবটা কুশ্রী, সেটাকে কেবলই চাপা দেবার জন্যে এতদিন কুমু প্রাণপণে চেষ্টা করেছে। কাল রাত্রে সেই চাপা-দেওয়া পরাভবটা এক মুহূর্তে সম্পূর্ণ ধরা পড়ে গেল। কুমুর অসতর্ক অবস্থায় মধুসূদন স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছে যে কুমুর সমস্ত প্রকৃতি মধুসূদনের প্রকৃতির বিরুদ্ধ, এইটে নিশ্চিত জানা হয়ে গেল সে ভালো, তার পরে পরস্পরের যা কর্তব্য সেটা অকপটভাবে করা সম্ভব হবে। মধুসূদন ওকে কামনা করে, সেইখানেই সমস্যা; ক্ষোভের সঙ্গে ওকে যে বর্জন করতে চায় সেইখানেই সত্য। সত্যই মধুসূদনের বিছানায় শোবার অধিকার ওর নেই। শুয়ে ও কেবলই ফাঁকি দিচ্ছে। এ বাড়িতে ওর যে পদ সেটা বিড়ম্বনা।" মধুসূদন সম্পর্কে কুমুদিনী ঠিকই ভেবেছিল যে, মধুসূদন তাকে যে ভালোবাসা জানাতো, তা নিশ্চয়ই সত্য নয়। তাদের দু'জনের মনোভাবের এতই পার্থক্য যে, কুমুদিনীকে নিয়ে মধুসূদনের কিছুতেই মন ভরতে পারে না। এবং সেই জন্যই যে রাত্রিতে মধুসূদন কুমুদিনীর পিতৃগৃহে তার নির্বাসন স্থির করল, সেই রাত্রিতেই এবং তার পরের মুহূর্তেই শ্যামাসুন্দরীর স্থূল লালসার সঙ্গে তার অশালীন ঘনিষ্ঠতার মাত্রা অকস্মাৎ অত্যন্ত দৃষ্টিকটুভাবে বেড়ে গেল।

পিতৃগৃহে এসে কুমুদিনী বিপ্রদাসের কাছে স্বীকার করল তার ট্র্যাজিক ভ্রান্তি,—বিবাহের পূর্বে বিপ্রদাসের সাবধান বাণীতে যেন তার কর্ণপাত করা উচিত ছিল। সে বলল, "আমি বরাবর কেবল তোমাদের জানি এখান থেকে অন্য জায়গা যে এত বেশি তফাৎ তা আমি মনে করতে পারতুম না। ছেলেবেলা থেকে আমি যা-কিছু কল্পনা করেছি সব তোমাদেরই ছাঁচে। তাই মনে একটুও ভয় হয়নি। মাকে অনেক সময় বাবা কষ্ট দিয়েছেন জানি, কিন্তু সে ছিল দুরন্তপনা, তার আঘাত বাইরে, ভিতরে নয়। এখানে সমস্তটাই অন্তরে অন্তরে আমার অপমান।"

কুমুদিনীর আর একটা ট্র্যাজিক ভ্রান্তি ছিল এই যে, সে ভেবেছিল মীরাবাই-এর মতো স্বামী সম্পর্কে একটা আধ্যাত্মিক আদর্শকে মনের মধ্যে বজায় রেখে সমাজের স্বামীকে মন থেকে ছেড়ে দিয়ে সতীধর্ম বজায় রাখা

সম্ভব,—এবং তার মাধ্যমে সমাজের স্বামীকে সে শ্রদ্ধা করে চলতে পারবে। কিন্তু আজ অনেক দুঃখ ভোগ করার পর এ সম্পর্কে তার ট্র্যাজিক সংশয় জেগেছে, "সংসারকে ছাড়বার সেই বড়ো অধিকার কি আমার আছে?" সংসারের মধ্যে বাস ক'রে কি এইভাবে জীবন কাটানো চলে? জীবনের সমস্ত মূল্য নিঃশেষিত করে দেওয়ার পর, আজ তার মধ্যে এই সংশয় জাগছে, এবং তাতেই তার এই সংশয় এত ট্র্যাজিক।

কুমুদিনী আরো ভেবেছিল, বাস্তবের স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক যত দুঃখেরই হোক না কেন, সে তার আরাধনার মধ্যদিয়ে মনের মধ্যে ঈশ্বরকে ঠিকই লাভ করতে পারবে। কিন্তু আজ সে বুঝছে, সেটাও ভুল। সে স্বীকার করছে, "যখন সংকটে পড়লুম তখন দেখি প্রাণ আমার কেমন শুকিয়ে গেছে, এত চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতে তাঁকে (ঈশ্বরকে) যেন আমার কাছে সত্য করে তুলতে পারছিনে! আমার সবচেয়ে দুঃখ সেই।" অসীম দুঃখের পর কুমুদিনীর এই সব স্বীকারোক্তি আমাদের মধ্যে প্রবল সহানুভূতির উদ্রেক করে, এবং তাতেই এগুলি এত ট্র্যাজিক বলে মনে হয়।

বিবাহের পূর্বে কুমুদিনীর মনের মধ্যে একটা অপরাধীভাব জেগেছিল যে, সে তার আইবুড়ো দশা নিয়ে গলগ্রহ হয়ে আছে দাদার অনটনের মধ্যে। বিবাহের পরে বুকভরা দুঃখ নিয়ে স্বামীগৃহ থেকে দাদার আশ্রয়ে ফিরে এসে তার মধ্যে পুনর্বার সেই অপরাধবোধ জেগে উঠল। সে যেন স্পষ্টই বুঝতে পারল, দাদার স্নেহের পরিবেষ্টনের মধ্যেও তার পূর্বের সেই জায়গাটি যেন নেই। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে, সবারই মনে প্রতিদিন এই প্রশ্নটি রয়েছে, সে ফিরে যাচ্ছে না কেন, কী হয়েছে তার? দাদার গভীর স্নেহের মধ্যেও ওই একটা উৎকণ্ঠা সে বেশ বুঝতে পারে। সুতরাং কুমুর আজ নিশ্চিন্ত থাকার জায়গা কোথায়? স্বামীগৃহ, পিতৃগৃহ সবই তার কাছে যেন কণ্টকাকীর্ণ হয়ে উঠল,—কোনোটাই যেন আর কোনটার বিকল্প নয়,—একমাত্র বিকল্প তার কাছে এখন মরণ, কারণ মরণ কখনো কারো জন্যেই স্থান সংকোচ করে না,—সকলকেই সমানভাবে আহ্বান জানায়। এই বিকল্পকে খুঁজে নেওয়াই কুমুদিনীর সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি,—রবীন্দ্রনাথ যার সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন এই উপন্যাসের শেষের দিকে,—"কুমুর মন হাঁপিয়ে উঠে আজ পালাই-পালাই করছে সবকিছু থেকে, আপনার কাছ থেকে। কিন্তু একী বেড়া! আজ এ-বাড়িতেও মুক্তি নেই। কল্পনায় মৃত্যুকেও মধুর করে তুললে। মনে মনে

বললে, কালো যমুনার পারে, সেই কালোবরণ, চলেছি তারই অভিসারে, দিনের পর দিনে—কত দীর্ঘ পথ কত দুঃখের পথ। মনে পড়ে গেল, দাদার অসুখ বেড়েছে—সেবা করতে এসে আমিই অসুখ বাড়িয়েছি, এখন আমি যা করতে যাব তাতেই উল্‌টো হবে। দুই হাতে মুখ চেপে ধরে কুমু খুব খানিকটা কেঁদে নিলে। কান্নার বেগ থামলে স্থির করলে বাড়ি ফিরে যাবে, তা যা হয় তাই হবে—সব সহ্য করবে—শেষকালে তো আছে মুক্তি, শীতল গভীর মধুর। সেই মৃত্যুর কল্পনা মনের মধ্যে যতই স্পষ্ট করে আঁকড়ে ধরল ততই ওর বোধ হল জীবনের ভার একেবারে দুর্বহ হবে না, গুন গুন করে গাইতে লাগল—

"পথপর রয়নি আঁধেরী,
কুঞ্জপর দীপ উজিয়ারা।"

জীবন সম্পর্কে কুমুদিনীর এই হতাশা ও বৈরাগ্য, তার বিবাহ-পূর্বকালের স্বপ্ন-কল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে একেবারেই অপ্রত্যাশিত, বরং সেই স্বপ্ন-কল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত করুণ এবং সহানুভূতি উদ্রেককারী। কুমুদিনীর সমস্ত দুঃখ এবং তার পরিণামে এই হতাশা ও বৈরাগ্য আমাদের চিত্তের শোক-ভাবটিকে জাগিয়ে তোলে, এবং তাতেই আমরা তার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হই—এইখানেই কুমুদিনীর জীবনের ট্র্যাজেডির প্রকৃত কার্যকারিতা।

উপন্যাসের উপসংহার যে ভাবে হয়েছে, তাতে কুমুদিনীর ট্র্যাজেডি কোন্ পর্যায়ে গিয়ে কি রূপ লাভ করল, সে সম্পর্কে কোন ধারণাই করা যায় না। আমরা শুধু দেখলাম কুমুদিনী মধুসূদনের ভাবী বংশধরকে গর্ভে ধারণ ক'রে স্বামী গৃহে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু মধুসূদনের সংসারে মধুসূদন-শ্যামার অবাঞ্ছনীয় সম্পর্কের মধ্যে কুমুদিনীর স্থান কোথায়—এই প্রশ্ন আমাদের কল্পনা ও অনুমান-শক্তিকে পীড়িত করতে ছাড়ে না। মধুসূদন কি শ্যামার কলুষিত আসনের এক পার্শ্বেই কুমুদিনীর জন্য একটা অবহেলায় স্থান নির্দেশ করে দিয়েছে, না স্ত্রী অপেক্ষা সন্তানের জননীকে উচ্চতর মর্যাদার অধিকারিণী বলে স্বীকার করে নিয়েছে? যে অবিনাশ ঘোষালের জন্মতিথি রাশি রাশি অভিনন্দন পত্র ও পুষ্পমাল্য সম্ভারের দ্বারা ভারাক্রান্ত বলে বর্ণিত হয়েছে, সে তার পিতা-মাতার মর্মান্তিক বিচ্ছেদকে কিরূপ যোগসূত্রে বেঁধেছে, তাদের বিরোধ-বিড়ম্বিত সম্পর্কের মধ্যে কিরূপ স্থায়ী আপোষ সন্ধির ব্যবস্থা করেছে, এই সমস্ত অনুচ্চারিত কৌতূহল প্রশ্ন নীরবে অপেক্ষা করতে থাকে। এই সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রশ্নের মীমাংসা না করেই উপন্যাসটির অতর্কিত পরিসমাপ্তি আর্টের দিক থেকে

একটা গুরুতর ত্রুটি বলেই মনে হয়।[৯] এবং সেইজন্যই কুমুদিনীর ট্র্যাজেডির চূড়ান্ত পর্যায়টি আমাদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়।[১০]

তবে এ ব্যাপারে একটা বিষয় খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কুমুদিনী তার ট্র্যাজেডির মধ্যদিয়েই একটা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি লাভ করতে পেরেছে,—যেটা রবীন্দ্রনাথের লিখিত এই ধরনের ট্র্যাজেডির একটা বিশেষত্ব। একত্রিশ পরিচ্ছেদে কুমুদিনীর এই উপলব্ধিটি ব্যক্ত হয়েছে, "আজ সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে, দুঃখ যদি তাকে এমন করে ধাক্কা না দিত তাহলে সে আপন দেবতার এত কাছে কখনোই আসতে পারত না। অস্তসূর্যের আভার দিকে তাকিয়ে কুমু হাত জোড় করে বললে, "ঠাকুর, আর কখনও যেন তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ না ঘটে; তুমি আমাকে কাঁদিয়ে তোমার আপন করে রাখো।" এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি কখনো কখনো বিচলিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এইটিই তার দুঃখকষ্টের মধ্যে একটা 'ধুয়া'র মতো তার চিত্তে বজায় থেকেছে এবং শেষকালে সে যে মরণকেও একটা বিকল্প হিসেবে বরণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, তাও এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি থেকেই উদ্ভূত। রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনায় জীবনে ট্র্যাজেডির মূল্য এখানেই। সমধর্মী 'তপতী' নাটকে অথবা 'পরিত্রাণ' নাটকে,--স্বামীর প্রদত্ত মূঢ়তায় যেখানে নারীর জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটেছে,—সেখানেও নারী তার ট্র্যাজেডির মধ্যদিয়ে লাভ করেছে এই ধরনের একটা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। 'তপতী' বা 'পরিত্রাণে'র আলোচনা থেকেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

'যোগাযোগ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ দুই পরস্পরবিরোধী শ্রেণীরুচি ও মূল্য-বোধের সংঘাতের মধ্যদিয়ে একটি নারীর জীবনের ট্র্যাজেডি বর্ণনা করেছেন,

---

৯. ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, (১৩৭২) পৃঃ ১৭৬।

১০. 'রবীন্দ্র জীবনী'-কার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'শেষের কবিতা' আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'যোগাযোগে'র ট্র্যাজেডি রচনা করার পর কবিমন যে 'রিলীফ' চাইছিল, তারই ফলে 'শেষের কবিতা' রচিত হয়। তিনি বলেছেন, "যোগাযোগকে ট্র্যাজেডি ছাড়া আর কি বলিব? কুমুর যে অবস্থায় গর্ভলক্ষণ দেখা দিল, তাহা তো এক হিসাবে Legalised rape-এর অব্যবহিত ফল। কুমু কিছুতেই অন্তরের আদর্শ-র সহিত এই আকস্মিক ঘটনার সামঞ্জস্য করিতে পারিতেছিল না। তাই এত বড় ট্র্যাজেডি পড়িবার পরে অমিত-র বাক্যালাপ পাঠকের মনকে যেমন আমোদ দেয়, তেমনি মনকে খুশি করে সবাইকে জোড়ে জোড়ে মিলিতে দেখিয়া।"

দ্রষ্টব্যঃ রবীন্দ্র জীবনী, তৃতীয় খণ্ড, (১৩৫৯) পৃঃ ২৫৩।

আর "মালঞ্চ" (১৩৩৪) উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ নারীর ট্র্যাজেডিকে সেই সামাজিক পটভূমি থেকে সরিয়ে মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যার উপর স্থাপন করেছেন,—দেখিয়েছেন পুরুষের স্বভাব ও প্রেমাকাঙ্ক্ষার বৈচিত্র্য নারীর জীবনের পক্ষে কত ট্র্যাজিক হতে পারে। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে নারীর স্বভাব-বৈচিত্র্যের কারণে নারীর (এবং সেই সূত্রে পুরুষেরও) জীবনের ট্র্যাজেডি দেখানো হয়েছে, আর এখানে 'মালঞ্চ' উপন্যাসে দেখানো হয়েছে পুরুষের স্বভাববৈচিত্র্যের কারণে সেই নারীরই ট্র্যাজেডি।

রবীন্দ্রনাথ নারীর মধ্যে দু'টি জাতি লক্ষ্য করেছেন,—একটি মাতৃজাতি, অপরটি প্রিয়াজাতি। একটিতে প্রেম শান্ত, অপরটিতে উর্মিমুখর। একটিতে প্রেমের কল্যাণী রূপ, অপরটিতে প্রেমের রোমান্টিক রূপ। পুরুষের সেই উর্মিমুখর, রোমান্টিক প্রেমাকাঙ্ক্ষা যে মাতৃজাতীয়া নারীকে পাশ কাটিয়ে প্রায়ই একটা চরিতার্থতা লাভ করতে চায়, সেখানেই মাতৃজাতীয়া নারীর বেদনা। এই বেদনা একেক সময় পুরুষের রোমান্টিক প্রেমাকাঙ্ক্ষার তীব্রতা অনুসারে ট্র্যাজিক হয়েও উঠতে পারে।

'মালঞ্চ' উপন্যাসের অব্যবহিত পূর্বে রবীন্দ্রনাথের 'দুইবোন' উপন্যাস রচিত হয়। দু'টি উপন্যাসেরই কাহিনী প্রায় এক এবং দু'টি উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথ নারীত্বের এই দুই জাতিতত্ত্বকে প্রকাশ করেছেন আর বুঝিয়েছেন, পুরুষের রোমান্টিক প্রেমাকাঙ্ক্ষার তীব্রতার জন্য মাতৃজাতীয়া বিবাহিতা স্ত্রী-র জীবন কিভাবে ট্র্যাজিক হয়ে ওঠে। ১৩৪০ সালের "বিচিত্রা" পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ 'দুইবোন' উপন্যাসের বক্তব্যের যে সংক্ষিপ্তসার লিপিবদ্ধ করেছেন, তা থেকেই আমাদের উপরি-উক্ত বক্তব্যটির সমর্থন পাওয়া যায়।

ঐ পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "...সাধারণতঃ মেয়েরা পুরুষের সম্বন্ধে কেউবা মা, কেউবা প্রিয়া, কেউবা দুইয়ের মিশোল। বাংলা দেশে অনেক পুরুষ আছে যারা বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মাতৃঅঙ্কের আবহাওয়ায় সুরক্ষিত। তারা স্ত্রীর কাছে মায়ের লালনটাই উপভোগ্য বলে জানে।... ..

আবার এমন পুরুষও নিশ্চয়ই আছে যারা আর্দ্র আদরের আবেশে আপাদ-মস্তক আচ্ছন্ন থাকতে ভালোই বাসেনা। তারা চায় যুগলের অনুষঙ্গ। তারা জানে যেখানে যথার্থ স্ত্রী, পুরুষ সেখানেই যথার্থ পৌরুষের অবকাশ পায়।......

শশাঙ্ক স্ত্রীর মধ্যে নিত্য স্নেহ-সতর্ক মাকে পেয়েছিল। তাই তার অন্তর ছিল অপরিতৃপ্ত। এমন অবস্থায় ঊর্মি তার কক্ষপথে এসে পড়াতে সংঘাত লাগল, ট্র্যাজেডি ঘটলো।"

কিন্তু এই উপন্যাসে ঊর্মি শেষ পর্যন্ত শশাঙ্কের কক্ষপথ থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় পরিণামে ট্র্যাজেডিকে পরিহার করা গেছে। 'মালঞ্চে' সেই ট্র্যাজেডিকে পরিহার করা যায়নি,—'মালঞ্চে'-র সমস্যা গভীরতর এবং জটিলতর।

মৃত সন্তান প্রসব করেই 'মালঞ্চে'র নায়ক আদিত্যের স্ত্রী নীরজা কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হ'লো। "বালুশয্যাশায়িনী বৈশাখের নদীর মতো তার স্বল্প-রক্ত দেহ ক্লান্ত হয়ে রইল পড়ে। প্রাণশক্তির অজস্রতা একেবারেই হল নিঃস্ব। বিছানার সামনে জানলা খোলা, তপ্ত হাওয়ায় আসছে মুচকুন্দ ফুলের গন্ধ, কখনো বাতাবি ফুলের নিঃশ্বাস, যেন তার সেই পূর্বকালের দূরবর্তী বসন্তের দিন মৃদুকণ্ঠে তাকে জিজ্ঞাসা করছে, 'কেমন আছ'।"

সবচেয়ে বড় আঘাত নীরজা পেল, যখন দেখল বাগানের কাজে সহযোগিতার জন্য আদিত্যের দূর সম্পর্কীয় বোন সরলাকে আনাতে হয়েছে। আদিত্যের ছোটোবেলা থেকেই এই সরলা তার সঙ্গিনী। আদিত্য যখন তার মেসো-মশায়ের কাছে ফুলের বাগানের কাজ প্রথম শিক্ষালাভ করতে সুরু করেছে, তখন থেকেই সরলা তার সঙ্গে আছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কখন যে দুজনের কর্মসাহচর্য ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়েছে, তা সরলা বুঝতে পারলেও আদিত্য বুঝতে পারেনি। পরবর্তীকালে আদিত্যের সঙ্গে বিবাহ হ'ল নীরজার, যার নারী-প্রকৃতি মাতৃজাতীয়া। উচ্ছল স্বভাব, কর্মদক্ষ, প্রিয়াজাতীয়া সরলার সঙ্গে আবাল্য পরিবর্ধিত আদিত্য নীরজার সঙ্গে দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত করতে গিয়ে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি তার স্বভাবের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষার অচরিতার্থতাকে। বুঝতে পারল, যখন সে নীরজার অসুস্থতার জন্য সুদীর্ঘকাল পরে সরলাকে নিজের কাজে নিজের কাছে নিয়ে এল এবং তারই ফলে যখন নীরজার ঈর্ষ্যা আদিত্যের সঙ্গে কথায় বার্তায় বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হতে থাকল। সরলার প্রতি অসুস্থ, শয্যাবিলগ্না নীরজার ঈর্ষ্যাই আদিত্যকে তার প্রকৃত এবং অতৃপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সচেতন করে তুলল এবং আদিত্যও নীরজার প্রতি সহানুভূতি সত্ত্বেও সরলার প্রতি নিজের এই সুপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে প্রশ্রয় না দিয়ে পারল না। সুতরাং নীরজার কাছে কোনো কিছুই আর গোপন থাকল না,—ধাপে ধাপে তার বেঁচে থাকার প্রয়োজন যেতে থাকল

ফুরিয়ে। অথচ নীরজার অপরাধ কিছুই ছিল না। স্বামীর প্রতি তার সেবা ও ভালোবাসা সবই ছিল। প্রাণপণে সে স্বামীর ও তার বাগানের পরিচর্যা করেছে, স্বামীর কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য সর্বদা উদ্বিগ্ন থেকেছে। এবং এরই মধ্যদিয়ে সে নিজেকেও মনে করেছে সৌভাগ্যশালিনী। কিন্তু ভাগ্যদোষে মাত্র সে অসুস্থ, আর তার সেই আয়ত্তাতীত অপরাধের সুযোগে তার স্বামী-সৌভাগ্য যেতে থাকল হারিয়ে, শিরে করাঘাত করা ছাড়া তখন যেন তার আর করার কিছু নেই। নিরপরাধ নীরজার এই অভিমান-ক্ষুন্ন জীবনের ট্র্যাজেডিই এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ 'মালঞ্চে'।

স্বামীপ্রেম বঞ্চনার অভিমান ও বেদনা যে নীরজার জীবনে কত গভীর ছিল, রবীন্দ্রনাথ তার বহু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এই উপন্যাসে। হলধরমালী তার কাছে ভিক্ষা চেয়েছিল, "বউয়ের জন্যে একখানা পুরানো কাপড়।" নীরজা তাকে দান করল একখানা ঢাকাইশাড়ী। পরিচারিকা রোশনি আপত্তি করলে, দুঃখে অভিমানে নীরজা বলল, "হোক না ঢাকাই শাড়ি। আমার কাছে আজ সব শাড়িই সমান। কবেই বা আর পরব।"

সরলার সান্নিধ্যে আদিত্য উপেক্ষা করতে থাকে তার কতকগুলি অভ্যাসকে, যেগুলি নীরজার অতিপ্রিয়, যেমন, প্রতিদিন গৃহ থেকে নির্গত হওয়ার পূর্বে নীরজাকে একটি ফুল উপহার দেওয়া। যেদিন প্রথম আদিত্যের এই অভ্যাস-বিপর্যয় হল, সেদিন গভীর দুঃখে এবং হতাশায় নীরজা বলল, "আজ এই প্রথম হ'ল। আমার সকালবেলাকার পাওনা ফুলে ফাঁকি পড়ল। দিনে দিনে ফাঁকি বাড়তে থাকবে। শেষকালে আমি গিয়ে পড়ব আমার সংসারের আস্তাকুঁড়ে, যেখানে নিবে-যাওয়া পোড়া কয়লার জায়গা।" নীরজার বেদনা ও হতাশা যে কত গভীর তা নিজেকে এই নিবে-যাওয়া পোড়া কয়লার সঙ্গে তুলনা করার মধ্যদিয়েই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নীরজা স্বভাবতঃই মাতৃজাতীয়া, কিন্তু সন্তানহীনা। দশবছর যাবৎ তার বিবাহিত জীবনে তার সমস্ত মাতৃহৃদয় জুড়ে বিরাজ করছিল আদিত্য এবং তার বাগান। আজ অসুস্থতায় সে হৃদয়ের দু'টি অবলম্বনকেই হারাতে বসেছে। আদিত্য ক্ষিপ্রস্বভাব, রোমান্টিক পুরুষ। নীরজার প্রতি আদিত্যের আকর্ষণ তাই কমে আসা যেন অনিবার্য। মনে মনে নীরজা যেন সেটা বুঝে ফেলেছে। তাই নীরজার সমস্ত দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে বাগানের উপর, যেখানে সরলার কর্তৃত্বকে সে কিছুতেই স্বীকার করবেনা। তাই সে পদে পদে চেষ্টা

করে বাগানের প্রসঙ্গ নিয়ে সরলাকে লজ্জা দিতে,—যেন সরলা ফুলের ব্যাপারটা কিছুই বোঝে না। অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবে নীরজা ফুলের ভুল নাম বলেও দেখাতে চায়, সরলার চেয়ে সে বেশী ফুল চেনে। এ শুধু অন্যকে জ্বলিয়ে নিজের জ্বালা উপশম করার একটা করুণ প্রচেষ্টা,—যে অধিকার তার হারিয়ে যাচ্ছে, সেই অধিকার রক্ষা করবার ক্ষমতা যে তার আছে, এটা সবাইকে বুঝিয়ে দেওয়ারই একটা ট্র্যাজিক প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "নিঃসন্তান মায়ের সমস্ত হৃদয় জুড়েছে যে বাগান, দশ বছর পরে আজ এত কাছে আছে, তবু এই বাগানের থেকে নির্বাসন। চোখের সামনেই নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ।" এটা স্বাভাবিকভাবেই নীরজার পক্ষে অসহনীয়!

একটা আকস্মিক অভিশাপের মতো সরলা নীরজার জীবনে এসে তার জীবনের সাজানো বাগানকে তছনছ করে দিচ্ছে। সে চায় সরলার পাণি-প্রার্থী রমেনের সঙ্গে সরলার বিবাহ হয়ে যাক, যাতে সরলা আদিত্যের কক্ষ থেকে অপসৃত হয়ে যায়। কিন্তু সে দেখল এই বিবাহের প্রস্তাবে আদিত্যের খুব একটা উৎসাহ নেই। আদিত্যের দিক থেকে অন্ততঃ প্রকাশ্যভাবে এই উৎসাহের অভাবের কারণ হয়তো তার বাগানের লোকসানের চিন্তা, কিন্তু নীরজা তার ঈর্ষ্যাকাতর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে ঠিকই সন্দেহ করেছে আদিত্যের আপত্তি কোনখানে, আর সেই সন্দেহ করতে গিয়ে তার অন্তঃকরণ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে, বেড়ে যায় বুকের ব্যথা।

ওদের বাগানের অর্কিডের ঘরটি ওদের দাম্পত্য-জীবনের অনেক মধুময় স্মৃতিতে ভরা,—সমস্ত বাগানের মধ্যে ওই ঘরটি নীরজার জন্য বিশেষভাবে উৎসর্গীকৃত। তাই সেখানে অর্কিডের কাজ নিয়ে সরলার অনুপ্রবেশ নীরজার কাছে যেমন অসহনীয়, তেমনি বেদনার। সরলা অর্কিডের কাজ বোঝে না, সুতরাং তার ও ঘরে না যাওয়াই উচিত,—এই নিয়ে নীরজা আদিত্যের কাছে ব্যর্থ অনুযোগ করেছে। আদিত্য বুঝতে পারেনি নীরজার অন্তরের কথা, তাই সে পক্ষান্তরে প্রমাণ করেছে, সরলা অর্কিডেই সিদ্ধহস্ত। পরাজিত এবং নিরুপায় নীরজা শেষকালে তার অনুযোগের অন্তর্নিহিত কথাটি প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে নির্লজ্জভাবে, অবুঝ স্বামীর কাছে নিজ অধিকার রক্ষায় এই হীন-প্রচেষ্টা চালাতে বাধ্য হওয়ায় সে কেঁদে ফেলেছে পরম বেদনায়। সে বলল আদিত্যকে, "তোমার সমস্ত বাগানটা ওকেই দিয়ে দাওনা যদি তোমার নিতান্ত ইচ্ছে হয়, কেবল খুব অল্প একটু কিছু রেখো যেটুকু কেবল

আমাকেই উৎসর্গ-করা। এতকাল পরে অন্ততঃ এইটুকু দাবি করতে পারি কপাল দোষে না হয় আজ আছি বিছানায় পড়ে, তাই বলে"—কথা শেষ করতে পারল না নীরজা, বালিশে মুখ গুঁজে অশান্ত হয়ে কাঁদতে লাগল।

আদিত্যের স্বপ্ন যেন ঠোকর খেয়ে চমকে উঠল। বুঝতে পারল আদিত্য যে, এ কান্না অনেক দিনের। "বেদনার ঘূর্ণি বাতাস নীরজার অন্তরে অন্তরে বেগ পেয়ে উঠছিল দিনে দিনে।" কিন্তু "নির্বোধ" আদিত্য "মনে করেছিল, সরলা বাগানের যত্ন করতে পারে এতে নীরজা খুশি।"

এরপর আদিত্যের কাছে নিজের বেদনা এবং হতাশাকে গোপন করার আর কোনো কারণ থাকল না নীরজার পক্ষে। সে স্পষ্টই বলল নীরজাকে, "আমার এই ভাঙ্গা প্রাণ নিয়ে দাঁড়াব কিসের জোরে তোমার ওই আশ্চর্য সরলার সামনে। আমার সে শক্তি আজ কোথায় যে তোমার সেবা করি, তোমার বাগানের কাজ করি।"

নীরজার হৃদয়ের ক্ষতকে আদিত্য স্পষ্ট দেখতে পাওয়ায় নীরজার কপাল এবার পুরোপুরি ভাঙ্গতে সুরু করল। কারণ যেখানে নীরজার ক্ষোভ, সেখানেই আদিত্যের তৃপ্তি, যে সরলার কারণে নীরজার হৃদয়ের ক্ষত, সেই সরলার প্রতি আদিত্যের দুর্নিবার রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষা এবং এই আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে আদিত্য সম্প্রতি মাত্র সচেতন হয়েছে। সুতরাং নীরজার হৃদয়ের ক্ষত দূরীকরণের জন্য আদিত্য পরিত্যাগ করতে পারে না তার স্বভাব-জ আকাঙ্ক্ষাকে। তাই তার মধ্যে সহানুভূতির পরিবর্ত দেখা গেল ক্ষোভ। ক্ষুব্ধ হৃদয়ে সে পরিত্যাগ করল নীরজার কক্ষ, চলে গেল তার জাপানীঘরে।

রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসের নীরজা ছাড়া অন্য তিনটি মুখ্য চরিত্রকে (আদিত্য, সরলা ও রমেন) এমনভাবে চিত্রিত করেছেন যে দেখা যায় পীড়িত, মুমূর্ষু নীরজার প্রতি একটুও সহানুভূতি নেই কারো। সকলের এই নির্দয়তার পরিপ্রেক্ষিতে নীরজার ট্র্যাজেডি অনেক বেশী করুণা উদ্রেককারী হয়েছে।

রমেন নীরজার কাছে আদিত্যের উপর দাবিকে পরিত্যাগ করবার কঠিন প্রস্তাব করে: "যদি ডাক্তারের কথা সত্য হয়, যদি যাবার দিন এসেই থাকে, তাহলে যাকে বড়ো করে পেয়েছ, তাকে বড়ো করে ছেড়ে দাও। এতদিন যে গৌরবে কাটিয়েছ, সে-গৌরবকে খাটো করে দিয়ে যাবে কেন।"

রমেনের এই হৃদয় বিদারক প্রস্তাবের জবাবে বিদীর্ণ-হৃদয় নীরজা বলে, "বুক ফেটে যায় ঠাকুরপো, বুক ফেটে যায়। আমার এতদিনের আনন্দকে ফেলে রেখে হাসি মুখেই চলে যেতে পারতুম। কিন্তু কোনোখানে কি এতটুকু ফাঁক থাকবে না যেখানে আমার জন্যে একটা বিরহের দীপ টিমটিম করেও জলবে। এ কথা ভাবতে গেলে যে মরতেও ইচ্ছে করে না। ওই সরলা সমস্তটাই দখল করবে একেবারে পুরোপুরি, বিধাতার এই কি বিচার।"

এখানেই নীরজার ট্র্যাজেডির গভীরতা। মর্ত্যের প্রতি যে তার আসক্তি প্রবল, এবং সেই সূত্রেই যে সে আদিত্যকে কেবল নিজের জন্য চায়, তা নয়। আসলে তার অবর্তমানে কারো মনে এতটুকু বেদনা জাগবে না, জাগবে না বিরহের শোক,—এই ভয়াবহ দুশ্চিন্তায় তার কাছে তার সমস্ত জীবনটাই একটা মূল্যহীন আত্মীয়সম্পর্ক-বঞ্চিত অস্তিত্বমাত্র বলে মনে হয়েছে। জীবনের এতবড় ব্যর্থতাকে সে স্বীকার করতে চায় না কিছুতেই, তাই সেও চায় না মরতে এবং আদিত্যের উপর নিজের দাবি পরিত্যাগ করতে।

সকলের কাছ থেকে বিস্মৃত হয়ে যাবার আতঙ্ক এর পরেও শোচনীয়ভাবে বেজেছে নীরজার হৃদয়ে। স্বামীর কাছে প্রকাশ করেছে তার এই আতঙ্কগ্রস্ত হতাশা: "ওই যে দারোয়ানটা ওইখানে বসে তামাক কুটছে, ও থাকবে দেউড়িতে, কিছুদিন পরেই আমি থাকব না। ওই যে গোরুর গাড়িটা পাথুরে কয়লা আজাড় করে দিয়ে খালি ফিরে যাচ্ছে ওর যাতায়াত চলবে রোজ রোজ, কিন্তু চলবে না আমার এই হৃদযন্ত্রটা।" আদিত্যের হাত হঠাৎ চেপে ধরে বলল, "একেবারেই থাকব না, কিচ্ছুই থাকব না? বলো আমাকে, তুমি তো অনেক বই পড়েছ, বলো না আমাকে সত্যি করে।"

মূঢ় আদিত্য মিথ্যা করেও দুটো সান্ত্বনাবাক্য প্রকাশ করতে পারল না মুমূর্ষু পত্নীর সম্মুখে। শেষে নীরজাই অস্থির হয়ে বলে উঠল, "তোমাদের বই যারা লেখে ভারি তো পণ্ডিত তারা, কিচ্ছু জানে না। আমি নিশ্চয়ই জানি, আমার কথা বিশ্বাস করো। আমি থাকব, আমি এইখানেই থাকব, আমি তোমারই কাছে থাকব, একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই তোমাকে বলে যাচ্ছি, কথা দিয়ে যাচ্ছি। তোমার বাগানের গাছপালা সমস্তই আমি দেখব, যেমন আগে দেখতুম, তার চেয়ে অনেক ভালো করে দেখব। কাউকে দরকার হবে না। কাউকে না।"

হঠাৎ একটা ছলনাময় আত্ম-বিশ্বাস যেন মৃত্যুর পূর্বে নীরজাকে পেয়ে বসল। মৃত্যুর পূর্বে তার এমনভাবে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষাটা এমনিতেই যথেষ্ট করুণ। তদুপরি সেই আকাঙ্ক্ষা যখন সহানুভূতিহীন মানুষের কাছে ব্যক্ত হয়, তখন তার কারুণ্য হয়ে ওঠে তীব্রতর।

এখন সে সরলার প্রতিও হঠাৎ সদয় হয়ে উঠল। এর আগে নীরজা প্রার্থনা করেছে ঠাকুর পরমহংসের কাছে, বল চেয়েছে, মুক্তি চেয়েছে মতিহীন অধম নারী হিসেবে। তারপর সরলাকে ডেকে তার কণ্ঠে মুক্তোর মালা পরিয়ে বলেছে, "একদিন ইচ্ছে করেছিলুম, যখন চিতায় আমার দেহ দাহ হবে, এই মালাটি যেন আমার গলায় থাকে। কিন্তু তার চেয়ে এই ভালো। আমার হয়ে মালা তুমিই গলায় পরে থেকো শেষদিন পর্যন্ত। বিশেষ বিশেষ দিনে এই মালা কতবার পরেছি যে তোমার দাদা জানেন। তোমার গলায় থাকলে সেই দিনগুলি ওঁর মনে পড়বে।" নীরজা ভেবেছিল, তার হৃদয় পরিষ্কার, কোনো ক্ষোভ নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা যে ছিল না, তা সে মুহূর্তের মধ্যেই বুঝেছিল।

আর আজ ভ্রান্ত আত্মবিশ্বাসে মুগ্ধ হয়ে সে ভাবল, এবার সে পরিষ্কার মনেই সরলাকে ডেকে নিতে পারবে, হীন জীবনস্পৃহার গ্লানি তার মধ্যে একটুও নেই। তাই সে স্বামীর কাছে বলল, "কাল রাত্রি থেকে বারবার পণ করেছি, এবার দেখা হলে নির্মল মনে ওকে বুকে টেনে নেব আপন বোনের মতো। তুমি আমাকে এই শেষ প্রতিজ্ঞা রক্ষায় সাহায্য করো। বলো, আমি তোমার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হব না, তাহলে সবাইকে আমার ভালোবাসা দিয়ে যেতে পারব।"

কিন্তু এর সবটাই নীরজার ভ্রান্ত ধারণা, ছলনাময় আত্মবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সে এইসব ভেবেছে। মৃত্যুর পূর্বে নীরজাকে দুদিনের শাস্তি দেবার জন্য সরলা যে সাধ করে কারাবাস বরণ করেছে, সরলার সেই সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে নীরজার মনে জেগেছে এই আত্মবিশ্বাস। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই আত্মবিশ্বাস, এবং সবাইকে তার ভালোবাসা দিয়ে যেতে পারার প্রস্তুতি তার আদৌ ছিল না এবং সেটা প্রমাণ হ'ল তার কাছে সরলার আকস্মিক মুক্তি পাওয়ায়।

সরলার মুক্তি পাওয়ার সংবাদেই আবার তার পরাজিত জীবনের বেদনা ও হতাশা পুরোপুরি তার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল, প্রাণপণে চাইল তার যা আছে

সবকিছুকে আঁকড়ে ধরে রাখতে,—কেউ যেন কোথাও তার অধিকারে ভাগ না বসাতে পারে। কিন্তু সরলার কাছে যে সে তার সবকিছু প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অথচ কোনো কিছুই পরিত্যাগ করতে মন চায় না। একদিকে ঔদার্য প্রদর্শনের জন্য স্বামীর উপর অধিকার পরিত্যাগের প্রতিশ্রুতি, অপরদিকে স্বামীর ও বাগানের প্রতিই তার প্রচণ্ড মমতা,—এই দুই বিপরীত মনোভাবের টানা পোড়েনে সে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল,—শেষ হয়ে গেল তার জীবনী-শক্তি। সরলা প্রণাম করবার জন্য তার পায়ে হাত দিতেই তার সমস্ত শরীর আক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। পা দ্রুত গেল সরে। ভাঙা গলায় বলে উঠল, "পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না, পারব না।" বলতে বলতে তার চোখের তারা প্রসারিত হয়ে জ্বলতে লাগল। অস্বাভাবিক জোরে সরলার হাত চেপে ধরে সে বলতে থাকল, "জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব, থাকব।" তারপর ঢিলে শেমিজ-পরা পাণ্ডুবর্ণ মূর্তি নিয়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে তার শেষ কথা বলল, "পালা, পালা, পালা এখনই, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।" 'উইল' ও 'আইডিয়া'র দ্বন্দ্বে এখানে এই যে আইডিয়ার পরাজয়, রক্তমাংসের মানুষের জীবনে এটাই স্বাভাবিক।

নীরজার এই উক্তি তার হতাশাগ্রস্ত, স্বামীপ্রেম-বঞ্চিত জীবনের দারুণ অন্তর্দাহেরই বহিঃপ্রকাশ, কিন্তু এই শেষ উক্তি তার ট্র্যাজেডির ভাব-গভীর ব্যাপকতাকে যেন কেবলমাত্র ঈর্ষ্যাকাতরতার সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে সংকুচিত করে ফেলে। কলাকৌশলের দিক থেকে এটা লেখকের একটা ত্রুটি।[১১] এবং এই কারণেই হয়তো মালঞ্চ উপন্যাসের সমাপ্তিটা 'মেলোড্রামাটিক' মনে হতে পারে।[১২]

---

১১. ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই ত্রুটি লক্ষ্য করেছেন, বলেছেন, "পারিব না, পারিব না, পারিব না,—নীরজার এই শেষ উচ্চারিত বাক্যে ঈর্ষ্যার যে তীব্র, ঝাঁঝালো সুর ফুটিয়াছে, তাহাতে ভাব সংগতি ও বর্ণসুষমার মায়াজাল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে—মানব প্রকৃতির এক অদম্য উচ্ছ্বাসের দমকা হাওয়া তাহাকে ইভের ন্যায় স্বর্গচ্যুত করিয়া পুষ্পোদ্যানের ক্ষীণ সুরভিটিকে নিঃশেষে উড়াইয়াছে। কলা-কৌশলের দিক দিয়া এই পরিচ্ছেদটিকে একটা ত্রুটি বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।"

• দ্রঃ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, (১৩৭২) পৃঃ ১৯৫।

১২. ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ঃ রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা ২য় খণ্ড, (১৩৫৩) পৃঃ ৪০০।

প্রায় একই কাহিনী সম্বলিত 'দুইবোন' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ একটা শেষ রক্ষা করেছিলেন, দৈবের সাহায্যে শর্মিলাকে বাঁচিয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত স্বামী শশাঙ্ককে স্বকেন্দ্রে ফিরিয়ে এনেছিলেন এবং উর্মিলাকেও আগ্রহ করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বিলেতে নিজের আদর্শকে চরিতার্থ করতে। তাই শর্মিলার অনেক দুঃখ ট্র্যাজিক হয়ে উঠলেও কাহিনীটি শেষ পর্যন্ত 'মডার্ণ কমেডি'-তে পর্যবসিত হয়েছে। "মালঞ্চ কিন্তু 'মডার্ণ কমেডি' নয়, নিষ্করুণ ট্র্যাজেডি এবং সেই ট্র্যাজেডিতে গভীর ট্র্যাজিক মহিমার স্পর্শ পর্যন্ত নাই, একেবারে শুষ্ক, নিষ্ঠুর, বীভৎস।"[১৩]

'মালঞ্চ' 'দুই বোন' অপেক্ষা সত্যই অনেক বেশী নিষ্ঠুর এবং নির্মম। রবীন্দ্রনাথ 'দুই বোনে' যে কথা বলতে চেয়েছিলেন,—বয়স্ক বিবাহিত পুরুষের নবীন প্রণয়োদ্‌গমে দাম্পত্য প্রেমের সমস্যাটিকে যেভাবে দেখতে চেয়েছিলেন, তা বোধহয় 'দুইবোনে' চূড়ান্তভাবে দেখানো হয়নি। তাই বোধ হয় কিছুকালের মধ্যেই 'মালঞ্চ' রচনার তাগিদ অনুভব করলেন। এখানে একই বক্তব্য এবং বিষয়বস্তুকে আরো সুস্পষ্ট ক'রে নিষ্ঠুরতম, নির্মমতম শেষ পরিণতি পর্যন্ত লেখক অগ্রসর হয়েছেন। এই জন্যই 'দুই-বোনের' কমেডি 'মালঞ্চে'র ট্র্যাজেডিতে রূপান্তর লাভ করেছে।[১৪]

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের মতেও 'দুইবোনে'র অসমাপ্ত ট্র্যাজেডি 'মালঞ্চে' সমাপ্ত হয়েছে। তিনি অল্পকথায় বলেছেন, "শর্মিলা ও উর্মিমালা সহোদরা হওয়ায় যে ট্র্যাজেডি তীব্রতার চরমে পৌঁছাইতে পারে নাই, নীরজা ও সরলা সম্পূর্ণ অসম্পর্কিত হওয়াতেই তাহা যেন দুঃখের শিখরে উপনীত হইয়াছে। শর্মিলা ও উর্মিমালার সোদরত্ব দুঃখের চরম অভিব্যক্তির পক্ষে বাধা মনে করিয়াই কি রবীন্দ্রনাথ নীরজা ও সরলাকে সম্পূর্ণ অনাত্মীয়রূপে পরিকল্পনা করিয়াছেন, যাহাতে দুঃখের অভিব্যক্তি সেখানে কোন বাধা না পায়? যে কারণেই হোক, 'দুইবোনে'র অসমাপ্ত ট্র্যাজেডি 'মালঞ্চে' চরমে পৌঁছিয়াছে।"[১৫]

---

১৩. ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ঃ রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, (১৩৫৩), পৃ. ৪০০।

১৪. ঐ পৃঃ ৪০১'।

১৫. অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীঃ রবীন্দ্র বিচিত্রা (রবীন্দ্রনাথের খণ্ডোপন্যাস), (১৩৬৪) পৃঃ ৩৪।

'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) উপন্যাসে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির পটভূমিকায় উপন্যাসের নায়ক নায়িকা অতীন্দ্র-এলার জীবনে যে ট্র্যাজেডি নেমে এসেছিল, তার একটি চিত্র রচিত হয়েছে। এই ট্র্যাজেডি নিজেকে ভুল বোঝার ট্র্যাজেডি। নিজে যা নয়, নিজের সম্পর্কে সেই ধারণাকে দৃঢতার সঙ্গে আঁকড়ে ধরে থাকা এবং তাই নিয়ে একটা ফাঁকা গৌরবের মূল্যবোধ গড়ে তোলার কী শোচনীয় পরিণাম হতে পারে, তাই দেখানো হয়েছে, এই উপন্যাসে। 'ঘরে বাইরে'র বিমলার মধ্যেও নিজেকে ভুল বোঝার সংকট দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেখানে শেষকালে বিমলা রক্ষা পেয়েও গেছিল। কিন্তু এখানে এলা বিমলার থেকে অনেক বেশীদূর এগিয়েছিল নিজের ভুলকে নিয়ে, তাই হয়তো তার আর রক্ষা পাবার কোনো উপায়ই ছিল না—সুতরাং অনিবার্যভাবেই তার শোচনীয় পরিণাম ঘটেছে।

উচ্চশিক্ষায় সুশিক্ষিতা এলা ইন্দ্রনাথের স্বদেশী দলে যোগদান করে। ইন্দ্রনাথের এই স্বদেশী ব্যাপারটা ছিল একটা আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ। রাজনীতির লক্ষ্যমাত্রা থাকার মানে বড়ো দরকার তার ছিল না। তাছাড়া তার চরিত্রের মধ্যেই ছিল প্রভুত্ব করবার এক অপরিসীম লালসা। এই প্রভুত্বের আত্মপ্রতিষ্ঠা করবার সুযোগ সে পেল স্বদেশী দলের মধ্যদিয়ে। স্বদেশীর উন্মাদনায় অসংখ্য নর-নারীর পূজ্য নায়ক হয়ে সে যে সকলের কাছে দেখাতে পারে নিজের গৌরবকে,—এখানেই তার এক অপরিসীম তৃপ্তি।

এই ইন্দ্রনাথের দলেই যোগদান করল এলা। সংসারের বন্ধনে কোনোদিন আবদ্ধ না হবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। এলা যে খুব ভেবেচিন্তে ইন্দ্রনাথের দলে যোগদান করেনি, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কারণ ইতিমধ্যেই কাকার সংসারে তার অবস্থানটা নানা কারণে অপ্রীতিকর হয়ে ওঠায় সে চাইছিল কোনোক্রমে কাকার সংসার থেকে বেরিয়ে পড়তে। সেই সুযোগ ঘটে গেল সেখানে ইন্দ্রনাথের আবির্ভাবে। নিতান্ত অসংকোচেই সে ইন্দ্রনাথের কাছে কোনো একটা কাজে লাগবার জন্য প্রস্তাব করল। সঙ্গে সঙ্গেই সে পেয়ে গেল নারায়ণী স্কুলের কর্মীপদ। এবং এই কাজ নিতে গিয়েই তাকে গ্রহণ করতে হ'ল ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। সময় এবং সুযোগ থাকলে এ সম্পর্কে সে হয়তো কিছু ভেবে দেখতো। কিন্তু তখনকার মানসিক অবস্থায় এবং উত্তেজনায় সে ভেবে দেখা তার হয়ে ওঠেনি। তা ছাড়া ইন্দ্রনাথ তাকে বলেছে, 'তুমি সমাজের নও, তুমি দেশের।'

আমাদের বিশ্বাস করো যাতে আমাদের সাধনা সত্য হয়।" ইন্দ্রনাথের নিরন্তর চেষ্টা এলার সামনে এলার একটা বড়ো রকমের প্রতিমূর্তি তুলে ধরা, যা দেখে এলাও মুগ্ধ হবে এবং সেই কল্পিত প্রতিমূর্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করবে। কিন্তু এলা ইতোমধ্যেই অতীন্দ্রের সাহচর্যে নিজের নারীসত্তা সম্পর্কে এত সচেতন হয়ে উঠেছে যে, ইন্দ্রনাথের কোনো কথাই তার মনে লাগে না। সে চায় ইন্দ্রনাথের এই কৃত্রিম স্বদেশীর দায় থেকে সে এবং অতীন যেন নিষ্কৃতি পায়। কিন্তু ইন্দ্রনাথ এলাকে নিষ্কৃতি দেবে না। কারণ, এলার হাতের রক্তচন্দনের ফোঁটা ছেলেদের মনে আগুন জ্বালিয়ে দেয়, সুতরাং এলাকে নিষ্কৃতি দিলে সংগঠনের উৎসাহ কমে যাবার সম্ভাবনা। আর অতীনকে নিষ্কৃতি দেবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ "ও বাঁধা পড়েছে নিজেরই সংকল্পের বন্ধনে। ওর মন থেকে দ্বিধা কোনো কালেই মিটবে না, রুচিতে ঘা লাগবে প্রতি মুহূর্তে, তবু ওর আত্মসম্মান, ওকে নিয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত।"

এই আত্মসম্মান রক্ষার জন্য সংকল্প পালন যেমন অতীন্দ্রের জীবনের ট্র্যাজেডির মূল কারণ, তেমনি তাই-ই এলার জীবনের ট্র্যাজেডিরও মূল কারণ। স্বদেশীর ব্রত এদের কারো জীবনে সত্য নয়। এলা এর মধ্যে এসেছে ঝোঁকে পড়ে, আর অতীন্দ্র এসেছে এলার টানে। কিন্তু সংকল্প নিতে হয়েছে দুজনকেই। এবং যেটা জীবনে চরম মিথ্যা তার কারণে জীবন দেওয়া, এবং সেই জীবন দেওয়ার মধ্যে গৌরব-বোধ না ক'রে তার মধ্যদিয়ে অব্যাহতি পাওয়ার করুণতম আকাঙ্ক্ষা নিঃসন্দেহে এক ট্র্যাজেডির বিষয়। যে স্বদেশীর কারণে সংকল্প গ্রহণ, সেটা যদি তাদের জীবনে সত্য হ'ত, তবে তার জন্য কোনো শোচনীয় পরিণাম লাভ করাটা ট্র্যাজেডির বিষয় নাও হতে পারত। এবং সেই শোচনীয় পরিণাম থেকে সান্ত্বনা পাবার মতো কিছু ব্যাখ্যাও পাওয়া যেত। কিন্তু এই স্বদেশী তাদের জীবনে সত্য নয় বলেই, এর ন্য দুঃখ পাওয়ার মধ্যে কোনো ঔচিত্য নেই। সুতরাং এই শোচনীয় পরিণাম, এটা তাদের পক্ষে একটা অনুচিত দুর্ভাগ্য,—যার রসপরিণাম ট্র্যাজেডি।

এই ট্র্যাজেডির হাত থেকে তারা রক্ষা পেতে পারত, যদি তারা একই সঙ্গে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারত স্বদেশীর ব্রত থেকে, এবং ঘটনাটি বেশী দূর এগিয়ে যাবার আগেই। কিন্তু তারা তা পারেনি। তারা প্রস্তুত হয়েছে একেক জন একেক সময়ে। প্রথমতঃ প্রস্তুত হয়েছে অতীন, কিন্তু

রাজী হয়নি এলা। শেষ মুহূর্তে এলা যেদিন রাজী হ'ল, তখন আর এলাকে নিয়ে ঘর করার মতো কোনো সুস্থ এবং শুদ্ধ মূল্যবোধ অবশিষ্ট নেই অতীনের মধ্যে। অতীন তখন স্বদেশীর মধ্যদিয়েই নিঃশেষিত হতে চায়, এবং তার পূর্বে নিঃশেষিত করতে চায় তার সুস্থ মূল্যবোধ থেকে সঞ্জাত তার ভালোবাসাকে। এদের বিভিন্ন উক্তির মধ্যদিয়ে এই মনোভাবটিই প্রকাশ পেয়েছে।

একদিন অকস্মাৎ মোকামা-র ঘাটে খেয়া পারাপারের স্টীমারের মধ্যে এদের পরিচয় হয়েছিল। প্রথমতঃ অতীনকে দেখে এলার মধ্যেই পূর্বরাগের জন্ম এবং এলার খদ্দর প্রচারের ছুতোয় অতীন বুঝতে পারে, এই পূর্বরাগকে। অতীনের মধ্যেও দেখা গেল স্বীকৃতি। কিন্তু এলা অতীনকে নিজের একান্ত ক'রে বরণ ক'রে নিতে ব্যর্থ হ'ল—সে ভুল ক'রে অতীনকে চাইল দেশের জন্য।—অতীনের প্রশ্নের জবাবে সে বলল, "তুমি আসবার আগেই শপথ ক'রে দেশের আদেশ স্বীকার করেছি, বলেছি আমার একলার জন্য কিছুই রাখব না। দেশের কাছে আমি বাগ্‌দত্তা।"

অতীন বোঝে, দেশের কাছে অ-নারীসুলভ মনগড়া প্রতিশ্রুতি এলার জীবনে একেবারেই মেকি। এই মেকি প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য এলা যে তার 'স্বভাব'কে বিনষ্ট করছে—এবং সেটা যে প্রকৃতির নির্দেশ নয়. সে সম্পর্কে অতীন এলাকে সতর্ক করেও দেয়,—"অধার্মিক তোমার পণ গ্রহণ, এ পণকে রক্ষা করাও প্রতিদিন তোমার স্বধর্ম-বিদ্রোহ। পণ যদি ভাঙতে তবে সত্য রক্ষা হ'ত। যে লোভ পবিত্র, যা অন্তর্যামীর আদেশবাণী, তাকে দলের পায়ে দলিত করেছ, এর শাস্তি তোমাকে পেতে হবে।"

এলা নিজেও জানে, যে সে এখন পরাজিত। পরাজয় যে নারী হিসেবে তার জীবনে অবশ্যম্ভাবী, একথা সে পূর্বে স্বীকার করতে চায় নি। কিন্তু আজ এমন অবস্থা, যে স্বীকার করতে চাইলেও সে স্বীকার করতে পারছে না। অন্তরে স্বীকার করেও, দেশের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণে রেখে মুখে অন্ততঃ অস্বীকার করতে হচ্ছে,—অন্তরে সত্যকে বরণ করতে হচ্ছে, কিন্তু মুখে মিথ্যাকেই ঘোষণা করতে হচ্ছে। এলার মতো শিক্ষিতা এবং অনুভূতি-প্রবণ আধুনিকা মেয়ের জীবনে—এটাই চরম ট্র্যাজেডি,—এটাকে তার প্রাপ্য শাস্তি হিসেবেই সে মেনে নিয়েছে। অতীনের পূর্বোক্ত ক্ষুব্ধ তিরস্কারের উত্তরে সে তাই বলে,—"অন্ত, শাস্তির সীমা নেই। দিনরাত মারছে আমাকে। এমন বিপ্লব ঘটতে পারে, সে-কথা কোনোদিন ভাবতে পারিনি। এর আগে কখনো

মন বিচলিত হয়নি বললে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু চঞ্চলতা করে খুশি হয়েছি নিজের শক্তির গর্বে। জয় করবার সেই গর্ব আজ নেই, ইচ্ছে হারিয়েছি—বাহিরের কথা ছেড়ে দাও, অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখো, হেরেছি আমি। তুমি বীর, আমি তোমার বন্দিনী।"

পরাজিত শুধু এলা নয়, পরাজিত অতীনও। নিজের সংকল্পের বন্ধনে সে বাইরের দিক থেকে একটা এলা-নিরপেক্ষ সাংগঠনিক জীবন যাপন করছে, কিন্তু এলার প্রতি তার প্রেম যতই পুরোনো হচ্ছে, ততই সে উপলব্ধি করছে,—অন্তরের সায় নেই এমন একটা কৃত্রিম স্বাদেশিকতার ব্রতে সে অনর্থক লিপ্ত রয়েছে। একদিকে এই কৃত্রিম স্বাদেশিকতার সংকল্প, আর একদিকে এলার প্রেম,—এর মধ্যে এলার প্রেমের কাছে নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে তার স্বাদেশিকতার সংকল্প। কিন্তু সংকল্প থেকে বেরিয়ে আসতেও সে পারে না সাংগঠনিক লৌকিকতার স্বার্থে। সুতরাং তিলে তিলে তাকে দগ্ধ হতে হচ্ছে, কর্তব্য এবং অকর্তব্যের আবর্তে। এটাই তার জীবনকে ট্র্যাজেডির দিকে নিয়ে গেছে। সে বলছে, "......হার শেষ হয়নি, প্রতি মুহূর্তের যুদ্ধে প্রতি মুহূর্তেই হারছি।"

স্বদেশের কাছে যে কৃত্রিম সংকল্পের কারণে অতীন আজ ক্ষত-বিক্ষত সেই সংকল্পকে পালন ক'রে যে সে চলে, তার মূলে আছে তার সৌজন্য, তার ভদ্রতা। এইজন্য সে সংগঠন ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারছে না আবার এরই কারণে বিবাহ করতে এলার লৌকিক অসম্মতির সম্মুখে তার কিছু বলবার ছিল না। সুতরাং তার ট্র্যাজিক জীবন—যন্ত্রণার মূলে তার নিজেরই সৌজন্য বা ভদ্রতাবোধ। এই সৌজন্য বা ভদ্রতাবোধকে পরোয়া না করলে এই ট্র্যাজেডিকে সে হয়তো পরিহার করতে পারত। এর জন্য তাকে আজ অন্তর্জ্বালা ভোগ করতে হচ্ছে। এলার সঙ্গে কথোপকথনে এই মূক অন্তর্জ্বালা অকস্মাৎ মুখর হয়ে উঠেছে প্রচণ্ড আত্মধিক্কারে—'কাপুরুষ আমি। অসম্মতির নিষেধ ভেদ ক'রে কেন তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারিনি বহু পূর্বে যখন সময় হাতে ছিল? ভদ্রতা। ভালোবাসা তো বর্বর। তার বর্বরতা পাথর ঠেলে পথ করবার জন্যে। পাগলাঝোরা সে ভদ্রশহরের পোষমানা কলের জল নয়।"

কিন্তু অতীনের ভাগ্যই এমনি। সে সব কিছুই বোঝে, কিন্তু কোনো কিছুই রূপায়িত করতে পারে না। রূপায়িত করতে গেলে যে মাটির কাছাকাছি নেমে আসতে হয়, এবং কিছু ধুলো-ময়লাও যে গায়ে লাগে—

ওখানেই অতীনের আপত্তি। আবার রূপায়িত করতে না পারার জন্য তার অন্তর্দাহেরও কোনো অন্ত নেই। এরকম চরিত্রের পক্ষে অন্তর্দাহের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার একমাত্র উপায় লৌকিকতা বা ভদ্রতার দিকেই অধিকতর নিষ্ঠা আরোপ ক'রে, নিজেকে বিস্মৃত হবার চেষ্টা করা এবং সেই সূত্রে আত্মপীড়ন ক'রে গভীরতর ট্র্যাজেডি ভোগ করা।

এলা না হয় ইন্দ্রনাথ তথা দেশের কাছে প্রদত্ত সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির জন্য সংগঠন থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেনা। কিন্তু অতীন্দ্রের বাধা ছিল কোথায়? সংগঠনের মধ্যে আসার সময় এলার মনে তবু একটা সেন্টিমেণ্টাল ঝোঁক ছিল, অতীন্দ্রের তো তাও ছিল না। সে তো বেশ ঠাণ্ডা মাথায়ই এলার টানে এর মধ্যে এসে পড়েছে—তবু বেরুতে পারছে না কেন? তার ট্র্যাজেডির মূল কারণ যে ভদ্রতাবোধ, তা কিভাবে জন্মলাভ করল, আর কেমন করেই বা তা এমন প্রবল হয়ে উঠল? এলা-অতীনের উক্তির মধ্য-দিয়েই এর সব কিছু জানা যাবে। এলার প্রশ্নের উত্তরে অতীন বলেছে, "অনেক কথা জানতুম না অনেক কথা ভাবিনি এই পথে প্রবেশ করবার আগে। একে একে এমন সব ছেলেকে কাছে দেখলুম, বয়সে যারা ছোট না হলে যাদের পায়ের ধুলো নিতুম। তারা চোখের সামনে কী দেখেছে, কী সয়েছে, কী অপমান হয়েছে তাদের, সে সব দুর্বিষহ কথা কোথাও প্রকাশ হবে না। এরই অসহ্য ব্যথায় আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। বারবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, ভয়ে হার মানব না, পীড়নে হার মানব না, পাথরের দেয়ালে মাথা ঠুকে মরব, তবু তুড়ি মেরে উপেক্ষা করব সেই হৃদয়-হীন দেয়ালটাকে।"

এলার প্রশ্ন: "তারপরে কি তোমার মত বদলে গেল?"

অতীন বলল, "...দিন যতই এগোতে থাকল, চোখের সামনে দেখা গেল,—অসাধারণ উচ্চমনের ছেলে অল্পে অল্পে মনুষ্যত্ব খোয়াতে থাকল। এতবড়ো লোকসান আর কিছুই নেই।"...

এলা বলল, "তখনও ওদের ছাড়লে না কেন?"

অতীন বলল, "আর কি ছাড়তে পারি? তখন যে শাস্তির নিষ্ঠুর জাল সম্পূর্ণ জড়িয়ে এসেছে ওদের চারদিকে। ওদের ইতিহাস নিজে দেখলুম, বুঝতে পেরেছি ওদের মর্মান্তিক বেদনা, সেই জন্যেই রাগই করি, আর ঘৃণাই করি, তবু বিপন্নদের ত্যাগ করতে পারিনে।"

এইখানটাতেই অতীন আটকে পড়ে গেছে সংগঠনের মধ্যে। অনেক মহৎ ছেলে, যারা স্বাদেশিকতার কৃত্রিম চাপে পড়ে পর্য্যুষিত হচ্ছে,—অথচ যাদের সম্মুখে বিকল্প কোনো জীবন নেই, তাদের পরিত্যাগ করে যেতে অতীনের রুচিতে বাধে। সুতরাং তাদের ভাগ্যের সমভাগী হওয়া ছাড়া তার আর কোনো পথ নেই।

স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে অতীনের মোহমুক্তির এই বৃত্তান্ত এলার মনেও স্বাদেশিকতা সম্পর্কে মোহমুক্তি ঘটিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন আর তার দেশের কাছে অবিবাহিতা থাকার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার কোনো অর্থ-ই নেই। পূর্বে তার অবলম্বন ছিল স্বদেশ-প্রেম, আর এখন অবলম্বন হয়ে উঠছে অতীন। কিন্তু অতীন রাজী হবে না এলার অবলম্বন হতে। কারণ এলা সংগঠন ছাড়তে পারলেও অতীন পারবে না। এলা এসেছিল একটা ঝোঁকের মাথায়। তাই ঝোঁকটা কেটে গেলেই সে ফিরতে প্রস্তুত এবং ফিরে যাওয়ায় তার কোনো নীতিগত বাধাও নেই। কিন্তু অতীন ঝোঁকের মধ্যদিয়ে আসেনি বলেই ফিরে যাওয়া তার পক্ষে এত সহজ নয়, ভদ্রতার নীতিগত বাধাই সবচেয়ে প্রবল হয়ে দেখা দিচ্ছে তার কাছে। সুতরাং এলার অবস্থা এখন খুবই শোচনীয়। পূর্বের অবলম্বন সে হারিয়েছে, এবং নতুন অবলম্বনকে একান্ত করে নিতে পারছে না, অথচ চিত্তবৃত্তি সমূহের জন্য একটা অবলম্বন না পেলে তারই বা চলে কি করে? তাই এখন সে কাতর হয়ে অতীনকে অবলম্বন করতে চায় এবং তার এই চাওয়ার মধ্যে তার অন্তরের বেদনা এবং নিঃসহায় অবস্থা ভিখারিণীর রূপ ধরে তার বাস্তব ট্র্যাজেডির সম্ভাবনাকে ঘনীভূত করেছে—

এলা অতীনের গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "ফিরে এস অন্তু। এত বছর ধরে যে বিশ্বাসের মধ্যে বাসা নিয়েছিলুম, তার ভিত তুমি ভেঙে দিয়েছ। আজ আছি ভেসে চলা ভাঙা নৌকো আঁকড়িয়ে। আমাকেও উদ্ধার করে নিয়ে যাও।—অমন চুপ করে বসে থেকো না, বলো অন্তু, একটা কথা বলো। এখনই তুমি হুকুম করো আমি ভাঙব পণ। ভুল করেছি আমি। আমাকে মাপ করো।"

"উপায় নেই।"—

"কেন উপায় নেই, নিশ্চয় আছে।"

"তীর লক্ষ্য হারাতে পারে, তূণে ফিরতে পারে না!"

"আমি স্বয়ংবরা হবো, আমাকে বিয়ে করো অন্ত। আর সময় নষ্ট করতে পারব না……"

"বিপদের পথ হলে নিয়ে যেতুম সঙ্গে। কিন্তু যেখানে ধর্ম নষ্ট হয়েছে সেখানে তোমাকে সহধর্মিনী করতে পারব না।"……

এখানেই অতীনের সজ্ঞান অপরাধবোধ। লৌকিকতার খাতিরেই হোক—বা ভদ্রতার খাতিরেই হোক, সে এই কৃত্রিম স্বাদেশিকতার সংগঠনে যুক্ত থেকে যে সজ্ঞানে নির্মমভাবে নিজের মনুষ্যত্বকে, ধর্মকে বিনষ্ট করছে, তারজন্য নৈতিক বিচারবুদ্ধিতে সে নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করে রেখেছে—সজ্ঞান অপরাধে সে অপরাধী। প্রথম দর্শনে এবং তার অব্যবহিত পরেও এলা যে অতীনকে প্রথম ভালোবাসতে স্বরু করে, সেই অতীন আর এই অতীনের মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য আজকের অতীন দেখতে পাচ্ছে।—সেই অতীন ছিল স্বভাব-ধর্মনিষ্ঠ, আর আজকের অতীন স্বভাব ধর্ম-বিনষ্ট। আবার অন্যদিকে এলা আজকে তার কৃত্রিম স্বদেশানুরাগিনীর খোলস ফেলে দিয়ে তার স্বভাবধর্মে পুনরায় ফিরে গেছে। সুতরাং সুতীক্ষ্ণ নীতি সচেতন অতীনের পক্ষে তার আজকের বিনষ্ট-ধর্ম জীবন নিয়ে স্বভাব ধর্ম পুনপ্রাপ্ত এলাকে গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব।

এখানে এলাকে গ্রহণ করতে অতীনের এই যে অস্বীকৃতি, এতে অতীনের যা লোকসান, এলার লোকসান তার চেয়ে অনেক বেশী। কারণ অতীন সব সময়েই একটা বুদ্ধি বিবেচনার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থেকেছে, এই বুদ্ধি-বিবেচনাই হয়েছে সব সময় তার আশ্রয়। কিন্তু এলা আবেগ-তাড়িতা। অতীনের প্রতি প্রেমের আবেগে তার স্বাদেশিকতার ঝোঁক গেল, কিন্তু অতীন তাকে গ্রহণ করল না। মনের প্রমত্ত আবেগ নিয়ে তাই সে এখন সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়। ঠিক এই মুহূর্তে অতীন তার সম্মুখ থেকে অদৃশ্য, আর অকস্মাৎ-আবির্ভূত ইন্দ্রনাথের উক্তি, "তোমাকে মারতে পারলে এখনই মারতুম।"

স্বাদেশিকতার মোহ থেকে মুক্ত হয়ে এলা যে এখন ইন্দ্রনাথের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে, তাতে তাকে দিয়ে এখন আর সংগঠনের ক্ষতি ছাড়া লাভ যে কিছুই হবে না, একথা ইন্দ্রনাথ বুঝলো। সুতরাং এখন এলাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া দরকার। দলের স্বার্থে দলের প্রত্যেকের দ্বারাই প্রত্যেকের মৃত্যু ঘটানোর এক জাল নিপুণ হাতে পেতে রেখেছে ইন্দ্রনাথ। সুতরাং এলাকে

পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য সেই জালে হাত পড়ল। এই উপন্যাসে যে সব ইঙ্গিত রয়েছে, তাতে মনে হয়, অতীনের উপরই পড়েছে সেই দায়িত্ব। ইন্দ্রনাথের বিবেচনায় অতীনের দ্বারাই একমাত্র এই কাজ সমাধা হতে পারে। কারণ ইন্দ্রনাথ অতীন সম্পর্কে ঠিকই ভেবেছে, "রুচিতে ঘা লাগবে প্রতি মুহূর্তে, তবুও আত্মসম্মান ওকে নিয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত।" দলের প্রতি আনুগত্যের ভদ্রতা এবং সেই ভদ্রতাকে নিয়ে গড়ে ওঠা যে আত্মসম্মান অতীনের নৈতিক অপমৃত্যুর তথা ট্র্যাজেডির মূল কারণ তা-ই তাকে আচ্ছন্নের মতো টেনে নিয়ে গেল প্রণয়িনী হত্যার মতো হীনতম কাজে। এই কাজে এসে সে এলার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে তার এই নৈতিক অপমৃত্যুকেই ঘোষণা করেছে,—"জানিনে কী মোহের বেগে, ধিক্কার দিতে দিতেই নিয়েছি স্খলিত জীবনের অসম্মান। ইতিহাসে পড়েছি এমন বিপত্তির কথা, কিন্তু আমার মতো বুদ্ধিঅভিমানীর মধ্যে এটা যে ঘটতে পারে, কখনো তা ভাবতে পারতুম না।" তারপর, সে আবার বলছে, "স্বভাবকেই হত্যা করেছি, সব হত্যার চেয়ে পাপ। কোনো অহিতকেই সমূলে মারতে পারিনি, সমূলে মেরেছি কেবল নিজেকে। ·সমস্ত কালো দাগ মুছবে যমুনার কালো জলে, তারই কিনারায় এসে বসেছি।"

শেষ দৃশ্যে যদিও দুজনেরই মৃত্যুর ইঙ্গিত আছে, তবু এলার মৃত্যুর ইঙ্গিতটাই স্পষ্ট হয়ে আছে বেশী। এলার ব্যর্থ প্রণয়ী বটু এলা এবং অতীন উভয়ের সম্পর্কে পুলিশের কাছে সবকিছু ফাঁস করে দিয়েছে। সুতরাং শীঘ্রই দুজনের ধরা পড়বার আশঙ্কা। আর ধরা পড়লে তাদের উপর পীড়নের মাধ্যমে পুলিশের পক্ষে দলের অনেক খবর বের করে নেওয়া সহজ হবে। তাই ধরা পড়বার আগেই তাদের মৃত্যু ঘটানোর ব্যবস্থা। এর মধ্যে এলার মৃত্যু ঘটানোই কঠিনতম—এবং সেই দায়িত্বই নিয়েছে অতীন।

অতীন এলাকে বুঝিয়েও দিল সেই ভয়াবহ সম্ভাবনা—"তোমারই আপন মণ্ডলীতে একদিন যারা ছিল এলাদির সব দেশভাই তাদেরই মধ্যে কথা উঠেছে যে, তোমার বেঁচে থাকা উচিত নয়।" তারপর সে এলাকে তার গ্রেপ্তারের আসন্নতার সংবাদও দিল। গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা এলারও জানা ছিল, কারণ, বটুর একটি চিঠিতে সে জেনেছিল, পুলিশ তাকে ধরতে আসবে, এবং সে যদি বটুকে বিবাহ করে, তবে বটু তার জামিন হয়ে সমস্ত দায় গ্রহণ করবে।

অতীন বলল, "খবর পেয়েছি সেই বটুই আসবে কাল পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে। তোমার সম্মতি পেলেই বাঘের সঙ্গে রফা করে তোমাকে কুমিরের গর্তে আশ্রয় দেবার হিতব্রতে সে উঠে পড়ে লাগবে। তার হৃদয় কোমল।"

মৃত্যুর চেয়েও কালো, কুৎসিত এবং ভয়াবহ এই আসন্ন লাঞ্ছনা। প্রণয়িনীর এই লাঞ্ছনা ঘটতে দেওয়া অতীনেরও আত্মসম্মানের পক্ষে অসহনীয়। অথচ এই লাঞ্ছনা এতই প্রবল এবং অনিবার্য যে এর হাত থেকে পরিত্রাণ দেবার কোনো উপায় অতীনের সামনে কিছুই নেই। হয়তো এই কারণেই সে এলাকে হত্যা করার দায় নিজ হাতে নিয়েছে—যদি এর মধ্যদিয়ে সে এলার সম্মান রক্ষা করতে পারে।

এলাও অতীনের মুখে তার আসন্ন বীভৎস লাঞ্ছনার কথা শুনে, মৃত্যুকেই বরণীয় মনে করল,—অভিভূতের মতো বলতে থাকলো—"মারো আমাকে অন্ত, নিজের হাতে। তার চেয়ে সৌভাগ্য আমার আর কিছু হতে পারে না"—"একটুও ভেবো না অন্তু। আমি যে তোমার সম্পূর্ণই তোমার—মরণেও তোমার। নাও আমাকে। নোংরা হাত লাগতে দিয়ো না আমার গায়ে, আমার এ দেহ তোমার"—"ভীরু নই আমি ; জেগে থেকে যাতে মরি তোমার কোলে তাই করো।"

এলার জীবনের এই যে অপচয়, এটাই তার জীবনের ট্যাজেডি। আত্মপ্রতারণার মূল্য তাকে এইভাবে নিজের জীবনের শোচনীয় অপচয়ের মধ্যদিয়ে দিতে হ'ল। একটি সম্ভাবনা পূর্ণ জীবনের পক্ষে এই ট্যাজেডি-ই সবচেয়ে করুণ ও মর্মান্তিক।

অতীনের ট্যাজেডির ঠিক এই রকম আনুপূর্বিক কোনো ঘটনাগত অবয়ব নেই। সেই ট্যাজেডি অনেকটাই মানসিক বা আধ্যাত্মিক, -নীতিবোধ ভ্রষ্ট হয়ে যাবার পর আত্মগ্লানির পরিণাম।

'চার অধ্যায়' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের এই ট্র্যাজেডি-চেতনার বিশেষত্ব ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের সমালোচনাতেও ধরা পড়েছে। ডঃ রায় 'চার অধ্যায়ে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "স্ব-ভাবের এবং স্ব-ধর্মের প্রতিকূল আচরণের মধ্যে গ্লানি ও দুঃখের বীজ নিহিত থাকে, স্ব-ধর্মের পীড়নে মানুষের গভীরতর চিত্ত পীড়িত হয়, ট্র্যাজেডি অনিবার্য হইয়া উঠে, এবং তাহারই ইঙ্গিত

'চার অধ্যায়' উপন্যাসে।"[১৬] এলা-অতীনের জীবনের এই ট্র্যাজেডিই যে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের মূল আকর্ষণ তাও ডঃ রায় বলেছেন,—"তাহাদের পূর্বাপর প্রেমকাহিনী, অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় ও গভীর অর্থবহ সংলাপ এবং তাহাদের প্রেমের সর্বশেষ ট্র্যাজিক পরিণতিই শেষ পর্যন্ত পাঠকচিত্তকে গল্পের মধ্যে টানিয়া রাখে।"[১৭]

---

১৬. ডঃ নীহাররঞ্জন রায় : রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা ২য় খণ্ড. (১৩৫৩) পৃঃ ৪১১

১৭. ঐ, পৃঃ ৪১৯।

প্রসঙ্গ—৬ | রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা : ছোটগল্পে ॥

রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার আরো বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর ছোটগল্পগুলিতে। কারণ তাঁর ছোটগল্পগুলিতে যে সমস্ত প্রসঙ্গ এবং চরিত্র উপস্থাপিত, তার প্রায় সবই রবীন্দ্রনাথের পরিচিত লোকালয় থেকে গৃহীত। নগর এবং নগর-জীবনকে অবলম্বন করেই রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসগুলি মোটামুটি রচনা করেছেন, কিন্তু ছোটগল্পগুলি রচনা করেছেন পল্লীগ্রাম এবং পল্লীগ্রামের মানুষকে নিয়ে। পল্লী-বাঙ্গলার সঙ্গে তাঁর স্থায়ী পরিচয়ের সূচনা থেকেই তিনি ছোটগল্পগুলি রচনা সুরু করেন। ১৮৯১ সালে বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর জমিদারী তদারকির কাজে রবীন্দ্রনাথ পল্লীবাংলাকে ব্যাপক ও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পান। "রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে প্রকৃতিকে অন্তরঙ্গভাবে জানিয়াছিলেন, মানুষকে তেমন নিবিড়ভাবে জানিতে সুযোগলাভ করেন নাই। জমিদারী পরিদর্শন ও পরিচালনা করিতে আসিয়া বাংলার অন্তরের সঙ্গে তাঁহার যোগ হইল—মানুষকে তিনি পূর্ণদৃষ্টিতে দেখিলেন।"[১]

অত্যন্ত কাছে থেকে দেখা পল্লীবাংলার মানুষের জীবনসমস্যাই, সুতরাং, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের উপজীব্য। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে মানুষের দুঃখ-বেদনা এক অতি বস্তুনিষ্ঠ রূপায়ণলাভ করেছে,—এখানে মানুষের জীবনের যে ট্র্যাজেডি বর্ণিত হয়েছে, তা রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষদৃষ্ট,—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত। ট্র্যাজেডি রচনার কোনো তত্ত্বগত কৌশল বা শৈলীর-র আশ্রয় না নিয়েও, কেবল যা দেখেছেন তা-ই বর্ণনা করতে গিয়েই তিনি তাঁর ছোটগল্পের নর-নারীর ট্র্যাজেডি-চিত্রিত করে ফেলেছেন এবং একমাত্র সেই-

১. শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, (১৩৬৭) পৃঃ ২৭৬

কারণেই তাঁর ট্র্যাজেডি-চেতনার এক বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ছোটগল্পে।

কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ হলেও, উপন্যাসে ও নাটকে রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার যে বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়, ছোটগল্পে বিধৃত রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনায় তেমন কোনো বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায় না। উপন্যাসে—নাটকে, মানুষের জীবনে ট্র্যাজেডির কারণ এবং ফলাফল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটা সুস্পষ্ট তত্ত্বদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ছোটগল্পে মানুষের জীবনের ট্র্যাজেডি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সে রকম কোনো তত্ত্ব-দর্শনের অবতারণা করেন নি। এখানে মানুষের জীবনের দুঃখ-বেদনা-ক্ষোভ-অভিমান অত্যন্ত তীব্র হয়ে আপনা থেকেই যেন ট্র্যাজিক হয়ে উঠেছে। আমাদের দৈনন্দিন আধিভৌতিক জীবনে যে সব ট্র্যাজেডি নিত্যই সংঘটিত হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে তাই যেন শুধু চিত্রিত হয়েছে। এই অর্থে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের 'ট্র্যাজেডি-চেতনা' না ব'লে 'ট্র্যাজেডি অবলোকন' বললেও চলে। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব প্রত্যক্ষদৃষ্ট জীবনের ট্র্যাজেডি উপলব্ধিতে এবং তার বর্ণনায়। এই ট্র্যাজেডি রবীন্দ্রনাথের নিজের চোখে দেখা বলে,—এর মধ্যে স্বভাবতই একটা ঘরোয়া এবং অন্তরঙ্গ পরিবেশ গড়ে উঠেছে। এবং তার ফলেই এই ট্র্যাজেডি অনায়াস দ্রুত অথচ গভীরভাবে আমাদের চিত্তে সাড়া জাগায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর সপ্তম খণ্ডে গল্পগুচ্ছ অংশে একানব্বইটি ছোটগল্প সংগৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু ছোটগল্প বা কাহিনীর রয়েছে। গল্পগুলির পরিণতিতেই যে শেষ পর্যন্ত ট্র্যাজেডি রসের নিষ্পত্তি ঘটেছে, তা নয়, অনেক সময়েই রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের রীতিতে অনিবার্য ট্র্যাজেডির আকস্মিকতার ব্যবহার করেছেন। হয়তো আগাগোড়াই গল্পটি ট্র্যাজেডির পথ ধরে করুণ সুর নিয়ে এগিয়েছে, এবং শেষ মুহূর্তে নিতান্ত আকস্মিকভাবে সবকিছুর পরিবর্তন হয়ে গেল। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ একাধারে ছোট গল্পের রীতি ও 'মডার্ণ কমেডি'র পদ্ধতিকে আশ্রয় দিয়েছেন। তবু এরই মধ্যে আবার পরিণামে মিলন বা মিটমাট হ'য়ে যাওয়া সত্ত্বেও ট্র্যাজেডির অনুভূতি অনেক ক্ষেত্রে শেষপর্যন্ত নিরাময় লাভ করতে পারেনি, এবং সেইসব ক্ষেত্রে আমরা বাহ্যিক মিলনের মধ্যেও ট্র্যাজেডি-রসেরই স্বাদ লাভ করি। আর যে বেশ কিছু সংখ্যক গল্পের পরিণামে সুস্পষ্টভাবে ট্র্যাজেডি ঘটেছে, সেইসব গল্পে আমরা ঘটনা-গত এবং রস-গত,—দুদিক থেকেই ট্র্যাজেডির

সংবিত্তি উপলব্ধি করতে পারি। তবে একটা কথা এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরে যেহেতু রবীন্দ্রনাথ তাঁর চোখে দেখা মানুষের জীবনের ট্র্যাজেডি বর্ণনা করেছেন, সেইজন্য ট্র্যাজেডি-সৃষ্টির আঙ্গিকগত বা কৌশলগত প্রথা এর মধ্যে আদৌ রক্ষিত হয়নি, এবং হওয়া সম্ভবও ছিল না। এখানে কেবল ট্র্যাজেডি-রস কত সার্থকভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে, আমরা সেইটারই অনুসন্ধান এবং পর্যালোচনা করব।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটগল্প "ভিখারিণী"[২] (১২৮৪) কবির ষোল বছর বয়সের রচনা। রচনাটি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, "ছোটগল্প রচনার হাতে খড়ি হয় ভারতীর প্রথম দুই সংখ্যায়। 'ভিখারিণী' গল্প হিসাবে এতই নগণ্য যে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই ইহার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। 'ছেলেবেলা'য় এই গল্প সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'সেটা যে কি বকুনি। নিজে তা যাচাই করবার বয়স ছিল না। বুঝে দেখবার চোখ যেন অন্যদেরও তেমন করে খোলেনি।'"[৩] গল্পটি সম্পর্কে এইভাবে রবীন্দ্রনাথ নিজে কোনো উচ্চ ধারণা প্রকাশ না করায়, গল্পটি বহুকাল অনাদৃত অবস্থাতেই পড়েছিল। কিন্তু সে যাই হোক, এই অনাদৃত গল্পটির মধ্যেই ষোলবছরের রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজিক-জীবনবোধের একটা অস্পষ্ট পরিচয় ধরা পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সের রচনা বলেই হয়ত গল্পটিতে কিশোর-কিশোরীর রোমান্টিক প্রণয় স্বপ্ন ভঙ্গের ট্র্যাজেডি ফুটে উঠেছে। বিষয়বস্তু এবং প্রকাশ ভঙ্গিতে গল্পটি 'নলিনী', 'কবিকাহিনী' প্রভৃতির সমধর্মী।

রবীন্দ্রনাথের কিশোর কবি-মনের বিষণ্ণতা কাহিনীটির উপর ছায়াপাত করেছে। কিশোর বয়সের তাঁর প্রায় সমস্ত রচনার উপরই এই ধরনের একটা বিষণ্ণতার ছায়া লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ে তিনি প্রকৃতির মধ্যেও করুণ রাগিনী শুনতে পেতেন। তাই তাঁর পাত্র পাত্রীরা প্রকৃতির সান্নিধ্যে থেকেও জীবনের দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পায় নি। শেষ পর্যন্ত দুঃখের মধ্যে জীবনের অবসানই তাঁর এই সময়কার রচনাগুলিতে কবির বক্তব্য হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। 'ভিখারিণী' গল্পটিতেও তাই। ঘটনার ঘাত-

২. ভারতী, প্রথম বর্ষের প্রথম দুটি সংখ্যায় "ভিখারিণী" প্রকাশিত হয়।

৩. রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড, (১৩৬৭) পৃঃ ৬৭।

প্রতিঘাত নেই, ভাবনা এবং কর্মের দ্বন্দ্ব নেই। শুধু নায়ক-নায়িকার মনের একটা রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষা প্রত্যাশিত সরলরেখায় না গিয়ে ঘটনাচক্রে বা দৈবক্রমে বাঁকা পথে চলে গেল, এবং তাদের স্বপ্ন সফল হ'তে হ'তে ব্যর্থ হয়ে গেল। তাদের এই অপূর্ণ বাসনার বেদনা উভয়ের জীবনকেই ট্র্যাজিক করে তুলেছে। তবে অমর সিংহের চেয়ে কমলের ট্র্যাজেডি বেশী গভীর। কারণ, সে যেটা চেয়েছিল, সেটা ভালো করেই চেয়েছিল, কোনো নীতিবোধ বা সামাজিক প্রশ্ন তার এই চাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি (যেমন হয়েছিল অমরের কাছে)। তথাপি সে যা চেয়েছিল, তা পেল না। ঘটনাচক্রে না পাওয়াটা বেদনার, কিন্তু তা অনেক সময় সহ্য হয়ে যায়। কিন্তু নিঃসঙ্কোচে চেয়ে ব্যর্থ হওয়াটা সহনীয় বেদনার সীমা অতিক্রম ক'রে ট্র্যাজেডি হয়ে ওঠে।

'ভিখারিণী' প্রকাশের ছয় বছর পরে ১২৯১-এ একই বছরে 'ভারতী'র কার্তিক সংখ্যায় এবং 'নবজীবন' এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় যথাক্রমে 'ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা' নামে দু'টি গল্প প্রকাশিত হয়। এই দু'টি 'কথা'র মধ্যে 'ঘাটের কথায়' একটা গল্প বলার আভাস আছে, কিন্তু 'রাজপথের কথায়' আছে কেবল একটি সহানুভূতি-প্রবণ বিষণ্ণ কবিচিত্ততা। হয়তো সেইজন্যই এই রচনা দু'টি 'বিচিত্র প্রবন্ধের' ও (১৩১৪) অন্তর্গত হয়েছিল। কিন্তু 'গল্পগুচ্ছে' যখন পাকাপাকিভাবে দু'টি রচনাই গৃহীত হয়েছে, তখন দু'টি রচনাকেই আমরা গল্প হিসেবে গ্রহণ করব। আর এদের রচনারীতি যাই হোক না কেন, দু'টি রচনাতেই জীবনের দুঃখ-বেদনা-দীর্ণ ট্র্যাজিক দিকটি প্রকাশিত হয়েছে, যা আপাততঃ আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়।

'ঘাটের কথা' একটি বালবিধবার জীবন-স্বপ্নভঙ্গের করুণ ইতিবৃত্ত। কুসুম আটবছর বয়সে বিধবা হয়। স্বামীর সঙ্গে তার মাত্র দু'একদিনই দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। কারণ স্বামী বিদেশে চাকুরি করত। বিদেশ থেকে আগত পত্র-যোগেই কুসুম তার বৈধব্যের সংবাদ পেয়েছে। মাত্র আট বছর বয়সেই বৈধব্যকে বরণ করে নিয়ে সে পিত্রালয়ে গঙ্গার তীরে ফিরে আসে।

দশবছর পরে কুসুমের পিত্রালয়ে গঙ্গার তীরে এক শিবমন্দিরে একদিন এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটে। সন্ন্যাসীর খ্যাতির আকর্ষণ কুসুমের শ্বশুরবাড়ীর গ্রামে এসেও পৌঁছালো। সেখান থেকেও নরনারী এল সন্ন্যাসীকে দেখতে। অনেকের মনেই সন্দেহ হ'ল, এই কুসুমের স্বামী। কিন্তু আরো অনেকের অনাগ্রহে কথাটা ক্রমশঃ চাপা পড়ে গেল।

একদিন কুসুমের সঙ্গেই সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ হ'ল। 'যেন চেনাশোনা হইল। মনে হইল যেন পূর্বজন্মের পরিচয় ছিল।' তার পরদিন থেকেই প্রত্যহ কুসুম সন্ন্যাসীর দেবসেবায় সহায়তা করে, শাস্ত্র ব্যাখ্যা শোনে মন দিয়ে। কিন্তু কিছু দিন পর হঠাৎ একদিন এইসব কাজে কুসুমের শৈথিল্য দেখা গেল। শেষে এই শৈথিল্যের হেতু হিসাবে সন্ন্যাসীর প্রশ্নের জবাবে সে বলল, "আমি ভালো করিয়া বলিতে পারিব না, কিন্তু আপনি বোধকরি মনে মনে সকলই জানিতেছেন। প্রভু, আমি একজনকে দেবতার মতো ভক্তি করিতাম, আমি তাঁহাকে পূজা করিতাম, সেই আনন্দে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম যেন তিনি আমার হৃদয়ের স্বামী, কোথায় যেন একটি বকুল-বনে বসিয়া তাঁহার বামহস্তে আমার দক্ষিণ হস্ত লইয়া আমাকে তিনি প্রেমের কথা বলিতেছেন। এ ঘটনা আমার কিছুই অসম্ভব, কিছুই আশ্চর্য মনে হইল না। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, তবু স্বপ্নের ঘোর ভাঙ্গিল না। তাহার পরদিন যখন তাহাকে দেখিলাম, আর পূর্বের মতো দেখিলাম না। মনে সেই স্বপ্নের ছবিই উদয় হইতে লাগিল। ভয়ে দূরে পলাইলাম, কিন্তু সে ছবি আমার সঙ্গে রহিল। সেই অবধি আমার হৃদয়ের অশান্তি আর দূর হয় না—আমার সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেছে।"

কোন্ ব্যক্তিকে নিয়ে কুসুম এমন স্বপ্ন দেখেছে? সন্ন্যাসীর পীড়াপীড়িতে কুসুম সেই প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'প্রভু সে তুমি।'

তারপরই সন্ন্যাসী কুসুমকে নির্দেশ দিল, 'আমাকে তোমার ভুলিতে হইবে।' সন্ন্যাসী স্থান ত্যাগ করে চলে গেল। আর কুসুম সন্ন্যাসীকে ভুলবার জন্য গঙ্গার জলে নামল। 'এতটুকু বেলা হইতে সে এই জলের ধারে কাটাইয়াছে, শ্রান্তির সময় এ জল যদি হাত বাড়াইয়া তাহাকে কোলে করিয়া না লইবে, তবে আর কে লইবে। চাঁদ অস্ত গেল, রাত্রি অন্ধকার হইল। জলের শব্দ শুনিতে পাইলাম, আর কিছু বুঝিতে পারিলাম না।'

স্পষ্টই গঙ্গাবক্ষে কুসুমের আত্মবিসর্জনের ইঙ্গিত। এ ছাড়া হয়ত' তার সমস্যার আর কোনো সহজ সমাধানও তার কাছে নেই। এই সন্ন্যাসী কুসুমের প্রকৃত স্বামী হতেও পারে, না হতেও পারে। কিন্তু কুসুমের অনাস্বাদিত জীবন এই যুবকসন্ন্যাসীর সান্নিধ্যে মানবিক কারণেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। সেই উচ্ছ্বাস, সেই আহ্লাদ কুসুমের অপরিচিত জীবনকে নিজের কাছে অনেকটা পরিচিত করে তুলছিল। তার এই আহ্লাদ যে বাস্তবও হতে

পারে, সেই সম্ভাবনা সে দেখল রাত্রির স্বপ্নে। এবং তার পরেই এই ট্র্যাজেডি তার অবচেতন মনের স্বামী-প্রেম আর সচেতন মনের সন্ন্যাসী-ভক্তির সংঘাতে, তার সন্ন্যাসী-ভক্তির উপরে স্বামী-প্রেম যখন জয়লাভ করল, তখনই জোর করে তাকে পরাজয় স্বীকার করতে হ'ল সচেতন মনের সন্ন্যাসী-ভক্তির কাছে। লৌকিক সত্যের কাছে মনের আকাঙ্ক্ষাকে বলি দিয়ে সে নিজের ট্র্যাজেডিকে বরণ করে নিয়েছে। সন্ন্যাসীর কাছে কথা রাখবার জন্তই তার জীবনের সর্বোচ্চ দাম তাকে এই ভাবে দিতে হ'ল।

কাঁচা হাতের রচনা সন্দেহ নেই। কিন্তু এরই মধ্যে কুসুমের জীবনের দুঃখকে রবীন্দ্রনাথ তীব্রভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন, এবং তারই ফলে কুসুমের প্রতি আমরা সরাসরি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠি, আর সেখানেই ট্যাজেডি হিসেবে রচনাটির সার্থকতা।

'রাজপথের কথায়' একটি রাজপথের অভিজ্ঞতায় বিধৃত একটি অসফল-প্রেমের ক্ষুদ্র-ইংগিত। একটি বালিকা কোমল চরণ দু'খানি নিয়ে বহুদূর থেকে এসে রাজপথের পাশে দাঁড়াত। "ছোট দুটি নূপুর রুনুঝুনু করিয়া তাহার পায়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিত।" আর একজন ব্যক্তি দিনের কাজ সমাপন ক'রে উদাসভাবে গান গাইতে গাইতে সেই পথ দিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করত। বালিকাটির দিকে হয়ত তার নজরই পড়ত না। "সে চলিয়া গেলে বালিকা শ্রান্ত পদে আবার যে পথ দিয়া আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিয়া যাইত। বালিকা যখন ফিরিত, তখন জানিতাম অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে।" এই ঘটনাটি প্রতিদিন সন্ধ্যায়ই ঘটত। "একদিন ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি অপরাহ্ণে যখন বিস্তর আম্রমুকুলের কেশর বাতাসে ঝরিয়া পড়িতেছে—তখন আর একজন যে আসে সে আর আসিল না। সেদিন অনেক রাত্রে বালিকা বাড়িতে ফিরিয়া গেল। যেমন মাঝে মাঝে গাছ হইতে শুষ্ক পাতা ঝরিয়া পড়িতেছিল, তেমনি মাঝে মাঝে দুই-এক ফোঁটা অশ্রুজল আমার নীরস তপ্ত ধূলির উপরে পড়িয়া মিলাইতেছিল।" পরদিনও বালিকাটি এল। কিন্তু অন্য জন এল না। রাত্রে বালিকা ফিরে গেল। "কিছু দূরে গিয়া আর সে চলিতে পারিল না। আমার উপরে ধূলির উপরে লুটাইয়া পড়িল। দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া বুক ফাটিয়া কাঁদিতে লাগিল।" তখন রাজপথ যেন তাকে বলতে লাগল, "তুই যাহাকে ডাকিয়া সাড়া পাইলি না সে কি আমার চেয়েও মূক। তুই যাহার মুখের পানে চাহিলি সে কি আমার চেয়েও অন্ধ!

রবীন্দ্রনাথ এক অপূর্ব 'লিরিক' ধর্ম নিয়ে ভালোবাসার অচরিতার্থতা জনিত একটি ট্র্যাজেডির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেছেন এখানে,—গোপন এবং নীরব, অথচ সুগভীর প্রেমের দৈবাহত লাঞ্ছনার শোচনীয় সমাপ্তির একটি করুণ কাহিনী।

এরপর রবীন্দ্রনাথ 'বালক' পত্রিকায় (১২৯২ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ) 'মুকুট' নামে একটি গল্প প্রকাশ করেন। কিন্তু ছোটগল্প-কার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করেন 'হিতবাদী' পত্রিকায়। 'হিতবাদী' পত্রিকার তিনি ছিলেন সাহিত্য সম্পাদক। এই সময়ই জমিদারি পরিচালনা করতে এসে তিনি পদ্মাতীরে বাস করতে থাকেন। এবং সেই সুযোগেই বাস্তব মানুষের জীবনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। এর পূর্বে 'ভিখারিণী', 'ঘাটের কথা', 'রাজপথের কথা', 'মুকুট' গল্পে যে সব মানুষের চিত্র আছে, তারা হয় কবি-কল্পনার, অথবা ইতিহাসের। তাঁর নিজের চোখে দেখা মানুষ তারা নয়। নিজের চোখে দেখা মানুষের কাহিনী তিনি লিখতে সুরু করলেন 'হিতবাদী'তে। 'দেনাপাওনা', 'পোস্টমাস্টার', 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' 'হিতবাদী'তেই (১২৯৮) প্রকাশিত হয়। এইসব গল্পে মানুষ রবীন্দ্রনাথের নিজের চোখে দেখা ব'লে এইসব গল্পে বর্ণিত জীবনের দুঃখ-দুর্দশার ট্র্যাজিকরূপ আমাদের কাছেও যেন নিত্যপরিচিত হিসাবে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে।

বিবাহের পণপ্রথাকে অবলম্বন ক'রে একটি দরিদ্র কন্যার বিবাহোত্তর জীবনের লাঞ্ছনার শোচনীয় কাহিনী 'দেনাপাওনা।' পিতা রামসুন্দর কন্যা নিরুপমার বিবাহে প্রতিশ্রুত পণের ছয় সাত হাজার টাকা পরিশোধ করতে না পারায় শ্বশুর বাড়ীতে নিরুপমার অবস্থা দুঃসহ হয়ে ওঠে। "সকলেই এমন ভাব দেখায় যেন বধূর এখানে কোনো অধিকার নাই, ফাঁকি দিয়া প্রবেশ করিয়াছে।" রামসুন্দরও প্রায়ই মেয়েকে দেখতে যান। কিন্তু বেহাই-বাড়ীতে তার কোনো প্রতিপত্তি নেই। "চাকরগুলো পর্যন্ত তাহাকে নিচু নজরে দেখে। অন্তঃপুরের বাহিরে একটা স্বতন্ত্র ঘরে পাঁচ মিনিটের জন্য কোনোদিন বা মেয়েকে দেখিতে পান, কোনো দিন বা পান না।"

কন্যার অনাদর এবং নিজের অপমান রামসুন্দরের পক্ষে একটা মানসিক পীড়ন হয়ে উঠেছিল। এর একটা দ্রুত প্রতিকার করার জন্য রামসুন্দর বিস্তর সুদে অল্প অল্প করে টাকা ধার করতে লাগলেন। ক্রমে সংসারের দারিদ্র্য এমন

এক স্তরে এসে পৌছালো, যখন দিন কাটানো একবারে অসম্ভব। "নিরু বাপের মুখ দেখিয়া সব বুঝিতে পারিল। বৃদ্ধের পক্ককেশে শুষ্ক মুখে এবং সদা সঙ্কোচভাবে দৈন্য এবং দুশ্চিন্তা প্রকাশ হইয়া পড়িল। মেয়ের কাছে যখন বাপ অপরাধী, তখন সে অপরাধের অনুতাপ কি আর গোপন রাখা যায়। রামসুন্দর যখন বেহাই-বাড়ীর অনুমতিক্রমে ক্ষণকালের জন্য কন্যার সাক্ষাৎ লাভ করিতেন, তখন বাপের বুক যে কেমন করিয়া ফাটে, তাহা তাহার হাসি দেখিলেই টের পাওয়া যাইত।"

এই ব্যথিত পিতৃ-হৃদয়কে সান্ত্বনা দেবার জন্য নিরু রামসুন্দরকে বলল, "বাবা, আমাকে একবার বাড়ী লইয়া যাও।" রামসুন্দর বললেন, "আচ্ছা।" কিন্তু তাঁর কোন জোর নেই। নিজের কন্যার উপর পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার আছে, তা যেন পণের টাকার পরিবর্তে বন্ধক রাখতে হয়েছে। এমন কি কন্যার দর্শন, সেও অতি সংকোচে ভিক্ষা চাইতে হয়, এবং সময় বিশেষে নিরাশ হলে দ্বিতীয় কথাটি বলবার মুখ থাকে না।

অবশেষে একদিন বহুকষ্টে তিনহাজার টাকা যোগাড় করে রামসুন্দর নিরুর শ্বশুর রায় বাহাদুরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। রায়বাহাদুর মাত্র তিন হাজার টাকার নোট দেখে অট্টহাস্যে তা ফিরিয়ে দিলেন। তাঁর পাওনা আরো বেশী। রামসুন্দর নিরুকে একবার পিতৃ-গৃহে নিয়ে যাবার প্রসঙ্গ তুললেন, এবং তা এক কথাতেই নামঞ্জুর হয়ে গেল।

এরপর রামসুন্দর সমস্ত টাকা শোধ করে দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। বাড়ী বিক্রী করে টাকা যোগাড় করলেন। পূজোর সময় পঞ্চমীর কি ষষ্ঠীর দিনে দৈন্য পীড়িত গৃহের ক্রন্দনধ্বনি কানে নিয়ে বৃদ্ধ পাওনা টাকা সমস্তটাই সঙ্গে নিয়ে বেহাই-বাড়ী এসে উঠলেন। দীর্ঘ-অদর্শনের পর পিতা ও কন্যার সাক্ষাৎকারে উভয়েরই চোখ থেকে আনন্দাশ্রু পড়তে থাকল। কিন্তু নিরু যখন জানতে পারল যে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বিক্রী করে এই টাকার যোগাড় হয়েছে, তখন সে কিছুতেই এই টাকা শ্বশুরকে দিতে দিল না। রামসুন্দর বললেন, "তাহলে তোমাকে যেতে দেবে না, মা।" নিরুপমা বলল, "না দেয় তো কি করবে। বলো। তুমিও আর নিয়ে যেতে চেয়ো না।"

এই ঘটনার পর পিতৃ-গৃহের সঙ্গে নিরুকে আর যোগাযোগ রাখতে দেওয়া হয়নি। আর স্বামীও তার বিদেশে থাকে। সুতরাং এখন থেকে সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। আত্ম-কৃচ্ছ্রের পথ ধরল নিরু। কঠিন পীড়ায় অচিরেই আক্রান্ত

হ'ল। অবশেষে একদিন সবিনয়ে শ্বশ্রূমাতাকে বলল, "বাবাকে আর আমার ভাইদের একবার দেখব, মা!" শ্বশ্রূমাতা বললেন, "কেবল বাপের বাড়ী যাইবার ছল।"

যেদিন সন্ধ্যার সময় নিরুর শ্বাস উঠল, সেইদিনই প্রথম তাকে ডাক্তার দেখল, এবং সেইদিনই ডাক্তারের দেখা শেষ হ'ল।

"বাড়ির বড় বউ মরিয়াছে। খুব ধুম করিয়া অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। প্রতিমা বিসর্জনের সমারোহ সম্বন্ধে জেলার মধ্যে রায় চৌধুরীদের যেমন লোকবিখ্যাত প্রতিপত্তি আছে, বড় বউএর সংকার সম্বন্ধে রায়বাহাদুরদের তেমনি একটা খ্যাতি রহিয়া গেল—এমন চন্দন-কাষ্ঠের চিতা এ মুলুকে কেহ কখনো দেখে নাই।" রবীন্দ্রনাথের এই ব্যঙ্গ রায়বাহাদুর পরিবারের হৃদয়হীনতাকে যেমন প্রকাশ করে, তেমনি স্পষ্ট ক'রে তোলে নিরুপমার শোচনীয় জীবন কাহিনী।

এখানে ট্র্যাজেডি রামসুন্দর এবং নিরুপমা দু'জনের জীবনেই ঘটেছে—নিরুপমার জীবনের ট্র্যাজেডিই বেশী মর্মান্তিক। এখানে ট্র্যাজেডির মূলে আছে একটা পারিবারিক প্রথার সংকীর্ণ চিত্তবৃত্তি। স্বার্থপরতা এবং অর্থ-লিপ্সা মানুষকে কতটা নিষ্ঠুর করে তুলতে পারে এবং কি ভাবে অপরের জীবনের ট্র্যাজিক সর্বনাশ সাধন করতে পারে, তা দেখানো হয়েছে এই গল্পটিতে। প্রেম, ভালোবাসা বা অন্য কোনো নৈতিক মূল্যবোধের সংঘাতে এখানে ট্রাজেডি ঘটেনি। একটা রূঢ় বাস্তব সমস্যার সংঘাতে ঘটেছে এই ট্র্যাজেডি। সমস্যাটি মূঢ় এবং রূঢ়, কিন্তু বাস্তব এবং স্পষ্ট। লেখকের কলা-নৈপুণ্য ব্যতিরেকেও তাই এর ট্র্যাজিক দিকটা ফুটে ওঠে এবং এই কাহিনীতেও তাই হয়েছে। এইজন্যই এই কাহিনীটির এই সমালোচনাই সঠিক বলে মনে হয়: "গল্পটির বিশেষ কিছু সাহিত্য মূল্য যে আছে, এমন নয়। তবু এই গল্পটির উল্লেখ করিলাম এইজন্য যে, গল্প রচনার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পরিবার ও সমাজের নানান বিধানের ফলে ব্যক্তিজীবনে যে নিদারুণ দুঃখ ও বেদনা জমা হইয়া আছে তাহা কবিচিত্তে কিভাবে রসসঞ্চার করিয়াছে, তাহার একটি প্রথমমত দৃষ্টান্ত হিসাবে।[৪]

'পোষ্টমাস্টার' একটি 'গিতধর্মী' গল্প। "একটি স্বজন হারা নিঃসহায় গ্রাম-

৪. ডঃ নীহার রঞ্জন রায়: রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, ২য়, (১৩৫৩) পৃঃ ২০৯

বালিকার স্নেহ-লোলুপ হৃদয় আসন্ন স্নেহবিচ্যুতির আশঙ্কায় কি সকরুণ অশ্রু সজল ছায়াপাত করিয়াছে এই গল্পটির উপর !"[৫]

উলাপুর নামে এক গণ্ডগ্রামে পোস্টমাস্টারের চাকরী নিয়ে এক শহুরে যুবকের আগমন। রতন নামে একটি বারো তেরো বছরের অনাথা বালিকা তার কাজকর্ম করে দেয়। নিঃসঙ্গ পোস্টমাস্টার যেমন রতনকে পেয়ে দুটো-একটা কথা বলার সুযোগ পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, তেমনি অনাথা রতন পোস্টমাস্টারের কাজকর্ম উপলক্ষ্যে যেন একটা নিশ্চিত আশ্রয় খুঁজে পেল। রতনের সঙ্গে পোস্টমাস্টারের আত্মীয় সুলভ আন্তরিক আচরণের সূত্রধরে রতন অবশেষে নিজেকে পোস্টমাস্টারের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলেই মনে করতে লাগল, এবং পোস্টমাস্টারের পরিবারের লোকদের মা, দিদি, দাদা বলে চিরপরিচিতের ন্যায় উল্লেখ করত। স্বভাবতঃই পোস্টমাস্টার যখন শারীরিক কারণে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে বাড়ী চললেন, তখন রতনের আশা হয়েছিল যে সেও সঙ্গে যাবে। পোস্টমাস্টার আর কখনোই এ গ্রামে আসবেন না বলায় "অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা কহিল না। মিট মিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং একস্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া সরার উপর টপ টপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।"

"কিছুক্ষণ পরে রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নাঘরে রুটি গড়িতে গেল। অন্যদিনের মত তেমন চটপট হইল না। বোধ করি মধ্যে মধ্যে মাথায় অনেক ভাবনা উদয় হইয়াছিল। পোস্টমাস্টারের আহার সমাপ্ত হইলে পর বালিকা হঠাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে ?"

পোস্টমাস্টার হেসে জবাব দিলেন, 'সে কী করে হবে।' ব্যাপারটা যে কী কী কারণে অসম্ভব তা বালিকাকে বোঝানোর দরকার হল না।

"সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্টমাস্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল 'সে কী করে হবে।'

তারপর পোস্টমাস্টার প্রত্যহই একাকী বিদায় নিলেন। তাঁর মনেও 'একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল।' তবে তিনি একটি তত্ত্বের দ্বারা সান্ত্বনাও পেলেন, 'জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, পৃথিবীতে কে কাহার।'

---

৫. ডঃ নীহার রঞ্জন রায়। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, ২য়। ১৩৫৩। পৃঃ ১৮৮।

'কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্ট-আপিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধকরি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে —সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না।'

বারো তেরো বছরের অনাথা বালিকা পোস্টমাস্টারকে নিয়ে কি ভেবেছিল, কে জানে! জগৎসংসার সম্পর্কে অনাথা বলেই ঐ বয়সে হয়তো কোনো ধারণাই তার গড়ে ওঠেনি। শুধু এইটুকুই নিশ্চিত করে বলা যায় যে, পোস্টমাস্টারকে অবলম্বন ক'রে সে একটা নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে পরম আহ্লাদিত হয়েছিল। হয়তো এর সঙ্গে হৃদয়ের কিছু অতিরিক্ত ভালো-লাগাও মিশ্রিত ছিল। আত্মীয়-সম্পর্ক রিক্ত অনাথাটি পোস্টমাস্টারের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কের একটা অস্পষ্ট রোমান্স-রসেরও হয়তো স্বাদ লাভ করেছিল। এ সবই ছিল ঐ সময়ে তার জীবনে একটা মস্তবড় প্রাপ্তি,—যা তার কাছে শূন্য হয়ে গেল পোস্টমাস্টারের বিদায়ে। এখানেই ট্র্যাজেডি,—অপ্রাপ্যকে পেয়ে আবার চিরকালের জন্য হারানোর বেদনা-গভীর ট্র্যাজেডি।

রতনের এই বেদনা-গভীর ট্র্যাজেডি আরো ঘনীভূত হয়েছে পোস্ট-মাস্টারের সঙ্গী হতে চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায়। সে পোস্টমাস্টারের সঙ্গে যেতে না চাইলেও তার বুকে যথেষ্ট বেদনা বাজত, কিন্তু সেই বেদনা অনেক গভীর এবং মর্মান্তিক হ'ল যেতে চেয়েও প্রত্যাখ্যাত হওয়ায়—এবং এখানেই রতনের কাহিনীর করুণ রস তীব্রতর হয়ে ট্র্যাজেডিরসে পরিণত হয়েছে।

'তারাপ্রসন্নের কীর্তি'তে বাস্তবের সংঘাতে ভাব-বিলাসীর ট্র্যাজেডি।[৮] লেখক তারাপ্রসন্ন সম্পর্কে পত্নী দাক্ষায়ণীর বিরাট ধারণা। স্বামী কেবল লাজুক প্রকৃতির বলেই যথেষ্ট ক্ষমতা সত্ত্বেও অর্থ-উপার্জন করতে পারেন না। কন্যারা বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠলে দাক্ষায়ণী গহনা বন্ধক রেখে গ্রন্থপ্রকাশের তাগাদা দিয়ে স্বামীকে কলকাতা পাঠালেন। 'বেদান্ত প্রভা' প্রকাশিত হল. খ্যাত-অখ্যাত পত্রিকায় গ্রন্থের সমালোচনা হ'ল। কিন্তু বই বিক্রী হ'ল না। এদিকে দাক্ষায়ণীর পুনবায় সন্তান সম্ভাবনায় তারাপ্রসন্ন গৃহে ফিরলেন। পত্নীর প্রত্যাশা, স্বামী অনেক অর্থ উপার্জন করে এনেছেন আশাভঙ্গ হলে সমস্ত দুঃখের জন্য নিজেকে এবং কিছুটা কন্যাদের দায়ী ক'রে অহর্নিশি

৮ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : কথা কোবিদ রবীন্দ্রনাথ, (১৩৭৩) পৃঃ ৬

অশান্তিতে কালাতিপাত করলেন। হতাশায় এখন তার বিশ্বাস হ'ল তাঁর পুনরায় একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করবে, এবং তার পরে তিনি আর বাঁচবেন না। সেইহেতু স্বামীর পায়ের ধুলা মাথায় নিলেন। যথাকালে কন্যার জন্ম হ'ল, নাম দিলেন 'বেদান্ত প্রভা', এবং পরমুহূর্তেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। আশাভঙ্গ, আত্ম-গ্লানি—এবং তার পরিসমাপ্তির করুণ কাহিনী 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি',—বস্তুতঃই 'বাস্তবের সংঘাতে ভাব বিলাসীর ট্র্যাজেডি।'

'হিতবাদী'-তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি খুব উন্নতমানের ছিল না। কারণ 'হিতবাদীর' কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের কাছে সব সময়ই খুব হাল্কা ধরনের গল্প চাইতেন। হয়তো রবীন্দ্রনাথকেও এই চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো আর্টিস্টের পক্ষে ফরমাইশি গল্প লেখা অসম্ভব, তাই অল্প দিনের মধ্যে 'হিতবাদী'র সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেল।

তারপর ঠাকুরবাড়ীর নিজস্ব পত্রিকা 'সাধনায়' (১২৯৮) রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনভাবে ছোটগল্প রচনার সুযোগ পেলেন। ১২৯৮, অগ্রহায়ণ থেকে ১৩০২ আশ্বিন পর্যন্ত 'সাধনায়' রবীন্দ্রনাথ ছত্রিশটি ছোটগল্প রচনা করেন। এই সব গল্পের কাহিনী রবীন্দ্রনাথের নিজের কানে শোনা, আর এই সব গল্পের নায়ক-নায়িকা রবীন্দ্রনাথের নিজের চোখে দেখা। সাধনার এই গল্পগুলির অধিকাংশই ট্র্যাজেডি; কতকগুলির পরিসমাপ্তি অত্যন্ত নিষ্ঠুর।

'সাধনায়' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' আদর্শের জন্য স্বার্থ বলি দেওয়ার একটি ট্র্যাজেডিরসাত্মক কাহিনী। নিজের অসাবধানতায় প্রভু অনুকূলের শিশুপুত্রটি পদ্মাবক্ষে নিমজ্জিত হয়েছে,—স্বকৃত এই অপরাধকে রাইচরণ কখনই ছোট করে দেখতে পারেনি। সেইজন্য পরে তার নিজের পুত্র জন্মগ্রহণ করলে সে মনে করল, 'প্রভুর একমাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে পুত্র সুখ উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক।'—ক্রমে তার মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হ'ল যে, খোকাবাবু তার মায়া ছাড়াতে না পেরে তারই পুত্রের রূপ ধরে তার ঘরে এসে জন্মগ্রহণ করেছে। সুতরাং সে নিজের ছেলেকে 'বড়ো ঘরের ছেলের' মতো ক'রে মানুষ করতে লাগল। ফলে 'পুত্রও বাপকে ঠিক বাপের মতো মনে করিত না। কারণ রাইচরণ স্নেহে বাপ এবং সেবায় ভৃত্য ছিল এবং···সে যে ফেল্‌নার বাপ্‌ একথা সকলের কাছেই গোপন রাখিয়াছিল।'

বারো বছর পর্যন্ত এইভাবে পুত্রকে ধনীর সন্তানের মতো ক'রে মানুষ করার পর যখন ব্যাপারটা রাইচরণের সাধ্যতীত হয়ে উঠল, তখন, একদিন রাইচরণ নিজপুত্রকে অনুকূল-দম্পতির হস্তে সমর্পণ করল। বলল, সেই অনুকূলের পুত্রকে চুরি করেছিল। অনুকূল রাইচরণের পুত্রকে নিজের পুত্র হিসাবে গ্রহণ করলেন, কিন্তু রাইচরণের এরূপ অপহরণের অপরাধ মার্জনা করতে পারলেন না। রাইচরণের পুত্র যখন দেখল যে, সে মুন্সেফের সন্তান, রাইচরণ তাকে এতদিন চুরি করে নিজের সন্তান বলে অপমানিত করেছে, তখন তার মনে মনে কিছু রাগ হ'ল। তথাপি 'উদারভাবে' সে পিতাকে বলল, 'বাবা, উহাকে মাপ করো। বাড়িতে থাকিতে না দাও, উহার মাসিক কিছু টাকা বরাদ্দ করিয়া দাও।'—এইখানেই রাইচরণের জীবনের সবচেয়ে বড়ো বেদনার সৃষ্টি হয়েছে। নিজের পুত্র অপরের হাতে চলে যাচ্ছে, কোনো দ্বিধা নেই—উপরন্তু কত স্পষ্ট ও নিদারুণভাবে পিতাকে অস্বীকার করছে। যদিও রাইচরণ নিজ পুত্রকে প্রভুর সন্তান ভেবেই মানুষ করেছিল, কিন্তু সেটা তার আদর্শ। বাস্তব দিক থেকে সে তার নিজের সন্তানকেই বাৎসল্য দিয়ে মানুষ করেছিল। মনে যা ভেবে এসেছে, তাকে কার্যকরী করিতে গিয়ে মনের মধ্যে কি কোনো দ্বিধাই দেখা দেয়নি? নিজে হয়ত দ্বিধাকে প্রকাশ করল না, কিন্তু পুত্রের মধ্যেও যে রাইচরণের প্রতি মমতা-জনিত কোনো দ্বিধা দেখা দিল না! এমন কিছু অভাবনীয় ঘটনাও তো ঘটতে পারত যাতে রাইচরণের পুত্র রাইচরণের কাছেই থেকে যেত। কিন্তু কিছুই হ'ল না। বরং সব কিছুই রাইচরণের চিত্ত বিদারণের কারণ হয়ে তার পুত্রকে মুন্সেফের পুত্র হিসেবে স্বীকৃতি দিল।

রাইচরণ সবচেয়ে বড়ো আঘাত পেয়েছে পুত্রের কাছ থেকে প্রাপ্ত অবহেলায়—যখন সে তার মুন্সেফ পিতাকে বলল, রাইচরণের জন্য একটা মাসিক বরাদ্দের ব্যবস্থা করে দিতে। রাইচরণের দেহের সমস্ত রক্ত যে অপত্য সম্পর্ক নিয়ে মুগ্ধ, পুত্রের আচরণে সে সম্পর্কের কি কিছুই ফুটবে না? এতদিন তার পুত্র যে তাকে অনেকটা ভৃত্য রূপে দেখত, তার মধ্যে হয়তো রাইচরণের একটা সান্ত্বনা ছিল, কারণ সে যে তার ছেলেকে বড়োঘরের ছেলের মতো ক'রে মানুষ করতে পারছে, সেই সাফল্যের একটা স্বীকৃতি সে পেত এর মধ্যে। তাছাড়া সমস্ত ব্যাপারটাই তখন তার কাছে ছিল আদর্শ। বাইরের দিক থেকে যাইহোক, ভিতরের দিক থেকে পুত্র তার কাছে পর হয়ে

যায়নি। আজ সেই পুত্র তার কাছে পর হয়ে যাচ্ছে বস্তুতঃই। এই বেদনা রাইচরণের কাছে মর্মান্তিক। তাই পুত্রের কথার জবাবে সে কিছু বলল না। কেবল পুত্রের মুখের দিকে একবার নিরীক্ষণ ক'রে সেখান থেকে বিদায় হয়ে গেল।

প্রভু-পুত্রকে হারানোর শাস্তি সে নিজেই নেবে ঠিক করেছিল, কিন্তু তা যে এমন মর্মান্তিক হয়ে দেখা দেবে,—সে শাস্তি যে এতখানি ট্র্যাজিক হয়ে উঠবে কার্যকালে, তা কি তার জানা ছিল? অবশ্য সে তার আদর্শকে রক্ষা করল, কিন্তু মূল্য দিল তার চেয়েও অনেক বেশী,—মূল ট্র্যাজেডি এখানেই।

'সাধনায়' প্রকাশিত গল্পগুলির মধ্যে যেগুলির পরিসমাপ্তি অত্যন্ত নিষ্ঠুর, তাদের মধ্যে সম্পত্তি সমর্পণ, কঙ্কাল, জীবিত ও মৃত, স্বর্ণমৃগ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

'সম্পত্তি সমর্পণ' কৃপণ বৃদ্ধের অর্থগৃধ্নুতার ট্র্যাজিক পরিণতির কাহিনী। পিতা যজ্ঞনাথের কৃপণতার জন্য পুত্রবধূর চিকিৎসা হয়নি! পুত্রবধূর মৃত্যু হ'ল। ক্ষোভে অভিমানে পুত্র বৃন্দাবন শিশুপুত্র গোকুলকে নিয়ে গৃহত্যাগ করে এবং ভিন্ন গ্রামে বাস করতে থাকে। বৃন্দাবন—দামোদর পাল এবং শিশুপুত্র গোকুল—নিতাই পাল নামে পরিচিত হতে থাকে।

বৃন্দাবনের গৃহত্যাগের পর গোকুলের বিহনে বৃদ্ধ যজ্ঞনাথের বড়ই অস্বস্তিতে ও দুঃখে কাল কাটতে থাকে। কিছুকাল পরে পথে এক অপরিচিত দুরন্ত বালক হিসেবে সে নিতাই পালকে দেখতে পায় এবং ঘরে নিয়ে এসে সমাদর করতে থাকে। বালকটি যে তারই পৌত্র, তা বৃদ্ধ যজ্ঞনাথ আদৌ বুঝতে পারেনি। পরের ছেলে হিসেবেই সে নিতাইকে বুঝেছিল। বৃদ্ধ এই নিতাইকেই সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে যেতে মনস্থ করে। এবং নির্দিষ্ট দিনে সে এক জঙ্গলের অভ্যন্তরে একটি ভাঙ্গা মন্দিরের নীচে এক গহ্বরের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে নিতাইকে নিয়ে যায়। যেখানে টাকা ও মোহরে পরিপূর্ণ কলসগুলির উত্তরাধিকারী হিসেবে এই অপরিচিত নিতাইকে অভিষিক্ত ক'রে বৃদ্ধ গহ্বর থেকে উপরে উঠে আসে এবং গহ্বরের মুখটি মাটি ও ঘাসের চাপড়া দিয়ে এমনভাবে বন্ধ করে দেয়, যেন বাইরে থেকে কিছু বোঝা না যায়। এইভাবে অর্থমোহে এবং কৃপণতার অন্ধতায় বৃদ্ধ পিতামহ স্বীয় পৌত্রকেই জীবন্ত সমাধি দিয়ে ফেলল।

প্রভাতে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতেই পুত্র বৃন্দাবনের সঙ্গে বৃদ্ধের দেখা।

বৃন্দাবন তার পলাতক পুত্র গোকুলকে খুঁজছে, সে জানাল, গোকুলেরই বর্তমান নাম নিতাই পাল।

এই কথা শোনার পর 'বৃদ্ধ দশ অঙ্গুলি দ্বারা আকাশ হাতড়াইতে হাতড়াইতে যেন বাতাস আঁকাড়িয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।' তারপরই বৃদ্ধ বৃন্দাবনকে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কান্না শুনিতে পাইতেছ।' তারপর থেকে বৃদ্ধ যাকেই দেখে, জিজ্ঞাসা করে, 'কান্না শুনিতে পাইতেছ?' পৌত্র-নিধনের এই অন্তর্জ্বালা নিয়েই উন্মাদ এবং বিকার-গ্রস্ত অবস্থায় বৃদ্ধের মৃত্যু হয়।

অর্থের প্রতি অত্যন্ত লালসাই বৃদ্ধের এই ট্র্যাজিক পরিণতির কারণ। সে নিজে মৃত্যুর সময় সঞ্চিত অর্থ নিয়ে যেতে পারবে না বলেই কারো কাছে এই অর্থ গচ্ছিত রেখে যেতে হবে। কিন্তু যার কাছে গচ্ছিত রেখে যাবে, সে যদি অর্থের অপচয় করে—এই ভয়েই সে এমনভাবে সম্পত্তি সমর্পণ করে গেল যার মধ্যে অপচয়ের কোনো ভয় নেই,—অর্থ অব্যয় হয়ে থাকবে।

অপরিজ্ঞাত নিতাই পালকেই বৃদ্ধ এমনভাবে প্রাণের বিনিময়ে সম্পত্তি সমর্পণ করতে পেরেছিল, নিজ পুত্র বা পৌত্রকে হয়তো পারত না, এবং যে কারণে পারত না, সেইটাই নিতাই-এর প্রকৃত পরিচয় জানার পর বৃদ্ধের জীবনে ট্র্যাজেডির কারণ হয়ে দাড়াল। পুত্র ও পৌত্রের চলে যাওয়ার পর আত্মীয়বিক্ত অবস্থা বৃদ্ধের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। বিশেষতঃ পৌত্রের অবর্তমানে তার কাছে জগৎসংসার শূন্য হয়ে উঠেছিল। এমন কি তার সম্পত্তির উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হিসেবে পৌত্রের কথাই সে সেই সময় ভাবছিল সবচেয়ে বেশী। নিতাই পালকে সম্পত্তি সমর্পণ করার সময়েও বৃদ্ধ নিতাইকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল যে, "যদি কখনো আমার নিরুদ্দেশ নাতি গোকুলচন্দ্র, কিম্বা তাহার ছেলে, কিম্বা তাহার পৌত্র, কিম্বা তাহার প্রপৌত্র, কিম্বা তাহার বংশের কেহ আসে তবে তাহার কিম্বা তাহাদের হাতে এই সমস্ত টাকা গণিয়া দিতে হইবে।" এমন কি সে যখন নিতাইকে গহ্বরের মধ্যে ফেলে রেখে উপরে উঠে আসছিল, তখনও শেষবারের মতো নিতাইকে মনে করিয়ে দিয়েছিল, "কিন্তু মনে রাখিস, যজ্ঞনাথের পৌত্র বৃন্দাবনের পুত্র গোকুলচন্দ্র।"

যে গোকুলচন্দ্রের জন্য বৃদ্ধের এত আগ্রহ, এত আকুলতা, বৃদ্ধ তারই ঘাতক। গল্পটির ট্র্যাজেডি এখানেই। অর্থান্ধতা যজ্ঞনাথকে যে শুধু উদ্‌ভ্রান্ত

করেছিল, তাই নয়, তাকে মতিভ্রান্তও করেছিল। তাই সে অর্থকে আগ্‌লাবার জন্য একজনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি। এইটিই তার ট্র্যাজেডির কারণ। এই ট্র্যাজেডি তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি যতক্ষণ না সে এই মৃত্যুর নিষ্করুণ রূপটি দেখতে পেয়েছে। যখন সে বুঝল যে, সে তার পৌত্রকেই মৃত্যুর গহ্বরে সম্পত্তি-সমর্পণ করেছে, তখন এই মৃত্যুর ভয়াবহ নিষ্করুণ রূপটি তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল, এবং অর্থগত-প্রাণতার ট্র্যাজেডি তাকে গ্রাস করে ফেলল।

অর্থ-গৃধ্নুতার এই ট্র্যাজেডির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তব্যের সন্ধান পাওয়া যায়,—অর্থ লিপ্সা মানুষের মনুষ্যত্বেরই ঘাতক, (যেমন 'সম্পত্তি সমর্পণ' গল্পে সর্বাগ্রে নিহত হয়েছে যজ্ঞনাথের মনুষ্যত্ব)—এই বক্তব্যই যেন রবীন্দ্রনাথ গল্পটির ট্র্যাজেডির মধ্যদিয়ে বিবৃত করেছেন। পরবর্তীকালে 'রক্তকরবী' নাটকে এই বক্তব্যই আরো সুন্দর এবং সুস্পষ্ট নাটকীয়রূপ লাভ করেছে।

'কঙ্কাল' গল্পটি এক বালিকা-বিধবার বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠা জীবন-আকাঙ্ক্ষার অচরিতার্থতার বিষাদান্ত কাহিনী। কৌতুকচ্ছলে গল্পটি কথিত। কিন্তু গল্পের শেষে বেদনা কৌতুকের আবরণে আর আচ্ছন্ন থাকেনি। বিধবা বালিকাটি তার পিতৃগৃহে বাস করত। যৌবনকালে সে নিজের রূপ-সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। জীবন-উপভোগের অপরিসীম আকাঙ্ক্ষা এবং সংসার সুখের আতীব্র বাসনা তার মনের মধ্যে উদ্বেল হয়ে উঠল। অপ্রাপনীয় পুরুষের ভালোবাসা তার কাছে কল্পনায় রূপ ধরে এল: "বাগানের গাছতলায় আমি একা বসিয়া ভাবিতাম, সমস্ত পৃথিবী আমাকেই ভালোবাসিতেছে, সমস্ত তারা আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে, বাতাস ছল করিয়া বারবার দীর্ঘ নিশ্বাসে পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং যে তৃণাসনে পা দু'টি মেলিয়া বসিয়া আছি, তাহার যদি চেতনা থাকিত, তবে সে পুনর্বার অচেতন হইয়া যাইত। পৃথিবীর সমস্ত যুবা পুরুষ ওই তৃণপুঞ্জরূপে দল বাঁধিয়া নিস্তব্ধে আমার চরণবর্তী হইয়া দাঁড়াইয়াছে এইরূপ আমি কল্পনা করিতাম; হৃদয়ে অকারণে কেমন বেদনা অনুভব হইত।"

এই সময় রোগশয্যায় তার সঙ্গে তার দাদার বন্ধু শশিশেখর ডাক্তারের পরিচয় হয়। এই পরিচয় কালক্রমে প্রণয়ে পরিণত হয়। তরুণী বিধবার জগৎ এক ডাক্তার এবং তাকে নিয়ে পূর্ণ হয়ে উঠল। বিধবাটি নিজেই

বলছে, "সেই হইতে আমি আর একলা ছিলাম না, যখন চলিতাম নত নেত্রে চাহিয়া দেখিতাম পায়ের অঙ্গুলিগুলি পৃথিবীর উপরে কেমন করিয়া পড়িতেছে এবং ভাবিতাম এই পদক্ষেপ আমাদের নূতন পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তারের কেমন লাগে; মধ্যাহ্নে ··আমি একখানি ধবধবে চাদর পাতিয়া নিজের হাতে বিছানা করিয়া শয়ন করিতাম, একখানি অনাবৃত বাহু কোমল বিছানার উপরে যেন অনাদরে মেলিয়া দিয়া ভাবিতাম, এই হাতখানি এমনি ভঙ্গিতে কে যেন দেখিতে পাইল, কে যেন দুইখানি হাত দিয়া তুলিয়া লইল, কে যেন ইহার আরক্ত করতলের উপরে একটি চুম্বন রাখিয়া দিয়া আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া যাইতেছে।"···

কিন্তু ডাক্তারকে নিয়ে তার এই সমস্ত রঙীন স্বপ্নের উপর বজ্রাঘাত হল, যেদিন সে শুনল ডাক্তারের অন্যত্র বিবাহ। অন্যত্র বিবাহে ডাক্তারেরও যে আনন্দ ছিল না, তা ও বোঝা যায়। কিন্তু বিধবার সঙ্গে বিবাহে বোধহয় কিছু সামাজিক বাধা ছিল, তাই অন্যত্র বিবাহ তাকে করতেই হচ্ছে হয়ত। কিন্তু সে যাই হোক, তার এই বিধবা প্রণয়িণী তাকে নিষ্কৃতি দেয় নি। বিবাহে যাত্রা করার পূর্ব মুহূর্তে দাদার সঙ্গে মদ্যপানের সময় ডাক্তারের গ্লাসে বিষ মিশিয়ে রেখে সে ডাক্তারের মৃত্যুর ব্যবস্থা করে রেখেছিল। তারপর—(বিধবার নিজের কথায়),—

—"বাঁশি বাজিতে লাগিল, আমি একটি বারাণসী শাড়া পরিলাম, যতগুলি গহনা সিন্দুকে তোলা ছিল সবগুলি বাহির করিয়া পরিলাম—সিঁথিতে বড়ো করিয়া সিঁদুর দিলাম। আমার সেই বকুলতলায় বিছানা পাতিলাম।

বাঁশির শব্দ যখন ক্রমে দূরে চলিয়া গেল, জ্যোৎস্না যখন অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল, এই তরুপল্লব, এবং আকাশ এবং আজন্মকালের ঘর-দুয়ার লইয়া পৃথিবী যখন আমার চারিদিক হইতে মায়ার মতো মিলাইয়া যাইতে লাগিল, তখন আমি নেত্র নিমীলন করিয়া হাসিলাম।

ইচ্ছা ছিল যখন লোকে আসিয়া আমাকে দেখিবে তখন এই হাসিটুকু যেন রঙীন নেশার মতো আমার ঠোঁটের কাছে লাগিয়া থাকে।'

বিধবার অনাস্বাদিত জীবন-রসকে আস্বাদ করার আতীব্র বাসনা এখানে প্রকাশ পেয়েছে। জীবনের আশা ভঙ্গে সে মৃত্যু বরণ করছে, কিন্তু তখনও মুখে হাসি টেনে সে পৃথিবীর কাছে জানিয়ে যেতে চাইছে জীবন সম্পর্কে তার রঙীন নেশাকে। এত গভীর, এত তীব্র এবং এত ন্যায্য জীবনআকাঙ্ক্ষার

অপ্রাপ্য ব্যর্থতাই একটা ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডির কারণ কে? ডাক্তার? অবশ্যই নয়। কারণ ডাক্তার প্রণয়-প্রতারক নয়—সে বিধবাকে জীবনরসে মাতিয়ে তোলে নি প্রণয়-নিশ্চয়তা দিয়ে। বিধবা নিজেই ডাক্তারকে অবলম্বন করে মুগ্ধ হয়ে উঠেছে একতরফাভাবে,—এর আগে সে যেমন মুগ্ধ ছিল নিজেকে নিয়েই। নিজেকে সে ভালো বাসত। নিজের ভালো-বাসাকে চূড়ান্ত করে পাবার জন্যই পুরুষ হিসেবে ডাক্তারের ভালোবাসা তার কাছে এত আকাঙ্ক্ষিত ছিল। এই আকাঙ্ক্ষা তাকে নেশার মতো মাতিয়ে রেখেছিল। কিন্তু বাধা হ'ল তার ভাগ্য। ডাক্তারকে একতরফা ভাবে—এত তীব্রভাবে কামনা করার জন্যই না পাওয়ার বেদনা সে সহ্য করতে পারল না। মৃত্যুবরণের মধ্যদিয়েই তাকে বরণ করতে হল ট্র্যাজেডি। প্রণয়চরিতার্থতার সম্ভাবনা-অসম্ভাবনার কথা ভুলে গিয়ে নিজেকে প্রণয়-বাসনা-সমুদ্রে নিক্ষেপ করাই তার জীবনে ট্র্যাজেডির ছিদ্র,—মৃত্যুবরণে যার পরিপূর্ণতা।

'কঙ্কাল' গল্পটির মতো 'জীবিত ও মৃত' গল্পটিতেও নারীহৃদয়ের নিদারুণ দুঃখের কাহিনী প্রকাশ পেয়েছে।

কাদম্বিনী নামে জনৈকা বিধবার মৃত্যুলক্ষণ দেখা দেয়। পরিজনেরা তাকে মৃত বলে মনে করে, এবং শ্মশানে নিয়ে যায়। কিন্তু শ্মশানে তার জীবন-লক্ষণ দেখা দেওয়ায় ভয়ে শবযাত্রীরা পলায়ন করে। কাদম্বিনীও নিজেকে তখন আর স্বাভাবিক মানুষ ব'লে মনে করতে পারে না,—সে শ্বশুর-গৃহে না গিয়ে তার এক সই-এর গৃহে যায়। সেখানেও খবর পৌঁছায় যে কাদম্বিনীর মৃত্যু হয়েছে। সুতরাং কাদম্বিনীর সেখানে আর থাকা হয় না। সে শ্বশুর-গৃহে ফিরে আসে। কিন্তু শ্বশুর গৃহে এসে বালক ভাশুরপো-কে দেখে (যাকে সে সন্তানের মতো পালন করত) তার মনে হ'ল, সে জীবিত আছে। "সই-এর বাড়ী গিয়া অনুভব করিয়াছিল বাল্যকালের সে সই মরিয়া গিয়াছে—খোকার ঘরে আসিয়া বুঝিতে পারিল, খোকার কাকীমা তো একতিলও মরে নাই।" শ্মশান যাত্রা, শ্মশানে অবস্থান, দাহ-উদ্যোগ প্রভৃতি সামাজিক বিধি তাকে মানসিক দিক থেকে মৃত করে ফেলেছিল। কিন্তু খোকার প্রতি স্নেহের টানে সে ঘোষণা করতে চাইল, সে মরেনি। সে অলক্ষ্যে খোকার ঘরে প্রবেশ করেছিল। একটুপরেই তাকে অন্যান্যরা দেখতে পেয়ে ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। ভাশুর স্বয়ং জোড়হাত করে খোকার কল্যাণে তাকে মায়াবন্ধন

ছিন্ন করতে বলল,—"যখন সংসার হইতে বিদায় লইয়াছ, তখন এ মায়াবন্ধন ছিঁড়িয়া যাও—আমরা তোমার যথোচিত সৎকার করিব।'

'তখন কাদম্বিনী আর সহিতে পারিল না, তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—ওগো, আমি মরি নাই গো, মরি নাই। আমি কেমন করিয়া তোমাদের বুঝাইব, আমি মরি নাই। এই দেখো, আমি বাঁচিয়া আছি।'—বলে কাঁসার বাটিটা ভূমি থেকে তুলে কপালে আঘাত করতে লাগল, কপাল ফেটে রক্ত বেরিয়ে পড়ল। তখন বলল, 'এই দেখো আমি বাঁচিয়া আছি।' কিন্তু আমাদের অস্তিত্ব পারিপার্শ্বিকের ধারণানির্ভর। অন্য প্রমাণের দ্বারা, অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। সেই জন্যই কেউই যেন কাদম্বিনীর এই বেঁচে থাকাকে স্বীকৃতি দিতে পারল না। কেউ স্তব্ধ, কেউ ভয়ে চীৎকাররত, কেউবা মূর্চ্ছিত। তখন কাদম্বিনী ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে 'ওগো আমি মরি নাই গো, মরি নাই গো, মরি নাই—বলে চীৎকার করতে করতে পুকুরের জলে আত্ম বিসর্জন করল। "কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।"

প্রকৃতপক্ষে বেঁচে থাকার মতো কোনো আকর্ষণ বিধবা কাদম্বিনীর ছিল না —কেবল মাত্র ভাশুরপোর প্রতি স্নেহ ছাড়া। তাই শ্মশান থেকে বেরিয়ে গিয়ে সে নিজেকে মৃতই ভাবছিল সবদিক থেকে,—ভাবছিল তার এই চলমান অস্তিত্বটি আসলে তার প্রেতাত্মা। এই মনোভাব নিয়ে সে শ্বশুরগৃহে যেতে পারে না, গেল সই-এর বাড়িতে। কিন্তু জীবিত মানুষের সংস্রবে মৃতের মনোভাব নিয়ে থাকা যায় না। কাদম্বিনীকেও চলে আসতে হ'ল সেখান থেকে। এল শ্বশুর-গৃহে। সেখানে ভাশুর পো-র প্রতি তার স্নেহের আকর্ষণ তাকে জগতের প্রতি, জীবনের প্রতি আকৃষ্ট এবং প্রসন্ন করে তুলল, সে আর নিজেকে মৃত মনে করল না, জীবিত মনে করল এবং জীবিত থাকতে চাইল পৃথিবীতে। কিন্তু জগৎ যাকে মৃত ব'লে জানে, তাকে জগৎ জীবিত বলে গ্রহণ করতে পারে না। তাই তার অমন আনন্দের বেঁচে থাকার পথে বাধল বিরোধ—তাকে জগৎ থেকে প্রকৃত মৃতের মতো বিদায় নিতেই হল। এখানে তার পরিস্থিতি জনিত ট্র্যাজেডি। পরিস্থিতির প্রতিকূলতায় তাকে মৃত্যুই স্বীকার করতে হল, যদিও তার অন্তর তা চাইছিল না। যেখানে একটি রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষকে পরিস্থিতির চাপে স্বীকার করতে হয় যে সে মৃত, তখন তার চেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি তার জীবনে আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু সমস্যা এখানেই যে, সে না হয় মৃত হিসেবে আত্মসমর্পণ করল, কিন্তু তার

প্রকৃতপক্ষে জীবন্ত-অস্তিত্বটাকে লুকোবে কোথায়, সেটা তো সর্বদাই তথাকথিত মৃত্যুকে অস্বীকার করে আত্মঘোষণা করবে। ভাগ্যবিড়ম্বিতা এবং অভিমানিনী কাদম্বিনী তখন সেই সমস্যার সমাধান করেছে তার জীবন্ত অস্তিত্বটাকে প্রকৃতই বিসর্জন দিয়ে।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এই গল্পের ট্র্যাজেডির দিকটার উপস্থাপনাকৌশলের প্রশংসা করে বলেছেন,—"সুকৌশল ঘটনা সন্নিবেশে গল্পটির সমগ্র আখ্যান-ভাগ সুন্দর দানা বাঁধিয়াছে, বিশেষ করিয়া জীবিতের সঙ্গে মৃতের সংঘর্ষের ট্র্যাজেডির শেষ অধ্যায়টুকু, যেখানে কাদম্বিনী অনেকদিন পরে অনুভব করিল যে সে মরে নাই—সেই পুরাতন ঘরদ্বার, সেই সমস্ত, সেই খোকা, সেই স্নেহ, তাহার পক্ষে সমান জীবন্তভাবেই আছে, মধ্যে কোনও বিচ্ছেদ কোনও ব্যবধান জন্মায় নাই।"[৭]

'স্বর্ণমৃগ' গল্পটি 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' গল্পটির মতোই অর্থোপার্জনের ব্যর্থ প্রচেষ্টার একটি করুণ ইতিবৃত্ত। বৈদ্যনাথ সূক্ষ্মকারুকর্মে নিপুণ। পুত্রদের পূজোর দিনে জামা কাপড় দিতে পারে না, কিন্তু খেলনা তৈরী করে দেয়। পাড়ার ছেলেদের ছড়ি তৈরী করে দেয়। চাকুরি-ব্যবসা প্রভৃতি অর্থোপার্জনের স্থূল উপায়গুলি সে অবলম্বন করতে অক্ষম। অর্থোপার্জনের একটা সংক্ষিপ্ত পথ তার আবিষ্কার করা চাই। ভগবানের কাছে এই ধরণেরই সে প্রার্থনা করে—"হে মা জগদম্বে, স্বপ্নে যদি একটা দুঃসাধ্য রোগের ঔষধ বলিয়া দাও, কাগজে তাহার বিজ্ঞাপন লিখিবার ভার আমি লইব।"—স্বভাবতঃ অলস প্রকৃতির মানুষও বৈদ্যনাথ। স্ত্রীর পরামর্শে, স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রয় করে সে কাশীতে গিয়ে একখানা বাড়ী ক্রয় করে, স্ত্রী শুনেছে যার মধ্যে নাকি গুপ্তধন আছে।

কাশীর এই বাড়ীতে পারিপার্শ্বিক ও আনুষঙ্গিক লক্ষণ ও রহস্য দেখে বৈদ্যনাথও বিশ্বাসী হয়ে ওঠে যে সে বাড়ীতে গুপ্তধন আছে। লক্ষণ অনুসরণ ক'রে অনেক পরিশ্রমে ঘরের নীচে সুড়ঙ্গের মধ্যে তামার কলসীও আবিষ্কার করে, কিন্তু কলসী শূন্য,—একটি মুদ্রাও তার মধ্যে নেই। পাওয়া গেল নরকঙ্কালের অস্থি।—বৈদ্যনাথের পূর্ববর্তী দৈবধনলিপ্সু ব্যক্তিদের অস্থি। বৈদ্যনাথ গৃহে ফিরে এল রিক্ত হাতে। স্ত্রীর সুদৃঢ় বিশ্বাস নিষ্করুণভাবে মিথ্যা

৭. রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, ২য়, ১৩৫৩) পৃঃ ২০০।

হয় যাওয়ায়, বৈদ্যনাথের মুখের উপর সে দরজা বন্ধ করে দিল। বাইরে দণ্ডায়মান লাঞ্ছিত বৈদ্যনাথ লজ্জায় অভিমানে গভীর রাত্রিতে গৃহত্যাগ করল।

বৈদ্যনাথের চরিত্রের মধ্যে মহত্ত্ব কিছুই নেই, সেইজন্য তার প্রতি সহানুভূতি উদ্রিক্ত না হওয়ারই কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গল্পটির শেষ দিকে এমন নিপুণতার সঙ্গে বৈদ্যনাথের আশান্বিত হওয়া এবং আশাভঙ্গে তার হতাশাকে বর্ণনা করেছেন যে, তার প্রতি সহানুভূতি পাঠকের মনে জাগে, তার ভাগ্যের জন্য দুঃখ হয়। 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' গল্পে তারাপ্রসন্নের স্ত্রীর দুঃখ গভীরতর। তারাপ্রসন্নের জন্য সেখানে আমাদের তত দুঃখ হয় না। তাকে অবলম্বন করে তার স্ত্রীর মনে আশা গড়ে উঠেছিল, সেই আশা ভেঙ্গে যাওয়াটা যতটুকু ট্র্যাজিক, এই গল্পে বৈদ্যনাথের হতাশা ততটুকু ট্র্যাজিক মনে হয় না, কারণ বৈদ্যনাথের কৃতকর্মের মধ্যে কোথাও-ই তাকে কোনো বড় মূল্য দিতে হয় নি, —একমাত্র শেষকালে স্ত্রীর কাছে পরিত্যক্ত হওয়া ছাড়া। আর তাছাড়া গ্রন্থরচনার মধ্যদিয়ে অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টায় কেউ ব্যর্থ হলে তার প্রতি আমাদের যতটা সহানুভূতি জাগে গুপ্তধন উদ্ধারের মাধ্যমে অর্থোপার্জনের সংক্ষিপ্ত প্রচেষ্টায় কেউ ব্যর্থ হলে, তার প্রতি আমাদের ততটা সহানুভূতি জাগে না। এইজন্যই 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি'র তুলনায় 'স্বর্ণমৃগ' ট্র্যাজেডির উপাদান কম। তথাপি কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের বর্ণনাগুণে 'স্বর্ণমৃগ' গল্পে বৈদ্যনাথের বিড়ম্বিত-বিপর্যস্ত অবস্থাটা আমাদের মধ্যে বেশকিছু করুণরসের সৃষ্টি করে।

'ছুটি' গল্পটি প্রকৃতি-সান্নিধ্য-প্রয়াসী, নিয়মতন্ত্র-বিরোধী খেয়াল-খুশির সহজ-জীবন-প্রিয় একটি দুরন্ত কিশোরকে লেখাপড়া শিখিয়ে 'ভদ্র' করে তোলার ভ্রান্ত প্রচেষ্টার করুণ ইতিবৃত্ত। দুরন্ত কিশোর ফটিকের দুরন্ত-পনায় তার মা অস্থির, তার দৌরাত্ম্যে নিরীহ ছোট ভাইয়ের জীবন অতিষ্ঠ। এমতাবস্থায় ফটিককে মামার আগ্রহে মামার বাড়িতে কোলকাতায় পাঠানো হ'ল লেখাপড়া শেখার জন্য। মামার বাড়িতে একদিকে মামীর চক্ষুশূল এবং গলগ্রহ বিবেচিত হওয়ায়, এবং অন্যদিকে শহুরে সঙ্কীর্ণ জীবনধারা অনভ্যস্ত হওয়ায়, ফটিকের কোলকাতার সমস্ত আনন্দ দূরীভূত হয়ে তার চিত্ত বিষণ্ণতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। "ঘরের মধ্যে এইরূপ অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবলই তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।"

"একটা প্রকাণ্ড ধাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, 'তাইরে নাইরে নাইরে না' করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্ব-রচিত রাগিনী আলাপ করিয়া অকর্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সঙ্কীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেই সব দলবল, উপদ্রব, স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ-করিত।"

মামার বাড়ী বিস্বাদ লাগে ফটিকের কাছে। তাই সে দেশে মায়ের কাছেই ফিরে যেতে চায়। কিন্তু পূজোর ছুটির অনেক দেরী। দুঃখে এবং অভিমানে ফটিক অসুস্থ হয়ে পড়ল। গুরুতর অসুখ। ডাক্তার আরোগ্য সম্পর্কে সন্দিহান। জ্বরের ঘোরে বিকারে ফটিক মায়ের কাছে ক্ষমা চাইতে লাগল: "মা, আমাকে মারিস্ নে, মা। সত্যি বলছি, আমি কোনো দোষ করিনি।"

ফটিকের বিকার-গ্রস্ত অবস্থায় ফটিকের মা-কে দেশ থেকে আনানো হ'ল। ফটিকের তখন আর সম্বিৎ বিশেষ নেই। মায়ের ব্যাকুল আহ্বানে সাড়া দিয়ে সে শুধু অন্তিম কথাটাই বলল, "মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ী যাচ্ছি।"

ফটিকের দুর্ভাগ্য, তাকে কেউ চিনতে পারেনি—তার মনের কথা কেউ বুঝতে পারে নি, বুঝতেও কেউ চায় নি। প্রকৃতির আত্মীয় এই কিশোরের যে স্বভাব,—সেটা পাঁচজনের বিচারে স্বাভাবিক নয়। পাঁচজন তাদের মনগড়া নিয়মতন্ত্রের অন্যথাকেই অস্বাভাবিক বলে। এই বিচারেই ফটিককে সভ্য করার প্রয়োজন হ'ল—অর্থাৎ তার প্রকৃতি-অনুমোদিত স্বভাবের উপর কৃত্রিম সভ্যতার নিষ্পেষণ চালানো হ'ল। এরই ফলে ফটিকের মৃত্যু, এবং তার জীবনের ট্র্যাজেডি। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কবিচ্ছিন্ন মানবসমাজ প্রকৃতির আত্মীয় ফটিকের উপর যে অন্যায় জুলুম চালিয়েছে, তারই শোচনীয় ফল ফটিকের জীবনের ট্র্যাজেডি। ফটিকের প্রকৃতি প্রদত্ত-স্বভাবের আর্তনাদ ও মৃত্যুকালীন অভিমান কাহিনীর সমস্ত কারুণ্যের উপর এক অপূর্ব লিরিক-সুরের সৃষ্টি করেছে।

ফটিকের কাহিনীর মতোই 'সুভা' গল্পের সুভার কাহিনী। প্রকৃতির এই মূক কন্যাটি শুধু পিতা-মাতার কাছেই নয় সমগ্র সমাজের কাছেই এক বিরক্তিকর ব্যতিক্রম। তার ভাষা নেই, কিন্তু বোধ আছে। ভাষা নেই ব'লে কাউকে সে মনের কথা বোঝাতে পারে না। কিন্তু বোধ আছে ব'লে

সকলের কথাই সে বোঝে। তাই পিতামাতার বিরক্তি এবং অসহায় অবস্থা, সমাজের সহানুভূতি-হীনতা বুক ভ'রে বুঝে নিয়ে সে নদীতীরে প্রকৃতির সান্নিধ্যে, দুটি গাভীর চোখের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে পায়।

তার বিবাহের আয়োজন চলে। সে চোখের জলে বোঝাতে চায়, তারজন্য কিছুরই দরকার নেই। সে নদীতীরে, সখী গাভীদের সঙ্গে, প্রকৃতির উদার মাতৃ-বক্ষেই শুধু জীবনটা কাটিয়ে দিতে চায়। সেটুকু পেলেই সে কৃতার্থ—তার যথেষ্ট পাওয়া। কিন্তু সামাজিক ভয়ে তার বিয়ে দেওয়া হ'ল তার মূক-তাকে লুকিয়ে। অর্থাৎ তাকে নিক্ষেপ করা হ'ল সহানুভূতিহীনতার প্রখর উত্তাপ থেকে সহানুভূতি-হীনতার অগ্নিকুণ্ডে. কারণ বিবাহের ক দিন পরেই তার স্বামী জানল সে মূক, এব তার পরেই সুভাব মূক-তাকে নির্মম-ভাবে মুখর করে তোলা হোল স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহে।

সুভার দুর্ভাগ্যকে ট্র্যাজিক মনে হয় এইজন্যই যে, সে কারো কাছে সমস্যা হয়ে উঠতে চায় নি। সে সকলের কাছ থেকেই বিদায় নিয়ে তৃণ-বৃক্ষ, নদীর জল, আকাশ জ্যোৎস্না গৃহপালিত পশু—অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে বিস্তৃত ক'রে দিয়ে সকলের কাছ থেকে বিস্মৃত হতে চেয়েছে। কিন্তু নীতি-নিষ্ঠ সমাজ তার কথা বুঝল না, তার একটা ন্যায্য 'গতি' করে দিতে চাইল তার বিবাহ দিয়ে. যদিও তার পরিণামে সে পেল প্রতারকের অপমান। কিন্তু 'সে কাহাকেও প্রতারণ করে নাই। তাহার দুটি চক্ষু সকল কথাই বলিয়াছিল, কিন্তু কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে চারিদিকে চায়—ভাষা পায় না. যাহারা বোবার ভাষা বুঝিত সেই আজন্ম পরিচিত মুখগুলি দেখিতে পায় না—বালিকার চিরনীরব হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম অব্যক্ত ক্রন্দন বাজিতে লাগিল—অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ তাহা শুনিতে পাইল না।" সে কারো কাছে সমস্যা হয়ে উঠতে চায় নি। কিন্তু মূঢ় সমাজের রীতিনীতিতে সে সকলের কাছেই সমস্যারূপে বিবেচিত হ'ল। এবং সেই সমস্যার সমাধান করে তার উপকার করতে গিয়েই সমাজ তার জীবনে কঠোর ট্র্যাজেডিকে ঘনিয়ে তুলল।

ফটিক ও সুভার জীবনের দুঃখ একই প্রকার। এ সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয় বলেছেন, "বোবা বালিকা সুভা পল্লীর গাছপালা, পশুপাখীর সঙ্গে মিলিয়া একরকম সুখেই ছিল, অন্ততঃ দুঃখ কাহাকে বলে ঠিক জানিত না। এমন সময় বিবাহোপলক্ষ্যে শহরে আনীত হইয়া (ফটিক

আনীত হইয়াছিল পাঠ উপলক্ষ্যে, দুইই সমান নিষ্ঠুর হইতে পারে) বোবা বালিকা সুভা এবারে সত্য সত্যই মূঢ় হইয়া পড়িল। ঐখানেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে—ইহার পরে কায়িক মৃত্যু ঘটানো বাহুল্য মাত্র। ফটিক ও সুভা কেহই শহরের আবহাওয়ায় টিকিল না।" "দ্বৌ অপি অত্র আবশ্যকৌ।"[৮]

বিবাহের জন্য সুভাকে শহরে নিয়ে যাওয়াটাই যে সুভার জীবনের ট্র্যাজেডি, অধ্যাপক বিশী মহাশয়ের মন্তব্যেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও একই কথা বলেছেন।[৯]

তিনি আরো ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর 'রুথে'র সঙ্গে সুভার মিল লক্ষ্য করেছেন: রুথের "নিসর্গাশ্রয়ী আনন্দিত জীবন বেশিদিন রইল না, এল মানুষের ছলনা, রুথকে কেড়ে নিল তার স্বর্গসুখ থেকে—সব বীভৎস হয়ে গেল। ঠিক একই ট্র্যাজেডি ঘটল সুভার ক্ষেত্রে।"

সামাজিক বিধি নিষেধের পরিণামে ট্র্যাজেডি ঘটেছিল 'মহামায়া' গল্পের নায়ক-নায়িকার জীবনে। উপযুক্ত কুলীন ব্রাহ্মণ পাত্রের অভাবে মহামায়াকে ঠিক পাত্রস্থ করা যাচ্ছিল না, অথচ অকুলীন ব্রাহ্মণ রাজীবের সঙ্গে মহামায়ার প্রণয় বেশ পুরাতন ব্যাপার। মহামায়ার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজীবের সঙ্গে মহামায়ার প্রণয় ব্যাপার অবগত হ'য়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শ্মশানে এক মুমূর্ষু বৃদ্ধের সঙ্গে মহামায়ার তথাকথিত বিবাহ দেন, এবং পরের দিনই মহামায়া বিধবা হয়। সতীদাহ প্রথানুসারে তাকে ঐ স্বামীর চিতায় হাত পা বাঁধা অবস্থায় দাহ করারও ব্যবস্থা হয়। কিন্তু প্রবল ঝড় জলে মহামায়া চূড়ান্ত দাহ থেকে রক্ষা পেয়ে যায়, যদিও তার মুখের একটা অংশ তখনই দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সামাজিক নিষ্ঠুরতার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেল কোনোক্রমে মহামায়া। ঝড়জলে শ্মশান যাত্রীরা আত্মরক্ষার্থ অন্যত্র সরে গেলে, চিতা থেকে উঠে এসে মহামায়া পূর্বের প্রতিশ্রুতি মতো রাজীবের কাছে এসে উপস্থিত হ'ল। মহামায়ার জীবন মিলিত হ'ল রাজীবের জীবনের সঙ্গে, কিন্তু উভয়ের মাঝখানে থেকে গেল মহামায়ার স্থায়ী অবগুণ্ঠন, যাকে মোচন করা চলবে না, এই হ'ল মহামায়ার সত। অধ্যাপক ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই কাহিনীর সঙ্গে পুরাণের কিউপিড আর সাইকি-র গল্পের মিল লক্ষ্য করে বলেছেন, "এ যেন

৮. রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প (১৩৬৮) পৃ ৪৪।

৯. কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ (১৩৭৩) পৃ ২৩।

কিউপিড আর সাইকি-র পৌরাণিক গল্পের আর একদিক। প্রতি রাত্রে মিলন, অথচ কোনোদিন কিউপিডের মুখ দেখতে পাবে না, এই ভাবনা অসহ্য হয়ে উঠেছিল সাইকির। শেষ পর্যন্ত সে আর সইতে পারল না, একদিন ঘুমন্ত কিউপিডের মুখে মোমের আলো পড়ল—সাইকির মুগ্ধ অনিমেষ চোখ বুঝতে পারল না, কী সর্বনাশ সে ডেকে আনছে- কিউপিডকে সে হারালো। এ ক্ষেত্রেও এই ট্যাজেডী ঘনিয়ে এল। চির-সহিষ্ণু রাজীবেরও অসহ্য হয়ে উঠল একদিন, ঘুমন্ত মহামায়ার মুখের ওপর থেকে আবরণ দিল সরিয়ে—দেখল সেই অপূর্ব আগের সৌন্দর্য আর নেই—"চিতানল শিখা তাহার নিষ্ঠুর লেলিহ রসনায় মহামায়ার বামগণ্ড হইতে কিয়দংশ সৌন্দর্য একেবারে লেহন করিয়া লইয়া আপনার ক্ষুধার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।"

তারপর মহামায়া হঠাৎ জেগে উঠল এবং তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। "সেই ক্ষমাহীন চিরবিদায়ের নীরব ক্রোধানল রাজীবের সমস্ত ইহজীবনে একটি সুদীর্ঘ দগ্ধ চিহ্ন রাখিয়া দিয়া গেল।"

অনেক বিপর্যয়ের পর রাজীবের জীবনের যে রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতা লাভ করছিল, তা এইভাবে অকস্মাৎ ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় রাজীবের প্রতি আমাদের অবশ্যই সহানুভূতি জাগে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রকৃত ট্র্যাজেডি যেন বরণ করে নিল মহামায়াই। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয় সঠিক প্রশ্নই উত্থাপন করেছেন "রাজীব না হয় বাঁচিল,—কিন্তু মহামায়া? তাহার চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস গল্পটির মধ্যে মর্মরিত না হইলেও পাঠকের বুকের মধ্যে অনুভূত হইতে থাকে।"[১০] মহামায়ার এই ট্র্যাজেডির ইঙ্গিত রয়েছে গল্পে, কিন্তু বিবরণ নেই।

'শাস্তি' গল্পটি স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অভিমানের একটি মর্মস্পর্শী কাহিনী। বড় ভাই দুখিরাম রাগের মাথায় নিজ স্ত্রীকে হত্যা করে ফেলেছে। এখন ছোট ভাই ছিদাম বড় ভাইকে বাঁচাবার জন্য নিজ স্ত্রীকে খুন স্বীকার করে নিতে বলল। ছিদামের এই কথায় তার স্ত্রী স্তম্ভিত হয়ে গেল, "তাহার কালো দুটি চক্ষু কালো অগ্নির ন্যায় নীরবে তাহার স্বামীকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমেই সংকুচিত হইয়া স্বামী-রাক্ষসের

১০. কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ (১৩৭৩) পৃ ৩৮।
১১. রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প (১৩৬৮) পৃ. ৭৫।

হাত হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা একান্ত বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল।" ফলে ছিদাম তার স্ত্রীর আত্মরক্ষার জন্য যে সব যুক্তি শিখিয়ে দিয়েছিল, সে সবের প্রতি স্ত্রীর কোনো আগ্রহই থাকল না। স্বামীর ঘর করতে আসার মূল্য হিসেবে ভাশুরের খুন স্বীকার করার পুঞ্জীভূত অভিমান বুকের মধ্যে নিয়ে সে পুলিশের কাছে এবং আদালতে খুন স্বীকার করল, এবং স্বামী বা অন্যকারো প্রতি কোনো বিরূপতা প্রকাশ করল না। তার ফাঁসির আদেশ হ'ল। এবং ফাঁসির পূর্ব মুহূর্তে সে শুধু মাকে দেখতে চাইল, স্বামীকে নয়। "যেদিন একরত্তি বয়সে একটি কালো কোলো ছোটোখাটো মেয়ে তাহার গোলগাল মুখটি লইয়া খেলার পুতুল ফেলিয়া বাপের ঘর হইতে শ্বশুর ঘরে আসিল, সেদিন রাত্রে শুভলগ্নের সময় আজিকার দিনের কথা কে কল্পনা করিতে পারিত। তাহার বাপ মরিবার সময় এই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল যে, যাহা হউক আমার মেয়েটির একটি সগদতি করিয়া গেলাম।" কিন্তু সেই শুভলগ্ন ও সগদতির পরিণাম এই অকারণ মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ। স্বামীর ঘরকে রক্ষা করার জন্য প্রাণ দিতে হবে পরের ঘরের মেয়েকে।—এইখানেই ট্র্যাজেডি। অবশ্য ট্যাজেডি ছিদামেরও কম নয়। কারণ সে প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ডের দিকে ঠেলে দিতে চায় নি। সে স্ত্রীকে খুন কবুল করতে বলে দাদাকে যেমন বাঁচাতে চেয়েছিল, তেমনি রামলোচনের পরামর্শে বানানো কাহিনীও স্ত্রীকে শিখিয়েছিল আত্মরক্ষার জন্য। সে কাউকেই বিপদে ফেলতে চায় নি। কিন্তু তার অভিমানিনী স্ত্রী আত্মরক্ষার জন্য কোনো আগ্রহই দেখালো না। ছিদামের জীবনকে শূন্য এবং নিরর্থক করে দিয়ে সে ফাঁসি মেনে নিল। অসচেতন কৃতকর্মের এই মর্মান্তিক ফল ছিদামের জীবনে বর্তালো ব'লে তার জীবনেও ট্র্যাজেডি কম নয়। ছিদামের স্ত্রী হয়তো ভেবেছিল, দাদাকে খুনের দায় থেকে বাঁচাবার অনেক পথ থাকতে পারে কিন্তু স্ত্রীকে দিয়ে সেই খুন স্বীকার করাবার সস্তা হীন ও দুর্বল পথ কেন? অথবা ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলোর মতো শ্বশুরকুলের সমস্ত ঝঞ্ঝাট এমন কি খুনের দায়ও ঘরের বৌকেই গ্রহণ করতে হবে না কি?—এই অভিমানই হয়তো ছিদামের স্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণে প্ররোচিত করেছে—যা তার আর তার স্বামী,—দু'জনের জীবনেই ট্র্যাজেডি এনে দিয়েছে। স্ত্রীকে খুন স্বীকার করতে বলাটা যে এতবড় অন্যায় এবং স্ত্রীর পক্ষে অপরিসীম অপমানের, তা ছিদাম প্রথমে বুঝতে পারে নি, যখন বুঝেছে, তখন ট্র্যাজেডির সবটাই ঘটে গেছে।

ট্র্যাজেডি ছিদামকে দিয়েছে অপরিসীম দুঃখ, কিন্তু ছিদামের স্ত্রীকে দিয়েছে অপরিসীম মহিমা Victory of the vanquished)। (সমাজের নীচুস্তরের মানুষ ছিদামের স্ত্রী, কিন্তু তার এই সুদৃঢ় আত্মমর্যাদা এবং সুগভীর অভিমান, যাকে সম্মানিত করার জন্য সে মৃত্যুকেও বরণ করতে পারে, তা তাকে অপরিসীম আভিজাত্য প্রদান করেছে। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের শিল্প কুশলতা।

'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষাকৃত পাকা হাতের রচনা। শশিভূষণ ও গিরিবালার একটি অস্পষ্ট অথচ সুগভীর সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে গল্পটি রচিত। শশিভূষণ এম. এ., বি. এল., কিন্তু বিষয়-আশয় করা সম্পর্কে অনাগ্রহী—লোকের ভীড়ে এবং কর্মতৎপরতার উপর নির্ভর ক'রে অর্থোপার্জন তার দ্বারা হয়ে ওঠে না। পিতা এমতাবস্থায় তাকে গ্রামের সম্পত্তির তদারকীর ভার দিলেন। শশিভূষণ নামে মাত্র তদারকীর ভার নিয়ে গ্রামে এসে সর্বক্ষণ বই নিয়েই থাকে। গ্রামের মানুষের সঙ্গেও ভালোভাবে মেলামেশা করতে পারে না। এই সময় স্থানীয় নায়েব হরকুমারের আটবছরের কন্যা গিরিবালার সঙ্গে তার একটা সখ্য সুরু হয়। গিরিবালাকে সে নিয়মিত পড়ায়, এব নিজের গ্রন্থসমূহ থেকে পাঠ করে শোনায়। এইভাবে দু'বছর কেটে যায়। ঘর-সংসার এবং অর্থোপার্জনের জন্য পরিশ্রম করতে যে-শশিভূষণের আগ্রহ নেই, সেই শশিভূষণ সরকারের উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারিদের অত্যাচারের প্রতিবিধান করতে সচেষ্ট হয়ে উঠল। কিন্তু যাদের জন্য তার এই চেষ্টা, সেই ভীত, দরিদ্র, স্বার্থ-সংরক্ষণ-সঙ্কুচিত বাঙ্গালী প্রতিবেশীরাই শশিভূষণের বিরোধিতা করতে লাগল। ইতোমধ্যে গিরিবালার বিবাহ হয়ে গেল। তার শ্বশুরালয়ে যাত্রার সময় নদীর ঘাটে পাঁচজন থেকে একটু দূরে শশিভূষণ দাঁড়িয়ে গিরিবালার শ্বশুরালয়-যাত্রা দেখল। গিরিবালার বিবাহের উদ্যোগপর্বে শশিভূষণ স্বদেশ-হিতৈষণায় ব্যস্ত ছিল। গিরিবালা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ-ই করতে পারেনি। তার "আশা ছিল যে, গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্বে কোনো মতে একবার শশিভূষণের সহিত সাক্ষাৎ হইবে কিন্তু আজ সে জানিতেও পারিল না যে, তাহার গুরু অনতিদূরে তীরে দাঁড়াইয়া আছেন।"

তারপর 'শশিভূষণ চশমা খুলিয়া চোখ মুছিয়া সেই পথের ধারে সেই গরাদের মধ্যে সেই ক্ষুদ্র গৃহে গিয়া প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ একবার মনে

হইল যেন গিরিবালার কণ্ঠ শুনিতে পাইলেন। 'শশী দাদা।'—কোথায় রে কোথায়? কোথাও না! সে গৃহে না, সে পথে না, সে গ্রামে না—তাঁহার অশ্রু জলাভিষিক্ত অন্তরের মাঝখানটিতে।'

তারপর ইংরেজ-বিদ্বেষের এবং ইংরেজদের অত্যাচার-বিরোধিতার 'অপরাধে' তাকে পাঁচবছর কারাবাস ভোগ করতে হ'ল। কারাবাস একসময় শেষ হ'ল। "স্বাধীনতা পাইলেন, কিন্তু তাহাছাড়া কারার বাইরে তাঁহার আর কেহ অথবা আর কিছু ছিল না। গৃহহীন, আত্মীয়হীন, সমাজহীন কেবল তাঁহার একলাটির পক্ষে এতবড় জগৎ-সংসার অত্যন্ত ঢিলা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল।"

তারপর নিতান্ত আকস্মিকভাবেই গিরিবালার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ। গিরিবালা তখন বিধবা। "তখন তাহার দুই চক্ষু ঝরিয়া দুই কপোল বাহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল।"

'শশিভূষণ তাহাকে কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ভাষা খুঁজিয়া পাইলেন না; নিরুদ্ধ অশ্রুবাষ্প তাঁহার বাক্যপথ সবলে অবরোধ করিল. কথা এবং অশ্রু উভয়েই নিরুপায়ভাবে হৃদয়ের মুখে কণ্ঠের দ্বারে বদ্ধ হইয়া রহিল।'

গল্পটির মধ্যে বেদনা কখনোই তীব্রভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেনি, কিন্তু সর্বত্রই সমভাবে বিরাজমান থাকায় গল্পটি আগাগোড়াই অশ্রু-জলসিক্ত হয়েছে। শশিভূষণ এবং গিরিবালা উভয়ের মধ্যেকার অস্পষ্ট মানসিক সম্পর্ক এবং অপ্রকাশিত জীবন যন্ত্রণার জন্য একজনেরও ট্র্যাজেডি প্রচণ্ড অন্তর্দাহ বা অপরিসীম জীবন-যন্ত্রণার রূপ লাভ করেনি। এখানে রবীন্দ্রনাথ ভিন্নতর কৌশল প্রয়োগ করেছেন,—কোমল লিরিক সুরের পর্দায় আগাগোড়া এক বিষণ্ণতার মধ্যে শশিভূষণ গিরিবালার জীবন-বেদনাকে স্থাপন করেছেন।

'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পটি আত্মম্ভরী-অহংকার সর্বস্ব কৃতার্থন্মন্য স্বামী অনাথবন্ধু কর্তৃক সুশীলা-স্বামীগতপ্রাণা এবং স্বামী-গরব-গরবিনী স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনীর বিশ্বাসভঙ্গের করুণ কাহিনী। স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীর স্ব-ঘোষিত বিদ্যাবুদ্ধি, যা খুশি হতে পারার ক্ষমতা এবং এতদ্‌সম্পর্কিত শূন্য বাগাড়ম্বরের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখত। এবং সেই কারণেই নিজেকে স্বামীর অযোগ্য স্ত্রী বিবেচনা করে সঙ্কুচিত হয়ে থাকত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অনাথবন্ধু অপেক্ষা তার স্ত্রীরই ভদ্রতা, বিবেচনা, আত্ম সম্মান-বোধ বেশী ছিল—এবং এই সব

গুণ নিয়ে, সে স্বামীকে অনেক অবাঞ্ছিত এবং অপ্রিয় পরিস্থিতির মধ্যে রক্ষা করেছে, স্বামীর সম্মান বাঁচিয়েছে। স্বামী ঘর-জামাই হয়ে থাকে,—এটা তার কাছে অসম্মানজনক বিবেচিত হওয়ায় সে স্বামীকে নিয়ে শ্বশুরগৃহে চলে আসে এবং সেখানে অর্থোপার্জন-বিমুখ স্বামীকে নিয়ে ভাশুরের সংসারে অসীম দুঃখ এবং নিঃসীম দারিদ্র্যে কালাতিপাত করতে থাকে। বৎসরান্তে পূজাবকাশে তার পিতৃ-গৃহে নিমন্ত্রণ হয়। সেখানে অনাথবন্ধু রাত্রিতে শ্বশুরের সিন্দুক ভেঙে অর্থ অপহরণ করে বিলাত রওয়ানা হয়ে যায় রাতারাতি এবং সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে সে স্ত্রীর জন্য একটি পত্র রেখে যায়।

সকালে চিঠির কথা গোপন ক'রে বিন্ধ্যবাসিনী সমগ্র চৌর্যের দায় নিজ মাথায় তুলে নেয় স্বামীর সম্মান রক্ষার জন্য। যদিও স্বামীর এই হীন কার্যে সে লজ্জায় নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছিল, তথাপি পাঁচজনের কাছে স্বামীর মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সে পিতার কাছে জ্ঞাপন করে যে, সমস্ত ব্যাপারটি তার নিজেরই ষড়যন্ত্র।

বিলাতে অনাথবন্ধুর অর্থাভাব ঘটলে, বিন্ধ্যবাসিনীই তার অলংকার, বেনারসী এমনকি শালখানা পর্যন্ত বিক্রয় ক'রে স্বামীকে অর্থ সাহায্য করে। অবশেষে অনাথবন্ধু ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরল, কিন্তু স্ত্রী এবং মাতাকে তুচ্ছ-জ্ঞানে কাছে বা সঙ্গে থাকতে দিল না।

এই সময় নৌ-দুর্ঘটনায় অনাথবন্ধুর শ্বশুরের পুত্র, পুত্রবধূ ও পৌত্রের মৃত্যু ঘটায় অনাথবন্ধুকেই প্রায়শ্চিত্ত ক'রে শ্বশুরগৃহে উঠতে আহ্বান করলেন শ্বশুর মহাশয়। অনাথবন্ধু রাজী। নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠান শেষ হোল। সর্বত্র অনাথবন্ধুর প্রশংসা। "সেই ঘোরতর কোলাহল এবং কর্মরাশির মধ্যে বিন্ধ্যবাসিনী প্রফুল্লমুখে পারদ-রৌদ্র-রঞ্জিত প্রভাতবায়ু-বাহিত লঘু মেঘখণ্ডের মতো আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। আজিকার দিনের সমস্ত বিশ্বব্যাপারের প্রধান নায়ক তাহার স্বামী।"

অনুষ্ঠানের শেষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শাস্ত্রীয় তর্কে লিপ্ত, অনাথের শ্বশুরও সেখানে উপস্থিত। এমন সময় অনাথবন্ধুর পত্নীত্বের দাবী নিয়ে এক ইংরেজ মহিলা সেখানে এসে উপস্থিত। সভাস্থলে শ্মশানের স্তব্ধতা নেমে এল। "এমন সময়ে ভূমিলুণ্ঠ্যমান চাদর লইয়া অলস মন্থরগামী অনাথবন্ধু রঙ্গভূমিতে আসিয়া পুনঃ প্রবেশ করিলেন। এবং মুহূর্তের মধ্যেই ইংরেজ মহিলা ছুটিয়া

গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া তাঁহার তাম্বুলরাগরক্ত ওষ্ঠাধরে দাম্পত্যের মিলন চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিলেন।"

এই ঘটনা পতিগতপ্রাণা এবং স্বামী গরব-গরবিনী বিন্ধ্যবাসিনীর চিত্তকে কতখানি আঘাত দিয়েছিল, তার কোনো বৃত্তান্ত গল্পে নেই। এবং তা না থাকার জন্য তার ট্র্যাজেডি,—বিশ্বাসের মূল্য না পাওয়ায় ট্র্যাজেডি,—কতটা গভীর হয়েছিল তা বুঝবার উপায় নেই। 'শাস্তি' গল্পে ছিদামের স্ত্রীর ট্র্যাজেডির গভীরতার স্পষ্ট পরিচয় গল্পেই আছে। এখানেও বিন্ধ্যবাসিনীর একই প্রকারের ট্র্যাজেডি প্রায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই ট্র্যাজেডিকে স্পষ্ট করে তোলেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এটা একটা নূতনতর শিল্পরীতিও হতে পারে। ছোটগল্পের শিল্পরীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই হয়তো তিনি বিন্ধ্যবাসিনীর ট্র্যাজেডি সম্পর্কে মৌন থেকেও তাকে মুখর করে তুলেছেন। প্রকৃত পক্ষেও বিন্ধ্যর দুর্ভাগ্য সম্পর্কে লেখক কিছু না বললেও আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠি, তাঁর ট্র্যাজেডি আমাদের কল্পনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এইখানেই এই শিল্পরীতির সার্থকতা।

'নিশীথে' গল্পেও রবীন্দ্রনাথ দাম্পত্য সংকটের ট্র্যাজেডি বর্ণনা করেছেন। সচেতনভাবে প্রথমা পত্নীকে প্রতারণা করায় পরিণামে নায়ক দক্ষিণাচরণের মনের মধ্যে যে বিবেকের দংশন বা অন্তর্যন্ত্রণা দেখা দিয়েছিল, তাই তাকে এক মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির মধ্যে নিয়ে গেল। দক্ষিণাচরণের নতুন প্রণয়িনী মনোরমাকে দেখে দুরারোগ্য রোগশয্যায় শায়িতা প্রথমা পত্নীর ভীত-সন্ত্রস্ত জিজ্ঞাসা,—'ওকে ! ও কে গো ' —দক্ষিণাচরণের মনের মধ্যকার অপরাধ-বোধকে প্রতি মুহূর্তে উদ্দীপিত করেছে —প্রতিটি মুহূর্তেই যেন ঐ জিজ্ঞাসাকে সে চতুর্দিকে ধ্বনিত হতে শুনেছে। এইজন্য প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর মনোরমাকে বিবাহ করেও দক্ষিণাচরণ শান্তি পেল না। প্রথমা পত্নীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সুতীব্র অপরাধ বোধ তাদের নতুন দাম্পত্য জীবনকে যেন অভিশপ্ত করে তুলল। তীব্র অন্তর্জ্বালা এবং অসীম মর্মদাহ তাকে হৃতসুখ, বীতনিদ্র করে তুলল। তার মানসিক জ্বালা-যন্ত্রণা অবশ্য রাত্রিতেই তাকে পাগল করে তুলত। প্রতিটি রাত্রি তার কাছে ভয়াবহ হয়ে উঠল। শান্তি বিহীন, আশ্রয় বিহীন, নিদ্রা বিহীন তার জীবন তার কাছে মরুভূমি হয়ে উঠল।

মনোরমাকে বিবাহ এবং প্রথমা পত্নীর প্রতি ছলনার ব্যাপারে দক্ষিণাচরণ

নিজেকে যতটা অপরাধী মনে ক'রে ট্র্যাজিক যন্ত্রণা ভোগ করছে, প্রকৃতপক্ষে হয়ত দক্ষিণাচরণ ততটা অপরাধী নয়। কারণ তার প্রথমা পত্নীও তাকে 'আর একটা' বিবাহ করতে পরামর্শ দিয়েছিল, নিজে চিররুগ্না ব'লে। অবশ্য এই পরামর্শ কতটা আন্তরিক ছিল, তাতে সন্দেহ আছে। স্বামীর পত্নী-প্রেমকে পরীক্ষা করার জন্যও সে এমন প্রস্তাব ক'রে থাকতে পারে। কিন্তু দক্ষিণাচরণ এই পরামর্শকে সহজভাবে নিতে পারেনি—সে এটাকে প্রথমতঃ হেসে উড়িয়ে দিয়েছে অলীক ব'লে। কিন্তু কার্যতঃ কিছুদিন পর থেকে স্ত্রীর চিকিৎসকের কন্যা মনোরমার সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হয়েছে এবং স্ত্রীর কাছে ছলনার আশ্রয় নিয়ে সে সেই প্রণয়কে গোপন ক'রে গেছে। প্রথমা স্ত্রীকে দক্ষিণাচরণ প্রকৃতই ভালোবাসত, সেইজন্য তাকে ছলনা করায়, প্রতারণা করায় সে স্ত্রীর মৃত্যুর পর এই মর্মযন্ত্রণা ভোগ করছে। তার নিশ্চিত ধারণা—এই ছলনা তার স্ত্রী অনুমোদন করেন নি, তিনি বুঝেছিলেন সব, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করেন নি। এবং যেদিন তিনি সবকিছুই বুঝলেন চূড়ান্তভাবে, সেদিন দক্ষিণাচরণের পথের কাঁটা হিসেবে নিজের রুগ্নজীবনকে আর বজায় রাখতে চাইলেন না, চাইলেন না, তা বেঁচে থাকার কারণে দক্ষিণাচরণ ছলনার আশ্রয় নিক। তাই তিনি সরিয়ে ফেললেন নিজেকে বিষ ঔষধ প্রয়োগে।

এরপর দক্ষিণাচরণের দ্বিতীয় বিবাহ মনোরমার সঙ্গে। এবং তার পর থেকেই দক্ষিণাচরণের মানসিক যন্ত্রণার সুরু। যাকে সে ভালোবাসত, এবং যে তাকেও ভালোবাসত তার ভালোবাসার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা এবং সততা বজায় রাখতে না পারার বেদনা এবং অপরাধ থেকেই তার এই মানসিক যন্ত্রণার জন্ম। প্রথমা স্ত্রীর রুগ্নাবস্থায় মনোরমা দক্ষিণাচরণের কাছে মরুভূমির মধ্যে মরুদ্যানের মতো একটা আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু তা যে তাকে ছলনার পথ গ্রহণে প্রবৃত্ত করবে, স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতক করে তুলবে, তা হয়তো দক্ষিণাচরণ ভাবতে পারে নি। কিন্তু কার্যতঃ ছলনাশ্রয়ী বিশ্বাস-ঘাতকই তাকে হতে হল পাকে-প্রকারে এবং মোহ-জ দুর্বলতায়। তাই তার এই মানসিক যন্ত্রণা অনিবার্য। সে অনুভূতি-প্রবণ বলেই এই যন্ত্রণা তার কাছে এত গভীর এবং তা তাকে এমন অস্থির করে তুলেছে। তার চরিত্রের মূল-গত যে সু-গুণ, তাই আলোড়িত হয়েছে তার কার্যে এবং তাতেই সে ভোগ করেছে ট্র্যাজেডির যন্ত্রণা। চরিত্রের মূলে এই সুগুণ না থাকলে সে

ট্র্যাজিক যন্ত্রণা ভোগ করত না। তাই তার এই ট্র্যাজেডি অনুভূতি-প্রবণ সৎ হৃদয়ের অপরিণামদর্শিতার বিষময় পরিণতির ট্র্যাজেডি। রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণাচরণের এই ট্র্যাজিক মানসিক যন্ত্রণাকে অতিপ্রাকৃতের মাধ্যমে আশ্চর্য শিল্প সুষমায় অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন।

'আপদ' গল্পটি 'ছুটি' গল্পের সমগোত্রীয়—গৃহ-চ্যুত, স্নেহ-বঞ্চিত, আত্মীয়তা সম্পর্ক রহিত যাত্রাদলের একটি কিশোর ব্রাহ্মণ সন্তানের আকস্মিক সব কিছু প্রাপ্তি আবার আকস্মিক সবকিছু হারিয়ে যাওয়ার বেদনার কাহিনী। স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় শরৎ-কিরণময়ী চন্দননগরে গঙ্গাতীরে বাস করছে। একদিন নৌকাডুবি থেকে আত্মরক্ষা করে ঐ ব্রাহ্মণ কিশোর নীলকান্ত সাঁতার দিয়ে শরৎবাবুর বাড়িতে আশ্রয় নিল। দয়াপরায়ণ কিরণময়ী ছেলেটিকে আশ্রয় দিল। সে সেখানেই থেকে গেল। কিরণময়ীর যত্নে ও স্নেহে এতদিনকার 'ছন্নছাড়া' নীলকান্তের মনের মধ্যে পরিবর্তন ঘটতে লাগল। আসলে নীলকান্তকে যতটা কিশোর বা বালক মনে হ'ত, সে তার চেয়ে বেশি বয়সের ছিল। কিন্তু আত্মীয়সম্পর্কবিহীনতার জন্য সে সেই বয়োবৃদ্ধি সম্পর্কে সচেতন হতে পারেনি। উপরন্তু যাত্রাদলে সখী সাজার প্রয়োজনে সকলেই তাকে যেমন অল্পবয়স্ক বিবেচনা করত, সে নিজেও তেমনি সেই বিবেচনায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। এখন নারী হিসাবে কিরণময়ীর সাহচর্যে, তার স্নেহ, যত্নে এবং তাদের পারিবারিক আশ্রয়-ছায়ায় নীলকান্তের বয়স নীলকান্তের কাছে অর্থময় হয়ে উঠল। এখন কিরণ তার সঙ্গে বালকযোগ্য ব্যবহার করলে সে মনে মনে লজ্জিত ও ব্যথিত হয়ে উঠতে লাগল। "সে যে একটা লক্ষ্মীছাড়া যাত্রার দলের ছোকরার অপেক্ষা অধিক কিছু নয়, একথা কিছুতে তাহার মনে লইত না।" যাত্রার দলে অভিনয়কালে সে যে সমস্ত প্রেম-সঙ্গীত গাইত, তার কোনো অর্থই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠত না—যন্ত্রের মতো শুধু গেয়ে যেত। কিন্তু এখন সে যখন সেই সব গান করত, "তখন সে যেন সহসা লোকান্তরে জন্মান্তরে উপনীত হইত, তখন চারিদিকের অভ্যস্ত জগৎটা এবং তাহার তুচ্ছ জীবনটা গানে তর্জমা হইয়া একটা নূতন চেহারা ধারণ করিত। (নল-দময়ন্তী পালার) রাজহংস এবং রাজকন্যার কথা হইতে তাহার মনে এক অপরূপ ছবির আভাস জাগিয়া উঠিত, সে আপনাকে কী মনে করিত স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না, কিন্তু যাত্রার দলের পিতৃ-মাতৃহীন ছোকরা বলিয়া ভুলিয়া যাইত।"

কিরণময়ীর আশ্রয়ে নীলকান্তের আভ্যন্তরীণ উপকার হতে থাকল, কিরণময়ীর অনুগ্রহও নীলকান্তের প্রতি অকুণ্ঠ থেকে গেল, কিন্তু পরিবারের আর সকলেই তাকে একটা 'আপদ' হিসেবে গণ্য করল। কিরণময়ী ছাড়া আর সকলেরই সে চক্ষুশূল হয়ে উঠল। নীলকান্ত এসব সহ্য ক'রেও কিরণময়ীর স্নেহকে অবলম্বন ক'রে পরম আনন্দে 'বড়' হয়ে উঠতে লাগল।

এই সময় কিরণের দেবর সতীশের সেখানে আবির্ভাব। দেবর হিসেবে সতীশও কিরণের স্নেহ ও প্রীতি অনেকখানি অধিকার করে নিল। কিরণের স্নেহে নীলকান্তের নিঃসপত্ন অধিকারে আঘাত লাগল। তাই সতীশের প্রতি মনে মনে সে বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠল। "সে কী উপলক্ষ্য করিয়া কাহার সহিত বিবাদ করিবে ভাবিয়া পায় না, অথচ তাহার মন তীব্র তিক্তরসে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।" নীলকান্তের এই মনোভাব তার হীনম্মন্যতা থেকে সৃষ্ট— রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে নীলকান্তের এই মনস্তত্ত্বকে প্রকাশ করেছেন।

অবশেষে কিরণদের দেশে ফিরবার সময় হ'ল। সকলেই প্রস্তুত হতে লাগল। কিন্তু নীলকান্তকে কেউ কোনো কথা বলে না। যাত্রার দু'দিন আগে কিরণ তাকে ডেকে স্নেহবাক্যে স্বদেশে যেতে উপদেশ দিল। উপরি উপর দু'দিন অবহেলার পর এই মিষ্টবাক্যে সে কেঁদে ফেলল।

যাত্রার আগের দিন সতীশের দামী দোয়াতদানটা পাওয়া গেল না। চৌর্য সম্পর্কে সকলেই (কিরণ ছাড়া) নীলকান্তকে সন্দেহ করল। কিন্তু কিরণের আপত্তিতে কেউ-ই সন্দেহকে প্রমাণিত করার চেষ্টা করল না। কিন্তু নীলকান্তের দুর্ভাগ্য এখানেই যে, ব্যাপারটা অন্ততঃ কিরণের অজানা থাকল না। নীলকান্তকে গোপনে অর্থসাহায্য করার মানসে নীলকান্তের বাক্সে টাকা রাখতে গিয়ে কিরণের নজরে পড়ল সতীশের দোয়াতদানটা। নীলকান্তও আড়াল থেকে সমস্ত দেখল। মনে করল, 'কিরণ স্বয়ং চোরের মতো তাহার চুরি ধরিতে আসিয়াছেন এবং তাহার চুরি ধরাও পড়িয়াছে। সে যে সামান্য চোরের মতো লোভে পড়িয়া চুরি করে নাই, সে যে কেবল প্রতিহিংসা সাধনের জন্য এ কাজ করিয়াছে, সে যে ঐ জিনিসটা গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিবে বলিয়াই ঠিক করিয়াছিল, কেবল এক মুহূর্তের দুর্বলতাবশতঃ ফেলিয়া না দিয়া নিজের বাক্সের মধ্যে পুরিয়াছে, সে সকল কথা সে কেমন করিয়া বুঝাইবে। সে চোর নয়, সে চোর নয়! তবে সে কী। কেমন করিয়া বলিবে সে কী। সে চুরি করিয়াছে কিন্তু সে চোর নহে, কিরণ যে তাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ

করিয়াছেন, এ নিষ্ঠুর অন্যায় সে কিছুতেই বুঝাইতে পারিবে না, বহন করিতেও পারিবে না।'

—এখানেই নীলকান্তের ট্র্যাজেডি।[১২] সে যত ক্ষুদ্র নয়, তত ক্ষুদ্র বলে প্রতিপন্ন হওয়ার দুঃখ তার কাছে অসহনীয়। দোয়াতদান আবিষ্কারে নীলকান্ত সম্পর্কে কিরণের ধারণারও কিছু পরিবর্তন হতে পারে। এবং কিরণেরও দুঃখ হতে পারে। কিন্তু সে দুঃখ থেকে নীলকান্তের দুঃখ বেশী গভীর। কারণ এই একটি ঘটনায় নীলকান্তের জীবনের সামগ্রিক মূল্যহ্রাস হয়ে যাচ্ছে। কিরণের তা হচ্ছে না। কিরণের স্নেহ এবং সাহচর্যই সোনার কাঠির মতো নীলকান্তের ধূসর জীবনে সবুজের আভা এনে দিয়েছিল। তাই নীলকান্তের সুন্দর জগতের মূর্ত প্রতীক কিরণময়ী,—সেই কিরণময়ীর কাছে সে 'চোর' হয়ে গেল! এই ঘটনায় কিরণের স্নেহসুধা সিঞ্চনে তার যে জীবন বড় হয়ে উঠছিল, তা অকস্মাৎ মর্মান্তিকভাবে সঙ্কুচিত হয়ে গেল। অথচ ঘটনাটি আদৌ সত্য নয়,—ঘটনাটি আদালতের বিচারে 'চৌর্য' হতে পারে, কিন্তু নীলকান্তের ন্যায়বোধের দিক থেকে আদৌ তা নয়। অকারণে তার জীবনের ক্রমবর্ধমান মূল্য নিঃশেষিত হয়ে গেল—এইখানেই তার ট্র্যাজেডি।

'দিদি' গল্পটির ট্র্যাজেডির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়,—নীতিবোধের পরাজয়ের ট্র্যাজেডি এই গল্পটির বিষয়।

স্বামী জয়গোপাল অর্থোপার্জনে বিদেশে গেলে ষোলবছরের দাম্পত্য জীবনে অভ্যস্ত পত্নী শশিকলার অন্তরে প্রেমভাব জেগে উঠল। সে মনে করতে লাগল, "এইবার যখন স্বামীকে নিকটে পাইব তখন জীবনকে নীরস এবং বসন্তকে নিষ্ফল হইতে দিব না। কতদিন কতবার তুচ্ছ তর্কে সামান্য কলহে স্বামীর প্রতি সে উপদ্রব করিয়াছে, আজ অনুতপ্ত চিত্তে একান্ত মনে সংকল্প করিল, আর কখনোই সে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবে না, স্বামীর ইচ্ছায় বাধা দিবে না, স্বামীর আদেশ পালন করিবে, প্রীতিপূর্ণ নম্র হৃদয়ে স্বামীর ভালোমন্দ সমস্ত আচরণ সহ্য করিবে—কারণ, স্বামী সর্বস্ব, স্বামী প্রিয়তম, স্বামী দেবতা।"

১২. ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ও বলেছেন, 'তাহার (নীলকান্তের) মধ্যে যে অভিমান, ঈর্ষা, আত্মসম্মানবোধ জাগিয়া উঠিয়াছে, কেহই তাহা বুঝিল না, চিনিল না, ইহাই এই গল্পের ট্র্যাজেডি।'
—রবীন্দ্রনাথ (চতুর্থ সংস্করণ), পৃ. ২০৪।

কিন্তু শশিকলার অদৃষ্টের পরিহাস, স্বামী বিদেশ থেকে ফিরে এলে স্বামীর সঙ্গে তার তীব্র বিরোধ বাধল ছোট ভাইকে কেন্দ্র ক'রে। মৃত্যুকালে শশীর মা তাঁর সদ্যোজাত পুত্রকে শশীর হাতেই দিয়ে গেছিলেন, শশীর পিতারও অল্পদিনের মধ্যে মৃত্যু হ'ল। শিশুটিকে রক্ষণাবেক্ষণের পূর্ণ দায়িত্ব এসে পড়ল শশীর উপর অথচ শশীর স্বামী নানাভাবে শিশুটির ক্ষতি করতে চায়, তাকে বঞ্চিত করতে চায় পিতার সম্পত্তি থেকে। শশী তার জীবনের সর্বস্ব দিয়ে শিশুটিকে আগলে রাখতে মরিয়া হয়ে উঠল। স্বামীর সঙ্গে বিরোধিতায় নামল, ক্রমে সে স্বামীর চক্ষুশূল হয়ে উঠল। যে দাম্পত্য-জীবনের মাধুর্যকে আকণ্ঠ পান করার জন্য সে অধীর হয়ে উঠেছিল, সেই দাম্পত্য-জীবন তার কাছে বিষাক্ত হয়ে উঠল। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের শত্রু হয়ে উঠল। ভাইয়ের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য স্বামীর চক্রান্তের মধ্যে তাকে পড়তে হল এবং এইপথে সে নিজেকে নিঃশেষিত করে দিল।

শাশ্বত ন্যায়-নীতি বোধকে রক্ষা করতে গিয়ে স্বামীর বিরুদ্ধেও এইভাবে লড়াই করা নারীদের মহৎ আদর্শ। সেই আদর্শের পরাভবটাই ট্র্যাজেডি,— এইটি রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট ভাবনা। তাই শশী তার ন্যায়-বোধকে নিয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে যাওয়ার প্রচণ্ড ক্ষতি স্বীকার করেও যে জয়লাভ করতে পারল না—এইটাই ট্র্যাজেডির বিষয় হয়ে উঠেছে এখানে। শশীর ট্র্যাজেডি তার জীবনের মর্মান্তিক পরিণতিতে।

'সাধনায়' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের শেষ ছোটগল্প 'অতিথি' (১৩০২)-র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে মানব চরিত্রের একাত্মতা সবচেয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন,—এবং সেইসূত্রে 'অতিথি' গল্পের আভাসিত ট্র্যাজেডিও প্রকৃতির পরিবর্তনের মাধ্যমে যেন সূচিত করেছেন তিনি। তিনি তাঁর চরিত্রকে পৃথিবীর ধূলো মাটির সঙ্গে সৃষ্টির এক পর্যায়-ভুক্ত করে দেখেছেন, এবং মানুষের দুঃখকে বেদনাকে আনন্দকে সৃষ্টির সকল বস্তুর দুঃখ, বেদনা, আনন্দ ব'লে গ্রহণ করেছেন। ছুটি, সুভা, পোষ্টমাস্টার প্রভৃতি গল্পে এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ব্যাপারটি সবচেয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে 'অতিথি' গল্পে।

কিশোর তারাপদ কোথাও স্থির হয়ে থাকে না, কোনো সুনির্দিষ্ট কাজ বা পারিবারিক বন্ধনের মধ্যে ধরা পড়তে চায় না। মতিবাবু, অন্নপূর্ণা অথবা চারু —এদের একজনেরও স্নেহ বা প্রেমের আকর্ষণে বাঁধা পড়ল না সে। তার সুদূরের পিয়াসী হৃদয় একদিন সমস্ত মায়াবন্ধনের আয়োজনকে অস্বীকার ক'রে

"বর্ষার মেঘ-অন্ধকার রাত্রে আসক্তি-বিহীন উদাসীন জননী বিশ্ব-পৃথিবীর নিকট চলিয়া গেল।"

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তারাপদ-র এই সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবার ঘটনাটি সম্পর্কে বলেছেন, "এই সমস্ত স্নেহ বন্ধন উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইবার ব্যাপারটির সঙ্গে যে দুঃখ-বেদনা জড়িত হইয়া আছে, যে ট্র্যাজেডির আভাস আছে, তাহাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কল্পিত ঘটনা বস্তু ও ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন না, তাঁহার স্বাভাবিক ভাব-লোক বিহারী মন এই চলিয়া যাইবার ব্যাপারটিকে সমস্ত বিশ্ব-সংসারের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিল।"[১৩]

তাই দেখি এর পরই রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করছেন, "দেখিতে দেখিতে পূর্বদিগন্ত হইতে ঘন মেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, চাঁদ আচ্ছন্ন হইল, পূবে বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া উঠিল, নদীর জল খল খল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল; নদীতীরবর্তী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লিধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল,—সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা, চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে, মেঘ উড়িতেছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে।"

'অতিথি' গল্পে বস্তুতঃ ট্র্যাজেডির ক্ষয়-ক্ষতির দিকটা স্পষ্ট নয়, কিন্তু তারাপদর অন্তর্ধানে, যারা তাকে আপন করে রাখতে চেয়েছিল, তাদের একটা ট্র্যাজেডির আভাস রয়েছে। প্রকৃতি বর্ণনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ সেই আভাসের পরিচয় দিয়েছেন, এটা তাঁর একটা কবি কৌশল।

'সাধনা' পত্রিকার পরে ১৩০৫ সালে 'ভারতীর' সম্পাদকত্ব গ্রহণ ক'রে রবীন্দ্রনাথ বহু রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, সামাজিক প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। তাঁর এই বিবিধ প্রসঙ্গ-চিন্তার প্রভাব আছে এই পর্বে লিখিত গল্পগুলিতে।

'দুরাশা' গল্পটি 'ভারতী' পর্বেই লিখিত। হিন্দুব্রাহ্মণ সেনাধিনায়কের প্রতি মুসলমান নবাব কন্যার আটত্রিশ বর্ষব্যাপী ব্যর্থ প্রণয়-অপেক্ষার কাহিনী 'দুরাশা'। কিশোরী নবাব কন্যা মনে মনে ব্রাহ্মণ সেনানায়ক কেশরলালের ব্রাহ্মণ্য ভক্তি ও শুচি-শুভ্র জীবনের প্রতি মুগ্ধ ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সময়

---

১৩. রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা ২য়. (১৩৩৩) পৃ. ১৯৩।

ভুটিয়াদের সঙ্গে কেশরলাল জীবন কাটাচ্ছে কি করে ?—অথচ এই ব্রাহ্মণ্যকে লাভ করবার জন্য সে ত্রিশ বছর সাধনা করেছে, আটত্রিশ বছর অপেক্ষা করেছে।—এও তার ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডি মূর্ত হয়েছে তার অনুতপ্ত চিত্তের আত্মজিজ্ঞাসায়: "যে ব্রাহ্মণ্য আমার কিশোর হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল, আমি কি জানিতাম তাহা অভ্যাস, তাহা সংস্কার মাত্র। আমি জানিতাম, তাহা ধর্ম, তাহা অনাদি অনন্ত। তাহাই যদি না হইবে তবে ষোল বৎসর বয়সে প্রথম পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইয়া সেই জ্যোৎস্না নিশীথে আমার বিকশিত পুষ্পিত ভক্তিবেগ-কম্পিত দেহ মন-প্রাণের প্রতিদানে ব্রাহ্মণের দক্ষিণ হস্ত হইতে যে দুঃসহ অপমান প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কেন তাহা গুরু হস্তের দীক্ষার ন্যায় নিঃশব্দে অবনত মস্তকে দ্বিগুণিত ভক্তিভরে শিরোধার্য করিয়া লইয়াছিলাম। হায় ব্রাহ্মণ, তুমি তো তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ, আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আর এক জীবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব।"

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ঠিকই বলেছেন, "সমস্ত গল্পটি যেন একটি মেঘাচ্ছন্ন কাহিনী। একটি দৃপ্ত সুগম্ভীর রাগিনী যেন একটি পরম ব্যথার মধ্যে আত্ম-বিসর্জিত, একটি গভীর অচঞ্চল আবেগ যেন হঠাৎ মরু-মরীচিকার মধ্যে ক্রন্দনরত।"[১৪]

ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও বলেছেন, "কেশরলালের প্রত্যাখ্যান, নবাব-কন্যার তপস্যা, এবং শেষ পর্যন্ত নিদারুণ মোহভঙ্গের আঘাত গল্পটিকে ট্র্যাজিক পরিণতি দিয়েছে।"[১৫]

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই ট্র্যাজেডির গভীরতা সম্পর্কে বলেছেন, "দুরাশার আখ্যানবস্তু রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠকের নিকট সুপরিচিত। আচারধর্ম ও মানবধর্মের মধ্যে যে শাশ্বত বিরোধ চলিতেছে এখানে তাহাই গল্পাকারে রূপ পাইয়াছে..। এতবড় ট্র্যাজেডি তাঁহার ছোটগল্পের মধ্যে কমই দেখা যায়, ঘটনার দিক হইতে ইহার সমাবেশ যেমন সম্পূর্ণ, অনুভূতির দিক হইতে ইহা তেমনি তীব্র।"[১৬]

'ভারতী' পর্বেরই আরেকটি গল্প 'পুত্রযজ্ঞ', অনেক পূর্বে লিখিত 'সম্পত্তি

---

১৪. রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা-২য় (১৩৫৩) পৃ ১৯০।

১৫. কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ, (১৩৭৭) পৃ. ৩৯।

১৬. রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড, (১৩৬৭) পৃ. ৪৩৬।

সমর্পণে'র মতোই নিষ্ঠুর। গল্পটিতে রয়েছে কলঙ্কিনী সন্দেহে স্বামী কর্তৃক বিতাড়িত পত্নীর ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ এবং দুর্ভিক্ষের দিনে সেই স্বামীর কাছেই ভিখারিণী বেশে সপুত্র পত্নীর অন্ন প্রার্থনার করুণ চিত্র।

বন্ধ্যা সন্দেহে বিনোদিনী শ্বশুরগৃহে সকলেরই চক্ষুশূল। তিরস্কারলাঞ্ছিতা বধূটি সখী কুসুমের গৃহে তাস খেলার আসরে মুক্তির আনন্দ লাভ করে। স্বামীর প্রেমবঞ্চিতা তরুণী বিনোদিনীর প্রতি তাসখেলার সাথী কুসুমের দেবর নগেন্দ্রের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। বিনোদিনীও ব্যাপারটি বুঝতে পারে, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য তৎপর হয় না। ফলে একদিন নগেন্দ্র বিনোদিনীকে চুম্বন দিয়ে ফেলে। বিনোদিনী নগেন্দ্রের কাছ থেকে নিষ্কৃতি লাভে সচেষ্ট, এমন সময় সে দাসীর নজরে পড়ে যায়। তারপরই সে স্বামী-কর্তৃক গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়।

তখন সকলেরই অজ্ঞাতে বিনোদিনী স্বামীর সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিল। গৃহচ্যুত অবস্থায় সে পুত্র প্রসব করে এবং ভিক্ষাবৃত্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এদিকে স্বামী বৈদ্যনাথ পর পর আরো তিনটি বিবাহ করে, কিন্তু কারো সন্তান হয় না। দুর্ভিক্ষের দিনেও ব্রাহ্মণ-ভোজন, সন্ন্যাসী-ভোজন প্রভৃতির মাধ্যমে পুত্রলাভের আশায় সে অজস্র অন্ন ও অর্থের অপচয় করতে থাকে। এই রকমই এক বিরাট অপচয়ের দিনে সপুত্র বিনোদিনী ভিখারিণী-বেশে সেখানে অন্নলাভ করতে আসে আরো অনেক ভিক্ষুকের সঙ্গে। দ্বাররক্ষক অবশ্য সকলকেই বিতাড়িত করে দেয়। যে পুত্রের আশায় এত অপব্যয়, সেই পুত্র অপরিচিত ও অনাদৃত অবস্থায় পিতা কর্তৃক বিতাড়িত হ'ল। চিত্রটি ট্র্যাজিক। কিন্তু এই ট্র্যাজেডির দিকটা ফুটিয়ে না তুলে লেখক বৈদ্যনাথের হৃদয়হীনতা, অবিবেচনা ও স্বার্থান্ধ মূঢ়তার দিকটাই বেশী করে ফুটিয়ে তুলেছেন, এবং সেইটাই এই গল্পের প্রধান আকর্ষণ।

'ভারতী' পর্বের আর একটি বিখ্যাত গল্প 'দৃষ্টিদান'। স্বামীর প্রতি প্রেম এবং কল্যাণের জন্য পত্নীর আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা কোন পর্যায়ে যেতে পারে, তা এই গল্পের কুমু-র চরিত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন।

গল্পটির স্বাভাবিক প্রবণতা ট্র্যাজেডির দিকে। যে ভাবে গল্পটি অগ্রসর হয়েছে তাতে ট্র্যাজেডি অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু অত্যন্ত কঠোর ট্র্যাজেডির প্রতি রবীন্দ্রকবিচিত্তের খুব বেশি আনুকূল্য বোধ হয় ছিল না, তাই শেষ পর্যন্ত তিনি বাহ্যলক্ষণের দিক থেকে গল্পটিতে ট্র্যাজেডি ঘটতে দেন নি এবং সেইসূত্রে

স্বামীর মঙ্গলের জন্য পত্নীর প্রার্থনার একটা সাফল্য দেখিয়েছেন, রবীন্দ্র-কবিচিত্তের মঙ্গলবোধ এর মধ্যদিয়ে অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

এই গল্পের নায়িকা কুমু-র চক্ষু-পীড়া হয়েছিল। তার স্বামী মেডিক্যাল ছাত্র। তাই নিজের বিদ্যাকে রূপায়িত করার জন্য নিজেই স্ত্রীর চিকিৎসার ভার নিল, কারো পরামর্শ গ্রাহ্য করল না। ফলে কুমুর চোখ দু'টি নষ্ট হয়ে গেল, সে সম্পূর্ণ অন্ধ হ'ল। এই ঘটনায় অনুতপ্ত চিত্ত স্বামী অশ্রুসজল কণ্ঠে স্বীয় অপরাধের জন্য যখন আত্মগ্লানি প্রকাশ করেছে, তখন স্বামী-গত প্রাণা কুমু স্বামীর অনুতাপকে প্রশমিত করার জন্য অকৃত্রিম অনুরাগে স্বামীর দক্ষিণ হস্ত চেপে ধরে বলল, "ভবিতব্যতা যখন খণ্ডে না, তখন চোখ তো আমার কেহই বাঁচাইতে পারিত না, সে চোখ তোমার হাতে গিয়াছে, এই আমার অন্ধতার একমাত্র সুখ। যখন পূজার ফুল কম পড়িয়াছিল তখন রামচন্দ্র তাঁহার দুই চক্ষু উৎপাটন করিয়া দেবতাকে দিতে গিয়াছিলেন। আমার দেবতাকে আমার দৃষ্টি দিলাম—আমার পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, আমার প্রভাতের আলো, আমার আকাশের নীল, আমার পৃথিবীর সবুজ সব তোমাকে দিলাম, তোমার চোখে যখন যাহা ভালো লাগিবে আমাকে মুখে বলিয়ো, সে আমি তোমার চোখের প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিব।"

দৃষ্টি হারিয়ে কুমু একটুও ক্ষুব্ধ নয়, স্বামীকেও সে দোষ দেয় না, বরং স্বামীকে সে আরেকটি বিবাহ করতে বলে সাংসারিক কাজকর্ম চালাবার জন্য। এমন সময় কুমু-র স্বামী উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে উঠল, "আমি মূঢ়, আমি অহংকারী, কিন্তু তাই বলিয়া আমি পাষণ্ড নই। নিজের হাতে তোমাকে অন্ধ করিয়াছি, অবশেষে সেই দোষে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যদি অন্য স্ত্রী গ্রহণ করি তবে আমাদের ইষ্টদেব গোপীনাথের শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি যেন ব্রহ্মহত্যা—পিতৃহত্যার পাতকী হই।"

এই শপথ বাক্যে কুমু-র নারীহৃদয় পুলকিত হয়ে উঠল। স্বামীর ভালবাসার আশ্রয় কোনদিনই তাহার চ্যুতি নেই—এটা কুমুর পক্ষে যেমন আনন্দের, তেমনি গৌরবের। সে নিজেই বলেছে, "এত বড়ো শপথটা করিতে দিতাম না, বাধা দিতাম, কিন্তু অশ্রু তখন বুক বাহিয়া, কণ্ঠ চাপিয়া, দুই চক্ষু ছাপিয়া, ঝরিয়া পড়িবার জো করিতেছিল, তাহাকে সম্বরণ করিয়া কথা বলিতে পারিতেছিলাম না। তিনি যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া বিপুল আনন্দের উদ্বেগে বালিশের মধ্যে মুখ চাপিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। আমি অন্ধ

তবু তিনি আমাকে ছাড়িবেন না। দুঃখীর দুঃখের মতো আমাকে হৃদয়ে করিয়া রাখিবেন। এত সৌভাগ্য আমি চাই না, কিন্তু মন তো স্বার্থপর।" কুমু জানত না যে, স্বামীর এই শপথকে রক্ষা করা পরবর্তীকালে তারই দায় হয়ে উঠবে, এমন কি নিজের সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডির বিনিময়েও তাকে, স্বামীর সত্য যাতে রক্ষিত হয়, তার জন্য প্রার্থনা করতে হবে।

স্বামীর সুনিশ্চিত ভালোবাসায় সুখের যে স্বর্গ কুমু সুদৃঢ় ভেবেছিল, তা অচিরেই ভাঙতে শুরু করল। স্বামীর কর্মস্থান হাসিমপুরে এসেই কুমু পরিবর্তনের ইঙ্গিতগুলি বুঝতে পারল। স্বামীর অর্থ প্রাপ্তি এবং তৎ-প্রসূত অর্থ-লিপ্সা তাকে পরিবর্তিত করতে লাগল। তার চিত্তের ভালোবাসার সূক্ষ্মতন্ত্রী গুলো অসাড় হয়ে যেতে লাগল। কোমল ভাবাবেগ তার মনে প্রশ্রয় পেল না, প্রশ্রয় পেল বাস্তব প্রয়োজনবোধ। একটু রূঢ় এবং শুষ্ক হয়ে উঠল তার স্বামী।

কিছুদিন পরেই স্বামীর এক পিসিমার হাসিমপুরে আবির্ভাব, তারপরেই এলেন তাঁর ভাগ্নী হেমাঙ্গিনী। এই হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে কুমুর স্বামীর বিবাহের গোপন আয়োজন চলল। কুমু সবটাকে বুঝল সবই, যদিও তার কাছে কেউই কিছু প্রকাশ করে না। 'নিশীথে' গল্পের দক্ষিণাচরণের মতো কুমু-র স্বামীও আগাগোড়া এ ব্যাপারে কুমুর কাছে ছলনা ক'রে গেল।—এগিয়ে আসতে লাগল তার ট্র্যাজেডি। অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াল যে, দুর্ভাগ্য তার জীবনে অনিবার্য হয়ে উঠল। তার সুখের স্বর্গ, ভালোবাসার স্বর্গ থেকে সে যেন অধঃপতনের দিকে নিক্ষিপ্ত হতে চলল।

দুর্ভাগ্যের জন্য কুমু ভীত না, ভীত সম্পূর্ণ অপর কারণে, লঙ্ঘনের দায়ে স্বামীর পাপের জন্য। এই পাপ থেকে কি ক'রে স্বামীকে রক্ষা করা যায়, এটাই কুমু-র চিন্তা। দুর্ভাগ্যের অতল গহ্বরে পতনোন্মুখ অবস্থাতেও তার অটল স্বামী-প্রেম। হেমাঙ্গিনীকে বিবাহ করবার জন্য রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে স্বামীর সম্মুখে এই উদ্দেশ্যেই কুমু পাগলের মতো বলে উঠল, "তুমি কোনো মতেই তোমার ধর্ম শপথ লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। সে মহাপাপের পূর্বে হয় আমি বিধবা হইব, নয় হেমাঙ্গিনী বাঁচিয়া থাকিবে না।" এবং স্বামী ঐ বিবাহে রওয়ানা হয়ে গেলে কালবৈশাখী ঝড়ে যখন দালান কাঁপতে লাগল, তখনও দেবতার কাছে কুমু এমন প্রার্থনা করতে পারল না যে, "হে ঠাকুর, আমার স্বামী এখন নদীতে আছেন, তাঁহাকে রক্ষা করো।" বরং সে বলে

উঠল, "ঠাকুর, আমার অদৃষ্টে যাহা হইবার তা হউক, কিন্তু আমার স্বামীকে মহাপাতক হইতে নিবৃত্ত করো।"—এমন কঠোর প্রার্থনার মধ্যেই মস্তবড় ট্র্যাজেডির বীজ নিহিত,—এমন প্রার্থনা যে করতে পারে, সে একটি জাত ট্র্যাজিক চরিত্র। কিন্তু কুমু হঠাৎ সবদিক থেকেই রক্ষা পেয়ে গেল। তার দাদা একবার হাসিমপুরে এসে তার স্বামীর সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর বিবাহের ষড়যন্ত্রটা আঁচ করে গিয়েছিলেন। তিনিই কুমর স্বামীর পূর্বে গিয়ে হেমাঙ্গিনীকে বিবাহ ক'রে কুমুকে এক সর্বাঙ্গীন ট্র্যাজেডির হাত থেকে বাঁচিয়ে দেন।

কিন্তু এর ফলে গল্পের সুষমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয়। ট্র্যাজেডির অনিবার্যতা গল্পটির শিল্পের দিক থেকেও প্রয়োজনীয় ছিল। শেষ ধাপে তাকে রোধ করায় সেই প্রয়োজনীয় শিল্প-পরিণতি গল্পটিতে রক্ষিত হতে পারে নি।

অবশ্য 'মানসী' কাব্যের 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলতে চেয়েছেন, এখানেও যদি রবীন্দ্রনাথের সে রকম কোনো বক্তব্য থেকে থাকে তবে বলতে হয় যে, 'দৃষ্টিদান' গল্পে কুমুর চক্ষুহীনতাই একটা ট্র্যাজেডি। কিন্তু সেই ট্র্যাজেডি তাকে ধ্বংস করে নি, তাকে ভিন্নপ্রকার শক্তি দিয়েছে যে শক্তি দিয়ে সে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে চেয়েছে তার দাম্পত্য ধর্ম এবং স্বামীর সত্য। সুরদাস তার দেবতার কাছে চোখের দৃষ্টি সমর্পণ ক'রে দেবতাকে লাভ করেছিলেন অধিকতর সত্যভাবে, কুমুও স্বামীর হাতে দৃষ্টি সমর্পণ ক'রে স্বামীকে লাভ করল চূড়ান্তভাবে। চক্ষু হারিয়েই সে যেন জগৎ ও সংসারকে অধিকতর পরিমাণে আঁকড়ে ধরতে চাইল। তাই তার চক্ষুহীনতা শুধু ট্র্যাজেডি নয়, এর মধ্যে রয়েছে রোমান্সের বিচিত্র মাধুর্য।

'ভারতী'তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের "নষ্টনীড়" গল্পটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে যেমন অসমসাহসিক, তেমনি এর ট্র্যাজেডির অগ্নিময় রূপ। গল্পটির পরিণতি অপরিসীম বিষাদ, অপরিমেয় বিক্ষোভ এবং সুগভীর বেদনায় পরিপূর্ণ। যে দু'টি চরিত্রকে অবলম্বন করে এই বিষাদ বিক্ষোভ-বেদনার সৃষ্টি, সেই দু'টি চরিত্রই উল্লেখযোগ্য। আবার এই দু'টি চরিত্রের (ভূপতি ও চারুলতা) মধ্যে ভূপতির জীবনেই আঘাতটা সবচেয়ে বেশী।

তৃতীয় চরিত্র অমলকে এইসব দুঃখ, বেদনা স্পর্শ করতে পারে নি। আত্ম-সচেতন, পরিবেশ-সচেতন, উন্নত মূল্যবোধের অধিকারী, সুবিবেচক অমল বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা আন্দাজ করা মাত্র নিজেকে আসর থেকে সরিয়ে নিয়েছে—কোনো অজুহাতেই সে 'হাতের পাঁচ' রেখে যাবার চেষ্টা করে নি

কিন্তু দুর্ঘটনার যা কিছু আয়োজন, তা এরই মধ্যে ঘটে গেছে, এখন অপেক্ষা শুধু বিস্ফোরণের এবং সেই বিস্ফোরণ ভূপতির সংসারে নিঃশব্দে ঘটতে লাগল চারুলতার মনোভাবের মধ্যদিয়ে!

অমলের সঙ্গে চারুলতার স্বভাবের মিলটাই ভূপতির সংসারের দুর্গতির বা তার জীবনের বেদনার কারণ। চারুলতার মনের আবেগ উচ্ছ্বাস, নিত্য নূতন পরিকল্পনার আনন্দ, শিশুসুলভ আমোদপ্রিয়তা এবং সর্বোপরি কবি-প্রাণতা খবরের কাগজের সম্পাদক ভূপতির দ্বারা কখনোই আলোড়িত হয়নি, আলোড়িত হয়েছিল সমবয়সী এবং সমমনোধর্মী অমলের সান্নিধ্যে। চারুলতা তার জীবনের বাণী খুঁজে পেয়েছিল অমলের মধ্যে। তার সাহিত্যচর্চা সাহিত্য রস পিপাসা চারুলতাকে আরো আকৃষ্ট করেছিল। এইভাবে অমলের ব্যক্তিত্ব গোপনে চারুলতার চিত্তের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় আসনটি দখল করে নিয়েছিল। এ খবর চারুলতাই জানত না। ভূপতির পক্ষে জানা তো দূরের কথা।

চারু ও অমলের মধ্যে নিবিড় মেলামেশায় যে কোনো অন্যায় আছে, সে কথা কোনোদিনই ভূপতি ভাবে নি। সে-ই অমলকে ভার দিয়েছে চারুলতার লেখাপড়ার। কখনোই সে কোনো বিপদের আশঙ্কা করে নি,—এমন কি অমলের বিবাহ নিয়ে চারুলতার সঙ্গে এ প্রসঙ্গে সে আপত্তিকর ঠাট্টাও করেছে। মনের মধ্যে কোনো কলুষ থাকলে বা দুর্ভাবনা থাকলে ভূপতির পক্ষে এই সব ঠাট্টা করা সম্ভব হ'ত না।

আসলে ভূপতির চরিত্র সাধারণের থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র। অবিশ্বাস, সন্দেহ তার চিন্তার মধ্যেই ছিল না। জগৎ-সংসারের প্রতি একটা অপারসীম প্রসন্ন দৃষ্টি থাকলেই সকলের প্রতি এমন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রক্ষা করা যায়। সংসারে এই ধরনের চরিত্র পুরস্কৃত হলেই ন্যায়বোধ রক্ষা পায়। কিন্তু প্রকৃত-ক্ষেত্রে সংসারে এরা মর্মান্তিকভাবেই প্রতারিত হয়, লাঞ্ছিত হয়। চিরকাল এই ট্র্যাজেডিই সংসারে ঘটতে দেখা যায়, ভূপতির জীবনেও তাই ঘটেছিল।

স্বভাব-ধর্মের দিক থেকে চারুলতা ও ভূপতি পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণই পৃথক। ভূপতির স্বভাব ও জীবন ছিল সদর-সর্বস্ব, আর চারুলতার স্বভাব ও জীবন ছিল অন্দর-সর্বস্ব। ভূপতির সদর জীবন যেমন চারুলতার পক্ষে ছিল দুরধিগম্য, চারুলতার অন্দর জীবনে বিশ্রাম করাও তেমনি ছিল ভূপতির পক্ষে অস্বস্তিকর। এইজন্যই ভূপতি 'যতদিন কাগজ লইয়া ভোর হইয়াছিল ততদিনে

তাহার বালিকা বধূ চারুলতা ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করিল। খবরের কাগজের সম্পাদক এই মস্ত খবরটি ভালো করিয়া টের পাইল না।'

আবার 'ধনীগৃহে চারুলতার কোনো কর্ম ছিল না। ফলপরিণামহীন ফুলের মতো পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠাই তাহার চেষ্টাশূন্য দীর্ঘ দিন রাত্রির একমাত্র কাজ ছিল। তাহার কোনো অভাব ছিল না।

এমন অবস্থায় সুযোগ পাইলে বধূ স্বামীকে লইয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে, দাম্পত্য লীলার সীমান্তনীতি সংসারের সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করিয়া সময় হইতে অসময়ে এবং বিহিত হইতে অবিহিতে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। চারুলতার সে সুযোগ ছিল না। কাগজের আবরণ ভেদ করিয়া স্বামীকে অধিকার করা তাহার পক্ষে দুরূহ হইয়াছিল।'

এই সময়ই অমল তার বালক-সুলভ বিচিত্র উৎপাত নিয়ে চারুলতার চিত্তকে অধিকার করে ফেলল। চারুলতাকে ব্যস্ত করে তুলল নানাবিধ শৌখিন আব্দার ও স্নেহের দাবী নিয়ে। ভূপতি চারুলতার প্রতি কোনো দাবি করত না, কিন্তু শাখায় একটু পড়িয়ে পিসতুতো ভাই অমলের দাবির অন্ত ছিল না। এই নিয়ে চারুলতা মাঝে মাঝে কৃত্রিম কোপ ও বিদ্রোহ প্রকাশ করত, 'কিন্তু কোনো একটা লোকের কোনো কাছে আসা এবং স্নেহের উপদ্রব সহ্য করা তাহার পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল।'

'ধনীর সংসারে চারুর আর কাহারো জন্য কিছুই করিতে হয় না, কেবল অমল তাহাকে কাজ না করাইয়া ছাড়ে না। এই সকল ছোটখাটো শখের খাটুনিতেই তাহার হৃদয়-বৃত্তির চর্চা এবং চরিতার্থতা হইত।'

এইভাবে প্রাণোচ্ছল অমলের নিরন্তর সান্নিধ্য চারুলতাকে ভূপতির প্রশান্ত এবং গাম্ভীর্য-নিস্পন্দ জীবন থেকে অনেক দূরে নিয়ে গেল। এই বিপর্যয় হয়তো সকলেরই দৃষ্টি এড়িয়ে যেত যদি না এর মধ্যে দু'টি ঘটনা ঘটত।—একটি ভূপতির সংবাদ পত্রের বিলুপ্তি এবং দ্বিতীয়টি অমলের বিবাহ ও বিলাত গমন।

সংবাদপত্রের বিলুপ্তির সম্ভাবনায় দুঃখে এবং বিলুপ্তির পর শূন্য হৃদয় নিয়ে ভূপতি সদর জীবন থেকে বিদায় নিয়ে যখন চারুলতার অন্দর জীবনে একটা পরিতৃপ্তির আসন পেতে উৎসুক হয়ে উঠল, তখন সে স্পষ্টই বুঝতে পারল, চারুলতা ও তার মধ্যকার সহজ সম্পর্কটা যেন হারিয়ে গেছে। সে তার প্রত্যাশা অনুসারে চারুলতার মনের যেন নাগালই পাচ্ছে না। এইখান থেকেই

সুরু হ'ল ভূপতির ট্র্যাজেডি। ট্র্যাজেডি এই জন্যই যে, ভূপতির এমন কিছু সচেতন ভ্রান্তি ছিল না, বা সে এমন কিছু রূঢ় অন্যায়ও চারুলতার প্রতি করেনি, যে পরিণামে এত কঠিন শাস্তি তার প্রাপ্য হতে পারে।

বরং ভূপতি চারুলতাকে আগাগোড়াই ভালোবাসত, কিন্তু সে ভালোবাসা ছিল নিস্তরঙ্গ ও অনুচ্ছ্বসিত। নিজের কর্মময় জীবনের তাগিদে সে নিরন্তর 'মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে' তার তরুণী বধূর সঙ্গে জীবনের গ্রন্থি-অঙ্কন করবার অবকাশ এবং মানসিকতা পায়নি। চারুলতার প্রতি অবহেলা তার আদৌ ছিল না। স্বামী মনোযোগ-বঞ্চিতা স্ত্রীর জন্য তার উদ্বেগ ছিল। এজন্য সে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে।—

> চারু ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'এখনও বুঝি তোমার কাজ শেষ হ'ল না। দিনরাত ঐ একখানা কাগজ নিয়ে যে তোমার কী করে কাটে, আমি তাই ভাবি।'
>
> ভূপতি হিসাব সরাইয়া রাখিয়া একটুখানি হাসিল, মনে মনে ভাবিল, বাস্তবিক, চারুর প্রতি আমি মনোযোগ দিবার সময়ই পাইনা, বড়ো অন্যায়। ও বেচারার পক্ষে সময় কাটাইবার কিছুই নাই।'
>
> ভূপতি স্নেহ-পূর্ণ স্বরে কহিল, 'আজ যে তোমার পড়া নেই! মাস্টারটি বুঝি পালিয়েছেন? ...'
>
> চারু কহিল, 'আমাকে পড়িয়ে অমলের সময় নষ্ট করা কি উচিত? অমলকে তুমি বুঝি একজন সামান্য প্রাইভেট টিউটর পেয়েছ?'
>
> ভূপতি চারুর কটিদেশ ধরিয়া কাছে টানিয়া কহিল, 'এটা কি সামান্য প্রাইভেট টিউটারি হ'ল। তোমার মত বৌঠানকে যদি পড়াতে পেতুম তা হ'লে...'

এতেই বোঝা যায় 'ভালোবাসার বা পত্নীপ্রেমের ব্যাপারে ভূপতি চারুলতাকে কখনোই বঞ্চিত করতে চায়নি। ভালোবাসা তার যতটা আছে, তার সবটাই নিঃসন্দেহে চারুলতার জন্যে। এ ব্যাপারে তার আন্তরিকতার কোনো অভাব ছিল না। এমনকি সে চারুলতার চেয়ে খবরের কাগজকে যে বেশি ভালো বাসত,—এমন কথা যদি বলা হয়, তাও ভুল। খবরের কাগজটা ছিল তার কর্মের জগৎ,—সেখানে সে তার স্বভাবগুণেই স্বচ্ছন্দ। কিন্তু দাম্পত্যপ্রেমের

যে মনের জগৎ, চিরাচরিত রীতির হিসাবে সেখানে তাকে খুব স্বচ্ছন্দ বলা যায় না। তাই তার পত্নীপ্রেম ভাবে এবং ভাষায় প্রকাশ পেল না, সঙ্গীতে মুখরিত হল না। তার প্রেম সুবিশাল ছায়া ফেলে চারুলতার তরুণী-জীবনকে আশ্রয় দিয়ে তাকে শান্ত করতে পারল না। এ ব্যাপারে তার স্বাভাবিক নৈপুণ্য ছিল না।—নারী হৃদয়ের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে প্রেমের সঙ্গীতকে বাজিয়ে তোলার কোমল কুশলতা তার ছিল না—এবং সেইটাই তার সবচেয়ে বড়ো দুর্দৈব। এইজন্যই ভুল করে মনে হয় চারুলতার চেয়ে তার সংবাদপত্র তার কাছে বেশি প্রিয় ছিল। বিশ্ব প্রকৃতপক্ষে কর্মের জগতে খবরের কাগজটা তার যত প্রিয় ছিল' মনের জগতে তার স্ত্রী তার কাছে ততটাই প্রিয় ছিল।

স্ত্রী সম্পর্কে তার ধারণাটাই ছিল খুব উঁচু। তার একটা সাধারণ সংস্কার ছিল, "স্ত্রীর উপর অধিকার কাহাকেও অর্জন করিতে হয় না, স্ত্রী ধ্রুবতারার মতো নিজের আলো নিজেই জ্বালাইয়া রাখে—হাওয়ায় নেবে না, তেলের অপেক্ষা রাখে না। বাহিরে যখন ভূপতির সাম্রাজ্য শুরু হইল তখন অন্তঃপুরে কোনো খিলানে ফাটল ধরিয়াছে কি না তাহা একবার পরখ করিয়া দেখার কথাও ভূপতির মনে স্থান পায় নাই।'

সুতরাং প্রেমের ব্যাপারে ভূপতির উদাসীন হওয়া তার পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক এবং আন্তরিক। স্ত্রী সম্পর্কে সে যদি সতর্ক হত, উৎসাহ এবং ব্যগ্রতা তার থাকত তাহলে হয়তো তার অপরাধ, কিন্তু সেই অপরাধের তুলনায় তাকে দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে অনেক বেশী।

রবীন্দ্রনাথ ভূপতির চরিত্রের এই ট্র্যাজিডির দিকটা খুব সুন্দরভাবেই ফুটিয়েছেন। সে যে স্ত্রীর কাছে কোনো সান্ত্বনা, কোনো আশ্বাস, কোনো সাহায্য, কোনো আশ্রয় পাবে না,—এবং না পাবার যে কোনো কারণ আছে, তা সে বুঝতেই না, বিশ্বাসই করত না। তাই খবরের কাগজটার উঠে যাওয়ার সম্ভাবনার সময় থেকেই সে কর্মজগৎ থেকে ছুটি নিয়ে এগুলিরই প্রত্যাশায় স্ত্রীর কাছে নিরন্তর ফিরে ফিরে এসেছে। অনভ্যাসে চারুর হৃদয় থেকেও ভূপতির প্রতি এগুলি উৎসারিত হল না। অনুতপ্ত তাই চারুও। কিন্তু উপায় কিছু নেই তাই ট্র্যাজেডি দুজনের জীবনকে ঘিরেই গড়ে উঠতে লাগল। অষ্টম পরিচ্ছেদটি দুজনের জীবনেরই এই ট্র্যাজিক দিকটা স্পষ্ট করে তুলেছে।

অমল চারুর কাছ থেকে সরে গিয়ে ভ্রাতৃবধূ মন্দার কাছে সুলভ হয়ে উঠেছে—এই আশঙ্কায় বিচলিত হৃদয়ে চারু যখন আনমনা তখন খবরের

কাগজ সম্পর্কে দুর্ভাবনায় ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ভূপতি "যেন কোন্ সান্ত্বনা-প্রত্যাশায় চারুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।" কিন্তু ভূপতি চারুর মনের আনুকূল্য পেল না। "ভূপতি দ্বিতীয়বার কোনো উত্তর না পাইয়া পুনর্বার স্নেহসিক্ত স্বরে কহিল—আমি সর্বদা তোমার কাছে আসতে পারিনে চারু, সেজন্য আমি অপরাধী, কিন্তু আর হবে না। এখন থেকে দিনরাত কাগজ নিয়ে থাকব না। আমাকে তুমি যতটা চাও ততটাই পাবে।" কিন্তু চারু তার মনকে উন্মুক্ত করল না ভূপতির কাছে। সে আস্তে আস্তে উঠে বাইরে চলে গেল। তার নিজের একটা কি কথা ছিল, বলা হ'ল না।

"ভূপতি যে একটা ক্ষোভ পাইয়া গেল, চারুর কাছে তাহা অগোচর রহিল না। মনে হইল 'ফিরিয়া ডাকি।' কিন্তু ডাকিয়া কী বলিবে। অনুতাপে তাহাকে বিদ্ধ করিল, কিন্তু কোনো প্রতিকার সে খুঁজিয়া পাইল না।"

চারুর নিজের অজ্ঞাতেই তার মনের মধ্যে একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। সে জানে না যে তার মনের কম্পাসের কাঁটা এখন ভূপতির অভিমুখে স্থির হয়ে নেই। তাই তার এই অবস্থা। এবং এটা সন্দেহ করে না ভূপতিও।

পাছে অমল মন্দার হস্তগত হয়, এই ভয়ে চারু যখন মন্দার নামে ভূপতির কাছে কুৎসাপূর্ণ অভিযোগ করে, তখন "ভূপতি মনে হাসিল, খুশিও হইল। গৃহ যাহাতে পবিত্র থাকে, দাম্পত্য ধর্মে আনুমানিক কাল্পনিক কলঙ্কও লেশমাত্র স্পর্শ না করে, এজন্য সাধ্বী স্ত্রীদের যে অতিরিক্ত সতর্কতা যে সন্দেহাকুল দৃষ্টিক্ষেপ, তাহার মধ্যে একটি মাধুর্য এবং মহত্ত্ব আছে।"

দাম্পত্য ধর্ম রক্ষায় নারী জাতির এবং বিশেষভাবে তার স্ত্রীর দায়িত্ব সম্পর্কে ভূপতির ধারণা যে কত উঁচু, তা ভূপতির এই কল্পনা থেকেই বোঝা যায়। সে "শ্রদ্ধায় এবং স্নেহে চারুর ললাট চুম্বন" করল এবং আশ্বাস দিল, চারুর দুর্ভাবনার কোনো কারণ নেই। তারপর চারুর মনোরঞ্জনের জন্য চারুর সঙ্গে অনভ্যস্ত সাহিত্যচর্চা করারও সে চেষ্টা করল, কিন্তু "ভূপতি আমল পাইল না।"

সংবাদপত্র সম্পর্কে এবং পাওনা অর্থ সম্পর্কে আত্মীয় বন্ধুদের চক্রান্ত, বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতারণায় "ভূপতির চক্ষে তাহার চতুর্দিকের চেহারা সমস্ত যেন বদল হইয়া গেল। সংসারের যে অংশ হইতে মুখোশ খসিয়া পড়িল সে দিকটা দেখিয়া আতঙ্কে ভূপতির শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। হঠাৎ বন্যা আসিয়া পড়িলে ভীত ব্যক্তি যেখানে সকলের চেয়ে উচ্চ চূড়া থাকে

সেইখানে যেমন ছুটিয়া যায়, সংশয়াক্রান্ত বহিঃসংসার হইতে ভূপতি তেমনি বেগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, মনে মনে কহিল, আর যাই হোক, চারু তো আমাকে বঞ্চনা করিবে না।"—এই ন্যূনতম প্রত্যাশার আকুলতা নিয়ে ভূপতি চারুর পাশে এসে দাঁড়াল। চারু তখন সাহিত্য রচনায় ব্যস্ত ছিল। অকস্মাৎ ভূপতিকে দেখে সে খাতা লুকোতেই ব্যস্ত হয়ে উঠল। "মনে যখন বেদনা থাকে তখন অল্প আঘাতেই গুরুতর ব্যথা বোধ হয়। চারু এমন অনাবশ্যক সত্বরতার সহিত তাহার লেখা গোপন করিল দেখিয়া ভূপতির মনে বাজিল।"

ভূপতির এই করুণ অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সেদিন ভূপতির নিজের কিছু দিবার বা চাহিবার ছিল না। সে রিক্ত হস্তে চারুর নিকটে প্রার্থী হইয়া আসিয়াছিল। চারুর কাছ হইতে আশঙ্কাধর্মী ভালোবাসার একটা কোনো প্রশ্ন, একটা কিছু আদর পাইলেই তাহার ক্ষত যন্ত্রণায় ঔষধ পড়িত। কিন্তু 'হ্যাদে লক্ষ্মী' হৈল লক্ষ্মীছাড়া,' এক মুহূর্তের প্রয়োজনে প্রীতি ভাণ্ডারের চাবি চারু যেন কোনোখানে খুঁজিয়া পাইল না। উভয়ের সুকঠিন মৌন ঘরের নীরবতা অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আসিল।" "খানিকক্ষণ নিতান্ত চুপচাপ থাকিয়া ভূপতি নিশ্বাস ফেলিয়া খাট ছাড়িয়া উঠিল এবং ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া আসিল।"

ইতোমধ্যে খবরের কাগজখানা তুলে দিতে হ'ল। ভূপতির জীবনের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা যে অভ্যস্ত পথে গত বারো বছর অবিচ্ছেদে চলে এসেছে, সেটা হঠাৎ এক জায়গায় যেন জলের মাঝখানে এসে পড়ল। অকস্মাৎ বাধা প্রাপ্ত তার এতদিনকার সমস্ত উদ্যমকে সে কোথায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে! তারা যেন উপবাসী অনাথ শিশু সন্তানের মতো ভূপতির মুখের দিকে চাইল, ভূপতি তাদের আপন অন্তঃপুরে করুণাময়ী শুশ্রূষা পরায়ণা নারীর কাছে এনে দাঁড় করাল। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস নারী তখন অমলের আসন্ন বিবাহ এবং বিলাত-গমনের চিন্তায় চিন্তিত, —ভূপতির পরিবর্তিত গতি উদ্যম ও উৎসাহ বিড়ম্বিত হয়ে ফিরে এল।

ভূপতির সংবাদ পত্রের বিলুপ্তির সম্ভাবনায় এবং বিলুপ্তির পর এইভাবে তার জীবনের ট্র্যাজেডির সূচনা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হতে লাগল। এই ট্র্যাজেডি যোজনায় পূর্ণ হয়ে উঠল অমলের বিবাহ ও বিলাত গমনের পর।

ভূপতি অমলের বিবাহ দিয়ে এবং তাকে বিলাত রওয়ানা করিয়ে দিয়ে এসে সেই বৃত্তান্ত চারুর কাছে বিবৃত করল। চারু আবেগাশ্রু প্লাবিত হওয়ার

আশঙ্কায় প্রথমতঃ সে সম্পর্কে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করল না। ভূপতি আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল, চারুর কি কোনো হৃদয় নেই? "চারুর হৃদয় যদি না থাকে তবে কোথায় ভূপতি আশ্রয় পাইবে।" কিন্তু ভূপতির বিবরণে চারু যখন শুনল যে, অমল ট্রেনে উঠে শিশুর মতো কেঁদেছিল, তখন চারু থাকতে না পেরে মাটিতে উপুড় হয়ে কান্না বোধ করতে চেষ্টা করতে লাগল।

ভূপতি স্বভাবতঃই কোনো কিছুর মধ্যে হীনতাকে খুঁজে পায় না, প্রবঞ্চনার কোনো লক্ষণ দেখে না। জগৎ সংসারের প্রতি তার এত অন্ধ বিশ্বাস। তাই অমলের জন্য চারুর এই শোকোচ্ছ্বাসে সে নিজের সর্বনাশকে দেখল না। বরং 'ভাবিল, চারুকে কী ভুল বুঝিযাছিলাম, চারুর স্বভাব এতই চাপা যে, আমার কাছেও হৃদয়ের কোনো বেদনা প্রকাশ করিতে চাহে না। সকলের প্রকৃতি একরূপ, তাহাদের ভালোবাসা সুগভীর, এবং তাহাদের বেদনাও অত্যন্ত বেশি।...ভূপতি চারুর ভালোবাসার উচ্ছ্বাস কখনোও দেখে নাই, আজ বিশেষ করিয়া বুঝিল, তাহার কারণ অন্যের দিকেই হৃদয়াবেগের স্বাভাবিক অস্বচ্ছন্দতার পরিচয় পাইয়া সে একটা তৃপ্তি অনুভব করিল।"

সংসারের মধ্যেও যে ব্যক্তি আশ্বাস খুঁজে পেয়ে তৃপ্তি লাভ করে, বস্তুর জগতে তারই ভাগ্যে ঘটে থাকে দুর্বিষহ ট্র্যাজেডি,—সেই ভ্রান্ত আশ্বাস যখন তার ভাঙে। তাই ভূপতিও প্রবেশ করল এইভাবে এক চূড়ান্ত ট্র্যাজেডির মধ্যে।

অমলের জন্য শোককে পরিহার করা, তার স্মৃতিকে বিস্মৃত হওয়া চারুর পক্ষে যখন কিছুতেই সম্ভব হ'ল না, তখন সে অমলের স্মৃতি পালন এবং স্বামীর প্রতি কর্তব্য সাধনের মাঝামাঝি এক ছলনাশ্রয়ী পথকে খুঁজে নিল। গৃহকার্যের অবকাশে একটা সময় সে নির্দিষ্ট করে নিল। সেই সময় নিজের গৃহদ্বার রুদ্ধ করে তন্নতন্ন ক'রে অমলের সঙ্গে তার নিজ জীবনের প্রত্যেক ঘটনা চিন্তা করত। অমল সম্মুখে থাকলে যেমন করে চারু ঠিক তেমনি করে কথাগুলি উচ্চারণ করে বলত, 'অমল, তোমাকে আমি একদিনও ভুলি নাই। এক দিনও না, এক দণ্ডও না। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পদার্থ সমস্ত তুমিই ফুটাইয়াছ, আমার জীবনের সার ভাগ দিয়া প্রতিদিন তোমার পূজা করিব।'

"এইরূপে চারু তাহার সমস্ত ঘরকন্না তাহার সমস্ত কর্তব্যের অন্তঃস্তরের তলদেশে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া সেই নিরালোক নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে অশ্রুমালা সজ্জিত একটি গোপন শোকের মন্দির নির্মাণ করিয়া রাখিল। সেখানে তাহার

স্বামী বা পৃথিবীর আর কাহারো কোনো অধিকার রহিল না। সেই স্থানটুকু যেমন গোপনতম, তেমনি গভীরতম, তেমনি প্রিয়তম। তাহারই দ্বারে সে সংসারের সমস্ত ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজের অনাবৃত আত্ম-স্বরূপে প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে বাহির হইয়া মুখোশখানা আবার মুখে দিয়া পৃথিবীর হাস্যালাপ ও ক্রিয়াকর্মের রঙ্গভূমির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়।"

এই প্রকার একটি বিচিত্র মনোভাব নিয়ে চারু প্রাণপণে স্বামীসেবা সুরু করল। পত্নীর এই সেবা ও যত্নেই কিন্তু ভূপতি যেন নবযৌবন ফিরে পেল। মনে মনে বলল, 'কাগজখানা গিয়া এবং অনেক দুঃখ পাইয়া এতদিন পরে আমি আমার স্ত্রীকে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি।'—এই ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে ভূপতির বাকী জীবন সুখেই কাটত। কিন্তু চারু যে ছলনার আশ্রয় নিয়েছে—তার পরিণতি অচিরেই ভূপতির এই মরুস্থানকে মরীচিকায় পরিণত করল।

অমল বিলাতে পড়াশুনায় ব্যস্ত। ঘনঘন পত্র দিতে পারছে না ভূপতিকে। তাই চারু কাতর হয়ে উঠল। টেলিগ্রাম করার প্রস্তাব করল। ভূপতি জানাল, আবশ্যকতা নেই। চারু গোপনে গহনা বন্ধক রেখে 'প্রী-পেড্' টেলিগ্রাম পাঠালো অমলকে। যেদিন উত্তর আসার সম্ভাবনা, সেদিন ধরা পড়বার ভয়ে চারু ভূপতিকে আত্মীয়বাড়ি যেতে প্রবৃত্ত করে। কিন্তু দৈবক্রমে পথে ভূপতির হাতেই টেলিগ্রামের উত্তর এল। চারুর এই হীন ষড়যন্ত্রই ভূপতির মরুস্থানকে মরীচিকায় পরিণত করল

ভূপতি সমস্ত ব্যাপারটা বুঝল। একটা অস্পষ্ট সন্দেহ অলক্ষ্যভাবে তাকে বিদ্ধ করতে লাগল। "সে সন্দেহটাকে ভূপতি প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে চাহিল না, ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বেদনা কোনো মতে ছাড়িল না।'

'প্রী-পেড্' টেলিগ্রামে উত্তর এসেছিল, অমল ভালো আছে। তবু সে কেন বিশদভাবে চিঠি লেখে না। চারুর সঙ্গে তার এমন বিচ্ছেদ হতে পারল কি ক'রে?—ভাবনায় চারু নিজেকে আর স্থির রাখতে পারে না। কাজকর্ম পড়ে থাকে, সকল বিষয়েই ভুল হয়, চাকরবাকর স্বরাজ পেয়ে যায়। তার এই অবস্থা দেখে সকলেই কানাকানি করে। শেষে এমন হল যে, হঠাৎ হঠাৎ সে চমকে উঠত, কথা বলতে বলতে তাকে কাঁদবার জন্ম উঠে চলে যেতে হ'ত; অমলের নাম শোনামাত্র তার মুখ বিবর্ণ হয়ে যেত।—এই সময়ই ভূপতির ট্র্যাজেডি ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে এল।

ভূপতির কাছে সমস্ত প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা স্পষ্ট হয়ে গেল। সে মুহূর্তের জন্যও যা কোনোদিন ভাবেনি, তাই ভাবতে বাধ্য হ'ল, চারুর প্রতি তার সমস্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভিত্তি আলগা হয়ে গেল, তার আর জীবনের অবলম্বন কিছুই থাকল না,—"সংসার একেবারে তাহার কাছে বৃদ্ধ শুষ্ক জীর্ণ হইয়া গেল।"

মাঝে যে কয়দিন ভূপতি চারুর মধ্যে জীবনের সব কিছু পেয়ে গেছে ভেবে আনন্দের উন্মেষে অন্ধ হয়েছিল, সেই ক'টা দিনের স্মৃতি তাকে এখন লজ্জা দিতে লাগল। পরম লজ্জা, প্রচণ্ড আত্মগ্লানি এবং গভীর দুঃখে সে ভাবতে লাগল, "যে অর্নাভিজ্ঞ বানর জহর চেনে না, তাহাকে ঝুঁটা পাথর দিয়া কি এমন করিয়া ঠকাইতে হয়।"

রবীন্দ্রনাথের এই প্রকার তির্যক এবং ইঙ্গিতধর্মী বাক্‌ভঙ্গি যেমন ছোটগল্পের রীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, তেমনি ভূপতির ট্র্যাজেডির গভীরতা প্রদর্শনেরও সহায়ক।

চারুর প্রণয়-প্রতারণা আবিষ্কার করে ভূপতি প্রচণ্ড আত্মগ্লানিতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। চারুর যে সব কপট কথায়, আদরে ব্যবহারে ভূপতি পুলকিত হয়ে উঠত সেগুলি তার ক্রমশঃ মনে পড়তে লাগল, এবং সেই স্মৃতি যেন "তাহাকে মূঢ় মূঢ় মূঢ় বলিয়া বেত মারিতে লাগিল।"

অন্তরের মধ্যে অমলকে আসন দিয়ে, প্রকাশ্য ব্যবহারে স্বামী সেবার যে ছলনার আশ্রয় নিয়েছিল চারু, তা ভূপতির চিত্তকে হাহাকারে পূর্ণ করে তুলল ঠিকই। কিন্তু ভূপতি সেই ধরনেরই চরিত্র, যারা দুঃখ যত বেশী পায়, দুঃখের বাহ্যপ্রকাশে ততই সংযত হয়ে ওঠে,—ততই তারা আত্মানুসন্ধানী হয়ে ওঠে, জগৎ-সংসারকে আরো ভালোভাবে বুঝতে চেষ্টা করে। এইজন্য এই সময় জীবনের ষোলআনা ট্যাজেডির মধ্যে অবস্থান করেও সে চারুর মনের দিকে চোখ তুলে চাইল। এই ছলনা ও বঞ্চনার আশ্রয় নেওয়াটাই কি চারুর পক্ষে কিছু কম ট্র্যাজিক?—এই ভাবনা ভূপতিকে ভাবিয়ে তুলল। সে ভাবল, "এই সমস্ত বঞ্চনা, এতো ছলনাকারিণীর হেয় ছলনা মাত্র নহে, এই ছলনাগুলির জন্য শত-যন্ত্রণা চতুর্গুণ বাড়াইয়া হতভাগিনীকে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত নিষ্পেষণ করিয়া বাহির করিতে হইয়াছে।" ভূপতি মনে মনে বলল, "হায়, অবলা, হায় দুঃখিনী। দরকার ছিল না। এত কাল আমি তো ভালোবাসা না পাইয়াও 'পাই নাই' বলিয়া জানিতেও

পারি নাই—আমার তো কেবল প্রুফ দেখিয়া, কাগজ লিখিয়াই চলিয়া গিয়াছিল ; আমার জন্য এত করিবার কোনো দরকার ছিল না।"

রবীন্দ্রনাথ ভূপতির এই সময়কার অনুসন্ধানী সুবিবেচক ও অনুভূতিপ্রবণ মনের সুন্দর একটি পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন, "তখন আপনার জীবনকে চারুর জীবন হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া—ডাক্তার যেমন সাংঘাতিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে দেখে, ভূপতি তেমনি করিয়া নিঃসম্পর্ক লোকের মতো চারুকে দূর হইতে দেখিল ! ঐ একটি ক্ষীণশক্তি নারীর হৃদয় কী প্রবল সংসারের দ্বারা চারিদিকে আক্রান্ত হইয়াছে। এমন লোক নাই যাহার কাছে সকল কথা ব্যক্ত করিতে পারে, এমন কথা নহে যাহা ব্যক্ত করা যায়, এমন স্থান নাই যেখানে সমস্ত হৃদয় উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়া সে হাহাকার করিয়া উঠিতে পারে—অথচ এই অপ্রকাশ্য অপরিহার্য অপ্রতিবিধেয় প্রত্যহ পুঞ্জীভূত দুঃখভার বহন করিয়া নিতান্ত সহজ লোকের মতো, তাহার সুস্থচিত্ত প্রতিবেশিনীদের মতো, তাহাকে প্রতিদিনের গৃহকর্ম সম্পন্ন করিতে হইতেছে।"

যার কারণে ভূপতির আজ এই মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডি, তার জন্য ভূপতির এরূপ দয়ার্দ্র বিবেচনা ভূপতির চরিত্রকে অপরিসীম মহিমায় মণ্ডিত করেছে। তার চরিত্রের এই মহিমার জন্যই তার প্রতি আমরা আরো বেশী সহানুভূতিশীল হই। এই মহত্ত্বের পুরস্কার সে কিছুই পায়নি, যা পেয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে প্রতারণা। কিন্তু সেই প্রতারণাকেও সে দয়ার্দ্র বিবেচনা এবং অপরিসীম প্রসন্ন দৃষ্টির আলোকে লঘু করে নিচ্ছে। ফলে তার আঘাতের গভীরতা ও ব্যাপ্তি বাইরে থেকে দেখা যায় না, কিন্তু ঔচিত্যের সূত্রে বোঝা যায়, এবং বুঝে বিস্মিত হতে হয়।

ভূপতি তার সকরুণ বিবেচনায় চারুর অপরাধকে লাঘব বা স্খালন করার চেষ্টা করলেও, মনের মধ্যে তার ধ্বংসকে সে কিছুতেই অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করতে পারল না। চারু এবং সে, যে আত্মিক দিক থেকে পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, এটা যেন সূর্যের মতো প্রখর এবং স্পষ্ট সত্যরূপে তার কাছে প্রতিভাত হ'ল। এইরকম অবস্থায় লৌকিকতার খাতিরে কেবল একসঙ্গে থাকার অর্থ বঞ্চনাকেই শুধু প্রশ্রয় দেওয়া।

তাই সে মহীশুরে খবরের কাগজের সম্পাদকের চাকরি নিয়ে সেখানে একাকী বাস করতে মনস্থ করল। বিদায়ের সময় চারু জিজ্ঞাসা করল, "কবে আসবে ?" ভূপতি বলল, "তোমার যদি একলা বোধ হয়, আমাকে লিখো,

আসব।" বলে ভূপতি যখন দ্বারের কাছে চলে এল, তখন হঠাৎ চারু ছুটে এসে তার হাত চেপে ধরে বলল, "আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমাকে এখানে ফেলে রেখে যেয়ো না।" কিন্তু আজ ভূপতি যে নিষ্ঠুর সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছে, তা তার ব্যবহারেও প্রকাশ পেল। সে চারুর মুখের দিকে চাইল। মুষ্টি শিথিল হয়ে ভূপতির হাত থেকে চারুর হাত খুলে এল। ভূপতি চারুর নিকট থেকে সরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

রবীন্দ্রনাথ ভূপতির এই সময়কার মনোভাবের একটি মর্মন্তুদ বর্ণনা দিয়েছেন—"ভূপতি বুঝিল, অমলের বিচ্ছেদ-স্মৃতি যে বাড়িকে বেষ্টন করিয়া জ্বলিতেছে চারু দাবানলগ্রস্ত হরিণীর মতো সে বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া পালাইতে চায়।—কিন্তু আমার কথা সে একবার ভাবিয়া দেখিল না? আমি কোথায় পালাইব। যে স্ত্রী হৃদয়ের মধ্যে নিয়ত অন্যকে ধ্যান করিতেছে, বিদেশে গিয়াও তাহাকে ভুলিবার সময় পাইব না—নির্জন বন্ধুহীন প্রবাসে প্রত্যহ তাহাকে সঙ্গদান করিতে হইবে? সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরিব তখন নিস্তব্ধ শোকপরায়ণা নারীকে লইয়া সেই সন্ধ্যা কী ভয়ানক হইয়া উঠিবে। যাহার অন্তরের মধ্যে মৃতভার, তাহাকে বক্ষের কাছে ধরিয়া রাখা, সে আমি কতদিন পারিব। আরও কত বৎসর প্রত্যহ আমাকে এমনি করিয়া বাঁচিতে হইবে। যে আশ্রয় চূর্ণ হইয়া ভাঙিয়া গেছে তাহার ভাঙা ইটকাঠগুলো ফেলিয়া যাইতে পারিব না, কাঁধে করিয়া বহিয়া বেড়াইতে হইবে?"

ভূপতির এই শেষ আত্মজিজ্ঞাসাতেই বোঝা যায় তার আঘাত কত গভীর ও ব্যাপক, তার ট্র্যাজেডি কী ভয়ানকভাবে অসহনীয়। তাই সে চারুকে বলল, "না সে আমি পারব না।" কিন্তু এটা ভূপতির মুহূর্তের অভিব্যক্তি-মাত্র। নিজের যন্ত্রণার কারণে অপরকে মার্জনা করতে না পারাটা তার স্বভাবের মধ্যেই নেই। সে নিজের যন্ত্রণাকে বরং আরো বেশী পরিমাণে সহ্য করে যাবে, কিন্তু কাউকে যদি ক্ষমা করার থাকে, তবে সে কার্পণ্য করবে না। তাই ভূপতির শেষ কথায় চারুর মুখ যখন অসহায়তায় শাদা হয়ে গেল, তখন ভূপতি না ব'লে পারল না যে, 'চলো চারু, আমার সঙ্গেই চলো।" কিন্তু চারুও বোধহয় শুধুমাত্র দয়ার আশ্রয় লাভ করাকে তার পক্ষে শ্রেয় মনে করল না। তাই সে বলল, "না থাক।"—অর্থাৎ ভূপতি তার সমস্ত ট্র্যাজেডিকে মাথায় নিয়ে একাকী হয়ে পড়ল।

ভূপতির ট্র্যাজেডি শুধু যে পত্নীর কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা ও বঞ্চনারই

কারণে ঘটেছে তা নয়। তার ট্র্যাজেডির মধ্যে আর একটু সূক্ষ্মব্যাপারও আছে। যে নারী জাতি সম্পর্কে ভূপতির অপরিসীম শ্রদ্ধা, যাদের উন্নত মূল্যবোধের উপর দাম্পত্যজীবনের ভিত্তি রক্ষিত, বিশেষভাবে তার স্ত্রীর মধ্যে সেই মূল্যবোধের হ্রাসপ্রাপ্তিও তার পক্ষে যথেষ্ট বেদনার কারণ। বাইরের বন্ধুবান্ধব এবং ভিতরের স্ত্রী—কাউকেই যে নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে বিশ্বাস করা যায় না, বিশ্বাস করলে প্রতারিত হবার সম্ভাবনা থাকে,—এই কুৎসিত সত্যটাই ভূপতির জীবনের মূল্যবোধকে বিচলিত করে দিয়েছে,—
—জগৎসংসার সম্পর্কে তার উন্নত ধারণার ভিত্তিমূলকে শিথিল করে দিয়েছে। এতেই সে বেদনা পেয়েছে সবচেয়ে বেশী। এটাই তার ট্র্যাজেডির মূল পরিচয়। —এই ট্র্যাজেডিই তার আরো ঘনীভূত হয়েছে যখন সে তার একমাত্র নির্ভরকেন্দ্র স্ত্রীকেও সংসারের সাধারণের ভীড়ের মাঝে একইরূপে দেখল। তার আকুল প্রত্যাশা ছিল, তার স্ত্রীকে অন্ততঃ জগৎ-সংসারের কলুষ স্পর্শ করতে নিশ্চয়ই পারেনি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার এই আকুল প্রত্যাশাও নিষ্ঠুর আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। এইখানেই তার ট্র্যাজেডির সম্পূর্ণতা। বহির্জীবনে আত্মীয়বন্ধুদের প্রতারণায় সংবাদপত্রের বিপর্যয়ের সংঘটনা মাত্রই সে ক্রমশঃ অন্তর-জীবনের দিকে সরে এসেছে আশ্রয়লাভের জন্য। কিন্তু অন্তর জীবনের কেন্দ্রস্থলেও এসে সে দেখল, বিশ্বাসের আশ্রয় নেই। বহির্জীবনে তার ট্র্যাজেডির সুরু, অন্তর্জীবনে তার শেষ। এইটাই তার ট্র্যাজেডির গতি।

ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্পষ্টতঃই 'নষ্টনীড়ে' গ্রীক্-ট্র্যাজেডির লক্ষণ খুঁজে পেয়েছেন। তিনি বলেছেন, "উপকরণের স্বল্পতায়, বাহুল্যবর্জিত গতিতে, স্থির ভয়াল পরিণামে"—এই গল্প গ্রীক ট্র্যাজেডীর সমধর্মা-ই বটে। উদার মহাপ্রাণ ভূপতি, শিল্পী ও সহৃদয় 'অমল, স্নিগ্ধ নির্মল-হৃদয়' চারু—দুর্যোগের একবিন্দু কালো মেঘও কোথাও ছিল না। তবু আকিলিসের মরণ কেন্দ্রের মতো একটি ভুল ভূপতিরও ছিল:

"এইরূপে যতদিন সে খবরের কাগজ লইয়া ভোর হইয়াছিল, ততদিনে তাহার বালিকাবধূ চারুলতা ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করিল। খবরের কাগজের সম্পাদক এই মস্ত খবরটি ভালো করিয়া টের পাইল না।" এবং

"যে সময়ে স্বামী স্ত্রী, প্রেমোন্মেষের প্রথম অরুণালোকে পরস্পরের কাছে অপরূপ মহিমায় চিরনূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়, দাম্পত্যের সেই স্বর্ণপ্রভামণ্ডিত প্রত্যুষকাল অচেতন অবস্থায় যখন অতীত হইয়া গেল, কেহ জানিতে পারিল

না। নূতনত্বের স্বাদ না পাইয়া উভয়ে উভয়ের কাছে পুরাতন পরিচিত অভ্যস্ত হইয়া গেল।"

দাম্পত্য জীবনেই এই পরম সত্যের দিকে অসতর্ক পতি-পত্নীকে এখানে সচেতন করে দিয়েছেন লেখক, এই ভ্রান্তিটুকুর মধ্যেই দেবলোকের কুটিল নির্দেশ —এরই রন্ধ্র ধরে প্রবেশ করল নেমেসিস্। অমল ভারতবর্ষ ছেড়ে ছুটে পালালো, ভূপতি দাঁড়িয়ে রইল বজ্র দগ্ধ বনস্পতির মতো— চারু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।...

মহান ট্র্যাজিডী, মহৎ উপন্যাসের এক অঞ্জলি স্বাদ আমরা 'নষ্টনীড়ে' লাভ করি।[১৭]

'নষ্টনীড়' প্রকাশিত হয় ভারতী পত্রিকায় ১৩০৮-এ। এর পরের বছর (১৩০৯) 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ দুটি গল্প ('দর্পহরণ' ও 'মাল্যদান') প্রকাশ করেন এবং তারপর পাঁচ বছর পরে ১৩১৪ 'প্রবাসী' পত্রিকায় পুনরায় একটি ভালো গল্প রচনা করেন: 'মাস্টারমশায়'।

গল্পটি পাঠ করে আমাদেরও মনে হয়, মাস্টারমশায় হরলালের জীবন এক ট্র্যাজিক পরিণতি লাভ করেছে। অবশ্য এখানে ট্র্যাজেডি কোন নীতিবোধের বিপর্যয়জনিত নয়, এখানে ট্র্যাজেডি ঘটেছে নিছক ঘটনাগত জটিলতায়। মাস্টার মশায় হরলাল ঘটনাচক্রে এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে গিয়ে পড়লেন, যেখান থেকে তিনি উদ্ধার পেতে পারেন না, এবং সেই জন্যই অনিবার্যভাবেই তাঁকে ট্র্যাজিক পরিণতি লাভ করতে হয়। ড শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনাগত জটিলতাকেই ট্র্যাজেডির দুশ্ছেদ্য জটিল জাল' বলেছেন।[১৮]

কোন সূত্রের মধ্যদিয়ে হরলালকে এই ট্র্যাজিক পরিস্থিতির মধ্যে গিয়ে পড়তে হল, তা যদি অন্বেষণ করতে হয়—যাকে ট্র্যাজেডির তত্ত্বে বলা হয় চরিত্রের নিহিত ত্রুটি বা ট্র্যাজিক ভ্রান্তি,—তাহলে দেখা যাবে যে, সেটা হচ্ছে ছাত্র বেণুগোপালের প্রতি হরলালের অপরিসীম মমতা এবং সেই কারণে তাকে সন্দেহ করতে না পারা। এই সূত্রের মাধ্যমে হরলালকে এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে গিয়ে পড়তে হ'ল, যা জন্য তিনি আদৌ তৈরী ছিলেন না, এবং যেখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার রাস্তাও তাঁর জানা নেই। তাই নিতান্ত অন্যায়ভাবেই তাঁকে বরণ করতে হ'ল একটা শোচনীয় পরিণতি।

ধনী অধরলালের পুত্র বেণুগোপালের গৃহশিক্ষকতার দায়িত্ব নিয়ে যাওয়া

১৭. কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭১, পৃ. ১৩—৭।
১৮. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৩৭২১, পৃ ২২।

থাকা ও পাঁচ টাকা বেতনের বিনিময়ে হরলাল অধরলালের গৃহে নিযুক্ত হন। শিক্ষকতার নৈপুণ্যে এবং স্নেহ-মমতায় হরলাল অচিরেই বালক ছাত্রটির মন জয় করে ফেলেন। ছাত্র বেণুগোপাল মাতা-পিতার চেয়েও হরলালের সান্নিধ্যকেই তাই বেশী ভালো বাসতে থাকে।

এরপর একদিন অধরলালের বাড়িতে কাপড়চোপড় চুরি যায়। হরলালকেও সন্দেহ করা হ'ল। অধরবাবু হরলালকে পৃথক বাসায় থাকতে বলেন। অপমাণিত হরলাল গৃহশিক্ষকতা পরিত্যাগ করেন এবং চাকুরির সন্ধানে প্রবৃত্ত হন। চাকুরিও একটা পেয়ে গেলেন হরলাল।

তারপর ছাত্র শিক্ষকে অনেক দিনের ছাড়াছাড়ি। ছাত্র বেণু বড় হয়েছে, বিলাসী হয়েছে, কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হচ্ছে। এই রকম অবস্থায় সে বিলাত গিয়ে ব্যারিস্টার হবার আকাঙ্ক্ষায় গৃহত্যাগ করে এবং হরলালের গৃহে এসে উপস্থিত হয়। হরলালের মা পুত্র স্নেহে তাকে আপ্যায়ন করতে ব্যস্ত। এমন সময় অধরবাবু এসে সেখানে উপস্থিত। তিনি পুত্রের সম্মুখে এসে ক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে হরলালের দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমি মনে করিয়াছ, বেণুকে বশ করিয়া উহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া খাইবে। কিন্তু সে হইতে দিব না। ছেলে চুরি করিবে। তোমার নামে পুলিশ কেস করিব, তোমাকে জেলে চৌদ্দ বছরে ছাড়ব।' অসহায় হরলালের কাউকে কিছু বলার থাকল না। সমস্যা সে সৃষ্টি করে না, সৃষ্টি করতে চায়ও না। কিন্তু সমস্যা তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরছে অক্টোপাসের মতো গ্রাস করছে।

অধরলাল প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিবাহ করতে প্রস্তুত। এমন সময় একদিন রাত্রে বেণু বিলাত পলায়নের উদ্দেশ্যে হরলালের গৃহে এসে উপস্থিত। কিন্তু সে জ্ঞাপন করল, পরশু পিতার দ্বিতীয় বিবাহ, তাই ক্ষোভে দুঃখে সে বারাকপুরে চলেছে, ইচ্ছা তার না ফেরার, এমন কি সাহস থাকলে সে জলে ডুবে মৃত্যু বরণ করত। বলতে বলতে সে কেঁদে ফেলল। এই সব কথা শুনে 'হরলালের বুকে যেন ছুরি বিঁধিতে লাগিল। একজন অপরিচিত স্ত্রীলোক আসিয়া বেণুর মার ঘর, মার খাট, মার স্থান অধিকার করিয়া লইলে, বেণুর স্নেহ-স্মৃতিজড়িত বাড়ি যে বেণুর পক্ষে কি রকম কণ্টকময় হইয়া উঠিবে তাহা হরলাল সমস্ত হৃদয় দিয়া বুঝিতে পারিল।' সেই রাত্রেই বেণু হরলালের অজ্ঞাতে তার অফিসের টাকা থেকে তিন হাজার টাকা নিয়ে, এক ব্যাগ স্বর্ণালঙ্কার এবং দু'খানি পত্র (একখানি পিতাকে, এবং একখানি

মাস্টারমশায়কে) রেখে বিলাত পলায়ন করল। মাস্টারমশায় ছাত্র-স্নেহের দক্ষিণা হিসেবে উদ্ধারের পন্থাবিহীন এক গভীর সঙ্কটের মধ্যে গিয়ে পড়লেন।

সকালে হরলাল যখন ব্যাপারটি বুঝলেন, তখন তিনি যেন বজ্রাহত হলেন। তিন হাজার টাকার বিনিময়ে তাঁর ছাত্র মায়ের স্বর্ণালঙ্কারগুলি রেখে গেছে। কিন্তু অন্যায় বোধে তিনি সেগুলি গ্রহণ করতে পারেন না। তাই তিনি অধরবাবুকে লেখা বেণুর পত্র ও স্বর্ণালঙ্কারগুলি নিয়ে অধরবাবুকে প্রদান করলেন। অলঙ্কার পেয়ে অধর বলে উঠলেন, 'মাস্টারে ছাত্রে মিলিয়া বেশ কারবার খুলিয়াছ তো। জানিতে এ চোরাই মাল বিক্রি করিলে ধরা পড়িবে, তাই আনিয়া দিয়াছ—মনে করিতেছ সাধুতার জন্য বকশিশ পাইবে?' বেণুর পত্রখানি পড়ে তিনি আগুন হয়ে উঠলেন। বললেন, 'আমি পুলিশে খবর দিব। আমার ছেলে এখনো সাবালক হয় নাই—তুমি তাহাকে চুরি করিয়া বিলাত পাঠাইয়াছ। হয়তো পাঁচশ টাকা ধার দিয়া তিন হাজার টাকা লিখাইয়া লইয়াছ। এ ধার আমি শুধিব না।'

যাই হোক গহনা চুরির মীমাংসা হওয়ার পরেই বেণুর বিলাত পালানো নিয়ে হুলস্থূল পড়ে গেল। হরলাল সমস্ত অপরাধের ভার মাথায় করে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন।

ছাত্রের প্রতি মমতায় হরলাল অফিসের সাহেবের কাছেও প্রকাশ করতে পারলেন না কে অফিসের টাকা চুরি করেছে। কিন্তু ট্র্যাজেডি এখানেই যে, এই মমতার জন্য তিনি কি কোথাও সুবিচার পাবেন? যে ছাত্রকে একদিন তিনি ভালোবেসেছিলেন, সেই ছাত্রের প্রতি মমতায় তাঁর বক্ষভরা। এই মমতাকে রক্ষা করতে গিয়েই তিনি একটার পর একটা অপমান এবং বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়েছেন, কিন্তু মমতাকে তো বিসর্জন দিতে পারছেন না। এতবড় যে মানবিকতা, হৃদয়বাদিতা, জগতে তো এর কোনো মূল্যই নেই। তাই তিনি বিনিময়ে পেয়েছেন লাঞ্ছনা, পরিণামে ট্র্যাজেডি।

অফিসের সাহেব তাঁকে একদিনের সময় দিয়েছিলেন টাকা যোগাড় ক'রে জমা দেবার জন্যে। কিন্তু হরলালের কাছে সময় দেওয়াও যা, সময় না দেওয়াও তা। কারণ উপার্জন ছাড়া অর্থসংগ্রহের কোনো সংক্ষিপ্ত পথ তাঁর জানা নেই। তাই তিনি বেশিক্ষণ অর্থসংগ্রহের উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারলেন না। পথে পথে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ক্ষুধার্ত, পরিশ্রান্ত অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে শেষকালটায় মনে করলেন, "রাত্রি যখন নিবিড় হইয়া আসিবে, কোনো

লোকই যখন এই অতি সামান্য হরলালকে বিনা অপরাধে অপমান করিবার জন্য জাগিয়া থাকিবে না, তখন সে চুপ করিয়া তাহার মায়ের কোলের কাছে গিয়া শুইয়া পড়িবে—তাহার পরে ঘুম যেন আর না ভাঙ্গে!"

এই সঙ্কট থেকে মুক্তি পাবার কোনো পথ খুঁজে না পাওয়ায় যখন তাঁর স্বাভাবিক বুদ্ধি বিনষ্ট হয়ে এল, মস্তিষ্কে যখন বিকৃতির লক্ষণ দেখা গেল, সমস্ত জীবন যখন দুর্বহ হয়ে একটা চঞ্চল বিক্ষোভের মধ্যে তার অবসান খুঁজতে লাগল, তখন জীবনের এই দুশ্ছেদ্য জটিল ট্র্যাজেডিটুকু একটা অদ্ভুত ভঙ্গির মধ্য-দিয়ে একটি শান্ত অচঞ্চল সুগভীর অনুভূতির মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করল। এই বিশেষ ভঙ্গিটুকুর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের কল্পনায়ার, তাঁর বিশেষ কবি-মানসের অপূর্ব পরিচয় আছে। ব্যাপারটি কিছুই নয়, এই সহায় সম্বলহীন নৈরাশ্যান্ধকারময় বর্তমান ও ভীষণতর ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে তার দেহ মনের চৈতন্য বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং এই প্রকাণ্ড মানসিক আঘাত সহ্য ক'রে তিনি আর বেঁচে উঠতে পারলেন না।

রবীন্দ্রনাথ হরলালের এই মৃত্যুকালীন মানসিক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'সমস্ত বেদনা যেন দূর হইয়া গেল···মনের মধ্যে একটি সুগভীর সুনিবিড় আনন্দপূর্ণ শান্তি ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। সে যে মনে করিয়াছিল কোথাও তাহার কোনো পথ নাই, সহায় নাই, নিষ্কৃতি নাই, তাহার অপমানের শেষ নাই দুঃখের অবধি নাই, সে কথাটা যেন এক মুহূর্তেই মিথ্যা হইয়া গেল।···মুক্তি অনন্ত আকাশ পূর্ণ করিয়া আছে, শান্তির কোথাও সীমা নাই।···যে আবেষ্টনে সে আপনাকে আপনি বাঁধিয়াছিল, তাহা সমস্তই খুলিয়া গেল।···বাতাস ভরিয়া গেল, আকাশ ভরিয়া উঠিল, একটি একটি করিয়া নক্ষত্র মিলাইয়া গেল,—হরলালের শরীর মনের সমস্ত বেদনা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চেতনা তাহার মধ্যে অল্প অল্প করিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল,—ঐ গেল তপ্ত বাষ্পের বুদ্বুদ একেবারে ফাটিয়া গেল, এখন আর অন্ধকারও নাই, আলোকও নাই, রহিল কেবল একটি প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা।'

'ইহাতে যে শুধু সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের সঙ্গে একটি অপূর্ব কল্পমায়াই আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, তাহাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে প্রকৃতির ভাষায় রূপান্তরিত করিবার, প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের সঙ্গে তাঁহাকে একান্তভাবে যুক্ত করিয়া অভিব্যক্তি দান করিবার যে বিশেষ শিল্পকৌশল একান্তই রবীন্দ্র প্রতিভার বৈশিষ্ট্য, এই গল্পটির পরিসমাপ্তির মধ্যে তাহারও পরিচয় আছে।[১৯]

১৯. ডঃ নীহাররঞ্জন রায়: রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, ২য় (১৩৫৩) পৃঃ ২১৮।

এছাড়া হরলালের মৃত্যুকালীন ঐ মানসিক অবস্থার বর্ণনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ হরলালের ট্র্যাজেডিকে অত্যন্ত করুণ এবং ভয়াবহ করে তুলেছেন। হরলালের এই ট্র্যাজেডিতে সহানুভূতির সঙ্গে বিস্ময়ও আমাদের মনে জাগে—কবির বর্ণনাগুণে বিনা অপরাধের এই বিপর্যয় ও ধ্বংস আমাদের হতবাক্ করে দেয়।

'মাস্টারমশায়' গল্পটির সঙ্গে একই বছরে দু'মাস পরে (১৩১৪, কার্ত্তিক) 'বঙ্গভাষা'য় রবীন্দ্রনাথ 'গুপ্তধন' গল্পটি রচনা করেন। গল্পটি রূপক-ধর্মী। গল্পটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যেন বোঝাতে চেয়েছেন যে, সংসারের ছোটখাটো সুখদুঃখের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা সন্ধান করতে হবে, স্বর্ণের লোভেই হোক আর সন্ন্যাসের লোভেই হোক অন্যত্র দৃষ্টিপাত করলে বিড়ম্বিত হবার আশঙ্কাই সর্বাধিক।[২০]

এই গল্পের মৃত্যুঞ্জয় তিনপুরুষ ধরে একটি লিখনপত্র সযত্নে রক্ষা করে আসছিল, তার বিশ্বাস ঐ লিখনপত্রের মধ্যে দুর্বোধ্য ইঙ্গিতে গুপ্তধনের সন্ধান আছে। অবশেষে অনেক দুঃখ এবং অধ্যবসায়ের পরে মৃত্যুঞ্জয় তার পুরুষানুক্রমিক আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী সেই গুপ্তধনের সন্ধান লাভ করল অজ্ঞাত অরণ্যের মাটির নীচে। মৃত্যুঞ্জয় উল্লাসে অধীর হয়ে উঠল, কিন্তু একটু পরেই তার মনে আতঙ্ক জাগ্রত হল, কারণ সোনার পিণ্ডগুলি আলো চায় না প্রাণ চায় না, মুক্তি চায় না। এই সময় তার মনে পড়তে লাগল, 'পৃথিবীতে এখন গোধূলি আসিয়াছে। আহা, সেই গোধূলির স্বর্ণ, যে স্বর্ণ কেবল ক্ষণকালের জন্য চোখ জুড়াইয়া অন্ধকারের প্রান্তে কাঁদিয়া বিদায় লইয়া যায়। তাহার পরে কুটিরের প্রাঙ্গণ তলে সন্ধ্যাতারা একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। গোষ্ঠে প্রদীপ জ্বালাইয়া বধূ ঘরের কোণে সন্ধ্যাদীপ স্থাপন করে। মন্দিরে আরতি ঘণ্টা বাজিয়া উঠে।'

মানুষের সুখ-দুঃখের সংসারের এই আনন্দ ও সৌন্দর্যের কল্পনা পাতালের সুড়ঙ্গের মধ্যে অবস্থিত স্বর্ণপুরীতে দিনের পর দিন আবদ্ধ মৃত্যুঞ্জয়কে ব্যথিত করে তুলনায়। মনুষ্য সংস্রব বিহীন এই নিষ্প্রাণ স্বর্ণগুহায় তাকে কতদিন থাকতে হবে,—এই আতঙ্কে মৃত্যুঞ্জয়ের মানব-চিত্ত আর্তনাদ করে উঠল। মৃত্যুঞ্জয়ের এই মানসিক অবস্থা নিঃসন্দেহে ট্র্যাজিক।

মৃত্যুঞ্জয়ের ট্র্যাজেডি হয়তো এখানেই যে, তার আজন্মসঞ্চিত স্বর্ণাকাঙ্ক্ষাকে অচিরেই পরিত্যাগ করতে হ'ল। যে স্বর্ণকে সে এখন পায়ের তলায় দলতে

২০. শ্রীপ্রমথনাথ বিশী: রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প (১৩৬৮) পৃ. ৪১।

পারে, দাঁতে কেটে টুক্‌রো করে ছড়িয়ে দিতে পারে, জীবনের আকাঙ্ক্ষায় সেই স্বর্ণের এক মুঠোও সে সঙ্গে নিতে পারবে না। তাই সন্ন্যাসী যখন জিজ্ঞাস করলেন 'মৃত্যুঞ্জয়, কী চাও।' 'মৃত্যুঞ্জয় বলে উঠল, 'আমি আর কিছুই চাই না—আমি এই সুরঙ্গ হইতে, অন্ধকার হইতে, গোলক ধাঁধাঁ হইতে, এই সোনার গারদ হইতে, বাহির হইতে চাই। আমি আলোক চাই, আকাশ, মুক্তি চাই।' সন্ন্যাসী বললেন, 'এই সোনার ভাণ্ডারের চেয়ে মূল্যবান রত্নভাণ্ডার এখানে আছে। একবার যাইবে না?'

মৃত্যুঞ্জয় বলল, 'না, যাইব না।'—'একবার দেখিয়া আসিবার কৌতূহলও নাই?'— 'না আমি দেখিতেও চাই না। আমাকে যদি কৌপীন পরিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয়, তবু আমি এখানে এক মুহূর্তও কাটাইতে ইচ্ছা করি না।'

সন্ন্যাসী তারপর মৃত্যুঞ্জয়কে নিয়ে একটি কূপের সামনে গিয়ে তার হাতে সেই লিখন পত্রটি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানি লইয়া তুমি কি করিবে।' মৃত্যুঞ্জয় সঙ্গে সঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে পূর্বসাত জন্মে সেই সযত্ন-রক্ষিত পত্রটিকে ছিঁড়ে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করল।

এইভাবে একটা ট্র্যাজিক অভিজ্ঞতা মৃত্যুঞ্জয়কে তার স্বর্ণমোহের নিরন্তর উদ্বেগ ও যন্ত্রণ থেকে মুক্তি দিল। গল্পটি রূপক এবং বক্তব্যপ্রধান। বাস্তব-জগতের বিশ্বাস্য দুঃখবেদনার স্পর্শ এই গল্পে নেই। হয়তো সেই জন্যই ট্র্যাজেডির প্রবল দুঃখের অভিজ্ঞতা এই গল্পটিতে লাভ করা যায় না।

এরপর পুনরায় 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের দু'টি গল্প প্রকাশিত হয়—রাসমণির ছেলে (আশ্বিন ১৩১৮) এবং 'পণরক্ষা' (পৌষ ১৩১৮)।

'রাসমণির ছেলে' গল্পটি অত্যন্ত করুণ-রসাত্মক। শানিয়াড়ির চৌধুরী বংশের ভবানীচরণ তার পিতা অভয়াচরণের দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শ্যামাচরণ বয়সে তার চেয়ে অনেক বড়। পারিবারিক চক্রান্তে ভবানীচরণ পৈতৃক সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত হয়। নিঃসীম দারিদ্র্যে ভবানীচরণ তার পুত্র কালীপদকে বড়োমানুষের সন্তানের মতো মানুষ করতে থাকে। পাঁচজনের পরামর্শে ভবানীচরণের বিশ্বাস হয় যে, কালীপদই পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারবে। এই কালীপদর উচ্চশিক্ষার জন্য কোলকাতায় থাকাকালীন দুঃখ-কষ্ট অত্যন্ত করুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। কোলকাতাতেই অসুখের সময় তাকে শ্যামাচরণের পৌত্র শৈলেন, যে কালীপদর লাঞ্ছনার মূল নায়ক, সে কালীপদকে চিনতে পারে কালীপদকে লিখিত তার পিতা

ভবানীচরণের চিঠিপত্রের মাধ্যমে। কিন্তু সে আত্মপরিচয় দেয় না। কালীপদর মৃত্যুর পর ভবানীচরণের সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের আশা নির্মূল হয়ে যায় এবং সম্পত্তি সম্পর্কেও আর তার কোনো বাসনা থাকে না। দেশে ফিরে এই প্রকার অস্থির এবং অস্বাভাবিক মানসিকতার মাঝে এক ঝড়জলের রাত্রিতে জানলার ধারে বসে সে পুত্রের কথা ভাবতে থাকে। জানলার কাছে হঠাৎ কাকে যেন দেখতে পায়। আগ্রহে বাইরে গিয়ে কাউকে না পেয়ে সে পাগলের মতো হয়ে যায়। কিন্তু তার পরেই ঘরের মধ্যে এসে সেই দলিলখানা সে দেখতে পায়,—যেটা শ্যামাচরণ বা তার পুত্র তালাপদ হরণ করেছিল। ভবানীচরণ ভাবল, তার পুত্রই মৃত্যুর পর-পারে থেকেও দলিল উদ্ধার করে দিয়ে গেছে। কিন্তু পুত্রের অবর্তমানে তখন আর তার দলিলের কোনো দরকার নেই—সেটাকে সে ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

আসলে কালীপদর পরিচয় পাবার পর পিতৃ-পিতামহের অন্যায়ের অনুতাপে শৈলেনই ঝড়জলের রাত্রিতে এসে গোপনে ভবানীচরণের ঘরের মধ্যে দলিলটিকে ফেলে দিয়ে গেছে। শৈলেনের ছায়ামূর্তিকেই ভবানীচরণ পুত্র ব'লে কল্পনা করে উঠেছিল।

গল্পটির আগাগোড়াই অত্যন্ত তীব্র করুণরসে পরিপূর্ণ,—হতাশার সমুদ্রে আশার ভেলায় ভেসে বেড়ানোর একটি করুণ কাহিনী। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'রাসমণির ছেলের' ন্যায় এত বড়ো মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডি-গল্প বিশ্বসাহিত্যে অতি অল্পই আছে।[২১] সুতীব্র করুণরস ট্র্যাজেডির মুখ্য উপাদান যে হতে পারে, তা আমরা পূর্বে দেখেছি। সেই করুণরসের প্রতি লক্ষ্য রাখলে এই গল্পটিকে যথেষ্টই ট্র্যাজিক মনে হয়। অবশ্য এই ট্র্যাজেডি কালীপদর জীবনের মধ্যদিয়ে ততটা ফোটেনি, যতটা ফুটেছে ভবানীচরণের জীবনের মধ্যদিয়ে—যেখানে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এই গল্পের সৌন্দর্যকে খুঁজে পেয়েছেন।[২২] সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করা ব্যাপারটা কালীপদর কাছে ছিল একটা কর্তব্য, কিন্তু ভবানীচরণের কাছে সেটা ছিল একটা স্বপ্ন, সেই স্বপ্ন বাস্তব করে তুলতেই হবে। সেই স্বপ্ন একদিন বাস্তব হ'ল, কিন্তু তখন তার এ সম্পর্কে আর আগ্রহ নেই। উপরন্তু পুত্রের অবর্তমানে যখন বৈরাগ্যই ভবানীচরণের একমাত্র প্রার্থনীয়, তখন অকস্মাৎ দলিলটা ফিরে পাওয়া

---

২১. রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড, (১৩৫৫) পৃ. ২৫২।

২২. রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, ২য়, (১৩৫৩) পৃ. ২২০

তারপক্ষে যেন একটা কঠিন বিদ্রূপ, সেটা যেন তার জীবনের ট্র্যাজেডিকেই আরো শোচনীয় করে তুলল।

‘পণরক্ষা’ গল্পটিরও অন্তিমভাগ অত্যন্ত বিষাদাচ্ছন্ন। বড়োভাই বংশীবদন ছোটভাই রসিককে মাতৃস্নেহে ভালোবাসত—নিজের জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিয়ে সে ছোটভাইয়ের আব্দার মিটিয়ে এসেছে। দাদা অশক্ত অবস্থায় অর্থোপার্জনের জন্য পৈতৃক তাঁতের কাজ করতে বলায় ছোট ভাই গৃহত্যাগ করে। সে হীন তাঁতের কাজের চেয়ে অন্য কোনো উপায়ে অর্থোপার্জনকে সহজ মনে করেছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখল তা নয়। কিন্তু কপাল-গুণে তন্তুবায় সমাজের এক ধনাঢ্যব্যক্তির কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে যায়। কিন্তু তার গ্রামের সৌরভী ছিল তার ভালোবাসার পাত্রী।

এদিকে বড়োভাই বংশীবদন ছোটভাইয়ের বিরহে কাতর হয়ে পড়ে। অশক্ত অবস্থাতেও সৌরভীর সঙ্গে ভাইয়ের বিবাহের পণের টাকা সে সংগ্রহ করে ফেলে। ভাইয়ের শখ ছিল বাইসাইকেলের -তাও একখানা ক্রয় করে ফেলে। পণের টাকা এবং বাইসাইকেল সৌরভীদের কাছে রেখে বংশী প্রাণত্যাগ করে। তার আশা ছিল, ভাই একদিন ফিরবে, এবং তখন তার সাধ মিটবে।

কিন্তু বণিক ধনীগৃহের জামাই হিসেবে যখন গ্রামে ফিরল, তখন স্নেহপ্রবণ দাদা বেঁচে নেই দেখল। আরও দেখল, তার দাদা তার বিবাহের জন্য টাকা এবং উপহারের সাইকেল রেখে গেছে—অথচ সে কি নিষ্করুণভাবে দাদার আশাকে সৌরভীর আশাকে এমন কি নিজের আশাকেও ব্যর্থ করে রেখেছে। তার ইচ্ছে, দাদার শেষ আশা পূর্ণ করে, কিন্তু উপায় নেই।—এই বিষাদ করুণ পরিস্থিতিতে গল্পটি শেষ হয়েছে।

ট্র্যাজেডির বিষাদ করুণ ভাবাবেগে গল্পটির শেষ ভাগ ভারাক্রান্ত। ‘রাসমণির ছেলে’ গল্পের ভবানীচরণের মতো এই গল্পের বংশীবদনেরও সমস্ত আশা-আহ্লাদ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল। ভবানীচরণের পুত্রস্নেহ, আর বংশীর ভ্রাতৃস্নেহ,—পারিবারিক সম্পর্কের মাধুর্যের রক্ষক এই বৃত্তিগুলির অচরিতার্থতা বা ব্যর্থতা আমাদের কাছে খুবই শোকাবহ লাগে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ পর্যায়ের গল্পে মানুষের এই সহজ ধর্মগুলিকে নিয়ে ট্র্যাজেডি রচনা করেছেন। অবশ্য একথাও স্বীকার করা উচিত যে, ভবানীচরণের ট্র্যাজেডি যত স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে উপস্থাপিত, বংশীর ট্র্যাজেডি তেমনভাবে উপস্থাপিত হয়নি।

এরপর রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্রে' অনেকগুলি গল্প রচনা করেন। তারমধ্যে প্রথমে 'হৈমন্তী' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১) উল্লেখযোগ্য।

এটিও একটি করুণ-রসাত্মক গল্প, শ্বশুরালয়ে অসহায় বধূর নিঃসঙ্গ দুঃখ যাপনের ইতিবৃত্ত। শ্বশুরালয় বধূর জীবন-যন্ত্রণার পক্ষে যেন একটি যন্ত্র স্বরূপ। কারণে এবং অকারণে বধূর জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলার মধ্যেই শ্বশুরালয়ের যেন যথার্থ গৌরব এবং আনন্দ। শ্বশুরালয়ের এই নিষ্করুণ অত্যাচারের বলি এই বধূগণ সহজেই আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে।

হিমাচলের এক নৃপতির কর্মচারীর কন্যা হৈমন্তী। পিতা তার বিবাহে পনেরো হাজার টাকা পণ এবং পাঁচহাজার টাকার গহনা দিয়েছেন। এত বিরাট খরচ করে যে পিতা কন্যার বিবাহ দেন, তিনি যদি পশ্চিমের রাজার মন্ত্রী হন, তবে সেই পিতা ও তার কন্যার প্রতি এই শ্রেণীর অত্যাচারী শ্বশুরালয়ের একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত দুর্বলতা থাকে। এক্ষেত্রেও বিবাহের অব্যবহিত পরে শ্বশুরালয়ে হৈমন্তীর একটু বিশেষ খাতির ছিল, তার পিতার প্রতিও ছিল তোষামোদ মিশ্রিত শ্রদ্ধা। কিন্তু অচিরেই জানা গেল, হৈমন্তীর পিতা আসলে দরিদ্র—আগাগোড়া ধার ক'রে কন্যার বিবাহ দিয়েছেন, এবং তিনি মন্ত্রী নন, রাজার স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে হৈমন্তর শ্বশুরালয়ে হৈমন্তীর এবং তার পিতার প্রতিপত্তি হ্রাস হয়ে গেল।

বিবাহের সময় হৈমন্তীর বয়স হয়েছিল সতেরো। পাড়ার স্বজনেরা তা নিয়ে ঠাট্টা করলেও হৈমন্তী শ্বশ্রূমাতার ইঙ্গিত সত্ত্বেও নারীচরিত্রের স্বভাব-রীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে বয়স কমিয়ে এগারো বছর বলতে পারল না। প্রকৃত বয়সটাই বলতে লাগল। ফলে শ্বশুরালয়ে সে নির্যাতন-ভাজন হয়ে উঠল।

হৈমন্তীর চরিত্রে কোনো প্রকারের কপটতা ছিল না। বয়স কমানোর জন্য সে যেমন মিথ্যা কথা বলতে পারে না, তেমনি পিতার কাছে পত্রেও সে শ্বশুরালয় সম্পর্কে কোনো বিক্ষোভ জানাতে পারে না। সহজ-সরল এবং অনাবিল তার চরিত্র। এতেও শ্বশুরালয়ের সকলে তার প্রতি খুবই অখুশি, কারণ তাকে আক্রমণ করার কোনো সূত্র সে কিছুই রাখে না। যেখানে তার কিছু অসম্পূর্ণতা আছে, কপটতার দ্বারা সে সেই অসম্পূর্ণতাকে গোপন করতেও জানে না। এইজন্যই পূজার অনুষ্ঠানে সে বিড়ম্বিত হয়, তার পিতা নিন্দিত হয়।

এইভাবে হৈমন্তীর শ্বশুরালয়-জীবন বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তার স্বামী তার এই বিষাদ করুণ অবস্থাটি বুঝতে পারে। প্রতিকারের জন্য সে

পিতার কাছে প্রস্তাব করে হৈমকে কিছুদিনের জন্য পিতৃগৃহে পাঠাতে। এটা সম্পূর্ণ-ই হৈম-র স্বামীর প্রস্তাব। কিন্তু হৈম-র শ্বশুর ভাবলেন, এটা হৈম-র পরামর্শ। তিনি হৈমকে জিজ্ঞাসা করলেন, অসুখটা আবার কিসের? হৈম যখন বলল, কোনো অসুখ নেই, তখন শ্বশুর ভাবলেন, এই নঞ্-অর্থক উত্তর শুধু তেজ দেখাবার জন্য।

কিন্তু বিষাদে এবং অসন্তোষে হৈম দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছিল। এটা লক্ষ্য ক'রে বিবাহের ঘটক তার পিতার কাছে পত্র দিলেন। পিতা এসে কন্যাকে ডাক্তারের পরামর্শ মতো বায়ুপরিবর্তনের উদ্দেশ্যে কন্যাকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে চাইলেন। তিনি জানেন না, তার সম্পর্কে ভুল ধারণা এখানে ভেঙ্গে গেছে, (যদিও সেই ভুল ধারণা হৈম-র শ্বশুর বাড়িরই সৃষ্টি)। এখন তিনি সাধারণ স্কুলের হেডমাস্টার মাত্র। সুতরাং তাঁর প্রস্তাব নিষ্ঠুরতার সঙ্গে প্রত্যাখ্যাত হ'ল।

পিতা কন্যার দুর্দশা স্বচক্ষে দেখে একাকী ফিরে গেলেন অসহায়ের মতো। হৈমন্তীর জীবন সবচেয়ে শোচনীয় এখানেই হয়ে ওঠে যে, পিতার এমন মর্মান্তিক বিদায়ের সময়ও তাকে হাসিমুখে থাকতে হয়। এতদিন শ্বশুরালয়-জীবনের সমস্ত বিষাদ যন্ত্রণা সত্ত্বেও সে এই স্নিগ্ধ হাসিটুকু সর্বদাই মুখে রেখেছিল। কিন্তু এবার পিতার বিদায়ের পর সে বোধহয় নিজ জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে গেল, তাই সেই স্নিগ্ধ হাসিটুকুকে বজায় রাখার প্রেরণা সে আর পেল না, —তা চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হয়ে গেল।

হৈমন্তীর পক্ষে এত দুঃখ সহ্য করার কোনো কারণই ছিল না। তবু তাকে এত মর্মান্তিক দুঃখ সহ্য করতে হ'ল। এখানেই এই গল্পের ট্র্যাজেডির সম্ভাবনা নিহিত।

গল্পটি 'দেনাপাওনা' গল্পের অনুরূপ। শ্বশুরালয়ের অত্যাচার উভয়স্থানেই বধূদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। কিন্তু 'দেনা পাওনা' গল্পে নিরুপমার পিতা পণ-এর টাকা মিটাতে পারেন নি বলেই নিরুপমাকে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। শ্বশুরের অর্থগৃধ্নুতা ছিল সেখানে নিরুপমার দুঃখের কারণ। কিন্তু এখানে হৈম-র পিতা সমস্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। তথাপি শ্বশুরালয় হৈমকে রেহাই দিল না,—এটা যেন তার জীবনে একটা নিয়তি প্রদত্ত অভিশাপ, শ্বশুরালয়ের নির্যাতন তার জীবনের যেন একটা অনিবার্য অধ্যায় এইজন্যই নিরুপমার চেয়ে হৈমন্তীর জীবনযন্ত্রণা বা ট্র্যাজেডি অনেক গভীর।

হৈমন্তীর জীবনের ট্র্যাজেডি বর্ণনার মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রনাথ নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। নারীর এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য অনেক পূর্বে প্রকাশিত 'শাস্তি' গল্পের ট্র্যাজেডিরও প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সবচেয়ে স্পষ্ট এবং ঋজু হয়ে উঠেছে 'স্ত্রীরপত্র' গল্পটিতে। এই গল্পটিও 'সবুজপত্রে' (শ্রাবণ, ১৩২১) প্রকাশিত হয়।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পে স্ত্রী মৃণালের যে সংসার ত্যাগ তার মধ্যে আমরা ট্র্যাজেডির স্বাদলাভ করি না। শ্বশুরালয় বা স্বামীর সংসারের সঙ্কীর্ণ চিত্তা, নারী-সত্তার প্রতি অশ্রদ্ধেয় মনোভাব, স্বার্থপরতা প্রভৃতি নানাপ্রকারের হীনতা তাকে বিক্ষুব্ধ করেছিল। এবং সে এই সংসারের সঙ্গে সমমনোভাবাপন্ন হয়ে এইসব হীনতাকে প্রশ্রয় দিতে পারত না ব'লে, সেও শ্বশুরালয়ে আদরের গৃহবধূ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে নি। অনাদরেই সেখানে তাকে জীবন কাটাতে হয়েছে এই অনাদরের অভিজ্ঞতা সে ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় স্বামীকে জানিয়েছে এবং সঙ্গে প্রকাশ করেছে ক্ষোভ ও ঘৃণা। শ্বশুরালয়ের প্রতি এই ক্ষোভ ও ঘৃণাই মৃণালের চিত্তে শ্বশুরালয়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত অবিচার ও দুর্ব্যবহার জনিত দুঃখকে জমতে দেয় নি। যার মনের মধ্যে অত্যাচারীর প্রতি এই ঘৃণা ও বিক্ষোভ রয়েছে, দুঃখ তাকে শক্তি দেয়, তাকে কাতর করে না। এইজন্যই ক্ষোভে, ঘৃণায়, অভিমানে মৃণালের সংসার ত্যাগের ঘটনায় আমরা তার প্রবল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করে বিস্মিত হই, কিন্তু তার মধ্যে দুঃখ খুঁজে পেয়ে তার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হওয়ার অবকাশ পাই না। এইজন্যই মৃণাল চরিত্রে আমরা ট্র্যাজেডির প্রকৃত স্বাদ পাই না।

কিন্তু যে মেয়েটির দুঃখে মৃণাল সংসারে দুঃখ সবচেয়ে বেশী পেয়েছে, সেই মেয়েটির জীবনে শেষ পর্যন্ত ট্র্যাজেডিই ঘটেছিল। এই গল্পে সেই মেয়েটির (বিন্দু) ট্র্যাজিক জীবনটাই সেইজন্য বর্তমান প্রসঙ্গে অধিকতর উল্লেখ যোগ্য।

মৃণালের বড়ো জায়ের ছোট বোন বিন্দু। বিধবা মায়ের মৃত্যুর পর খুড়তুতো ভাইদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বিন্দু তার দিদির কাছে এসে আশ্রয় নিল। মৃণালের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ভাবল, এ এক আপদ। কিন্তু পরের বাড়িতে পরের অনিচ্ছায় এসে আশ্রয় নেওয়া যে কতবড় অপমান, মৃণাল তা বুঝল, এবং বিন্দুকে বুকে টেনে নিল। কিন্তু অবাঞ্ছিত আগন্তুক হিসেবে বিন্দুর সঙ্কোচের সীমা ছিল না। তাকে দেখতেও তই সাধারণ ছিল, যে, পড়ে গিয়ে সে যদি মাথা ভাঙত তবে ঘরের মেজেটার

জন্যই সকলে উদ্বিগ্ন হ'ত, তার মাথাটার জন্য নয়। সুতরাং বিন্দুর বিবাহেরও বিশেষ সম্ভাবনা কেউ দেখে নি।

বিন্দুর এই সময়কার দুরবস্থার কথা সকরুণ প্রকাশলাভ করেছে মৃণালের চিঠিতে। বিন্দুকে নিজের ঘরে তুলে নেবার পর যা হ'ল, সে সম্পর্কে মৃণাল লিখছে, "কিন্তু, আমার ঘর শুধু তো আমারই ঘর নয়। কাজেই আমার কাজটি সহজ হ'ল না। দু'চারদিন আমার কাছে থাকতেই তার গায়ে লাল লাল কী উঠল, হয়তো সে ঘমাচি, নয়তো আর কিছু হবে। তোমরা বললে বসন্ত। কেননা, ও যে বিন্দু। তোমাদের পাড়ার এক আনাড়ি ডাক্তার এসে বললে, আর দু একদিন না গেলে ঠিক বলা যায় না। কিন্তু সেই দুই-একদিনের সবুর সইবে কে। বিন্দু তো তার ব্যামোর লজ্জাতেই মরবার জো হ'ল। আমি বললুম, বসন্ত হয়তো হোক, আমি আমাদের সেই আঁতুড় ঘরে ওকে নিয়ে থাকব, আর কাউকে কিছু করতে হবে না। এই নিয়ে আমার উপরে তোমরা যখন সকলে মারমূর্তি ধরেছ, এমন কি বিন্দুর দিদিও যখন অত্যন্ত বিরক্তির ভান করে পোড়াকপালি মেয়েটাকে হাসপাতালে পাঠাবার প্রস্তাব করছেন, এমন সময় ওর গায়ের সমস্ত লাল দাগ একদম মিলিয়ে গেল। তোমরা দেখি তাতে আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলে। বললে, নিশ্চয়ই বসন্ত বসে গিয়েছে। কেননা, ও যে বিন্দু।"

এই বিন্দুর ভরণ-পোষণের দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়ার সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্যই একটা উন্মাদ পাত্রের সঙ্গে বিন্দুর বিবাহ দেওয়া হ'ল। শ্বশুরবাড়িতে স্বামীর পাগলামিতে ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে বিন্দু তার দিদি মৃণালের কাছে চোরের মতো এসে হাজির হ'ল।

এরপর বিন্দুর দুদিক থেকেই বিপদ। সে যেখানে আশ্রয় নিতে এসেছে, সেখানকার লোকেরাও যেমন তার উপর খড়্গহস্ত, তেমন তার নিজের ভাসুরও তার পলায়ন সম্পর্কে থানা পুলিশ করতে উদ্যত। এমন অবস্থায় পাছে সে মৃণালকে কোনো প্রকারে বিপদে ফেলে, এই ভয়ে সে ফের নিজে থেকেই ভাসুরের কাছে গিয়ে ধরা দিয়েছে।

যদিও জানা কথা যে, এরপর থেকে বিন্দু সমস্ত অপমান, দুঃখ, অত্যাচার মাথায় করে নিয়েই স্বামীর ঘর ক'রে চলবে, তবু মৃণাল তাকে প্রতিশ্রুতি মতো উদ্ধার করবার ব্যবস্থা করে। মৃণালের খুড় শাশুড়ি শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে যাবেন। মৃণাল তাঁর সঙ্গে যেতে চাইল। তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বর্তে

এবংবিধ ধর্মে মতি দেখে আর আপত্তি করল না। মৃণাল বিন্দুকে উদ্ধার করার সুযোগ পেল। ঠিক হ'ল, তার ভাই শরৎ নির্দ্ধারিত সময়ে পুরীর গাড়ীতে বিন্দুকে তুলে দেবে। কিন্তু যথাসময়ে জানা গেল, বিন্দু শাড়ীতে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

বিন্দুর এই জীবন-বৃত্তটি নিঃসন্দেহে ট্র্যাজিক। পিতৃমাতৃহীন কিশোরীটির সংসারের কোথাও একটু সাদর আশ্রয় লাভ করবার অধিকার নিশ্চয়ই ছিল—, এই ন্যূনতম প্রত্যাশা সে করতেই পারে। এই ভেবেই সে দিদির কাছেও বোধহয় এসেছিল। কিন্তু ভাগ্য লাঞ্ছিতা বিন্দুর জন্য সমস্ত সংসারটাই যেন কৃপণ এবং অনুদার হয়ে উঠল। পৃথিবীতে তার ন্যূনতম প্রার্থনাও মঞ্জুর হ'ল না। তাই তার আত্মহত্যা নিরতিশয় অভিমান এবং অপরিসীম বেদনার পরিণাম, অবশ্যই একটা ট্র্যাজিক পরিণাম। বিন্দুর জীবনের ট্র্যাজেডির মাধ্যমেই যেন রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, সংসারের মধ্যে নারীর অবস্থাটা কেমন। মৃণালের এই উক্তি যেন রবীন্দ্রনাথের উক্তি: "আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা কী তা আমি পেয়েছি।"

'শাস্তি' গল্পের চন্দরার স্ত্রী আর 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের বিন্দু সংসারের নিগড়ে নারীজীবনের ট্র্যাজেডির দুটি চিত্র। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সরাসরি এদের ট্র্যাজেডিকে সমাজের সামনে তুলে ধ'রে সংসারে নারীর স্থান সম্পর্কে যেন সমাজকে সতর্ক করে তুলতে চেয়েছেন।

'সবুজপত্রে' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের আরেকটি গল্পও ট্র্যাজেডি হিসেবে উল্লেখযোগ্য—''শেষের রাত্রি' (আশ্বিন, ১৩২১)।

'শেষেররাত্রি' গল্পটির মধ্যে ঘটনা বা চরিত্র চিত্রণ কিছু নেই, কেবল সেবাপরায়ণা আনন্দময়ী মাতৃমূর্তি মাসীর সঙ্গে পীড়িত, মুমূর্ষু পত্নীপ্রেম-কাতর যতীনের বিষাদঘন সংলাপ।

যতীন তার মনের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও কল্পনা মিশিয়ে তার স্ত্রীকে একটা আদর্শের আসনে স্থাপন করেছে মনে মনে। সে বিশ্বাস করে, সে যেমন পত্নী প্রেম-কাতর, তার স্ত্রী মণিও তেমনি স্বামী-প্রেম কাতর। তাই সে প্রতি মুহূর্তে তার স্ত্রীকে প্রত্যাশা করে তার মরণ শয্যার শিয়রে। কিন্তু তার স্ত্রীর মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন, সে স্বভাব চটুল এবং আমোদপ্রিয়। রোগীর কক্ষে তার মৃত্যুর আতঙ্ক। তাই সে ভুলেও যতীনের কক্ষে প্রবেশ করে না, সেবা করা তা দূরের কথা।

যতীনের আশা পরাভব মানে না, প্রতি মুহূর্তে সে মাসীর কাছে প্রকারান্তরে শুনতে চায়, মণি তার অসুখের জন্য কত উদ্বিগ্ন, সেবা করার জন্য কত কাতর। এইভাবে ভ্রান্ত আশায় ভর ক'রে যতীন প্রতিটি প্রত্যাশার মুহূর্তেই কেবল আত্মপ্রতারিত হয়। আর মণির প্রকৃত পরিচয় জানলে পাছে যতীন অসহনীয় দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে, এই ভয়ে মাসীও যতীনকে মণি সম্পর্কে মিথ্যা প্রশংসায়, স্তোকবাক্যে আশ্বস্ত করে। এইভাবে নিজের এবং মাসীর— এই দুই প্রকার প্রতারণার মধ্যে একসময় যতীনের সামনে তার কাল্পনিক দাম্পত্য-প্রেমের বাস্তব বিভীষিকাটি প্রায় প্রকাশিত হয়ে পড়ে, কিন্তু যতীন তখনো প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় তার দাম্পত্য প্রেমের কাল্পনিক মাধুর্যকে। দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্যরক্ষায় যতীনের এই ব্যর্থ প্রয়াস যেমন করুণ, তেমনি হৃদয় বিদারক। একটা ট্র্যাজেডির অনুভূতি এর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, "সমস্ত গল্পটির মধ্যে, বিশেষ করিয়া তার পরিসমাপ্তির মধ্যে আশার ঊর্ধ্বশিখ প্রেমের নিষ্ঠুর ব্যর্থতার একটি করুণ চাপ। কান্নার সুর, দুঃখে দুর্বল, ব্যথায় অস্ফুট একটি রাগিণী কি নিবিড় স্পন্দনের মধ্যে আবর্তিত হইত।"[২৩]

এইভাবে দেখা যায় যে, ছোটগল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যেখানে ট্র্যাজেডি রচনা করেছেন, সেখানে তিনি মানুষের সামাজিক বা ব্যক্তিক সমস্যা-সমূহকে অবলম্বন করেছেন। মানুষের সামাজিক ব্যবস্থার নানাবিধ অসঙ্গতি, স্থূলতা এবং অন্যায় যেমন অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের জীবনের ট্র্যাজেডির কারণ হয়, তেমনি মানুষের ব্যক্তিগত রুচি, মূল্যবোধ, মূঢ়তার কারণেও মানুষের জীবনের পরিণাম ট্র্যাজিক হয়ে ওঠে। এই সব ট্র্যাজেডি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ কোনো তত্ত্বের অবতারণা করেন নি, কেবল জগতে যেমন দেখেছেন বা শুনেছেন এবং জীবনে যেমন বুঝেছেন, আনুপূর্বিক কেবল তাই তিনি উপস্থাপিত করেছেন। এইজন্যই উপন্যাসে এবং নাটকে রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি চেতনার সঙ্গে ছোটগল্পে বিধৃত রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাস ও নাটকের ক্ষেত্রে জীবনের ট্র্যাজেডির অন্তরালে বা মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে সব তত্ত্বকে খুঁজেছেন, ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তিনি তেমন কোনো তত্ত্বের বিশেষ অনুসন্ধান করেন নি।

---

২৩ ডঃ নীহাররঞ্জন রায় রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা দ্বিতীয় খণ্ড, (১৩৫৩), পৃঃ ১৯৩।

প্রসঙ্গ—৮ | রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা : নাটকে ॥

রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা সুস্পষ্টভাবে একটা তত্ত্বগতরূপ পরিগ্রহ করেছে তাঁর নাটক সমূহে। তিনি তাঁর প্রতিটি নাটকেই একটা বিশেষ তত্ত্বকে তুলে ধরেছেন, তাঁর নাটক সমূহের মধ্যে যেগুলি ট্র্যাজেডি, সেগুলির মধ্যেও সেই সূত্রে একটা না একটা তত্ত্ব গুরুত্ব-সহ প্রকাশমান হয়ে উঠেছে। এই তত্ত্ব প্রায়শঃই তাঁর দুঃখবাদের তত্ত্ব। দুঃখ জীবনকে কোন্ মূল্যে মূল্যবান করে তোলে, বা জীবনের চূড়ান্ত ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্যদিয়ে কোন্ সত্য চূড়ান্ত-ভাবে লাভ করা যায়, সেইসব কথাই রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন তাঁর ট্র্যাজেডি-গুলির মধ্যে।

ট্র্যাজেডি সর্বপ্রথম গ্রীক নাটকের মধ্যে রূপ-লাভ করেছিল বলেই 'ট্র্যাজেডি' কথাটার সঙ্গে 'নাটকে'র একটা যোগাযোগের কথা স্বতঃই আমাদের মনে হয়। কিন্তু ট্র্যাজেডি রচিত হয় কবির একটি বিশেষ জীবনবোধ, যাকে আমরা ট্র্যাজিক জীবনবোধ (Tragic view of life) বলে থাকি, সেই জীবনবোধের কারণে। সুতরাং এই জীবনবোধকে কবি নাটক, উপন্যাস এবং গল্প যে কোনরূপ জীবন-বৃত্তের মাধ্যমেই প্রকাশ করতে পারেন। তবে নাটক যেহেতু 'দৃশ্যকাব্য,' আর উপন্যাস ও গল্প 'শ্রব্যকাব্য', সেইজন্য নাটকে উপস্থাপিত ট্র্যাজেডি এবং উপন্যাস-গল্পে বর্ণিত ট্র্যাজেডির মধ্যে উপস্থাপনা-গত পার্থক্য থাকতে পারে। উপন্যাসে ও গল্পে আমরা ট্র্যাজেডি ঘটতে শুনি আর নাটকে আমরা ট্র্যাজেডি ঘটতে দেখি। এই শোনা আর দেখার পার্থক্যটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। শুনে আমাদের যে অনুভূতি হয়, দেখে অনুভূতি হয় তার চেয়ে তীব্রতর। এই পার্থক্যটি রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসের ট্র্যাজেডি ও নাটকের ট্র্যাজেডি সম্পর্কেও একইভাবে প্রযোজ্য।

'রাজা ও রানী' (১৮৮৯) থেকেই প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের নাটকরচনা সুরু হয়। এরপূর্বে তিনি নাট্যাকারে যা লিখেছেন, সেগুলিকে 'নাটক' না ব'লে নাট্য প্রচেষ্টা বলাই অধিকতর সঙ্গত। এ সম্পর্কে 'রবীন্দ্রজীবনী'কার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি আমরা সাধারণভাবে গ্রহণ করতে পারি : "রাজা ও রানী রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক বলা যাইতে পারে; ইতিপূর্বে যাহা নাটকাকারে লিখিয়াছিলেন, তাহাকে যথার্থ নাটক আখ্যা দান করা যায় না। বাল্মীকিপ্রতিভা, কালমৃগয়া, মায়ার খেলা গীতিনাট্য, নলিনী অকিঞ্চিৎকর গদ্য নাটক। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'কে নাটক বলা চলে না, উহা নাট্যকাব্যের প্রথম পরীক্ষা, উহাতে তত্ত্ব আছে, নাট্যিক বিষয় কমই। 'রাজা ও রানী'তে হৃদয়াবেগ প্রবল হইলেও কল্পনার ক্ষেত্র বেশ প্রশস্তই, আখ্যানাংশে বিষয়বস্তু প্রচুর ও ঘটনাবৈচিত্র্য যথেষ্ট, বরং একখানি নাটকের পক্ষে বিষয়বস্তু বেশি বলিয়া মনে হয়। ইহাতে সৃষ্টি স্থাপত্য দৃঢ়তর হইয়াছে, সংসারের সহিত কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের আভাস পাই।"১

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমারের আর একটি উক্তিও 'রাজা ও রানীর' ট্র্যাজেডির স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : "মানসীপর্বের দুঃখবাদ সকল কবিতার মধ্যেই যেমন নিহিত রহিয়াছে, এই যুগে রচিত নাটকের মধ্যে সেই অন্তর্বেদনা, সেই দ্বন্দ্বও অপ্রকট নহে। 'রাজা ও রানী'র আলোচনায় সেই তত্ত্বটি আরও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইবে।"২

অতঃপর 'রাজা ও রানী' নাটকের ট্র্যাজেডির স্বরূপ নির্ণয়ে সচেষ্ট হওয়া যেতে পারে। সাংসারিক কর্তব্য-বিস্মৃত আত্মমগ্ন প্রেমের প্রতি (তা, সে প্রেম যত গভীরই হোক না কেন) রবীন্দ্রনাথের শ্রেয়োবোধসম্পন্ন কবিচিত্তের বিশেষ সমর্থন ছিল না। এই বিশেষ মনোভাবটি তিনি হয়তো আহরণ করেছিলেন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে (যেমন, অভিশপ্ত শকুন্তলা, অভিশপ্ত যক্ষ), কিন্তু তাকে এত গভীরভাবে আত্মীকৃত করে নিয়েছিলেন যে, সেই মনোভাবটি অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'রাজা ও রানী' নাটকে রূপলাভ করেছে। এই মনোভাবটিকে প্রকাশ করাই যে 'রাজা ও রানী' নাটকের প্রকৃত উদ্দেশ্য তা কবি স্বয়ং সূচনায় স্পষ্ট করে বলেছেন, "এর মধ্যে এই কথাটাই প্রকাশ পাবার জন্য স্বত উদ্যত

---

১. রবীন্দ্র জীবনী ১ম.(১৩৬৭), পৃ. ২৫৫।

২. ঐ. পৃ. ২৫০।

হয়েছে যে, সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি যোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।"—কিন্তু যে প্রেমিক সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক-শূন্য রেখে প্রেমকে জীবনে ফুটিয়ে তুলতে চায়, সে জানতেও পারে না, তার ভুলটা কোথায়। তাই সে সেই প্রেমের জন্য জীবনের এবং জগতের সর্বোচ্চ মূল্যও দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে যখন প্রার্থিত প্রেমকে লাভ করতে পারে না, উপরন্তু লাভ করে ঘৃণ্য বিকৃতি, তখন সমগ্র ব্যাপারটাই একটা ট্র্যাজেডির বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। 'রাজা ও রানী'র বিক্রম এইরূপ এক ট্যাজেডির নায়ক।

'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের এক স্থানে[৩] রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তাঁর সমগ্র কাব্যের একটিই মাত্র পালা, এবং তা হ'চ্ছে সীমার সঙ্গে অসীমের মিলন সাধনের পালা। সীমাকে বাদ দিয়ে যেমন অসীমকে কোনোদিন পাওয়া যায় না, তেমনি অসীমকে চিন্তা ভাবনার মধ্যে না রাখলে সীমার সত্যকেও লাভ করা যায় না। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র সন্ন্যাসী সীমা অর্থাৎ বাস্তবকে অস্বীকার ক'রে অসীম অর্থাৎ নির্বিশেষ সত্যকে লাভ করতে চেয়েছিলেন, তাই তাঁকে ব্যর্থ হতে হয়েছিল। কিন্তু সেই সত্যকেই তিনি লাভ করলেন, যখন বাস্তবকে অর্থাৎ সীমাকে মেনে নিলেন।

'রাজা ও রানী' নাটকেও তেমনি সুমিত্রার প্রেমকে অসীমের সম্পদ, আর বিক্রমের রাজকার্যকে সীমার সত্য যদি বলি, তবে স্পষ্টই দেখা যায় যে, এখানেও বিক্রম সীমার সত্যকে অস্বীকার করার কারণে অসীমের সম্পদকে কোনোদিন পেলেন না। এবং এই অসীমের সম্পদকে পাবার জন্য বিক্রমের সমস্ত ঐকান্তিক প্রচেষ্টা তাঁকে সাফল্যের পথে না নিয়ে বিকৃতির পথে নিয়ে গেল। বিপরীত পথে অভীষ্ট অন্বেষণের ব্যর্থ-প্রচেষ্টার যে ট্র্যাজেডি, বিক্রমের সেই ট্র্যাজেডিকে রবীন্দ্রনাথ ধাপে ধাপে প্রকাশ করেছেন এই নাটকে।

মহারাজ বিক্রম তাঁর প্রেমকে বাস্তব সংসারের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য এক অতি রোমান্টিক ভাবাবেগের স্তরে তুলে নিয়ে ভোগ করতে চেয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, এই বিশেষ রাজকার্য থেকে নির্বিশেষ প্রেম অনেক বড়। সেইজন্য ভোগমত্ততার কারণেই হোক অথবা তরল ভাবাবেগের কারণেই হোক, তিনি রাজ্য ও প্রজার প্রতি সমস্ত কর্তব্যকে অস্বীকার করে শুধু রাণী সুমিত্রাকে

---

৩. জীবনস্মৃতি, (১৩৬৬), পৃ. ১৩৩।

নিয়েই ব্যস্ত থাকতে চেয়েছিলেন। এর ফলে রাজ্যে অরাজকতা সুরু হয়ে যায়। মন্ত্রী ও সেনাপতিদের যথেচ্ছাচার এবং রাজার আত্মীয়বর্গের উৎপীড়ন অবাধ হয়ে ওঠে। প্রতিকারের কোনো উপায় না দেখে প্রজারাও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। রাজা সবই জানেন, কিন্তু জেনেও কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করেন না। রাজকার্যে এরূপ অবহেলার জন্য তাঁর কোনো অনুশোচনাও নেই। এই জন্য তিনি সুমিত্রাকে খুশি করতে গিয়ে বলতে পারেন,—

"জীর্ণরাজকার্যরাশি চূর্ণ হয়ে যায়
তোমার চরণ তলে ধূলির মাঝারে।" (প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য)

রাণী সুমিত্রা আবার বিক্রমের বিপরীত চরিত্র। রাজা হিসেবে বিক্রমের গৌরবে গরীয়সী হওয়াই রাণী হিসেবে তাঁর একমাত্র অভিপ্রায়। তিনি জানেন, রাজ কার্যে অবহেলা করার জন্য বিক্রমের গৌরব ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে। তাই তিনি বিক্রমের এই ধরনের উক্তি শুনে সখেদে বলেন, "আমারে দিয়ো না লাজ, আমারে বেসো না ভালো রাজশ্রীর চেয়ে।"—১।৩। এর জবাবে ভ্রান্ত বিক্রম যখন প্রশ্ন করেন, "চাহনা আমার প্রেম?" তখন সুমিত্রা বলেছেন, "কিছু চাই নাথ, সব নহে। স্থান দিয়ো হৃদয়ের পাশে, সমস্ত হৃদয় তুমি দিয়ো না আমারে"—১।৩। এখানে সুমিত্রার যে উক্তি, প্রেমিকা হিসেবে সেইটেই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উক্তি। বিক্রমের সমস্ত হৃদয়কে পাওয়া নিশ্চয়ই সুমিত্রার সর্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু তাঁকে তো ভুললে চলবে না যে, বিক্রমকে প্রয়োজন যেমন সুমিত্রার তেমনি বিক্রমকে প্রয়োজন সংসারের অর্থাৎ রাজ্যের। নিজের আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার জন্য যদি সুমিত্রা বিক্রমকে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন, তবে তিনি প্রকারান্তরে বিক্রমের নৃপতিগৌরবকেই ক্ষুণ্ণ করবেন, সেটা সুমিত্রার একেবারেই অনভিপ্রেত। তাই তিনি বিক্রমকে বলেছেন, "স্থান দিয়ো হৃদয়ের পাশে, সমস্ত হৃদয় তুমি দিয়ো না আমারে।"

এইভাবে সুমিত্রা প্রেম ও সংসারের মধ্যে যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা বিক্রম পারেন নি।—এইখানেই নিহিত ছিল বিক্রমের ট্র্যাজেডির বীজ। বহু ব্যক্তিসত্তার সমবায়ে ব্যক্তির সমগ্রতা। সত্তাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য না ঘটাতে পারলে চরিত্রে ট্র্যাজেডির সম্ভাবনা দেখা দেয়। প্রেমিক ও রাজা এই দুই সত্তার সামঞ্জস্য না করতে পারার জন্যই বিক্রমের জীবনে ট্র্যাজেডি দেখা দিয়েছে। তিনি সর্বদাই সংসারকে প্রেমের প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাই সংসার এবং সংসারের প্রয়োজন থেকে

নিজেকে সর্বদাই দূরে সরিয়ে রাখতে ভালো বাসতেন। এমনকি প্রেয়সী সুমিত্রাকেও সংসারের কাজে নিমগ্ন বা রাজ্যের চিন্তায় ব্যস্ত দেখলে ক্ষুব্ধ হতেন। একটি দৃশ্যে তাই দেখি, সুমিত্রার জন্য অপেক্ষমান রাজা বিক্রম নির্দ্বিধায় বিশ্বাসী অমাত্যের কথা প্রত্যাখ্যান করছেন, রাণীর আত্মীয় আরেক অত্যাচারী অমাত্যকে অকারণেই রেহাই দিচ্ছেন শুধুমাত্র অবসরকে নির্বিঘ্ন করার জন্য। তাঁর মতে—

"চিরকাল আছে রাজ্য, আছে রাজকার্য—
সুমধুর অবসর শুধু মাঝে মাঝে
দেখা দেয়, অতিভীরু, অতি সুকুমার।
ফুঠে ওটে পুষ্পটির মতো, টুটে যায়
বেলা না ফুরাতে।" —১।৬

বিক্রমের এই সমস্ত উক্তি থেকেই তার জীবনের অনিবার্য ট্র্যাজিক পরিণতি আভাসিত হয়ে ওঠে। অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলবার জন্য এক সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টায় তিনি আন্তরিকভাবেই নিরত। ব্যক্তিগত জীবনের জন্য তিনি এমন একটি জগৎ চান, যেখানে বাস্তব কখনো গিয়ে হাজির হবে না। কিন্তু জীবনটাই যে বাস্তবের সৃষ্টি, এবং সেই কারণে যেখানে জীবন সেখানেই যে বাস্তবের আবেষ্টনী থাকবে আর সেই বাস্তবকে অস্বীকার ক'রে পালিয়ে বেড়াবার যে কোনো উপায় নেই—এই অনিবার্যতাকে বিক্রম উপলব্ধি করতে পারেননি,—এই ভ্রান্তিই তাঁকে পরিণামের দিকে নিযে গেছে। এই একই দৃশ্যে সুমিত্রাকে তিনি বলেন,—

"মনে কি পড়িল তবে অধীন এ জনে
সংসারের সব শেষে? জান না কি, প্রিয়ে,
সকল কর্তব্য চেয়ে প্রেম গুরুতর।
প্রেম এই হৃদয়ের স্বাধীন কর্তব্য।" —১।৬

কিন্তু সুমিত্রা বিক্রমের এই মনোভাবকে সমর্থন করতে পারেন না। তাই তিনি বিক্রমের ভুল ভাঙবার জন্যই দূরে দূরে থাকেন। অন্ততঃ স্বামীর ভুলের সহায়ক হয়ে সহধর্মিনীর কর্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হতে তিনি চাননি। তাই একটি দৃশ্যে তিনি বিক্রমকে স্মরণ করিয়ে দিতে চান, তাঁর কাছে সংসারের দাবীকে। বলেছেন—

"যে প্রেম করিছে ভিক্ষা সমস্ত বসুধা
একা আমি সে প্রেমের যোগ্য নই কভু।" —২।২

কিন্তু সুমিত্রার সমস্ত সুপরিকল্পিত বাম্যভাবই যখন বিক্রমকে স্বাভাবিক বা প্রকৃতিস্থ করে তুলতে পারল না, তখন সুমিত্রা স্বামীর কল্যাণের জন্য রাজ্য থেকে দূরে সরে যেতে সঙ্কল্প নিলেন—"পিতৃসত্য পালনের তরে রামচন্দ্র গিয়াছেন বনে, পতিসত্য পালনের লাগি আমি যাব।" —২।৩

সুমিত্রা তাঁর এই সঙ্কল্পকে কার্যকরী করার পরই বিক্রমের ট্র্যাজেডির দ্বিতীয় বা চূড়ান্ত পর্যায়ের সুরু। এতদিন বিক্রম তাঁর রোমান্টিক প্রেমের কুসুমাস্তীর্ণ স্বপ্নের জগৎকে কণ্টকাকীর্ণ বাস্তব জগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় নিরত থেকে নিজের চতুর্দিকে কেবল সর্বনাশকে পুঞ্জীভূত করছিলেন। এটা যে প্রকৃতপক্ষে একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা, তা বিক্রম জানতেন না। বরং তিনি এটাকে একটা প্রশংসনীয় এবং শ্রদ্ধেয় উদ্যম হিসেবে বিবেচনা করতেন এবং এর মাহাত্ম্য যে অন্যেরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন না, তাতে বিক্রম বিরক্তও হতেন। সুতরাং এই ব্যর্থ প্রচেষ্টায় নিরত থেকে তিনি একটি পরম পুলক এবং আত্মপ্রসাদ অনুভব করতেন। এই অনাহত এবং ক্রমবর্দ্ধমান আত্মপ্রসাদে সর্বপ্রথম আঘাত পড়ল সুমিত্রার জালন্ধর ত্যাগে। এই প্রথম তিনি বুঝলেন, রাজকার্যে তাঁর অবহেলার সুযোগেই সুমিত্রা এইভাবে রাজ্য ছেড়ে কাশ্মীরে পিতৃগৃহে চলে যেতে পেরেছেন। তাই এখন তিনি প্রেমের স্বপ্নরাজ্য থেকে অকস্মাৎ ভ্রষ্ট হয়ে পৌরুষের উত্তেজনা দিয়ে হৃদয়ের গভীর বেদনাকে প্রশমিত করতে চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন,—

"তবে দাও, ফিরে দাও ক্ষাত্রধর্ম মোর—
রাজধর্ম ফিরে দাও, পরুষ হৃদয়
মুক্ত করে দাও এই বিশ্বরঙ্গ মাঝে।
কোথা কর্ম ক্ষেত্র।" —২।৪

এই কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব নিতে গিয়েই বিক্রম আরো মারাত্মক ভুলের মধ্যে গিয়ে পড়লেন, যেখান থেকে নিজেকে উদ্ধার করা তাঁর পক্ষে আর কিছুতেই সম্ভব নয়। এই মারাত্মক ভুলই তাঁকে জীবনের চূড়ান্ত ট্র্যাজেডির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল। কারণ আজ অকস্মাৎ যে কর্মক্ষেত্রে বিক্রম ফিরে আসতে চাইছেন, সেই কর্মক্ষেত্রও দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির জন্য তাঁর কাছে অপরিচিত হয়ে উঠেছিল। তাই কোন্ কাজের আপেক্ষিক গুরুত্ব কতটা, তা তিনি যেমন

ভুলেছিলেন, তেমনি ভুলেছিলেন কর্মোদ্যোগের মাত্রাজ্ঞান। এইজন্যই সুমিত্রার পলায়নের পর নিদ্রালস ব্যক্তির অপূর্ণ নিদ্রাভঙ্গের ক্ষিপ্ততা নিয়ে রাজা বিক্রম তাঁর বকেয়া কর্তব্য কর্মগুলি নিষ্পন্ন করতে আত্মনিয়োগ করলেন। কর্তব্যের জগৎ যাঁর কাছে অপরিচিত, তিনি যখন কর্তব্য নিষ্পন্ন করতে যান, তখন তার মধ্যে অনেক অনাচার, অনেক বিকৃতির প্রশ্রয় পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই রাজ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করার জন্য তাঁর যে অভিযান, তা প্রকৃতপক্ষে একটি মানব-মৃগয়ায় পর্যবসিত হয়। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে বিক্রমের কতকগুলি উক্তি থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে,—

"ভালবাসি আমি এই ব্যগ্র ঊর্ধ্বশ্বাস—
মানবমৃগয়া।" —৪।১

"চাই আমি উদগ্র সংগ্রাম,
বুকে বুকে বাহুতে বাহুতে অতিতীব্র
প্রেম আলিঙ্গন সম। ভালো নাহি লাগে
অস্ত্রে অস্ত্রে মৃদু ঝনঝনি—ক্ষুদ্র যুদ্ধে
ক্ষুদ্র জয়লাভ।" —৪।১

:

"এ প্রবল হিংসা ভালো ক্ষুদ্র প্রেম চেয়ে।" —৪।১

বিক্রমের এই যুদ্ধোন্মাদনার কারণই হচ্ছে, তার চরিত্রে সামঞ্জস্যের অভাব, —এটাই তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডিকে ঘনীভূত করেছে। প্রেমে এবং প্রশাসনে —কোথাও তাঁর মাত্রাজ্ঞান ছিল না। সুমিত্রাকে ভালোবাসার ব্যাপারে তিনি যেমন মোহাবিষ্ট, রাজ্যশাসনের স্বার্থে দুষ্টের দমনের ব্যাপারেও তেমনি। বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য যেমন শুধু ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত তাঁর প্রেম, তেমনিই হিতাহিত জ্ঞানরহিত—ভাবাবেগাপ্লুত তাঁর যুদ্ধায়োজন। সুমিত্রার বিরহে তাঁর যে মোহ এখন যুদ্ধে, সেই মোহই ছিল সুমিত্রার সান্নিধ্যে প্রেমে।

বিক্রমের ট্র্যাজেডি প্রেমের ব্যর্থতার জন্য নয়, প্রেমের বিকৃতির জন্য। প্রকৃত প্রেম মানুষের চরিত্রকে পরিশোধিত করে, সামঞ্জস্যপূর্ণ করে, সুন্দর করে। কিন্তু বিক্রমের জীবনে এর বিপরীতটাই দেখা যায়। কারণ সংসারের ভালোমন্দের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হওয়ায় তাঁর প্রেম তাঁকে মুক্তি দেয়নি, বন্দী করেছিল,—তাঁকে দূরদর্শী করেনি, পরন্তু অন্ধ করেছিল। এইজন্য দাম্পত্য

প্রেমে এবং রাজ্যশাসনে,—উভয়ত্রই তিনি শুধু বিকৃতিকেই প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বিক্রমের এই ট্র্যাজিক জীবনের একটি মুহূর্তকে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী করে তুলেছেন। বিক্রম সুমিত্রার ভ্রাতা কুমারসেনকে বন্দী করার উদ্দেশ্যে কাশ্মীরে এসেছেন। কাশ্মীরের রাণী রেবতী কুমারসেনের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ বিক্রমকে সাহায্য করার মানসে যখন বললেন, "প্রজাগণ লুকায়ে রেখেছে তারে। আগুন জ্বালাও ঘরে ঘরে তাহাদের। শস্যক্ষেত্র করো ছারখার। ক্ষুধা রাক্ষসীর হাতে সঁপি দাও দেশ, তবে তারে করিবে বাহির,"—তখন বিক্রম তাঁর মানব মৃগয়ার বীভৎস রূপটিকে যেন প্রত্যক্ষ করলেন, এবং চমকিত হয়ে উঠলেন—

"এতদিন পরে
আপনার হৃদয়ের প্রতিমূর্তি খানা
দেখিতে পেলেম ওই রমনীর মুখে।" —৫।৫

চমকিত চিত্তে সুরু হ'ল তাঁর আত্মজিজ্ঞাসা—

"অমনি শাণিত ক্রূর বক্রজ্বালা রেখা
আছে কি ললাটে মোর? রুদ্ধহিংসাভারে
অধরের দুই প্রান্ত পড়েছে কি নুয়ে?
অমনি কি তীক্ষ্ন মোর উষ্ণ তিক্ত বাণী
খুনীর ছুরির মতো বাঁকা বিষমাখা? —৫।৫

বিক্রম ভাবতেই পারেন না, তাঁর যুদ্ধায়োজন অর্থাৎ রাজকার্য এত প্রতিহিংসাপরায়ণ, এমন বিধ্বংসী এবং ঘৃণ্য। তাই তিনি যেন অকস্মাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলতে থাকেন,—

"নহে নহে, কভু নহে। এ হিংসা আমার
চোর নহে, ক্রূর নহে, নহে ছদ্মবেশী।
প্রচণ্ড প্রেমের মতো প্রবল এ জ্বালা
অভ্রভেদী সর্বগ্রাসী উদ্দাম উন্মাদ
দুর্নিবার! নহি আমি তোদের আত্মীয়।
হে বিক্রম, ক্ষান্ত করো, এ সংহার খেলা।
এ শ্মশাননৃত্য তব থামাও থামাও,
নিবাও এ চিতা। পিশাচ পিশাচী যত

অতৃপ্ত হৃদয়ে লয়ে দীপ্ত হিংসা তৃষা
ফিরে যাক রুদ্ধরোষে, লালায়িত লোভে।" —৫।৫

কিন্তু ভুল যা হবার তা সম্পূর্ণই হয়ে গেছে, এবং তার ফসলও ফলতে সুরু করেছে। সমস্ত ট্র্যাজিক চরিত্রের মধ্যেই দেখা যায়, ভুল যখন ধরা পড়ে, তখন আর করণীয় কিছুই থাকে না। দুর্ভাগ্যের ষোলআনা তার পূর্বেই সংঘটিত হয়ে যায় বা সুনিশ্চিত হয়ে যায়। তাই তখন ভুলকে বুঝতে পারা ট্র্যাজেডিকে প্রতিরোধ করার পক্ষে যেমন অকার্যকরী, তেমনই শোচনীয়। কারণ যার গুরুত্ব প্রকৃতপক্ষে অসীম, শুধু বিলম্বের জন্য তার গুরুত্ব একেবারে শূন্য হয়ে যাওয়া ট্রাজিক চরিত্রের পক্ষে সত্যই শোচনীয়। এখানে বিক্রমও যখন বুঝতে পেরেছেন তাঁর ভুলকে, তাঁর উদগ্র যুদ্ধায়োজনের অনাবশ্যকতাকে, তখন তা বুঝতে পারার আর প্রকৃত গুরুত্ব কিছুই নেই। মোহগ্রস্ত যুদ্ধায়োজনের মধ্যদিয়ে যে সর্বনাশকে তিনি নিজের জীবনে এবং রাজ্যের সর্বত্র সুনিশ্চিত করে তুলেছেন, তাকে আর এখন প্রতিরোধ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। সেহেতু ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়েও নিজ-সৃষ্ট বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডকে নির্বাপিত করতে চাইলেও, তাকে তিনি নির্বাপিত করতে পারলেন না, পরন্তু লেলিহান অগ্নিশিখা অন্যসকলকে গ্রাস করতে করতে সুস্পষ্টভাবে তার দিকেও এগিয়ে এল।

পঞ্চম অঙ্কের নবম দৃশ্যে (শেষ দৃশ্যে) দেখা যায় কাশ্মীর রাজসভায় বিক্রমদেব সম্পূর্ণভাবেই হিংসা বিদ্বেষ বিবর্জিত। তিনি কুমারসেনকে ক্ষমা করেছেন, এবং তাকে কাশ্মীরের সিংহাসন সমর্পণ করতেও প্রস্তুত। কিন্তু তার পূর্বেই বিক্রমের অত্যাচারে নিপীড়িত প্রজাদের দুঃখে ব্যথিত এবং তার প্রতিকারে অপারগ হওয়ার ক্ষোভে—অভিমানে কুমারসেন আত্মহত্যা করেছে (পূর্ববর্তী অষ্টম দৃশ্যে এর ইঙ্গিত আছে) এবং সেই কুমারসেনের ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে ভগিনী সুমিত্রা নবম দৃশ্যের কাশ্মীর রাজসভায় বিক্রমের সম্মুখে উপস্থিত। যে সুমিত্রার জন্য বিক্রমের এই নারকীয় অভিযান, সেই সুমিত্রাকে এইভাবে অকস্মাৎ দেখে বিক্রম বিস্মিত। কিন্তু সুমিত্রা যেন সমস্ত রকম ধরাছোঁওয়ার বাইরে। বিক্রমের প্রতি তাঁর এই মুহূর্তের উক্তিটির মধ্যে যেমন রয়েছে বিক্রমকৃত অমঙ্গলের সামগ্রিক পরিচয়, তেমনি এক প্রবল ঘৃণা,—

ফিরেছ সন্ধানে যার রাত্রিদিন ধরে
কাননে কান্তারে শৈলে রাজ্য ধর্ম দয়া

রাজলক্ষ্মী সব বিসর্জিয়া, যার লাগি
দিগ্বিদিকে হাহাকার করেছ প্রচার,
মূল্যদিয়ে চেয়েছিলে কিনিবারে যারে,
লহ মহারাজ, ধরণীর রাজ বংশে
শ্রেষ্ঠ সেই শির। অতিথ্যের উপহার
আপনি ভেটিলা যুবরাজ। পূর্ণতব
মনস্কাম। এবে শান্তি হোক, শান্তি হোক
এ জগতে, নিবে যাক নরকাগ্নিরাশি—
সুখী হও তুমি।" —৫।৯

ভ্রাতৃশোকে এবং স্বামীর প্রতি অভিমানে, ক্ষোভে, হতাশায় ভারাক্রান্ত চিত্তে এই কথা কটি বলতে গিয়ে সুমিত্রা নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত করে ফেলেছেন। তাই কথা ক'টি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে গেল তাঁর মৃত্যু,—বিক্রমের চরমতম শাস্তি।

পত্নীপ্রেমের আত্মপ্রসাদ নিয়ে বিক্রম সকলের জন্য যে অমঙ্গল সাধন করে চলেছিলেন, সেই অমঙ্গল সাধন থেকে যখন তিনি প্রতিনিবৃত্ত, তখনই নিজ পত্নীর মুখেই শুনতে হ'ল সেই অমঙ্গলের জন্য ধিক্কার। এ ধিক্কার তাঁর কাছে নির্মম কশাঘাত-সদৃশ। ভাগ্য বিক্রমের জন্য শুধু এই টুকুই বিড়ম্বনা রাখেনি, তাঁর পাওনা আরও বেশী, একেবারে চূড়ান্ত। তাই যে পত্নীকে নিয়ে প্রেমের জগতে ধন্য হবার আকুল আকাঙ্ক্ষায় তাঁর এই আত্মক্ষয়ী এবং সর্ববিধ্বংসী মরুযাত্রা, সেই প্রেমাস্পদ পত্নীই মৃত্যুর যবনিকার আড়ালে সরে গেলেন চিরকালের জন্য স্বামীর মূঢতার প্রতি মর্মান্তিক এক অন্তিম ধিক্কার জানিয়ে। সহসা সংসারের কর্তব্য-সচেতন মহিষীর মহিমা পরাভূত, সর্বস্বরিক্ত, বিমূঢ় বিক্রমের কাছে দেদীপ্যমান হয়ে উঠল। মহিষীর মৃতদেহের সম্মুখে তাই নতজানু হয়ে ট্র্যাজেডি-বিধ্বস্ত বিক্রম অভিমানে দারুণ বিলাপ করে উঠলেন—

"দেবী, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই বলে মার্জনাও করিলে না? রেখে
গেলে চির অপরাধী করে? ইহ জন্ম
নিত্য অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব, তাহারও দিলে না অবকাশ

দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর,

অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান।" —৫।৯

পত্নীপ্রেম সম্পর্কে বিক্রমের আকাঙ্ক্ষাটা ছিল খুব বড় মাপের, এবং সেই আকাঙ্ক্ষার অচরিতার্থতা ছিল সমান মাপের। বড় করেই তিনি চেয়েছিলেন এবং বড় করেই তিনি হারালেন। তাই তাঁর আকাঙ্ক্ষিত দাম্পত্য প্রেমকে না পাওয়া এবং পত্নীকে হারানোর বেদনা তাঁর কাছে এমন ট্র্যাজিক হয়ে ঘটেছিল। ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, কোনো কিছুকে লাভ করবার জন্য যে ব্যক্তি সর্বস্ব পণ করেছে, সে যখন সর্বস্ব হারিয়েও, কোথাও এতটুকু সান্ত্বনালাভ করতে পারে না, তখন তা একটি যথার্থ ট্র্যাজেডির বিষয় হয়েই দাঁড়ায়। কারণ সর্বস্ব হারানোর প্রস্তুতি সেই নিতে পারে, যে অন্ততঃ শক্তিহীন বা স্বার্থকৃপণ নয়। সর্বস্ব হারানোর প্রস্তুতিতে বিক্রম যে উন্মাদ বা মূর্খ নয়, তার প্রমাণ আছে দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে। সুতরাং কোনো একটা প্রাপ্তি তার প্রত্যাশিত ছিল।[৪] সে প্রত্যাশা যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, তখন তার চারিপাশের আলোবাতাসে জীবন ধারণের উপাদান যেন অকস্মাৎ নিঃশেষিত হয়ে যায়। সুমিত্রার মৃত্যু বিক্রমকে যেন এমনিই একটা অসহনীয় জীবন-প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে এনে ফেলল। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে যদিও এক্ষেত্রে বিক্রমের চাওয়ার মধ্যেই ভুল ছিল, কারণ তাঁর প্রেম ছিল সংসারসম্পর্কশূন্য, আত্মসুখ-প্রবণ, তথাপি এই ভুল চাওয়ার জন্য তাঁকে অনেক বেশী মূল্য দিতে হয়েছে—সংসারের প্রতি অপরাধের পাপে এবং প্রিয়তম পত্নীর মৃত্যুতে।—এবং সেইখানেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর ট্র্যাজেডি। ভুল করে সুখের জন্য প্রেম চেয়ে, প্রেমও পাওয়া গেল না, সুখও চলে গেল,--এ শুধু মায়ার ছলনা নয়, নিষ্করুণ ট্র্যাজেডি।

'রাজা ও রানী' নাটকে ট্র্যাজেডি কেবল বিক্রমের জীবনেই ঘটেনি, ঘটেছিল কুমারসেনের জীবনেও।

'রাজা ও রানী' নাটকে কুমারসেন একটি অপ্রধান চরিত্র। ইলা ও কুমারের উপকাহিনীর মাধ্যমে এই চরিত্র নাটকের মূল ঘটনাসূত্রে আবদ্ধ। আবার

---

৪. কিন্তু ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের একটি মন্তব্য খুবই উল্লেখযোগ্য এই প্রসঙ্গেঃ "ট্র্যাজেডির—বিশেষতঃ রোমান্সমূলক ট্র্যাজেডির নায়কের খানিকটা মানসিক ঔদার্য ও শ্রেষ্ঠত্ব থাকা দরকার। বিক্রমের চরিত্রে তাহা নাই এবং ইহা 'রাজা ও রানীর'...প্রধান দোষ।

—রবীন্দ্রনাথ (৪র্থ সংস্করণ) পৃ. ২১০

ইলাও কুমারের এই উপকাহিনীটি সামগ্রিকভাবে নাটকটির মধ্যে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই উপকাহিনীটি সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও উঁচু গলায় কিছু বলেন নি। বরং নাটকের 'সূচনায়' একে নাট্য পরিণতির বিঘ্নস্বরূপ এক অনাবশ্যক লিরিকের প্লাবনেরই অংশ বলে অভিহিত করেছেন। সমগ্র নাটকটির এক কথায় আলোচনা করতে গেলে একথা সত্য হতেও পারে। কিন্তু নাটকটির শিল্পগত রূপটিকে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করতে গেলে এই উপকাহিনীরই নায়ক কুমারসেন চরিত্রটির পরিকল্পনা ও পরিণতি মোটেই উপেক্ষা করা যায় না।

প্রকৃতপক্ষে এই নাটকে যেখানে যেখানে নাটকীয় অবসর ছিল, নাট্যকার সেই সমস্ত সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করেছেন। সেইজন্য অপ্রধান চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও এই নাটকীয় অবসরের সুযোগেই এই কুমারসেন চরিত্রটিও যথেষ্ট নাট্য ঘাত-প্রতিঘাতময় হয়ে উঠেছে। এই চরিত্রটির মধ্যে যথার্থই একটি ট্র্যাজেডির বোধ (Tragic sense) অনুভব করা যায়।[৫] কোনো একটা ক্ষমাহীন দৈব যেন তাকে পেয়ে বসেছে। এই নিয়তি নিষ্পেষণাই এই চরিত্রটিকে উল্লেখযোগ্য করে তুলেছে।

অপরিমেয় প্রেম, প্রজা ও সৈন্যদের আন্তরিক শ্রদ্ধা, ক্ষাত্রশক্তি ও আত্মপ্রত্যয় প্রভৃতি সবই কুমারের ছিল। কিন্তু ভাগ্যের অগ্নি-পরীক্ষায় এ সমস্তই দুর্বার বন্যাস্রোতে বালির বাঁধের মতো ভেসে গেল। আর সবচেয়ে ট্র্যাজিক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তার নিজের মহত্ত্বই তার নিজের মাথার উপর দুর্ভাগ্যের বজ্রকে ডেকে আনল।

কুমারকে আমরা প্রথম দেখছি তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে ইলার সঙ্গে প্রমোদ কাননে। সম্ভবতঃ ক্ষমাহীন দৈব নিষ্পেষণার জন্য সুরু থেকেই তাকে আমরা বিষণ্ণ দেখছি। তাই প্রমোদ কাননেও সে চিন্তাভারগ্রস্ত। প্রেম সম্ভাষণে সুপটু হওয়া সত্ত্বেও সে ইলার মতো উচ্ছল এবং উচ্ছ্বসিত নয়, কর্তব্য-সাধনের জন্য কষ্ট পেতে সে যেন সতত উন্মুখ। সুতরাং আনন্দ উচ্ছ্বাসে তাকে যেন মানায় না। কুমারকে খুশি রাখার জন্য তাই ইলার প্রচেষ্টার অন্ত নেই—পরিচারিকাদের নিত্যই ফরমাশ করে প্রমোদ-সঙ্গীতের। এর ফলে

---

৫. ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা, (১৩৬৪), পৃ. ২২৬।

কুমারের চিত্তের পরিবর্তন হয় ঠিকই। কিন্তু এই পরিবর্তনের জন্য সে যেন প্রস্তুত থাকে না। তাই এই রকম একটি মুহূর্তে সে অপ্রস্তুতের মতোই যেন ব'লে ওঠে,—

"আমারে কি করেছিস, অয়ি কুহকিনী!
নির্বাসিত আমি। সমস্ত জীবন-মন
নয়ন বচন ধাইছে তোমার পানে
কেবল বাসনাময় হয়ে।......৩।২

এরপর তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে জালন্ধর রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত অবস্থায় কুমারকে দেখছি। কাশ্মীর-মহিষী রেবতীর যে ষড়যন্ত্রই থাক কুমারকে এই যুদ্ধযাত্রায় অনুমতি প্রদানের পিছনে, কুমার তা খতিয়ে দেখতে চায় না। কারণ যে প্রকার কর্তব্যসাধনে সে সতত প্রস্তুত, সেই প্রকার কর্তব্যের আহ্বান সে পেয়েছে এবং তাতেই সে খুশী। দাবার ঘুঁটির মতো অপরের স্বার্থে ব্যবহৃত হতে তার কোনো দ্বিধা নেই, যদি শুধু সে এইটুকু বুঝতে পারে যে সেই কাজটি সম্পন্ন করা তার কর্তব্য। এক্ষেত্রেও তাই দেশপ্রেমের আহ্বানে সাড়া দেওয়া তার কর্তব্য বলেই যে যুদ্ধযাত্রায় পিতৃব্যের অনুমতি প্রাপ্তিতে বলে উঠেছে—

জয় হোক, জয় হোক জননী তোমার।
এ কি আনন্দ সংবাদ!

কিন্তু কুমারের ভাগ্য বিড়ম্বনা এই যে, জননীর জয়-প্রার্থনা করা সত্ত্বেও সে যখন জননীর আশীর্বাদ চাইল, তখন জননী রেবতী 'নিষ্করুণ ঔদাসীন্যের সঙ্গে বললেন—

"...কি হইবে মিথ্যা আশীর্বাদে?
আপনারে রক্ষা করে আপনার বাহু।"

এই ধরনের অকারণ-বিড়ম্বনা প্রাপ্তিই কুমারসেনের জীবনের ট্র্যাজেডি।

চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে সুমিত্রা ও কুমারসেনের সংলাপের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, সুমিত্রার মধ্যস্থতায় অথবা কাতরতায় কুমার বিক্রমদেবের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে যথোচিত বীরত্ব প্রদর্শন করতে পারেনি। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ কুমারের পক্ষে তখন সংযম অবলম্বন করা প্রকৃতপক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু ভগিনীর স্বার্থে তখন তাকে তাই-ই করতে হয়েছিল। বিক্রমদেবের সঙ্গে যদি যথার্থই তার একবার শক্তিপরীক্ষা হোত, তবে হয়ত বিক্রমের রোষানলও

নির্বাপিত হয়ে যেত। তাই নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুমিত্রার মুখ চেয়ে ক্ষমা ও মৈত্রীর বাণীতে কর্ণপাত ক'রে সে নিজ সর্বনাশের পথকেও আরো উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এটাও কুমারের জীবনে একটা দুর্দৈব। সুমিত্রা-কুমারসেনের নিম্নের উক্তি দুটির মধ্যেই এই বিষয়টিকে পাওয়া যায়—

সুমিত্রা।—"ভাই, রাজারে মার্জনা করো, করো রোষ
আমার উপরে। আমি মাঝে না থাকিলে
যুদ্ধ ক'রে 'বীর' নাম করিতে উদ্ধার।
যুদ্ধের আহ্বান শুনে অটল রহিলে
তবু তুমি; জানিনা কি অসম্মান-শেল
চিরজীবী মৃত্যুসম মানীর হৃদয়ে?
আপন ভায়ের হৃদে দুর্ভাগিনী আমি
হানিতে দিলাম হেন অপমান শর
যেন আপনারি হস্তে। মৃত্যু ভালো ছিল,
ভাই, মৃত্যু ভালোছিল।

কুমারসেন।— জানিস্ তো বোন,
যুদ্ধবীর ধর্ম বটে—ক্ষমা তার চেয়ে
বীরত্ব অধিক। অপমান অবহেলা
কে পারে করিতে মানী ছাড়া? —৪।৩

পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে,—জালন্ধর-রাজ-বিক্রম কাশ্মীর আক্রমণ করলে কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কুমার যখন কাশ্মীরের সৈন্যভার নিতে চাইল, তখন পিতৃব্যপত্নী রাজমহিষী রেবতীর সুতীব্র গঞ্জনা ও অপমান কুমারের সমস্ত মৌন ধৈর্যকে টলিয়ে দিয়েছে। তাই এই প্রথম সে জননীর লাঞ্ছনার জন্য বলেছে—

জননী! কি অপরাধ করেছি চরণে?
কী কঠিন বচন তোমার! এ কি মাতা
স্নেহের ভর্ৎসনা? বহুদিন হতে তুমি
অপ্রসন্ন অভাগার পরে।... ..৫।১

এখানেও কুমারের ভাষণে সংযত ভাষা-ভঙ্গি ও বিনয়াবনত ভাবটি লক্ষণীয়। কুমার সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় চরিত্র। তাই রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য প্রিয় চরিত্রগুলির তুল্য কুমারের মধ্যেও রুচির অভাব কখনো দেখা যায় না

এই অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যেও অমরুরাজের কাছে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়াটা কুমারের জীবনে একটি শোকাবহ ঘটনা। এইখানে সে সবচেয়ে মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছে, পিতা অমরুরাজ যখন কন্যা ইলার কাছে কুমার সম্পর্কে মিথ্যা ভাষণ করেছেন। তাই ক্ষোভে-অভিমানে আহত কণ্ঠে কুমার তীব্র শ্লেষের সঙ্গে অমরুরাজকে বলেছে—

" ধিক, ধিক্, প্রতারণা।
সরলা বালিকা সে কি তোমার দুহিতা?
এ নিষ্ঠুর মিথ্যা তারে কহিলে যখন
বিধাতা কি ঘুমাইতেছিল? শিরে তব
বজ্র পড়িল না ভেঙ্গে? ....
.... হানো তবে তরবারি
বোলো তারে মরে গেছি আমি। প্রতারণা
কোরো না তাহারে।" —৫।৩

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে ইলার প্রতি কুমারের উক্তি। সেখানে কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিতে ইলার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় কুমার বলেছে—

এমনি বিশ্বাস
মোর পরে রেখো চিরদিন। মনদিয়ে
মন বোঝা যায়, গভীর বিশ্বাস শুধু
নীরব প্রাণের কথা টেনে নিয়ে আসে। —৩।৫

কুমার সম্পর্কে ইলার মধ্যে এই বিশ্বাসকে ভাঙবার ষড়যন্ত্র করেছেন অমরুরাজ। ইলার কাছে এর ফলে মহান প্রেমিক কুমার নিজেকে সঙ্কুচিত বোধ করেছে। তাই ক্ষোভে অপমানে তার অন্তরের আবেগ এখানে উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে। ইলা-কুমারের প্রণয় উপাখ্যানের মাধ্যমেই এই নাটকে কুমারের প্রবেশ। সুতরাং সেই প্রণয়-উপাখ্যানের পরিসমাপ্তিতে এখানেই প্রকৃত পক্ষে তার কাহিনীর শেষ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই চরিত্রের আরো শোচনীয় পরিণাম দেখিয়েছেন এবং তা ঘটেছে পঞ্চম অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যে এবং শেষ দৃশ্যে।

রেবতীর প্ররোচনায় বিক্রমদেব কুমারকে খুঁজে বার করবার জন্য যখন গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দিতে লাগলেন, তখন প্রজাদুঃখ-কাতর কুমার প্রাণ ভয়ে লুকিয়ে থাকার চেয়ে নিজ প্রাণের বিনিময়ে জালন্ধররাজকে নিবৃত্ত করা

শ্রেয় মনে করল। তাই সুমিত্রাকে শপথ করিয়ে সে পঞ্চম অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যে বলেছে—

> "এ জীবন দিব বিসর্জন। তারপরে
> তুমি মোর ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে, নিজ হস্তে
> জালন্ধর রাজকরে দিবে উপহার।" —৫.৮

এই ধরনের শোচনীয় পরিণতি, যাকে স্পষ্ট ভাষায় আমরা বলি অপমৃত্যু, —তা রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের প্রেমিক চরিত্রগুলির প্রত্যেকের ভাগ্যে ঘটেছে। জয়সিংহ (বিসর্জন), সুপ্রিয় (মালিনী), এবং কুমার একই ধাতুতে গড়া,—একই তাদের পরিণাম,—ক্ষমাহীন দৈবের মর্মান্তিক বিড়ম্বনা।

শেক্সপীয়রের নাটকেও এই ধরনের চরিত্র আছে। কুমারের দুর্ভাগ্য, হ্যমলেট বা কর্ডেলিয়ার দুর্ভাগ্যকেও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।[৬] উদার হৃদয়ে ঔদার্য জনিত যে দুর্ভাগ্য, তা যদি ট্র্যাজেডির উপাদান হয়, তবে আলোচ্য কুমার চরিত্রটি নিঃসন্দেহে একটি ট্র্যাজিক চরিত্র।

চল্লিশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ 'রাজা ও রানী' নাটকটিকে ভেঙ্গে গদ্যনাটক 'তপতী' (১৯২৯) রচনা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল 'রাজা ও রানী'র বক্তব্য বিষয়কে অধিকতর স্পষ্ট করে তোলা। এ সম্পর্কে 'তপতী' নাটকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "সুমিত্রা এবং বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে—সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হ'ল, এইটেই রাজা ও রানীর মূলকথা।

"রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয়নি। কুমার ও ইলার প্রণয়-বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসংগত প্রাধান্যলাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধা বিভক্ত।"

'রাজা ও রানীর' এই ত্রুটি অনেকদিন থেকেই রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করে এসেছেন এবং এর প্রয়োজনীয় সংশোধনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেছেন এবং চল্লিশ বছর পরে সেই উপলব্ধিরই ফলশ্রুতি এই 'তপতী' নাটক।

---

৬. ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা. (১৩৬৪), পৃ. ২২৬

এই নাটকে ইলা চরিত্রটি নেই এবং কুমার চরিত্রটিও বিশেষ কোনো প্রাধান্য পায়নি। ইলা-কুমারের বৃত্তান্তটি না থাকায়, সুমিত্রা ও বিক্রমের সম্বন্ধের বিরোধটি খুব স্পষ্ট হয়েই এই নাটকের উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

রাজা ও রানী নাটকে সুমিত্রা ও বিক্রমের সম্বন্ধের বিরোধের পরিণামে বিক্রমের জীবনে যে ট্র্যাজেডি নেমে আসে, তা থেকে সুমিত্রাও মুক্ত ছিল না—সে ট্র্যাজেডি সুমিত্রাকেও স্পর্শ করেছিল। কারণ সেখানে বিক্রমের ঐ শোচনীয় পরিণাম সুমিত্রার প্রার্থনীয় ছিল না। সুমিত্রা চেয়েছিল রাজ্যের বাইরে থেকে বিক্রমের রাজ্যের উপর আঘাত হেনে তাঁর রাজকর্তব্যবুদ্ধিকে জাগিয়ে তুলতে। কিন্তু ঘটনাচক্রে পরিস্থিতির জটিলতা এমনভাবে বেড়ে গেল যে, বিক্রম ও সুমিত্রার মধ্যে এক অনতিক্রম্য বিদ্বেষের দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেল এবং সুমিত্রা বিক্রম থেকে সেই দূরত্বে অবস্থান করেই স্বামীর জিঘাংসাকে চরিতার্থ করার জন্য ভ্রাতার ছিন্ন মুণ্ড থালায় বহন ক'রে পরম ঘৃণায় স্বামীকে উপহার দিল। ভ্রাতার সম্মান রক্ষা করার জন্য ছিন্ন মুণ্ড বহন করার নিস্তব্ধ শোক এবং স্বামীকে সেটা উপহার দেবার মত নিষ্ঠুর কর্তব্য ছিল সুমিত্রার পক্ষে অসহনীয়। তাই সঙ্গে সঙ্গেই ঘটল তার মূর্চ্ছা ও মৃত্যু। এতবড় ভয়াবহ পরিণাম সুমিত্রার রাজ্য ত্যাগের সময় তার পরিকল্পনার মধ্যে অবশ্যই ছিল না। তাই বলা চলে, ট্র্যাজেডির যে ঝড় বিধ্বংসীরূপে বিক্রমের দিকে এগিয়ে এসেছিল, তার ঝাপটা সুমিত্রার জীবনের উপর দিয়েও বয়ে গেছে। 'পতিসত্য পালনের লাগি' যার রাজ্য ত্যাগ, রবীন্দ্রনাথ তাকে যথেষ্ট করুণ পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে এই শোচনীয় পরিণাম দান করেছেন।

কিন্তু তপতী নাটকে সুমিত্রার জীবনে যা ঘটেছে তার মধ্যে ক্রন্দন নেই, রয়েছে গৌরব। কারণ তিনি 'রাজা ও রানীর' সুমিত্রার মতো কোনো 'পতিসত্য পালনের লাগি' রাজ্যত্যাগ করেন নি, তিনি রাজ্য ত্যাগ করেছেন ধ্রুবতীর্থে মার্তণ্ডদেবের কাছে তাঁর নিবেদিত জীবনকে সঁপে দিতে। সুতরাং শেষ দৃশ্যের জ্বলন্ত চিতায় তাঁর আত্মবিসর্জন তাঁর উপাসিকা জীবনেরই,—'তপতী' জীবনেরই গৌরবময় পরিণতি। এর মধ্যে নিজেকে বা অপর কাউকে হারানোর ক্রন্দন নেই। 'রাজা ও রানী'র সুমিত্রার মতো অভীষ্ট পূরণে ব্যর্থতার হাহাকার নেই, বরং রয়েছে তত্ত্বনিষ্ঠ আত্মসম্মান রক্ষা করতে পারার সাফল্যের দীপ্তি। তাই 'তপতী' নাটকে ট্র্যাজেডি যা কিছু সবই বিক্রমের জীবনে ঘটেছে, এবং তাও অত্যন্ত সরাসরি সুমিত্রার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের

বিরোধের সূত্র ধরে। এই জন্তই 'রাজা ও রানী'র বিক্রমের তুলনায় 'তপতী'র বিক্রমের ট্র্যাজেডি বেশী স্পষ্ট এবং দ্রুত-সম্পন্ন।

'রাজা ও রানী'র বিক্রমের প্রেম ছিল মোহগ্রস্ত। কিন্তু 'তপতী'র বিক্রমের প্রেম উদ্দাম, নিঃসঙ্কোচ এবং কামনাবলিষ্ঠ। তাই সুমিত্রা যখন রাজাকে বলে, "মহারাজ, যে প্রেম রাজকর্তব্যেরও উপরে, সে গ্রহণ করুন দেবতা, সে কি আমি নিতে পারি,"—তখন রাজা বিক্রম নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছেন, "দেবতার যা প্রাপ্য তিনি তা নেবেন তোমার মধ্যদিয়েই। তোমার মুখে পরমাশ্চর্যকে দেখেছি। লজ্জা কোরো না, শোনো আমার কথা। যশের লোভে যারা দেশ জয় করে বেড়ায় লক্ষ্মীর তারা বিদূষক। তাদের আয়ু যায় বৃথায়, কীর্তিও চিরকাল থাকে না, লক্ষ্মী বসে বসে হাসেন। আমি তাদের দলে নই। কাশ্মীরে গিয়ে যুদ্ধ করেছিলাম তোমারই সাধনায়"—(১ম দৃশ্য)। এখানে বিক্রম স্বীকার করেছেন যে, তাঁর কাশ্মীর অভিযান রাজ্য বিস্তারের জন্য নয়, সুমিত্রাকে লাভ করবার জন্য। কাশ্মীর অভিযানের মধ্যদিয়ে তিনি সুমিত্রাকে লাভ করলেনও, কিন্তু পেলেন যেন সুমিত্রার কেবল দেহ, মন নয়, প্রেম নয়। তাই সুমিত্রার এই মন ও প্রেমকে পাওয়ার জন্তই তাঁর এখন সমস্ত আয়োজন,—এই মন-প্রেমকে যতক্ষণ তিনি না পাচ্ছেন, ততক্ষণ তাঁর অসীম অতৃপ্তি। সুমিত্রা যখন তাঁকে প্রশ্ন করেছেন, "তোমার যুদ্ধযাত্রা সফল হয়েছে। এখন আর কি চাও।"—তখন বিক্রমের উক্তির মধ্যে অতৃপ্তিটাই প্রকাশ পেয়েছে বেশী করে: "পেয়েছি বীণাটিকে। সংগীত দিয়ে অধিকার হবে কোন্ শুভক্ষণে? সুর মেলাতে পারছিনে, পেয়েও হার হচ্ছে পদে পদে। ভাগ্যের কাছে যে দান পেয়েছি, সেই দানই আমাকে লজ্জা দিচ্ছে"—(১ম দৃঃ)। সুমিত্রার মন ও প্রেমকে না পাওয়ার তীব্র যন্ত্রণা এখানে প্রকাশ পেয়েছে। বিক্রম সামরিক শক্তির বলে শারীরিকভাবে সুমিত্রাকে নিজের করায়ত্ত করেছেন,—এখানে তাঁর সামরিক শক্তি সফল। কিন্তু প্রেমিক হিসাবে যখন তিনি সুমিত্রার প্রেমলাভে ব্যর্থ হলেন, তখন তার পৌরুষ হল লাঞ্ছিত। এইখানেই শক্তি মদমত্ত সাধারণ নৃপতির সঙ্গে বিক্রমের পার্থক্য। সাধারণ নৃপতি পরাজিত রাজ্যের রাজকন্যাকে শারীরিকভাবে করায়ত্ত করেই ধন্য, তার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করা গেল কিনা, তা নিয়ে সাধারণ নৃপতির কোনো দুশ্চিন্তা থাকে না। কিন্তু বিক্রমের নারী-সাধনা ভিন্নতর। তিনি নারীকে নারী হিসেবে পেয়েই তৃপ্ত নন, তিনি পেতে

চান তাকে প্রেমিকা হিসেবে। অবরুদ্ধ-প্রেম নারী তাঁর কাছে সঙ্গীত-রিক্ত বীণার মতোই, তা সংগ্রাহকের সম্মান বৃদ্ধি করেনা, বরং অযোগ্য অপহারকের লজ্জাকেই চিরস্থায়ী করে রাখে। বিক্রমের প্রতি সুমিত্রার প্রেম কখনো স্ফুরিত হয়নি, বিক্রম তাঁর সমস্ত আয়োজনের দ্বারাও সুমিত্রার প্রেমিকা-চিত্তকে লাভ করতে পারেন নি। এখানেই বিক্রমের পৌরুষ পরাভূত। এই পরাভবের লজ্জা দূর করবার জন্যই সুমিত্রাকে নিয়ে তাঁর প্রেমের উৎসব,—সঙ্গীতরিক্ত বীণায় সঙ্গীতকে ফুটিয়ে তোলার আমরণ প্রচেষ্টা,—এই প্রচেষ্টার ব্যর্থতায় তাঁর ট্র্যাজেডি,—ট্র্যাজেডি আরো গভীর এখানেই যে, তিনি সুমিত্রার প্রেমকে তো লাভ করতে পারলেনই না, উপরন্তু হারালেন সুমিত্রাকেই।

সুমিত্রার প্রেমকে লাভ করার সঙ্গে যেমন যুক্ত বিক্রমের আত্মসম্মান, তেমনি সুমিত্রাও বিক্রমের প্রেমিকা হয়ে না ওঠার সঙ্গে যুক্ত করেছেন নিজের নারী মর্যাদা। তাঁর সব সময়ই একথা স্মরণ আছে যে, নারী বলেই তাঁকে কাশ্মীর থেকে ছিনিয়ে এনেছেন বিক্রম, এবং কাশ্মীরের প্রজাদের জীবন রক্ষার স্বার্থে তাঁকে মেনেও নিতে হয়েছে এই অপমান। এই অপমানকে তিনি চিরস্থায়ী করে তুলবেন, যদি তিনি বিক্রমের কাছে প্রেমপূর্ণ মন-প্রাণ নিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু তা তিনি করবেন না। তিনি ভুলতে চান এই অপমানের স্মৃতিকে। তাই তিনি সচেতনভাবে নিজেকে বিক্রমের কামিনী হওয়া থেকে নিবৃত্ত রেখেছেন। বিক্রমের রাজ্যে যখন তাঁকে আসতেই হয়েছে, তখন তিনি বিক্রমের ভোগের উপাদান হ'য়ে নিজের অপমানকে বাড়িয়ে তুলবেন কেন, বরং বিক্রমের রাণী হয়ে তিনি নিজের অপমানকে লাঘব করতে পারেন। এই কথাই তিনি বলেছেন তাঁর প্রেমলিপ্সু বিক্রমকে: "তুমি আমাকে কেড়ে নিয়ে এসেছ কাশ্মীর থেকে—সেই অপমান আমার ঘুচিয়ে দাও—আমাকে রাণীর পদ দিতে হবে।"—(১ম দৃঃ)।

বিক্রম সুমিত্রাকে চান কামিনী হিসাবে, আর সুমিত্রা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান রাণী হিসেবে,—এখানেই উভয়ের মধ্যে বিরোধ। আবার সুমিত্রাকে কামিনী হিসেবে পাওয়ার সঙ্গে যেমন বিক্রম সংযুক্ত করেছেন তাঁর আত্ম-সম্মানকে, তেমনি রাণী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টার সঙ্গে সুমিত্রা সংযুক্ত করেছেন নিজের মর্যাদাকে।—এখানেই বিরোধের তীব্রতা বেড়ে উঠেছে। এই দুই পক্ষের মধ্যে সুমিত্রা সুরু থেকেই পরাভূত। তাই পরিণামে তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও তার মধ্যে ট্র্যাজেডি নেই, কিন্তু বিক্রম সুরু থেকেই

বিজয়ী এবং তারই উল্লাসে প্রমত্ত। তাই পরিণামে তাঁর ব্যর্থতায় রয়েছে ট্র্যাজেডি।

বিক্রমের সামরিক শক্তির চাপে কাশ্মীর-রাজকন্যা সুমিত্রা যখন বিক্রমকে বরণ করতে বাধ্য হন, তখন তিনি কৈলাসনাথের মন্দিরে তিনদিন ধরে তপস্যা ক'রে এই শক্তি চেয়েছিলেন যে, "রুদ্রের প্রসাদে" তাঁর "বিবাহ" যেন ভোগের না হয়। জালন্ধর রাজগৃহে তিনি "কোনোদিন কিছুর জন্যই যেন লোভ" না করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জালন্ধর রাজগৃহে ভোগের ব্যাপক আয়োজন এবং বিক্রমের উদ্দাম প্রেম-ব্যাকুলতা "প্রতিদিন" "হাজারবার" সুমিত্রার চিত্তকে বিচলিত করেছে। এমনকি বিক্রম সম্পর্কেও তাঁর মনের মধ্যে একটি সশ্রদ্ধ উপলব্ধি পর্যন্ত তৈরী হয়েছে। বিপাশার প্রতি উক্তিব মধ্যে সেই সশ্রদ্ধ উপলব্ধিটি প্রকাশ পেয়েছে : "ওঁর মধ্যে তুচ্ছ কিছুই নেই। প্রচণ্ড তাঁর শক্তি—সে শক্তিতে বিলাসের আবিলতা নেই, আছে উল্লাসের উদ্দামতা। আমি যদি সেই কূলভাঙ্গা বন্যার ধাবে এসে দাঁড়াতুম, তাহলে আমার সমস্ত কোথায় ভেসে যেত, ধর্মকর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা। ওই শক্তির দুর্জয়তাকে অহরহ ঠেকাতে গিয়েই আমার মন এমন পাষাণ হয়ে উঠল। এত অজস্র দান কোনো নারী পায়না—এই দুর্লভ সৌভাগ্যকে প্রত্যাখ্যান করবার জন্যে নিজের সঙ্গে আমার এমন দুর্বিষহ দ্বন্দ্ব। মহারাজকে যদি অবজ্ঞা করতে পারতুম তাহলে তো সমস্তই সহজ হত। অন্তরে বাহিরে আমার দুঃখ যে কত দুঃসহ তা তিনিই জানেন. যাঁর কাছে ব্রত নিয়েছিলুম।" (১ম দৃঃ)

বিক্রম সম্পর্কে এই দুর্বলতা সুমিত্রার মনে উঁকি দিলেও সুমিত্রা তাকে প্রশ্রয় দেন নি। তিনি নিজেকে কিছুতেই বিক্রমের ভোগের বিষয় হয়ে উঠতে দেবেন না, এবং সেইভাবেই তিনি বিক্রমের কাশ্মীব জয়ের গৌরবকে ম্লান করে দিতে চান। যদি তিনি এই দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে বিক্রমের ভোগেব আয়োজনে গা ভাসিয়ে দিতেন তবে বিক্রমের কাশ্মীর জয়ের গৌবব হ'ত ষোল আনা, এবং নিজের অপমানের হত চূড়ান্ত। তাই তিনি নিজের ও কাশ্মীরের গৌরব রক্ষার জন্যই বিক্রমের পার্শ্ববর্তিনী না হয়ে হয়েছেন বিক্রমের সম্মুখবর্তিনী, প্রেম সম্ভোগের পরিবর্তে প্রজা রক্ষায় আগ্রহী, নারীর সৌভাগ্যের পরিবর্তে রাণীর মর্যাদালাভে বদ্ধ পরিকর।

সুমিত্রা এইভাবে রাজার সমস্ত উদ্দেশ্যকে নিষ্করুণভাবে ব্যর্থ করে দেওয়াতেই রাজার মহত্ত্ব এল শুকিয়ে, তাঁর মধ্যে দেখা দিতে লাগল স্থূলবুদ্ধির

আত্মনাশী আচরণ। সুমিত্রার প্রতি বিপাশার উক্তির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে রাজার এই মূঢ় রূপ,—

"ওই ভুবনমোহন রূপ নিয়ে কোথায় সুদূরে দাঁড়িয়ে রইলে তুমি। কিছু চাইলে না, কিছু নিলে না, একী নিষ্ঠুর নিরাসক্তি। তুমি রাজহংসীর মতো, রাজার তরঙ্গিত কামনা সাগরের জলে তোমার পাখা সিক্ত হতে চায় না, রাজবৈভবের জালে পারলে না তোমাকে একটুও বাঁধতে, তুমি যত রইলে মুক্ত, রাজা ততই হলেন বন্দী।"—(২য় দৃশ্য)।

"রাজা ভেবেছিলেন নিজের দাক্ষিণ্যের উন্মত্ততায় তোমাকে বিস্মিত করে দেবেন। তখনো তোমাকে চেনেননি। কিন্তু কত বড়ো দুর্ভাগা—রাজ-সিংহাসনের উপর বসে ছটফট করে মরছে ; দিতে চায়, দিতে পারে না, নিতে চায় নেবার যোগ্যতা নেই। ব্যর্থ নির্বুদ্ধিতার ধিক্কারে আজ সকলেরই উপর রেগে রেগে উঠছেন। তার মধ্যে তুমিও আছ"—(২য় দৃশ্য)।

বিক্রমের জীবনে যে একটা অশান্তি, একটা সর্বনাশ আসন্ন হয়ে আসছে, এই সমস্ত উক্তির মধ্যদিয়েই তা আভাসিত হচ্ছে। সুমিত্রা বুঝতে পারেন না তাঁর অপরাধটা কোথায়। দেবদত্ত বুঝিয়ে বলেন, কলিকে কখন যে জাগিয়ে তোলা হয়, সব সময় বোঝা যায় না। কিন্তু বিপাশাই স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয় রাজার অনিবার্য সর্বনাশের মূল কারণকে : "মহারাণীর সঙ্গে মহারাজের সম্বন্ধ অন্যায় দিয়ে আরম্ভ হয়েছে, সেই পাপের ছিদ্র দিয়েই কলির প্রবেশ"—(২য় দৃশ্য)। বিপাশার এই উক্তির মধ্যেই ধরা পড়েছে বিক্রমের জীবনের ট্র্যাজেডির উৎস।

সুমিত্রার সঙ্গে বিক্রমের সম্বন্ধের সুরু যে একটা অন্যায়ের মধ্যদিয়ে, সেটাকে বিক্রম স্বীকার করতেই চান না। তাই তিনি সুমিত্রার উপরে প্রয়োগ করতে চান তাঁর অধিকারকে, আর সেখানেই সুমিত্রার প্রবল প্রতিরোধ। সেই প্রতিরোধকে অতিক্রম করার জন্য বিক্রম নির্ভর করেন তাঁর শক্তির উপর! এই শক্তির মত্ততায় জাগে আত্মশ্লাঘা। এইজন্যই প্রজামঙ্গলের জন্য সুমিত্রার উৎকণ্ঠার প্রতি কোনো আগ্রহ তিনি দেখান না, পরন্তু নিজের বুদ্ধি বিবেচনার প্রতি অসীম গুরুত্ব দিয়ে গর্বোদ্ধত কণ্ঠে তিনি সুমিত্রাকে বলতে থাকেন : "তুমি আমাকে চিনতে পারলে না—তোমার হৃদয় নেই, নারী! শংকরের তাণ্ডবকে উপেক্ষা করতে পার কি। সে তো অপ্সরার নৃত্য নয়। আমার প্রেম, এ প্রকাণ্ড, এ প্রচণ্ড, এতে আছে আমার

শৌর্য—আমার রাজ প্রতাপের চেয়ে এ ছোট নয়, তুমি যদি এর মহিমাকে স্বীকার করতে পারতে তাহলে সব সহজ হত। ধর্মশাস্ত্র পড়েছ তুমি, ধর্মভীরু—কর্মদাসের কাঁধের উপর কর্তব্যের বোঝা চাপানোকেই মহৎ বলে গণ্যকরা তোমার গুরুর শিক্ষা। ভুলে যাও, তোমার ওই কানে গুরু মন্ত্রগুলো। যে আদিশক্তির বন্যার উপর ফেনিয়ে চলেছে সৃষ্টির বুদ্‌বুদ, সেই শক্তির বিপুল তরঙ্গ আমার প্রেমে—তাকে দেখো, তাকে প্রণাম করো, তার কাছে তোমার কর্ম অকর্ম দ্বিধাদ্বন্দ্ব সমস্ত ভাসিয়ে দাও, একেই বলে মুক্তি, একেই বলে প্রলয়, এতেই আনে জীবনে যুগান্তর"—(২য় দৃঃ)।

বিক্রমের এই প্রচণ্ড প্রেমের কাছে যদি সুমিত্রা ধরা দেন, তবে তাঁর সমস্ত সাধনাই ব্যর্থ। তাই তিনি বিক্রমের এই উক্তির জবাবে বলেন, "আমার স্থিতি তোমার প্রজাদের কল্যাণলক্ষ্মীর দ্বারে—সেখানকার ধূলির পরেও যদি আসন দিতে, আমার লজ্জা দূর হত। তোমার নিজের তরঙ্গ গর্জনে তোমার কর্ণ বধির, কেমন করে জানবে কী নিদারুণ দুঃখ তোমার চারিদিকে। কত মর্মভেদী কান্নার প্রতিধ্বনি দিনরাত্রি আমার চিত্তকুহরে ক্ষুব্ধ হয়ে বেড়াচ্ছে তোমাকে তা বোঝাবার আশা ছেড়ে দিয়েছি। যখন চারদিকেই সবাই বঞ্চিত, তখন আমাকে তুমি যতবড়ো সম্পদই দাও, তাতে আমার রুচি হয় না"—(২য় দৃঃ)।

এই উক্তির পর সুমিত্রা রাজ্যে শৃঙ্খলা আনয়নের উদ্দেশ্যে রাজভ্রাতা নরেশকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রীর কাছে যেতে উদ্যত হলে, তাঁর সঙ্গে এই প্রসঙ্গে বিক্রমের তর্ক বিতর্ক হয়। বিক্রম বিমূঢ় আত্মপ্রসাদ নিয়ে তাঁকে বললেন, "মহারাণী, মনে রেখো, দয়ার অবিচারেও অন্যায় আছে। প্রজাদের পরে অত্যাচার হচ্ছে, এও যেমন অত্যুক্তি, অন্যায়কারীদের শাসন আমার পক্ষে অসাধ্য এও তেমনি অশ্রদ্ধেয়। এসব কথা তোমার সঙ্গেও নয়, এবং আজও নয়।" (২য় দৃঃ)। তারপরই তিনি মকর কেতনের উৎসবের বেশ পরিধান করতে সুমিত্রাকে আদেশ করলেন।

সুমিত্রা বুঝলেন, এখানে তাঁর ভূমিকা কেবল কামিনীর, মহিষীর নয়। মহিষীর সম্মান লাভ করা এখানে অসম্ভব, এবং কামিনীর লজ্জা এখানে অনিবার্য। তাই মার্তণ্ডদেবের কাছে উৎসর্গীকৃত তাঁর সত্তাকে জালন্ধররাজ-কামিনীর লজ্জা থেকে রক্ষা করা তার এখন একমাত্র কর্তব্য। তীব্র ক্ষোভে তিনি রাজাকে বললেন, "তাই করব মহারাজ, তাই করব, বেশ পরিবর্তন করব। ধিক এই রাজ্য। ধিক্ আমি এ রাজ্যের রাণী।" এখানে বেশ

পরিবর্তন করার অর্থটি বক্রোক্তির অর্থদ্যোতক। কারণ এর পরেই দেখি কাশ্মীরের ধ্রুব তীর্থে মার্তণ্ডদেবের মন্দিরের উদ্দেশ্যে তাঁর রাজ্যত্যাগ।

সুমিত্রা বিক্রমের সঙ্গে বিবাহের মাধ্যমে জালন্ধরের রাজা ও রাজ্যের মঙ্গল করতেই শুধু চেয়েছিলেন, এই ভাবেই তিনি চেয়েছিলেন কাশ্মীর কন্যা তথা সমগ্র কাশ্মীরের গৌরবকে তুলে ধরতে। রুদ্রভৈরবের কাছে তিনি বিবাহের পূর্বেই নিজেকে নিবেদন করে রেখেছেন, পাছে কামনার কলুষ তাঁকে পথভ্রষ্ট ক'রে দেয়, তাঁর প্রিয় কাশ্মীরের শ্রদ্ধেয় গৌরবকে ম্লান করে দেয়। এইজন্যই তিনি দেবতার কাছে নিবেদিত তাঁর জীবনে মানুষের লোভকে প্রশ্রয় দিতে পারেন না। ধ্রুবতীর্থের পথ থেকে পত্র মারফৎ বিক্রমকে স্পষ্ট করেই একথা তিনি জানালেন: "বিবাহের পূর্বে একদিন রুদ্রভৈরবকে আত্মনিবেদন করতে গিয়েছিলেম। তাঁরই বলি ফিরিয়ে নিয়ে এসে দিলেম তোমাকে, তোমার রাজ্যকে। ব্যর্থ হল, তুমিও পেলে না, তোমার রাজ্যও পেতে বাধা পেল।" (২য় দৃঃ)

"আমি যাঁর কাছে নিবেদিত তাঁকে তাঁর অর্ঘ্য ফিরিয়ে দিতে চললেম। কাশ্মীরে ধ্রুবতীর্থে মার্তণ্ডদেব আমাকে গ্রহণ করবেন। রূপ দিয়ে তোমাকে তৃপ্ত করতে পারিনি, শুভ কামনা দিয়ে তোমাব রাজ্যের অকল্যাণ দূর করতে পারলুম না। যদি আমার তপস্যা সার্থক হয়, যদি দেবতাকে প্রসন্ন করি তবে দূর হতে তোমাদের মঙ্গল করতে পারব। আমাকে কামনা কোরো না, এই তোমার কাছে আমার শেষ নিবেদন। আমাকে ত্যাগ কোরো, তোমাদের শান্তি হোক।" (২য় দৃঃ)

বিক্রমের যে প্রমত্ত শক্তির কাছে সুমিত্রার ব্রত লাঞ্ছিত হবার উপক্রম হয়েছিল, সেই প্রমত্ত পুরুষ-শক্তি সুমিত্রার এই শুষ্ক তত্ত্ব কথায় স্তিমিত হতে পারে না। বরং তাঁর অতৃপ্ত পুরুষ-স্বভাব সুমিত্রার এই আচরণে আরও পরুষ হয়ে ওঠে। নারী হিসেবে তাঁর জীবনে সুমিত্রা কোন্ সুষমা আনয়ন করেছেন, তা অন্বেষণ করতে গিয়ে তাঁর অচরিতার্থ প্রেমার্তি হাহাকার করে উঠেছে: "দেন নি, তিনি কিছুই দেন নি, সমস্ত ফাঁকি! নারী যে সুধা এনেছে আমার দীনতম প্রজারও ঘরে, আমি রাজ্যেশ্বর তার কণাও পাইনি— আমার দিনরাত্রি তৃষ্ণায় শুকিয়ে গেছে, সুধা সমুদ্রের তীরে বসে" (২য় দৃঃ)।

বিক্রমের এই হাহাকার অযথার্থ নয়। সুমিত্রার কাছে তাঁর কাশ্মীরের গৌরব, তাঁর ব্রত, প্রভৃতির যত মূল্যই থাক, বিক্রমের কাছে সে-সবের বিশেষ

কিছু মূল্য না থাকারই কথা। তিনি শক্তি দিয়ে পরাজিত করেছেন কাশ্মীরকে এবং সেই যোগ্যতায় কাশ্মীর কন্যা স্থমিত্রাকে বিবাহ করেছেন। এই বিবাহের উদ্দেশ্য স্থমিত্রার কাশ্মীরমুখিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়, তাঁর ব্রত উদ্‌যাপনে সহায়তা করা নয়, স্থমিত্রাকে নিয়ে প্রেম-পরিপূর্ণ একটি সংসার সৃষ্টি করা, যেখানে স্থমিত্রা হবেন রাজার জীবন-রঙ্গের নায়িকা। বিক্রমের এই ন্যায্য প্রত্যাশাকে যদি স্থপরিকল্পিতভাবে স্থমিত্রা ব্যর্থ করে দেন, তবে বিক্রমের বেদনা হবে স্বতঃস্ফূর্ত, হাহাকার হবে দুর্নিবার।

বিক্রম যদি এই বেদনাকে মেনে নিয়ে দুঃখের মধ্যেই জীবনকে অবসিত করে দিতেন, তবে ব্যর্থপ্রেমের মধ্যেও একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা তাঁর প্রাপ্য হত, এবং স্থমিত্রারও রাজ্যত্যাগের মাহাত্ম্য অনেকটাই যেত খর্ব হয়ে। কিন্তু বিক্রমের স্বভাবের সঙ্গে তা সঙ্গতি-পূর্ণ হত না। বিক্রমের সব কিছুরই ভিত্তিতে আছে তাঁর শক্তির গৌরব। এই গৌরবে গৌরবান্বিত বিক্রম তাই স্থমিত্রার রাজ্যত্যাগকে একটা প্রচণ্ড ঔদ্ধত্যরূপে বিবেচনা করলেন এবং বহুকাল-ক্ষুব্ধ তাঁর শক্তির গৌরব সমস্ত বিষকে ধারণ করে ফণা তুলে উঠল, এক মুহূর্তের মধ্যে চাইল স্থমিত্রার উদ্ধত অভিমানকে স্তব্ধ করে দিতে। মন্ত্রীকে তিনি বললেন "পদানত ধূলিশায়ী কাশ্মীরের চোখের উপর দিয়ে নিয়ে আসব তাঁকে বন্দিনী ক'রে, যেমন করে দাসীকে নিয়ে আসে। এই কাশ্মীরের স্পর্দ্ধা মনের মধ্যে গোপনে পোষণ করে এতদিন আমাকে উপেক্ষা করেছেন। এবার তলোয়ার দিয়ে তার মূল উৎপাটিত করে তবে আমি শান্তি পাব"— (২য় দৃঃ)।

অদৃষ্টের পরিহাসে ভুল হ'ল বিক্রমের। প্রথমতঃ বেদনাকে সহ্য ক'রে স্থমিত্রার রাজ্যত্যাগের মহিমাকে উপেক্ষা করতে পারলেন না, দ্বিতীয়তঃ স্থমিত্রার আত্মসম্মানের ভিত্তিরূপে তিনি বিবেচনা করলেন কাশ্মীরের সম্মানকে, তাই স্থমিত্রাকে জয় করবার মানসে তিনি ধ্বংস করতে চললেন কাশ্মীরকে। তাঁর স্বভাবের যা গঠন, তাতে এই ভুল তার পক্ষে অনিবার্য এবং এই অনিবার্য ভুলই তাকে নিয়ে চলল গভীর আত্মক্ষয়ী ট্র্যাজেডির দিকে, যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তৃতীয় দৃশ্যে বিক্রম সম্পর্কে দেবদত্তের একটি উক্তির মধ্যে আভাসিত হয়েছে বিক্রমের এই দুর্নিবার ট্র্যাজেডি : "ওরে উন্মত্ত দুর্বৃত্ত অন্ধ, তোমার মহাপাতক তোমাকে মহাপতনে নিয়ে চলল, আজ কে তোমাকে বাঁচাতে পারে।"

সমগ্র তৃতীয় দৃশ্যব্যাপী কাশ্মীরের জনগণের উপর বিক্রমের প্রচণ্ড শক্তির নারকীয় অত্যাচারের পরিচয়। কাশ্মীরকে কতটা বিধ্বস্ত করলে সুমিত্রার আত্মসম্মানকে পদানত করা যায়, সে সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট পরিমাণবোধ বিক্রমের ছিল না। সুমিত্রার মনস্তত্ত্ব তাঁর অনায়ত্ত বলেই সুমিত্রার আত্ম-সম্মানের কোনো সুস্পষ্ট পরিমাপ তাঁর ছিল না, বরং নিজের শক্তির প্রমত্ততায়, অত্যাচারের মাত্রাবৃদ্ধির প্রলোভনে প্রকারান্তরে তিনি নিজের কাছে সুমিত্রার আত্মসম্মানকে অসীম করে তুলেছিলেন। তাই কাশ্মীরে তাঁর অত্যাচারের মাত্রা ছিল অসীম, যা কাশ্মীরবাসীর কাছে সঙ্গতভাবেই মনে হয়েছিল উদ্দেশ্যহীন সংহারলীলা। জনৈক কাশ্মীরবাসীর উক্তির মধ্যে এই সংহারলীলার বিমূঢ় রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে : "অকারণ সর্বনাশ করতে এল কেন এরা! খিদে পেলে বাঘে খায়, ভয় পেলে সাপে তাড়া করে আসে, এদের এ যে নিষ্কাম পাপ, অহৈতুকী হিংসা। এরা কোন্ জাতের মানুষ,......" (৩য় দৃঃ)। এই সময়ই দেবদত্তের পূর্বোল্লিখিত উক্তিটি, যার মধ্যে আভাসিত হচ্ছে, কিভাবে অনাবশ্যক জিঘাংসার আত্মনাশা বিমূঢ়তা বিক্রমকে ট্র্যাজেডির পথে নিয়ে চলেছে।

সুমিত্রার আশ্রয় এখন কাশ্মীরের মার্তণ্ডদেবের মন্দিরে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র বিক্রম সেইদিকে সৈন্য চালনা করার নির্দেশ দিলেন। দেবস্থানে সৈন্য চালনা করা যায় না, কারণ তা পার্থিব জগতের বাইরে,—ধর্মভীরু এবং বিক্রমের ভয়ে ভীত কাশ্মীর নরপতি চন্দ্রসেন এই কথা বললে, বিক্রম চন্দ্রসেনের ধর্মভাবে আঘাত হেনেই বললেন, "সে কথা দেবতা সম্বন্ধে খাটে, কিন্তু সুমিত্রা সম্বন্ধে নয়, তিনি ইহলোকের সীমায় যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ তিনি আমার, ততক্ষণ তিনি দেবতার নন। ততক্ষণ আমার কাছে তাঁর নিষ্কৃতি নেই, তাঁর কাছে আমারও নেই নিষ্কৃতি"—(৩য় দৃঃ)।

এই শেষের বক্তব্যটির মধ্যেই বিক্রমের ট্র্যাজেডির আত্মনাশী প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। কাশ্মীর জয়ের চিহ্নস্বরূপ সুমিত্রার উপর বিক্রমের অধিকার, আর সুমিত্রারও একমাত্র আশ্রয় বিক্রমের কাছে। সুতরাং সুমিত্রা যদি বিক্রমের অধিকারের বাইরে কোথাও আশ্রয় নেন, এবং সে আশ্রয় যদি দেবস্থানও হয়, তবে ন্যায়ে হোক, অন্যায়ে হোক, সেই আশ্রয় চূর্ণ করাও বিক্রমের অধিকারের মধ্যে পড়ে। ইহলোকের সীমার মধ্যে যতক্ষণ সুমিত্রার অস্তিত্ব আছে, অর্থাৎ সুমিত্রা যতক্ষণ বেঁচে আছেন, ততক্ষণ বিক্রম তাঁর এই অধিকার প্রয়োগ থেকে

নিরস্ত হবেন না এবং ততক্ষণ এই অধিকার প্রয়োগের দায় থেকে বিক্রমেরও নিস্তার নেই। অর্থাৎ যতক্ষণ বিক্রমের জীবন রয়েছে, ততক্ষণ তিনি জীবন্ত সুমিত্রার অধিকার পরিত্যাগ করবেন না। সুমিত্রার জন্য বিক্রমের এই মরণপণই তাঁর ট্র্যাজেডিকে অনিবার্য করে তুলেছে। কারণ এই মরণপণই তাঁকে সর্বনাশ সাধনে এবং সর্বনাশ বরণে প্রেরণা যুগিয়েছে এবং সুমিত্রাকে তাঁর কাছ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এবং শেষ পর্যন্ত তা সুমিত্রাকে মৃত্যুর আড়ালে এতদূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে, যেখানে বিক্রমের মারণশক্তির কোনো কার্যকারিতা নেই. এবং যেখানে পৌঁছে বিক্রম দেখবেন যে, জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা সবই অপচয়িত হওয়ায় তিনি রিক্ত, সর্বস্বান্ত। দেহে মনে সুমিত্রাকে পাওয়ার জন্য বিক্রম মরণপণ না করলে সুমিত্রাকেও হয়ত আত্ম-সম্মান রক্ষার জন্য মৃত্যুর ওপারে গিয়ে আশ্রয় নিতে হত না, এবং বিক্রমকেও হতে হত না আত্ম-প্রবঞ্চিত।

চতুর্থ দৃশ্যে ধ্রুব তীর্থে দেখি সুমিত্রা মন্দিরে বিক্রমের আগমনের আশঙ্কায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কুমারসেনকে বলছেন, "তিনি আসুন এখানেই, নইলে তাঁর মুক্তি কিছুতেই হবে না। আমার এই শেষ কাজ, তাঁকে বাঁচাতে হবে—তাঁর মোহগ্রন্থি ছিন্ন করে দিয়ে চলে যাব।" স্বামীর সুরে সুর মিলাতে না পারলেও স্বামীর কল্যাণ কামনা সুমিত্রা করছেন, স্ত্রীর ধর্ম নিয়েই। সুমিত্রার প্রতি বিক্রমের সঙ্কীর্ণ মোহ-ই বিক্রমের যত অকল্যাণের মূলে। সেই মোহ ছিন্ন করা দরকার এবং সেই উদ্দেশ্যের চরিতার্থতায়ই সুমিত্রার মর্যাদা। কিন্তু বিক্রম সুমিত্রার এই মনোভাবকে ভাবলেন স্বেচ্ছাচার, এই চরিত্রকে বললেন "স্বৈরিণী।" সুতরাং ভুল পথে তিনি সুমিত্রাকে লাঞ্ছিত করতে চাইলেন। কিন্তু তবু সুমিত্রা ধরা দিলেন না। আত্মসম্মান রক্ষায় এবং স্বামীর কল্যাণ কামনায় "তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধের চরম পরিণামের জন্য মন্দিরে দেবতার চরণপ্রান্তে" অপেক্ষা করতে লাগলেন।

শেষ দৃশ্যে বিক্রম যখন মন্দিরে এসে প্রবেশ করলেন, তখন সুমিত্রা অগ্নি-শয্যায় আত্মবিসর্জিত। তখন বেদমন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে, "হে অগ্নি, আমাদিগকে সুপথে নিয়ে যাও। হে দেব, তুমি আমাদের সকল কার্য জান, তুমি আমাদের সমস্ত জটিল পাপকে বিনাশ করো।"

সুমিত্রা বিক্রমের প্রেমের উপকরণ না হয়ে উঠলেও বিক্রমের এই ট্র্যাজেডি ঘটত না, যদি তিনি অপরাপর রাজকর্তব্যের প্রতি একনিষ্ঠ হতেন। কিন্তু

তাঁর আত্মসুখলিপ্সা এবং আত্মশ্লাঘা তাঁর বিবেকবুদ্ধিকে বিনষ্ট করে দিল। তাঁর চরিত্রের মহৎ গুণাবলী এবং প্রেম-প্রবণতা চাপা পড়ে গেল পত্নীর প্রতি বিদ্বেষ, অবজ্ঞা এবং অসম্মানের মনোভাবে। বিস্মৃত হলেন তিনি শ্রেয়বোধ—প্রেয়বোধ, এবং সেই সূত্রে প্রয়োজনীয় রাজকর্তব্য। বধির হলেন হিত পরামর্শে, শুভ কামনার মধ্যেও খুঁজে পেলেন ষড়যন্ত্র। এক কথায় কুটিল পাপ স্থায়ী আসন লাভ করল তাঁর চিত্তে। এবং তারই অনিবার্য পরিণামে আত্মনাশী বিমূঢ় প্রমত্ততার মহানন্দে নিজেরই অজ্ঞাতসারে সাধন করতে লাগলেন নিজেরই সর্বনাশ,—ঘনিয়ে এল শক্তিশালী এক নরশ্রেষ্ঠের বুদ্ধিনাশের ট্র্যাজেডি। দ্বিতীয় দৃশ্যে বিপাশার মুখে শুনেছি, "মহারাণীর সঙ্গে মহারাজের সম্বন্ধ অন্যায় দিয়ে আরম্ভ হয়েছে", সেই অন্যায়ের ছিদ্রপথেই এই ট্র্যাজেডির বীজের অনুপ্রবেশ এবং পরিশেষে এই পরিণতি।

'রাজা ও রানী' নাটকের শেষ দৃশ্যে যেখানে বিক্রমের ট্র্যাজেডি চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে, সেখানে সুমিত্রা কর্তৃক ভ্রাতার ছিন্নমুণ্ড থালায় আনয়ন, তারপর তার আবেগতপ্ত ভাষণ এবং শেষে মূর্চ্ছা ও মৃত্যু অতিনাটকীয়তার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বিক্রমের ট্র্যাজেডি পরিকল্পনায় এই ত্রুটি সকলেরই নজরে পড়বে। এই ত্রুটি না থাকলে 'রাজা ও রানী' উল্লেখযোগ্য ট্র্যাজেডিগুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারত। 'তপতী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের ত্রুটি সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। তাই এখানে বিক্রমের ট্র্যাজেডি সম্পর্কে ঐ ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করা যায় না। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ট্র্যাজেডির নায়ক হিসেবে 'রাজা ও রানীর' বিক্রমের মধ্যে মানসিক ঔদার্য ও শ্রেষ্ঠত্বের অভাব লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু 'তপতী'র বিক্রমের চরিত্র-পরিকল্পনায় তিনি লক্ষ্য করেছেন, ঐ দোষ কিছুটা পরিমাণে স্খলন করা সম্ভব হয়েছে।[৭]

'বিসর্জন' (১৮৯০) নাটকে ট্র্যাজেডি দুটি চরিত্রের মধ্যদিয়ে, অভিব্যক্তি লাভ করেছে,—রঘুপতি এবং জয়সিংহ।

'বিসর্জনে' মূল দ্বন্দ্ব গড়ে উঠেছে রাজা গোবিন্দমাণিক্য এবং রাজপুরোহিত রঘুপতির মধ্যে। রাজা নিত্যধর্ম অর্থাৎ মানবধর্মের প্রবক্তা আর রঘুপতি চিরাচরিত প্রথার সমর্থক। এঁদের মাঝখানে জয়সিংহ। তাঁর জীবনে দু'দিকের টান,—পালক পিতা রঘুপতির প্রতি কর্তব্য এবং গোবিন্দমাণিক্যের

৭. রবীন্দ্রনাথ: ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, (৪র্থ সং), পৃ ২১০।

মানবধর্ম সম্পর্কে আন্তরিক উপলব্ধি—যা আরও তীব্র হয়েছে ভিখারিণী অপর্ণার প্রেমে। এই দুদিকের বিপরীত টানের সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে জয়সিংহকে করতে হয়েছিল আত্মবিসর্জন। আর সেই আত্মবিসর্জনই বজ্রকঠোর রঘুপতির অন্তরের পাষাণকে গলিয়ে দিল। জয়সিংহের আত্মত্যাগ পরাজিত করল গোবিন্দমাণিক্যের কাছে রঘুপতিকে। রঘুপতির এই পরাজয় অত্যন্ত শোচনীয়। তাঁর চরিত্রে ব্রাহ্মণ্য অহংকার ও তার শোচনীয় পরাজয় এবং সেই পরাজয়ের মধ্য থেকে অপার করুণা ও বেদনার আবির্ভাব অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। কিন্তু এরই অন্তরালে জয়সিংহের স্ফুটমান জীবনের শোচনীয় পরিণামও যথেষ্ট বেদনার সঞ্চার করে। এই দুটি কারণেই 'বিসর্জন' নাটকের শেষ দিকটা ট্র্যাজেডির ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। নাট্যকার নিজেও নাটকের এই করুণরস পরিণাম সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এই নাটকটি পাঠ করার পর তাঁর প্রিয় পাঠক-পাঠিকার প্রতিক্রিয়া তিনি কল্পনা করেছেন গ্রন্থের উৎসর্গে :

> "তোদের নয়নে জল করে আসে ছল ছল
> শুনিয়া কাহিনী করুণার।"

বস্তুতঃই এই নাটকে ট্র্যাজেডি একজনের জীবনে ঘটেনি। রঘুপতি এবং জয়সিংহ উভয়ের জীবনেই ঘটেছে ট্র্যাজেডি। এবং এই দুটি ট্র্যাজিক জীবনকে নিয়েই এই নাটকের ট্র্যাজেডির রস পরিণাম।

রঘুপতিকে নিয়েই নাটকের মূল দ্বন্দ্ব গড়ে উঠেছে বলে, প্রথমে রঘুপতির ট্র্যাজেডিই আলোচ্য।

ভিখারিণী অপর্ণার স্নেহের পুত্তলি এক ছাগ শিশু দেবীর কাছে বলির জন্য আনীত হওয়ায়, অপর্ণা রাজার কাছে অভিযোগ করল। অপর্ণার চোখের জল রাজার কাছে নূতনতর সত্যের সন্ধান এনে দিল। তিনি বুঝলেন হিংসার অনুষ্ঠানে আবদ্ধ দেবীপূজা এমন এক রূঢ় প্রথাকে গড়ে তুলেছে, যার মধ্যে দয়া, মায়া প্রভৃতি মানুষের ধর্মগুলি স্থান পায়নি। মানুষের ধর্মের স্বার্থে তাই তিনি নিষেধ করলেন তাঁর রাজ্যে জীববলি। দেবীমন্দিরের পুরোহিত রঘুপতি রাজার এই নিষেধকে নিজ পৌরোহিত্যের উপর অপমান হিসেবে বিবেচনা করলেন। জীববলি নিয়ে গড়ে ওঠা যে চিরাচরিত প্রথা, তার উপরই প্রতিষ্ঠিত তাঁর পৌরোহিত্য। সুতরাং সেই প্রথার পরিবর্তনে কেঁপে ওঠে তাঁর পৌরোহিত্য এবং স্খলিত হয়ে পড়ে পুরোহিতের আত্মগৌরব। এইজন্য

জীববলি নিষেধকে প্রতিরোধ করা দরকার রঘুপতির, এবং সেই মনোভাব নিয়েই তিনি গোবিন্দমাণিক্যের মুখের উপর বললেন,—

"তুমি ভেবেছ মনে ত্রিপুর-ঈশ্বরী
ত্রিপুরার প্রজা? প্রচারিবে তাঁর'পরে
তোমার নিয়ম? হরণ করিবে তাঁর
বলি? হেন সাধ্য নাই তব, আমি আছি
মায়ের সেবক।"—১।২

এইভাবে রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে প্রতিরোধ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলেন। যে ত্রিপুরেশ্বরীমন্দিরের তিনিই সর্বেসর্বা, এবং সেই পদমর্যাদায় সমগ্র ত্রিপুরায় যাঁর অপরিসীম প্রতিপত্তি ও সম্মান তিনি ভোগ করে আসছেন সেই ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে বলি নিষেধের বিধান তাঁর সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই রাজা ঘোষণা করলেন,—এ যেন রঘুপতির নিজেরই মর্যাদা হানি। তাঁর আশঙ্কা, রাজার 'বাহুবল রাহুসম ব্রহ্মতেজ গ্রাসিবারে চায়—সিংহাসন তোলে শির যজ্ঞ বেদী পরে'—(১।৩)। রাজা যে এত সহজেই দেবতার মন্দির সম্পর্কে এই নিষেধের বিধানকে বলবৎ করতে পারলেন, এতে দেবতা সম্পর্কে রঘুপতির শ্রদ্ধার ভিত্তিও শিথিল হয়ে গেল। কারণ রঘুপতির বোধ হয় প্রত্যাশা ছিল মন্দিরে রাজার এই অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ দেবতা সহ্য করবেন না, দেবতার ক্রোধ রাজার আদেশকে ব্যর্থ করে দেবেই। কিন্তু কার্যতঃ তা হ'ল না। বরং বিস্ময়ে তিনি দেখলেন, "হায় হায়, কলির দেবতা, তোমরা চাটুকার সভাসদ সম নতশিরে রাজআজ্ঞা বহিতেছ? চতুর্ভুজা, চারি হস্ত আছে জোড় করি"—(১।৩)।

মন্দিরের উপর মানুষের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে দেবতা যখন এমন নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন, তখন রঘুপতিই দেবতার মর্যাদা রক্ষার ভার নিলেন—

"দেবতা না যদি থাকে, ব্রাহ্মণ রয়েছে।
ব্রাহ্মণের রোষযজ্ঞে দণ্ড সিংহাসন
হবিকাষ্ঠ হবে।" —(১।৩)

দেবতার কর্তব্য এইভাবে ব্রাহ্মণ রঘুপতির নিজের হাতে নেওয়ার যে দম্ভ, তারই মধ্যে রঘুপতির জীবনের ট্র্যাজেডির বীজ নিহিত রয়েছে। 'দেবতা না যদি থাকে, ব্রাহ্মণ রয়েছে'—রঘুপতির এই হঠকারী উক্তির মধ্যে রঘুপতি নিজেকে দেবতারও উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেবতা না থাকলে মন্দিরও

থাকত না, রঘুপতির পৌরোহিত্যেরও প্রশ্ন উঠত না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মন্দিরও আছে, এবং রঘুপতির পৌরোহিত্যও রয়েছে। এখন যদি দেবতার অস্তিত্ব সম্পর্কে রঘুপতির মনে প্রশ্ন জাগেই, তথাপি তাঁর পক্ষে মন্দির এবং পৌরোহিত্যকে পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। কারণ মন্দির এবং পৌরোহিত্যের উপরই তাঁর ব্রাহ্মণত্ব আজ প্রতিষ্ঠিত। তাই দেবতা-নিরপেক্ষভাবেই এই ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদা তাঁকে রক্ষা করতে হবে, এই মর্যাদা রক্ষা করতে না পারলে তাঁর ব্যক্তিত্বের সমস্ত ওজনটাই শূন্য হয়ে যায়! কাজেই দেবতা থাকুন আর না থাকুন, এই ব্রাহ্মণত্যের মর্যাদা রক্ষার জন্যই তাঁকে রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে, এবং এই লড়াই চালাতে গিয়েই তাঁর যে পরাজয়, সেই পরাজয়েই ঘটল তার জীবনের ট্র্যাজেডি।

রঘুপতি যদি নিজের ব্রাহ্মণত্বকে দেবতারও উপরে প্রতিষ্ঠিত না করতেন, দেবতা সম্পর্কে যদি তাঁর সুগভীর প্রত্যয় ও ভক্তি থাকত, তবে রাজার বলি নিষেধের আদেশ সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া এত তীব্র হত না, দেবস্থানে রাজার হস্তক্ষেপের ঔচিত্য-অনৌচিত্যের মীমাংসার ভার তিনি দেবতার উপরই ন্যস্ত রাখতেন,—যথার্থ ভক্তের মতো। নিজেকে দেবতার অভিভাবক নিযুক্ত করার ধৃষ্টতা তাঁর হত না। এবং রাজার আদেশের এই আত্মনাশী প্রতিরোধ স্পৃহাও তাঁর মনে জাগত না। অনিবার্য ট্র্যাজেডিকে তিনি পরিহার করতে পারতেন। সুতরাং 'দেবতা না যদি থাকে ব্রাহ্মণ রয়েছে'—দেবতার উপরে ব্রাহ্মণকে এইভাবে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যেই রয়েছে রঘুপতির ট্র্যাজেডির বীজ।

প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যেও দেখি, এই ব্রাহ্মণত্বের অবমাননার জ্বালাই রঘুপতিকে অনর্থক ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে, ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। বলি নিষেধের আদেশ জারির মধ্যে রঘুপতির মহিমাকে খর্ব করার কোনো উদ্দেশ্যই গোবিন্দ-মাণিক্যের ছিল না। অথচ রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যের সেই উদ্দেশ্যই সর্বদা খুঁজে পেয়েছেন বলি নিষেধের আদেশের মধ্যে,—তিনি ধরে নিয়েছেন, তাঁর ব্রাহ্মণত্বের অবমাননাই গোবিন্দমাণিক্যের আসল মতলব। সুতরাং দেখা যায় তাঁর অপরিসীম আত্মযন্ত্রণার ইন্ধন তিনি নিজেই সংগ্রহ করেছেন অফুরন্ত, —এমনকি নিজেই বাড়িয়েও তুলেছেন সেই ইন্ধনকে ক্রমাগত। আত্মযন্ত্রণার ইন্ধনকে এইভাবে বাড়িয়ে তুলবার প্রবণতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর আত্ম-যন্ত্রণারও শেষ নেই। তাই দেখা যায়, তাঁর ব্রাহ্মণত্বের অবমাননার স্বকপোল-কল্পিত মিথ্যা ধারণাই তাঁকে ট্র্যাজেডির বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে গেছে।

প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে গোবিন্দমাণিক্য কর্তৃক গুণবতীর আয়োজিত পূজাকে ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির দ্বার থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার ঘটনার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে গুণবতীকে রঘুপতি বলেছেন,—

"এই বড়ো সর্বনাশ, রাজদর্প
ক্রমে স্ফীত হয়ে, করিতেছে অতিক্রম
পৃথিবীর রাজত্বের সীমা—বসিয়াছে
দেবতার দ্বার রোধ করি, জননীর
ভক্তদের প্রতি দুই আঁখি রাঙাইয়া।" ১।৪

এখানে জননীর 'ভক্তদের প্রতি' রাজদর্পের 'দুই আঁখি রাঙাইয়া' যে দেবতার দ্বার রোধ করা,—এটাই রঘুপতির আত্মনাশী ট্র্যাজিক কল্পনা। এরই যন্ত্রণায় গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি তাঁর জলন্ত প্রতিহিংসা। এই প্রতিহিংসা এমন দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য যে তার স্থূল রূপটি স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসংযত। তাই গুণবতীর সম্মুখেই স্বামী গোবিন্দমাণিক্য সম্বন্ধে সেই প্রতিহিংসা এইভাবে স্ব-ঘোষিত হতে পারে—

—"যে সিংহাসনের ছায়া
পড়েছে মায়ের দ্বারে, ফুৎকারে ফাটিবে
সেই দম্ভমঞ্চখানি জলবিম্ব সম।" (১।৪)

স্বামীর এই ভয়ঙ্কর বিপদাশঙ্কায় গুণবতী 'রক্ষা করো! রক্ষা করো!' বলে আর্তচীৎকার করে উঠলে, রঘুপতির প্রতিহিংসা আরো বিকটভাবে আত্মপ্রকাশ করে—

হাহা! আমি
"রক্ষা করিব তোমারে! যে প্রবল রাজা
স্বর্গে মর্ত্যে প্রচারিছে আপন শাসন
তুমি তাঁরি রাণী! দেব ব্রাহ্মণেরে যিনি"—(১।৪)

অর্থাৎ দেবতা এবং ব্রাহ্মণকে যিনি এমনভাবে অপমানিত করতে পারেন, সেই প্রবল রাজার এবং তাঁর রাণীর রক্ষাকর্তা কেউ নেই। এখানেও দেখি, দেবতার অপমানের সঙ্গে ব্রাহ্মণের অপমানেরও সংযুক্তি ঘটিয়েছেন রঘুপতি, এবং সেই ব্রাহ্মণ হিসেবে নিজেকেও বিবেচনা করেন আক্রান্ত। এই কল্পিত আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে গিয়েই তিনি হারালেন জীবনের সর্বস্ব, তাঁর জীবনে ঘটল ট্র্যাজেডি।

গোবিন্দমাণিক্যের রাজদর্পের কাছে দেবতার অপমানের প্রতিবিধান না হয় দেবতা একভাবে করবেন, কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের অপমানের প্রতিবিধান ব্রাহ্মণ রঘুপতি কিভাবে করবেন? ব্রাহ্মণ হিসেবে তাঁর বহুশ্রুত ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মশাপ আজ কোথায়? নিরস্ত্র, নির্বিষ ব্রাহ্মণ্যের এই বৃথাদর্পের অন্তর্জ্বালা অত্যন্ত তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে এখানে—

"ধিক্, ধিক্, শতবার! ধিক্ লক্ষবার!
কলির ব্রাহ্মণে ধিক্! ব্রহ্মশাপ কোথা!
ব্যর্থ ব্রহ্মতেজ শুধু বক্ষে আপনার
আহত বৃশ্চিক-সম আপনি দংশিছে!
মিথ্যা ব্রহ্ম আড়ম্বর!" ১।৪

কৃত-কৃতার্থ-ব্রাহ্মণ্য রঘুপতির কাছে এমন নিষ্করুণভাবে ব্যর্থ প্রমাণিত হওয়ায়, রাজদর্পের প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্য রঘুপতিকে এবার আরো অনেক নীচ ষড়যন্ত্রের মধ্যে নামতে হ'ল। প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে রঘুপতির কুটিল প্রশ্নের উত্তরে সেনাপতি নয়ন রায় যখন জানালেন যে, ভক্তবংশে তাঁর জন্ম, এবং যাঁরা মাতৃভক্ত, তিনি তাঁদেরই দাস, তখন পুলকিত চিত্ত রঘুপতি সেই ভক্তিকে নিজের কাজে নিয়োজিত করার মানসে অতিস্থূলভাবেই বললেন—

"সাধু! ভক্তি তব
হউক অক্ষয়। ভক্তি তব বাহু মাঝে
করুক সঞ্চার অতি দুর্জয় শকতি।
ভক্তি তব তরবারি করুক শাণিত,
বজ্রসম দিক তাহে তেজ!" —১।৫

ভক্তিকে এইভাবে রাজার বিরুদ্ধে শক্তিতে রূপান্তরিত করার হীন প্রচেষ্টায় নয়ন রায় সম্মত না হওয়ায়, অতঃপর রঘুপতি ত্রিপুরার স্বল্পবুদ্ধি, নিরীহ সাধারণ পুরবাসীকে রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য উত্তেজিত করতে চেষ্টা করেন। এইসব ম্রিয়মান ভীরু পুরবাসীর পরিবর্তে কেবল ভক্তির জোরে জয়সিংহ মায়ের সৈনিক হবার জন্য প্রস্তুত হলে, প্রচণ্ড আত্মধিক্কারে রঘুপতি স্বগত বলেছিলেন, "সে কাল গিয়েছে। অস্ত্র চাই, অস্ত্র চাই—শুধু ভক্তি নয়"—(১।৫)। ভক্তির গৌরবে গৌরবান্বিত, ব্রাহ্মণ্যের আত্মপ্রসাদে স্ফীত-পুষ্ট রঘুপতির এইভাবে অস্ত্রের শরণাপন্ন হওয়া তাঁর দাম্ভিক চিত্তের দীন অবস্থাটিকেই সূচিত করে।

এইভাবে রঘুপতির কাছে অস্ত্রের প্রয়োজন যখন খুব জরুরী হয়ে উঠেছে, তখনই অস্ত্রের কাছে তাঁকে পরাজিত হ'তে হ'ল। এই দৃশ্যেই—১।৫ রঘুপতির প্রহরায় রাণীর প্রদত্ত পুজার অয়োজন হ'লে গোবিন্দমাণিক্য সৈন্য দিয়ে সেখানে বাধা সৃষ্টি করলেন। এই ঘটনায় লজ্জা এবং আক্রোশ দুইই রঘুপতিকে প্রায় পাগল করে তুলল। রাজশক্তির কাছে ব্রাহ্মণ্যের পরাজয়ের লজ্জা, এবং প্রতিশোধ নিতে না পারার আক্রোশ তাঁকে প্রায় উন্মাদ করে তুলল। মরিয়ার মতো প্রতিশোধ নেবার কোনো এক প্রত্যাশাকে সজোরে বুকের মধ্যে আঁকড়ে রেখে তিনি গোবিন্দমাণিক্যকে বললেন—

"অবিশ্বাসী, সত্যই কি হয়েছে ধারণা
কলিযুগে ব্রহ্মতেজ গেছে—তাই এত
দুঃসাহস? যায় নাই। যে দীপ্ত অনল
জ্বলিছে অন্তরে, সে তোমার সিংহাসনে
নিশ্চয় লাগিবে। নতুবা এ মনানলে,
ছাই করে পুড়াইব সব শাস্ত্র, সব
ব্রহ্মগর্ব, সমস্ত তেত্রিশ কোটি মিথ্যা।" —১।৫

অদৃষ্টের ট্র্যাজিক পরিহাস বশতঃই রঘুপতি এর পরই তাঁর প্রত্যাশা পূরণের একটা ক্ষীণ আভাস দেখলেন যেন। মন্দিরে সৈনাপত্য করতে রাজী না হওয়ায় নয়ন রায়কে রাজা পদচ্যুত করলেন। নয়ন রায় রাজার সম্মুখে অস্ত্র সমর্পণ করে বিদায় নিলেন।—এই ঘটনায় আশান্বিতচিত্ত রঘুপতি বলে উঠলেন—

"এমনি করিয়া ব্রহ্মশাপ
ফলে, বিশ্বাসী হৃদয় ক্রমে দূরে যায়,
ভেঙে যায় দাঁড়াবার স্থান।" —১।৫

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই দেখা যায়, রঘুপতি রাজশক্তির কাছে নিজের ক্রম পরাভূয়মান ব্রাহ্মণ্য-দর্পকে বিজয়ী করে তুলবার জন্য গোবিন্দমাণিক্যের মৃত্যুর ষড়যন্ত্র করছেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি রাজভ্রাতা নক্ষত্র রায়কে রাজার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করলেন। এই ষড়যন্ত্রকে সফল করে তোলার জন্য রঘুপতি মিথ্যার এবং ছলনার আশ্রয় নিতেও দ্বিধা করেন নি। স্বপ্নে দেবী নক্ষত্র রায়ের রাজা হওয়ার কথা বলেছেন,—এই মিথ্যা রঘুপতি নক্ষত্র রায়কে বললেন। নক্ষত্র রায় কথাটিকে সহজে বিশ্বাস না করায় রঘুপতি বললেন, "দেবীর স্বপন

সত্য। রাজটীকা পাবে তুমি, নাহিকো সন্দেহ।" কিন্তু তথাপি নক্ষত্র রায় সন্দেহ প্রকাশ করলে, রঘুপতির ব্রাহ্মণ্য গর্বে আঘাত লাগল। তিনি ভুলে গেলেন যে, তিনি দেবতার নামে কথাটি বলেছেন, কথাটি তাঁর নিজের নয়। তাই দেবতার কথায় নক্ষত্র রায় অবিশ্বাস প্রকাশ করলে, সে অবিশ্বাস প্রকারান্তরে দেবতা সম্পর্কেই হয় রঘুপতির মহিমা সম্পর্কে নয়। কিন্তু রঘুপতি দেবতার মহিমার সঙ্গে নিজের মহিমাকে সংযুক্ত করতেই অভ্যস্ত। দেবতার কথা এবং তাঁর কথা যেন একই। তাই দেবতার কথায় নক্ষত্র রায় সন্দেহ প্রকাশ করলে সেই সন্দেহকে রঘুপতি নিজের ব্রাহ্মণ্য-মহিমার প্রতি সন্দেহ হিসাবে বিবেচনা করলেন। তাই বিস্মিত হয়ে নক্ষত্র জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার কথায় অবিশ্বাস?" নিজের ভ্রান্ত মহিমাবোধকে যিনি মোহবশতঃ অপরিসীম করে তুলে সর্বত্র বিস্তৃত করে দিতে অভ্যস্ত, তিনি যে কারণে-অকারণেই সেই মহিমাবোধে আঘাত পাবেন, তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এবং এই ধরনের চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণতিও এই প্রকার ক্ষুদ্র-বৃহৎ আঘাত পেতে পেতে ক্রমশঃ জীর্ণ দীর্ণ হয়ে যাওয়া। আর এই জীর্ণ দীর্ণ অবস্থা যতই বাড়তে থাকে, ততই বাড়তে থাকে চরিত্রের উগ্রতা। আবার উগ্রতা যত বাড়বে, তত দ্রুত ঘটবে ক্ষয়। এইভাবে এই সব চরিত্রে ট্র্যাজেডি অনিবার্য হয়ে ওঠে।

এই ভাবে নক্ষত্র রায়কে রাজা হবার প্রলোভন দেখিয়ে একটি শর্তের কথা বললেন রঘুপতি: "রাজরক্ত চান দেবী।" এবং "ঘরে আছে গোবিন্দমাণিক্য। তাঁরি রক্ত চাই"—২।১। এমন ভয়ানক কথা শুনে পার্শ্ববর্তী জয়সিংহ প্রকম্পিত হলেন। কিন্তু রঘুপতি বিমূঢ় নক্ষত্র রায়কে বলে চললেন,—

"দেবীর আদেশ,
রাজরক্ত চাই—শ্রাবণের শেষরাত্রে।
তোমরা রয়েছ দুই রাজ ভ্রাতা—জ্যেষ্ঠ
যদি অব্যাহতি পায়, তোমার শোণিত
আছে। তৃষিত হয়েছে যবে মহাকালী,
তখন সময় আর নাহি বিচারের।" —২।১

এই শেষের কথা ক'টির দ্বারা রঘুপতি নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নক্ষত্র রায়কে কার্যতঃ বন্দী করে ফেললেন। নক্ষত্র রায় যদি গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত আনতে ব্যর্থ হয়, তবে তাকে তার নিজেরই রক্ত প্রদান করতে হবে। "তৃষিত হয়েছে যবে মহাকালী," তখন আর "মুক্তি নাই, মুক্তি নাই কিছুতেই।"

পার্শ্ববর্তী জয়সিংহ দেবতার নামে এই ভ্রাতৃহত্যার জঘন্য পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুললে, রঘুপতি পাপের মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করে এক দীর্ঘ বিবৃতি দিলেন। এ তাঁর এক নতুন তত্ত্ব—যা তাঁর কাছে জয়সিংহ কোনোদিন শোনে নি। বলাই বাহুল্য এটা রঘুপতির কার্যসিদ্ধির তত্ত্ব।[৮] কার্যসিদ্ধির জন্য যে কোনো নীচতার আশ্রয় নিতে তাঁর দ্বিধা নেই। যে আত্মপ্রবঞ্চক ব্রাহ্মণ্য-মহিমাকে তুলে ধরবার জন্য তিনি গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে লিপ্ত

৮. তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেও দেখা যায় রঘুপতি নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য মিথ্যা দিয়ে সত্যকে বুঝাবার এক তত্ত্ব জয়সিংহের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। দেবতা বিমুখ হয়েছেন,—একথা জনসাধারণের কাছে প্রমাণিত করার জন্য তিনি নিজে প্রতিমাকে ঘুরিয়ে রেখেছিলেন। এই দুষ্কৃতির সাফাই গাইবার জন্য তিনি তখন জয়সিংহকে বলেছেন—

দেবতার অসন্তোষ
প্রতিমার মুখে প্রকাশ না পায়। কিন্তু
মূর্খদের কেমনে বুঝাব! চোখে চাহে
দেখিবারে চোখে যাহা দেখিবার নয়।
মিথ্যা দিয়ে সত্যেরে বুঝাতে হয় তাই।
মূর্খ, তোমার আমার হাতে সত্য নাই।
সত্যের প্রতিমা সত্য নহে, কথা সত্য—
নহে, লিপি সত্য নহে, মূর্তি সত্য নহে—
চিন্তা সত্য নহে। সত্য কোথা আছে—কেহ
নাহি জানে তারে, কেহ নাহি পায় তারে।
সেই সত্য কোটি মিথ্যারূপে চারিদিকে
ফাটিয়া পড়িছে; সত্য তাই নাম ধরে
মহামায়া, অর্থ তার 'মহামিথ্যা'। সত্য
মহারাজ বসে থাকে রাজ অন্তঃপুরে—
শত মিথ্যা প্রতিনিধি তার, চতুর্দিকে
মরে খেটে খেটে। —৩।১

অপরিসীম বুদ্ধিমান এবং ভাষাপটু রঘুপতি তার যে কোনো বক্তব্যকেই একটা তত্ত্বে পরিণত করতে পারতেন। বিতর্কে তাঁর এই সাফল্যই অন্যায় কর্মে তাঁকে বেশী করে প্ররোচিত করেছে। ভাষা কুশলী হওয়ার সাফল্যে তিনি ষড়যন্ত্র কুশলীও হতে পারবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু সেখানেই ঘটেছিল তাঁর ব্যর্থতা।

হয়েছেন, তা তাঁকে এইভাবে নীচতার আশ্রয় নিতে বাধ্য করবেই। এই জন্যই তিনি জয়সিংহকে আজ এ কথা বলতে পারছেন যে,—

কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ !
এ জগৎ মহা হত্যাশালা।
... ...
রক্তের অক্ষরে
অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল
বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।
হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে.
হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে,
অগাধ সাগর জলে, নির্মল আকাশে,
হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে,
হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে—
চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে
উর্ধ্বশ্বাসে প্রাণপণে, ব্যাঘ্রের আক্রমে
মৃগসম, মুহূর্ত দাঁড়াতে নাহি পারে।
মহাকালী কাল স্বরূপিণী, রয়েছেন
দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি—
বিশ্বের চৌদিকে বেয়ে চিররক্ত ধারা
ফেটে পড়িতেছে, নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হতে
রসের মতন, অনন্ত খর্পরে তাঁর —২।১

অর্থাৎ ভ্রাতৃহত্যা পাপ নয়। বিশেষতঃ "দেবতার আজ্ঞা পাপ নহে"—(রঘুপতির উক্তি ২।১)।

রাজরক্ত সত্যই দেবী চান,—রঘুপতির এই কথাকে অতঃপর সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করে নিল জয়সিংহ, এবং রঘুপতির কাছে প্রতিশ্রুতি দিল, "রাজরক্ত চায় তবে মহামায়া, সে রক্ত আনিব আমি। দিব না ঘটিতে ভ্রাতৃহত্যা —২।১। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে প্রকাশিত হয়েছে এই প্রতিশ্রুতি বহনকারী জয়সিংহের নিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই অমানবিক প্রতিশ্রুতিকে পালন করতে তার মন সায় দিচ্ছে না, অথচ কথা দেওয়ার সত্যরক্ষা তাকে করতে হবে। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব রঘুপতির সম্মুখেও অনিবার্যভাবে প্রকাশিত হয়ে

পড়ে, তারপরেই অবশ্য সে ছুরি দেখিয়ে গুরুকে আশ্বস্ত করে : "এই দেখো—
তোমার আদেশস্মৃতি অন্তরে বাহিরে হতেছে শাণিত।"

দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে মন্দিরপ্রাঙ্গণে মহারাজকে একাকী অবস্থায় পেয়ে যায় জয়সিংহ। এই হচ্ছে মহারাজকে হত্যা করার একমাত্র অবসর। কিন্তু তার পূর্বে চূড়ান্ত প্রমাণ চাই, সত্যই দেবী রাজরক্ত চান কি না। তাই জয়সিংহ দেবীকে জিজ্ঞাসা করে—

"বল্ চণ্ডী, সত্যই কি রাজরক্ত চাই ?
এই বেলা বল্, বল্ নিজমুখে বল্
মানব ভাষায়, বল্ শীঘ্র—সত্যই কি
রাজরক্ত চাই ?"

অন্তরাল থেকে রঘুপতি উত্তর দিলেন 'চাই।' জয়সিংহ ভাবল দেবীই উত্তর দিলেন, সুতরাং এখন তাকে রাজরক্তপাতে প্রস্তুত হতে হবে। গোবিন্দমাণিক্য তাকে বুঝিয়েছিলেন যে, কণ্ঠস্বর রঘুপতির, দেবীর নয়। কিন্তু "নহে নহে, আর নহে! কেবলই সংশয় হতে সংশয়ের মাঝে" জয়সিংহ আর নামতে পারে না। তার কাছে এখন "গুরু হোক কিম্বা দেবী হোক, একই কথা।"—

কিন্তু প্রকৃত ঘটনায় জয়সিংহ গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা করতে পারল না। মানবিকতাবোধ তাকে নিরস্ত করল। কিন্তু নীচাশয় রঘুপতি তাকে মুক্তি দিলেন না, বরং দেবীর চরণ ছুঁইয়ে তাকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিলেন, "আমি এনে দিব রাজরক্ত শ্রাবণের শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।" —২।৪

নিজের দর্প এবং অহমিকাকে অক্ষত রাখার জন্য যে আত্মক্ষয়ী দ্যূতক্রীড়ায় মত্ত হয়েছেন রঘুপতি, তাতে এইভাবেই তাঁকে একটি একটি করে তাঁর ধর্ম, ন্যায়, নীতি, জীবনের গভীর মূল্যবোধ, সত্যবাদিতা প্রভৃতি সবকিছুকে ক্রমশঃ হারাতে হচ্ছে। বাইরের পরিস্থিতি তাঁর পক্ষে যতই প্রতিকূল হয়ে উঠছে, ততই তিনি হারাচ্ছেন, জীবনের সম্পদ। অহমিকাকে অক্ষত রাখতে গিয়ে ক্ষয় করছেন নিজেকে।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রঘুপতি নক্ষত্র রায়ের দ্বারা গোবিন্দমাণিক্যের হত্যার যে ষড়যন্ত্র করেছিলেন, তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেল। গোবিন্দমাণিক্যের বিনম্র-সুন্দর মহৎ ব্যক্তিত্বের সম্মুখে নক্ষত্র রায় স্বীকার করল ষড়যন্ত্রের কথা এবং পরিত্যাগ করল ভ্রাতৃহত্যার প্ররোচনা।

কিন্তু পরবর্তী দৃশ্যেই—৩।৩ দেখি রঘুপতির বাসনা অন্যভাবে কার্যকরী হতে চলেছে। সন্তান হীনা রাজমহিষী গুণবতীর সন্তানাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য রঘুপতি গুণবতীর নামেই পূজা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—১।১ প্রত্যাশায় পুলকিত-চিত্ত গুণবতী তখন বলেছিলেন, সে পূজায় বলির পশু তিনি নিজে দেবেন, এবং সন্তান লাভ করতে পারলে প্রতিবছর দেবেন "একশো মহিষ এবং তিনশত ছাগ।" অকস্মাৎ বলি নিষেধ করে রাজার আদেশ জারি হওয়ায় গুণবতীর পূজা অ-নিবেদিত রয়ে গেল, কিন্তু তিনি এখনও আশা ক'রে আছেন যে, তিনি কোনো প্রকারে রাজাকে দুর্বল ক'রে দেবীর কাছে সন্তান-আশায় পূজা নিবেদন করবেনই। কিন্তু তার আগেই যে পালিত পুত্র ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠে রাজ-মুকুটের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই রকম অবস্থায় তাঁর নিজের সন্তানের স্থান হবে কোথায়? ধ্রুবকে লক্ষ্য করে তাঁর এই দুশ্চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে—

> না আসিতে আমার বাছারা, তাহাদের
> পিতৃস্নেহ 'পরে তুই বসাইলি ভাগ!
> রাজ হৃদয়ের সুধাপাত্র হ'তে তুই
> নিলি প্রথম অঞ্জলি—রাজপুত্র এসে
> তোরই কি প্রসাদ পাবে ওরে রাজদ্রোহী! —৩।৩

সুতরাং গুণবতীর নিজের সন্তানের স্থান যাতে ধ্রুব না গ্রহণ করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে ধ্রুবকে পৃথিবী থেকে তাঁর সরিয়ে দেওয়া দরকার। উদ্দেশ্যটি তিনি স্বল্পবুদ্ধি নক্ষত্র রায়কে বুঝিয়েছিলেন। নক্ষত্র রায় বুঝে ফেললেন। তখন গুণবতী বললেন, "তবে যাও, যা বলিনু করো। মনে রেখো, মোর নামে কোরো নিবেদন।"—৩।৩। রাজার নিষেধের ফলে সন্তান কামনায় দেবীর কাছে গুণবতীর নামে যে বলি অ-নিবেদিত হয়ে আছে, তা গুণবতী এইভাবে নিবেদন করার চক্রান্ত করলেন। এবং এইভাবেই চরিতার্থ হতে চলল রঘুপতির বাসনা,—মন্দিরের প্রথাকে অক্ষুন্ন রাখার মধ্য-দিয়ে নিজের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখা।

তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে দেবীর মন্দিরে ধ্রুবকে বলি দেওয়ার আয়োজন। রঘুপতি যে কী করুণভাবে নিজের মনের সমস্ত সুকুমার বৃত্তিকে স্বহস্তে ধ্বংস

করে নিজেকে নিঃশেষিত করছেন তার দৃষ্টান্ত এই দৃশ্যে রঘুপতির একটি উক্তি। নিদ্রিত শিশু ধ্রুবকে দেখে তাঁর মনে শিশু জয়সিংহের স্মৃতি জাগছে—

"জয়সিংহ
এসেছিল মোর কোলে অমনি শৈশবে
পিতৃমাতৃহীন। সেদিন অমনি করে
কেঁদেছিল নূতন দেখিয়া চারিদিক,
হতাশ্বাস শ্রান্ত শোকে অমনি করিয়া
ঘুমায়ে পড়িয়াছিল সন্ধ্যা হয়ে গেলে
ওইখানে দেবীর চরণে! ওরে দেখে
তার সেই শিশুমুখ শিশুর ক্রন্দন
মনে পড়ে।" —৩।৫

নিদ্রিত শিশু ধ্রুবকে দেখে পালিত পুত্র জয়সিংহের শিশুকালের স্মৃতি তাঁর মনে উদিত হওয়ায়, নিশ্চয়ই তাঁর চিত্তে করুণার সঞ্চার হয়েছিল, নিগূঢ় বাৎসল্য নিশ্চয়ই তাঁর চিত্তে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, তাকে বাঁচিয়ে রাখার আকুলতাও নিশ্চয়ই জেগেছিল তাঁর চিত্তে। কিন্তু এই সমস্ত সুকুমারবৃত্তিকে তিনি দমন করলেন, কেবল তাঁর মর্যাদার সঙ্গে সংযুক্ত করে রাখা মন্দিরের প্রথাকে রক্ষা করার জন্য। এটা রঘুপতির পক্ষে মর্মান্তিক আত্মপীড়ন,—অসহ্য পরীক্ষা। কিন্তু রঘুপতি সেই আত্মপীড়নকে সহ্য করেও এই অসহ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চাইছেন। এক অপ্রত্যাশিত নিরানন্দ তাঁর চিত্তকে ভারাক্রান্ত করেছে—তিনি 'কারণ সলিল' পান করে কাটাতে চেষ্টা করেছেন সেই নিরানন্দকে। ট্র্যাজেডির দ্বন্দ্ব অপূর্ব সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে এখানে!

দুর্বল মনের মধ্যে সাহস সঞ্চয় করবার জন্য এখন তিনি বলছেন—

"মনোভাব যতক্ষণ
মনে থাকে, ততক্ষণ দেখায় বৃহৎ—
কার্যকালে ছোট হয়ে আসে, বহু বাষ্প
গলে গিয়ে এক বিন্দু জল। কিছুই না,
শুধু মুহূর্তের কাজ। শুধু শীর্ণ শিখা
প্রদীপ নিবাতে যতক্ষণ। ঘুম হতে
চকিতে মিলায়ে যাবে গাঢ়তর ঘুমে
ওই প্রাণ রেখাটুকু—শ্রাবণ নিশীথে

বিজুলি ঝলক-সম, শুধু বজ্রতার
চিরদিন বিঁধে রবে রাজদণ্ড মাঝে।
এস এস যুবরাজ, ম্লান হয়ে কেন
বসে আছ এক পাশে—মুখে কথা নেই,
হাসি নেই,—নির্বাপিত প্রায়! এস পান
করি আনন্দ-সলিল।" —৩।৫

এইভাবে প্রাণপণ প্রচেষ্টায় নিজ স্বভাবের বিরুদ্ধে তাঁর কৃত্রিম কর্তব্যের পথে তিনি অটল থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর অদৃষ্টের পরিহাস, এত করেও তিনি সফল হলেন না। ধ্রুবকে বলি দেওয়ার জন্য খড়্গ উত্তোলনের মুহূর্তেই তিনি গোবিন্দমাণিক্যের কাছে ধরা পড়ে গেলেন, সাধারণ বন্দীর মতো রাজ প্রহরীর হাতে ধৃত হলেন।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে গোবিন্দমাণিক্যের বিচার সভায় অপরাধ স্বীকার করলেন রঘুপতি, কিন্তু ভেঙ্গে পড়লেন না। এখনও তিনি সদম্ভে নিষ্প্রভ করে রাখতে চান গোবিন্দমাণিক্যের রাজদর্পকে, স্বীকার করতে চান না যে, তিনি পরাজিত এবং গোবিন্দমাণিক্য তাঁর বিচার করছেন। বরং একথাই তিনি বলতে চান যে, গোবিন্দমাণিক্যকে উপলক্ষ্য দেবতাই শাস্তি দিচ্ছেন, অর্থাৎ এরজন্য গোবিন্দমাণিক্যের উল্লসিত হওয়ার কোনো কারণ নেই,—

অপরাধ করিয়াছি বটে। দেবীপূজা
করিতে পারিনি শেষ—মোহে মূঢ় হয়ে
বিলম্ব করেছি অকারণে। তার শাস্তি
দিতেছেন দেবী, তুমি উপলক্ষ শুধু। —৪।১

মনের দিক থেকে রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যের কাছে নিজের বন্দীত্বকে অস্বীকার করলেও, বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি গোবিন্দমাণিক্যেরই বন্দী। সুতরাং এখন তাঁর কিছু প্রার্থনা থাকলে, তা গোবিন্দমাণিক্যকেই জানাতে হবে, এবং গোবিন্দমাণিক্যই মঞ্জুর করবেন সেই প্রার্থনা। এটা রঘুপতির পক্ষে নিদারুণ লাঞ্ছনা হলেও, এটাকে এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই রঘুপতির। যে রাজ-মহিমাকে তিনি কিছুতেই স্বীকার করতে চান না, অদৃষ্টের পরিহাসে কার্যক্ষেত্রে সেই রাজমহিমার কাছেই তাঁকে নতজানু হ'তে হচ্ছে। এই অপরিসীম গ্লানি এবং অপমান তাঁকে সহ্য করতে হচ্ছে কেবল স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির শেষ চেষ্টার

জন্য। লজ্জায়, ঘৃণায় এবং ক্ষোভে তাঁর চিত্ত যেন ফেটে পড়ছে যখন তিনি গোবিন্দমাণিক্যের কাছে বলছেন,—

"দেবী ছাড়া এ জগতে
এজানু হয় নি নত আর কারো কাছে।
আমি বিপ্র, তুমি শূদ্র, তবু জোড় করে
নতজানু, আজ আমি প্রার্থনা করিব
তোমা কাছে—দুইদিন দাও অবসর
শ্রাবণের শেষ দুইদিন। তার পরে
শরতের প্রথম প্রত্যূষে—চলে যাব
তোমার এ অভিশপ্ত দগ্ধ রাজ্য ছেড়ে,
আর ফিরাব না মুখ।" —৪।১

মহারাজ 'দুইদিন' অবসর মঞ্জুর করলে রঘুপতি অত্যন্ত দীন, অভাজন প্রজার মতো মহারাজের তোষামোদ আরম্ভ করলেন অকস্মাৎ। মহারাজ কর্তৃক তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর হওয়াতেই হয়ত অকস্মাৎ রাজার নিকটে ক্ষুদ্রত্বকে তিনি আবিষ্কার করে ফেলেন। এবং সেই ক্ষুদ্রত্ববোধই বোধ হয় তাঁর অবচেতন অথবা হতচেতন অবস্থায় এইভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে—

মহারাজ! রাজ অধিরাজ!
মহিমা সাগর তুমি কৃপা-অবতার!
ধূলির অধম আমি, দীন অভাজন! —৪।১

চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় যে, রাজদ্বারে ভিক্ষা মেগে, দু'দিনের অবসর লাভ করায় রঘুপতি নিজের সমস্ত দীপ্তি ও শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছেন। এমন কি জয়সিংহের কাছেও আর পূর্বের মতো তেজোদৃপ্ত ভঙ্গিতে নিজের কথা বলতে পারছেন না। তাঁর পরাজিত, ভগ্নদশাপ্রাপ্ত এই জীবন জয়সিংহের কাছেও তাই অনুনয় করছে—

"গেছে গর্ব, গেছে তেজ, গেছে ব্রাহ্মণত্ব।
ওরে বৎস আমি তোর গুরু নহি আর।
কাল আমি অসংশয়ে করেছি আদেশ
গুরুর গৌরবে, আজ শুধু সানুনয়ে
ভিক্ষা মাগিবার মোর আছে অধিকার।
অন্তরেতে সে দীপ্তি নিভেছে, যার বলে

তুচ্ছ করিতাম আমি ঐশ্বর্যের জ্যোতি,
রাজার প্রতাপ। নক্ষত্র পড়িলে খসি
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর মাটির প্রদীপ।
তাহারে খুঁজিয়া ফিরে পরিহাস-ভরে
খদ্যোত ধূলির মাঝে, খুঁজিয়া না পায়।
দীপ প্রতিদিন নেভে প্রতিদিন জ্বলে—
বারেক নিভিলে তারা চির অন্ধকার।
আমি সেই চির দীপ্তি হীন; সামান্য এ
পরমায়ু, দেবতার অতি ক্ষুদ্র দান,
ভিক্ষা মেগে লইয়াছি, তারি দুটো দিন
রাজদ্বারে নতজানু হয়ে। জয়সিংহ,
সেই দুইদিন যেন ব্যর্থ নাহি হয়।" —৪।২

এই দুই দিনই এখন রঘুপতির শেষ অবলম্বন। জীবরক্তপাত ঘটিয়ে রাজার মহিমাকে খর্ব করার এই তাঁর শেষ সুযোগ। তাঁর এখন আর মানসিক শক্তি তেমন প্রবল নয় যে, এই শেষ দু'টি দিনের সুযোগের নিশ্চিন্ত সদ্ব্যবহার করার জন্য নতুন করে কোনো ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত করতে পারেন, বা এই পাশবিক কার্যে ভাষাকুশলতার দ্বারা কাউকে প্ররোচিত করতে পারেন। তাই অগত্যা তাঁকে নির্ভর করতে হচ্ছে জয়সিংহের উপরই,—যে জয়সিংহ আবেগ-প্রবণ, পিতৃ-দুঃখকাতর, এবং বাক্‌নিষ্ঠ। তার ভাবপ্রবণতাকে ঈষৎ পরিমাণে নাড়া দিলেই তাকে দিয়ে কার্যোদ্ধার চলে। তাই প্রকৃত ক্ষেত্রেও রঘুপতি তাকে বললেন—

"নহি কিরে আমি তোর পিতার অধিক
পিতৃবিহীনের পিতা বলে? এই দুঃখ,
এত ক'রে স্মরণ করাতে হ'ল! কৃপা
ভিক্ষা সহ্য হয়, ভালোবাসা ভিক্ষা করে
যে অভাগ্য, ভিক্ষুকের অধম ভিক্ষুক
সে যে। বৎস? তবু নিরুত্তর? জানু তবে
আরবার নত হোক। কোলে এসেছিল
যবে, ছিল এতটুকু, এ জানুর চেয়ে
ছোটো—তার কাছে নত হোক জানু। পুত্র,
ভিক্ষা চাই আমি।" —৪।২

জয়সিংহের স্বভাব অনুসারে এর পরে আর তার পক্ষে নিরুত্তর থাকা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে দেবীর চরণ স্পর্শ ক'রে যে রাজরক্ত আনার প্রতিশ্রুতি সে রঘুপতিকে দিয়েছে, এখন রঘুপতির এই কাতর এবং মর্মন্তুদ উক্তির পর সেই রাজরক্ত, জয়সিংহ যে-ভাবেই পারুক, এনে দিতে পুনরায় অঙ্গীকৃত হ'ল। অদৃষ্টের পরিহাস বা ট্র্যাজেডি এই যে, রঘুপতি জানলেন না, তিনি কিসের অঙ্গীকার করালেন জয়সিংহকে। ট্র্যাজেডির শনি যাঁর জীবনে একবার প্রবেশাধিকার পায়, তিনি সর্বনাশকে এইভাবেই নিজের হাতে ডেকে আনেন।

পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ঝড়ের রাত্রির ভয়াবহতার মধ্যে রঘুপতি নৈরাশ্যের মরুভূমিতে কল্পনার মরুদ্যান প্রাপ্তির মতো জাগ্রত দেবতাকে যেন প্রত্যক্ষ করলেন—

"এতদিনে আজ বুঝি জাগিয়াছে দেবী!
ওই রোষ হুহুংকার! অভিশাপ হাঁকি
নগরের 'পর দিয়া ধেয়ে চলিয়াছ
তিমির রূপিণী!—ওই বুঝি তোর
প্রলয় সঙ্গিনীগণ দারুণ ক্ষুধায়
প্রাণপণে নাড়া দেয় বিশ্ব মহাতরু।
আজ মিটাইব তোর দীর্ঘ উপবাস।
ভক্তেরে সংশয়ে ফেলি এতদিন ছিলি
কোথা দেবী? তোর খড়্গ তুই না তুলিলে
আমরা কি পারি? আজ কী আনন্দ তোর
চণ্ডীমূর্তি দেখে! সাহসে ভরেছে চিত্ত,
সংশয় গিয়েছে, হতমান নতশির
উঠেছে নূতন তেজে।" —৫।১

রাজদ্বারে জানুপেতে ভিক্ষা মেগে দু'দিনের অবসর যে চেয়ে নিয়েছিলেন রঘুপতি, সেই দু'দিনের এমন সুন্দর সদ্ব্যবহারের আশায় তাঁর চিত্তের সমস্ত গ্লানি এবং অপমান দূর হয়ে গেল। আজকে তিনি নিশ্চিত যে, জয়সিংহ রাজরক্ত আনবেই। রাজরক্ত আনার যে সত্যকে সে অঙ্গীকার করেছে, সেই "সত্যভঙ্গ কভু নাহি হবে তার।" কিন্তু অন্যদিক থেকে একটু আশঙ্কা তাঁর আছে। কারণ জয়সিংহ "যদি বাধা পায়—যদি ধরা পড়ে শেষে—যদি প্রাণ

যায় তার প্রহরীর হাতে!" তাহ'লে তো সবই ব্যর্থ,—এই ভিক্ষালব্ধ দুটি দিনের সুযোগও নষ্ট। তাই তিনি দেবতার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেন—

"জয়মা জাগ্রত দেবী, জয় সর্বজয়া!
ভক্ত বৎসলার যেন দুর্নাম না রটে
এ-সংসারে, শত্রু পক্ষ নাহি হাসে যেন
নিঃশঙ্ক কৌতুকে।" —৫।১

অবশেষে মন্দিরে জয়সিংহ এল। ব্যাকুলভাবে রঘুপতি জিজ্ঞাসা করেন, "রাজরক্ত কই?" জয়সিংহ বলল, "আছে আছে। ছাড়ো মোরে নিজে আমি করি নিবেদন।"—এই বলে দেবীর রাজরক্তের পিপাসা চিরতরে মিটাবার প্রার্থনা নিয়ে বুকে ছুরি বিঁধিয়ে আত্মবিসর্জন করল। যে রাজরক্ত আনয়ন করার জন্য রঘুপতি দু'বার জয়সিংহকে দিয়ে শপথ করিয়েছেন, সেই রাজরক্ত এইভাবে দেবীর কাছে সমর্পণ ক'রে জয়সিংহ তার সত্যকে রক্ষা করল, পিতৃভক্তির প্রমাণ দিল এবং পালক পিতার কাছে অনাথ শিশুর ঋণ শোধ করল।

কিন্তু এইভাবে যে জয়সিংহ রঘুপতির প্রত্যাশাকে পূর্ণ করবে, এটা ছিল রঘুপতির অভাবিত। যদিও জয়সিংহকে রাজরক্ত আনয়নের কাজে নিযুক্ত করার সময় জয়সিংহের বিপদাশঙ্কায় রঘুপতির প্রাণ কেঁদে উঠেছিল ("সত্য ক'রে বলি, বৎস, তবে। তোরে আমি ভালবাসি প্রাণের অধিক—পালিয়াছি শিশুকাল হতে তোরে, মায়ের অধিক স্নেহে—তোরে আমি নারিব হারাতে।"—২।১) কিন্তু সেই বিপদাশঙ্কা ছিল নরহত্যাজনিত পাপের। রঘুপতি তখন যদিও দেবীর রাজরক্তের তৃষ্ণা মিটাবার জন্য নরহত্যাকে দেবতার আদেশ ব'লে প্রচার করেছেন, এবং বলেছেন, "দেবতার আজ্ঞা পাপ নহে," তবু তিনি নিজের মনের মধ্যে জানতেন, এ আদেশ দেবতার নয়। এ আদেশ তাঁর নিজের। সুতরাং রাজরক্ত আনয়নের জন্য এই নরহত্যায় পাপ থাকতেই পারে। এবং সেই পাপের জন্য কোনো অমঙ্গল হত্যাকারীকে লাগতেই পারে। এই হত্যাকারী যদি জয়সিংহ হয়, তবে নরহত্যার পাপে তার ক্ষতির আশঙ্কা। জয়সিংহের এই ক্ষতির আশঙ্কাতেই রঘুপতি তখন ছিলেন বিচলিত। তাছাড়া নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নীচতার আশ্রয় গ্রহণকারী রঘুপতির সংকীর্ণ দৃষ্টিতে এটা তখন স্পষ্ট না হয়ে ওঠারই কথা যে

তার কুটিল চক্রান্তে প'ড়ে জয়সিংহ কী গভীর যন্ত্রণায় কত মর্মন্তুদ ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, যা রঘুপতির চিত্তের নিপীড়ন-ক্লিষ্ট সুকুমারবৃত্তির পক্ষেও অসহনীয়। তাই তিনি নিজের ভ্রমেই জয়সিংহকে সুস্পষ্টভাবে নরহত্যার কর্তব্য থেকে মুক্ত রাখতে পারেন নি, বরং একরোখা অহংকার অভিমানের বশে নিজের চিত্তের সুকুমারবৃত্তির অজ্ঞাতে জয়সিংহকে অত্যন্ত তীব্রভাবে প্ররোচিত করেছেন এই দুষ্কর্মে। এখন জয়সিংহের আত্মহত্যায় তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর মহাভুল, কিন্তু যখন তা স্পষ্ট হয়ে উঠল, তখন তাঁর সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে গেছে, ভুল সংশোধন ক'রে সর্বনাশের হাত থেকে জীবনের যা কিছু প্রিয়, তার এক তিলকেও আর রক্ষা করা সম্ভব নয়,—এইটাই ট্র্যাজেডি। জয়সিংহের আত্মহত্যা রঘুপতির কাছে স্পষ্ট করে দিল, কি ভাবে তিনি তিলে তিলে জীবনের সম্পদকে নষ্ট করতে করতে জয়সিংহ-বিহীন জগতের এই ভয়াবহ শূন্যতার মধ্যে গিয়ে পড়লেন। জয়সিংহের-আত্মহত্যার পর রঘুপতির করুণ আর্তনাদের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর জীবনের এই ট্র্যাজেডি—

> "ওরে জয়সিংহ, মোর একমাত্র প্রাণ,
> প্রাণাধিক জীবন মন্থন করা ধন!
> জয়সিংহ, বৎস মোর, হে গুরুবৎসল!
> ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর
> কিছু নাহি চাহি! অহংকার অভিমান
> দেবতা ব্রাহ্মণ সব থাক্! তুই আয়!" —৫।১

এবং এরপরে দেবতার পদতলে মাথা রেখে জয়সিংহকে ফিরে পাবার জন্য তাঁর ব্যাকুল এবং ব্যর্থ ক্রন্দন—

> "ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে!" —৫।১

এর মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডি।

পঞ্চম অঙ্কের[৯] চতুর্থ দৃশ্যে বা নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখা যায়, রঘুপতি দেবীর অস্তিত্বের মুখর সমালোচক। জয়সিংহের মৃত্যু দেবতা সম্পর্কিত তাঁর আজীবন

৯. প্রকৃত পক্ষে—৫।১ (পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য) দৃশ্যেই নাটকের যথার্থ সমাপ্তি হওয়া উচিত ছিল। এবং এর পরেও কাহিনীকে টেনে নিয়ে যাওয়ায় ট্র্যাজেডির উপলব্ধি বিঘ্নিত হয়।

লক্ষিত বিশ্বাসকে ভেঙে দিয়েছে। তাই দেবতার প্রতি উদ্দিষ্ট ভাষায় তাঁর ভক্তি নেই, রয়েছে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ—

"দেখো, দেখো, কী করে দাঁড়ায়ে আছে, জড়
পাষাণের স্তূপ, মূঢ় নির্বোধের মতো!
মূক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির! তোরই কাছে
সমস্ত ব্যথিত বিশ্ব কাঁদিয়া মরিছে!
... ...
দে ফিরায়ে জয়সিংহে মোর! দে ফিরায়ে!
দে ফিরায়ে রাক্ষসী পিশাচী! —৫।৪

যে দেবতার প্রতি এরূপ শাণিত বিদ্রূপ নিক্ষেপ, সেই দেবতার কাছেই জয়সিংহকে ফিরে পাবার জন্য অবুঝ মনের কাতর প্রার্থনা জানাতে জানাতে হঠাৎ রঘুপতি যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন—

"কার কাছে কাঁদিতেছি!
তবে দূর, দূর, দূর, দূর করে দাও
হৃদয়-দলনী পাষাণীরে! লঘু হোক
জগতের বক্ষ!" —৫।৪

এই কথা বলতে বলতে তিনি গোমতীর জলে নিক্ষেপ করলেন, দেবীর প্রতিমাকে, বিসর্জন দিলেন দেবতা সম্পর্কে সযত্নলালিত মনের মোহকে, যে মোহ আজ তাঁকে এক সর্বনাশের মধ্যে এনে ফেলেছে।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এর পরেও রঘুপতিকে উদ্ধার করেছেন। জয়সিংহের মৃত্যুর পর রঘুপতি যে মহাশূন্যতার মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন এক পরম পূর্ণতার মধ্যে অপর্ণার মাধ্যমে। অপর্ণা ট্র্যাজেডির বিপর্যয়ক্লিষ্ট রঘুপতিকে এসে 'পিতা' নামে সম্বোধন করল। রঘুপতি এই সম্বোধনের মধ্যেই খুঁজে পেলেন আবার জীবনের সন্ধান। বললেন—

"মা জননী, এ পুত্রঘাতীরে পিতা ব'লে
যে জন ডাকিত, সেই রেখে গেছে ওই
সুধা মাখা নাম তোর কণ্ঠে, এইটুকু
দয়া করে গেছে! আহা, ডাক্ আরবার!" —৫।৪

অপর্ণা রঘুপতিকে মন্দির ছেড়ে চলে আসার আহ্বান জানাল। যে

মন্দিরের মধ্যে হিংসার ধর্ম পালিত, যে হিংসার ধর্ম পালন করতে গিয়ে রঘুপতির এতবড়ো বিপর্যয়, সেই মন্দির থেকে মুক্তির আহ্বান জানাল অপর্ণা, —এবং রঘুপতি লাভ করলেন নবজীবনের স্বাদ।

রবীন্দ্রনাথ প্রথাধর্মের উপর মানব ধর্মের জয়কে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই এইভাবে শেষকালে অপর্ণাকে দিয়ে রঘুপতিকে উদ্ধার করেছেন! রঘুপতির জীবনের কেবল মাত্র ট্র্যাজেডিটুকু দেখানো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না,—ট্র্যাজেডির মধ্যদিয়ে মানুষ পরম সত্যকে কি ভাবে পায়, তা দেখানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য, এবং সেইখানেই রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার বিশিষ্টতা আমরা লক্ষ্য করি

রঘুপতির জীবনের কেবল ট্র্যাজেডিটুকু দেখানো যদি কবির উদ্দেশ্য হ'ত, তবে নাটকের পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য পর্যন্ত পরিসরই যথেষ্ট ছিল। কারণ ঐখানেই রঘুপতির জীবনের ট্র্যাজেডি যথার্থ পরিণতি পেয়েছে। রঘুপতি যে প্রকৃতই একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি, তা আমরা আগাগোড়াই লক্ষ্য করতে পারি। তাঁর চিত্তে মানুষের সুন্দর কোমল গুণগুলি সবই ছিল মনে হয়। অন্ততঃ বেশ কয়েকবার জয়সিংহের প্রতি তাঁর অপরিসীম স্নেহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে (যেমন ১।৩,—বলি নিষেধ ঘোষিত হবার প্রথম প্রতিক্রিয়ায় জয়সিংহের প্রতি রঘুপতির অনর্থক রূঢ় আচরণের পর; ২।১—রাজরক্ত আনয়নে যদি জয়সিংহের পাপ হয়, রঘুপতির সেই উদ্বেগ ২।৩—রঘুপতি অপর্ণাকে মন্দির থেকে বিতাড়িত করে দেওয়ার পর জয়সিংহের মনোব্যথা উপলব্ধি করে তার প্রতি রঘুপতির স্নেহ সম্ভাষণ; ৫।১—জয়সিংহের প্রতিশ্রুত রাজরক্ত আনয়নে বিলম্ব দেখে জয়সিংহের বিপদাশঙ্কায় দেবতার কাছে প্রার্থনা এবং জয়সিংহের আত্মহত্যার পর জয়সিংহের জন্য কাতর ক্রন্দন), তাছাড়া চারিত্রিক দৃঢ়তাও ছিল তাঁর অসামান্য, বুদ্ধিও ছিল অত্যন্ত প্রখর।[১০] সবদিক থেকেই তিনি ছিলেন একজন উঁচুদরের মানুষ। কিন্তু এই সমস্ত গুণকেই তিনি অপচয়িত করলেন এক ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ্য অহমিকাকে চরিতার্থ করবার জন্য। তাঁর ট্র্যাজেডির মূল সূত্র এখানেই যে, তিনি জানেন না যে, তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে আত্মক্ষয় করছেন—জীবনের

১০. 'রাজা ও রানী' আলোচনায় ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় ট্র্যাজেডির নায়কের যে 'খানিকটা মানসিক ঔদার্য ও শ্রেষ্ঠত্ব' থাকার আবশ্যিকতার কথা বলেছেন, তা আমরা রঘুপতির চরিত্রে স্পষ্টই দেখতে পাই।

দ্রঃ রবীন্দ্রনাথঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, (৪র্থ সং) পৃ. ২১০।

ব্রাহ্মণ্য মর্যাদার সব সঞ্চয়কে সুরক্ষিত করতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে জীবনের সমস্ত প্রিয় সম্পদেরই অপচয় করছেন। জানলেন পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে,—তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়, বাৎসল্যের আধার জয়সিংহকে হারাবার পর। তখনই তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডি তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের সমালোচনাতেও আমাদের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। ডঃ রায় বলেছেন, রঘুপতির "ট্র্যাজেডির বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে জয়সিংহের আত্মদানের পরমুহূর্ত হইতে। সে মুহূর্তের পূর্ব পর্যন্তও রঘুপতির একটা ঐশ্বর্য ছিল, একটা প্রকাণ্ড সুবৃহৎ গর্ব ছিল, তাহা তাহার বুদ্ধির অহংকার, যুক্তির অহংকার, বিশ্বাসের অহংকার, ক্ষমতার অহংকার; এই অহংকারই তাহার সমস্ত সত্তাটাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু জয়সিংহ যে মুহূর্তে তাহার অহংকারের নিষ্ঠুর বেদীমূলে আত্মবিসর্জন করিল সেই মুহূর্তেই তাহার সকল অহংকার চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল, সমস্ত ঐশ্বর্য তাহার খসিয়া পড়িল, একটা বিরাট শূন্যতার মধ্যে সে 'গৃহচ্যুত হতজ্যোতি' তারকার মতন কোথায় যে গিয়া পড়িল তাহার ঠিকানা নাই। রঘুপতির এই যে একান্ত রিক্ততা, ইহাই নাটকের করুণতম ও চরমতম ট্র্যাজেডি; এই ট্র্যাজেডিটুকুর বিকাশ না হইলে রঘুপতির চরিত্রের শেষ পরিচয় কিছুতেই আমরা পাই না।"[১১] রঘুপতি-চরিত্রের সেই শেষ পরিচয় রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন অপর্ণার আহ্বানে রঘুপতি কর্তৃক মন্দির ত্যাগের ঘটনায়। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, রঘুপতির ট্র্যাজেডি রঘুপতির জীবনে পূর্ণতার সন্ধান এনে দিয়েছে।

'বিসর্জন' নাটকে জয়সিংহের ট্র্যাজেডিও সমানভাবে উল্লেখযোগ্য।

জয়সিংহ আবেগ-অনুভূতি-প্রবণ, পরদুঃখ কাতর, উদার হৃদয়, যথার্থ-প্রেমিক এবং সত্যবাক্ ও কর্তব্যনিষ্ঠ। এই সব গুণ তাঁর চিত্তে একত্র সমাবিষ্ট হওয়ায় রঘুপতি সহজেই নিজের ব্রাহ্মণ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁকে নিয়োজিত করতে পেরেছেন, তাঁর মহৎ গুণাবলীকে হীন উদ্দেশ্যে অপব্যয়িত করতে প্ররোচিত করেছেন এবং তারই পরিণামে জয়সিংহ রঘুপতির হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থতার ষড়যন্ত্রের বলি হিসেবে নিজের অমূল্য প্রাণকে পর্যন্ত বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছেন। জীবনে শান্তির এছাড়া আর কোনো পথ তাঁর খোলা ছিল না। রঘুপতির ষড়যন্ত্রকে তিনি হীন বিবেচনা করেছেন, কিন্তু সেই ষড়যন্ত্র থেকে তিনি মুক্তি নিতে পারেননি নিজেরই বিশিষ্ট মনোভাবের

১১. রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা (২য়): ডঃ নীহাররঞ্জন রায় (১৩৫৩), পৃ. ৫৫।

জন্য। এই দ্বন্দ্বের হাত থেকে মুক্তির পথ তিনি একমাত্র খুঁজে পেলেন মৃত্যুর মধ্যে, এবং তাকেই আশ্রয় করলেন শেষ পর্যন্ত। জীবনের সবগুলি মহৎ গুণ যদি একত্র সমাবিষ্ট হয়, এবং একসঙ্গে সক্রিয় হয়ে ওঠে, তবে জীবনের পরিণতি এই রকমই বিষণ্ণ ভয়ানক হয়ে ওঠে, এবং তা আমাদের কাছে একটা যথার্থ ট্র্যাজেডির আস্বাদ এনে দেয়।

জয়সিংহের জীবনের এই ট্র্যাজেডি সুস্পষ্টতঃ কয়েকটি স্তরের মধ্যদিয়ে সংঘটিত হয়েছে। প্রথম স্তরে জয়সিংহ রঘুপতির সান্নিধ্যে নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন, দেবতার অস্তিত্ব এবং দেবতার রক্তপান-স্পৃহা সম্পর্কে প্রশ্নবিহীন। দ্বিতীয় স্তরে তিনি দেবী মন্দিরে বলি নিষেধের আদেশ শুনেছেন এবং রঘুপতির নির্দেশে বা প্রভাবে যথার্থ ভক্তের মতো দেবী মন্দিরে চিরাচরিত প্রথাকে বজায় রাখবার জন্য কুটিল হয়ে উঠেছেন। তৃতীয় স্তরে তিনি বুঝলেন মন্দিরের চিরাচরিত প্রথা রক্ষার আড়ালে রঘুপতি নিজের অহমিকাকেই প্রকৃতপক্ষে রক্ষা করতে চাইছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে দেবতার নামে হীন ষড়যন্ত্রের অভিযান চালনা করছেন। রঘুপতির এই প্রকৃত উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করতে পেরে জয়সিংহের মনে দ্বন্দ্বের তীব্রতা সুরু হ'ল। একদিকে পালক পিতা রঘুপতির প্রতি অনস্বীকার্য কর্তব্যবোধের তাড়নায়, রঘুপতিকে নিরন্তর সহায়তাদানের প্রতিশ্রুতি, আর অন্যদিকে সেই প্রতিশ্রুতিকে রূপায়িত করতে অনতিক্রম্য এক প্রচণ্ড নীতিগত বাধা। এই অসহনীয় দ্বন্দ্বের আবর্ত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ।

প্রথম স্তরের সুরু বস্তুতঃ নাটক সুরু হবার পূর্ব থেকেই, এবং নাটকে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে এই স্তরের শেষভাগটি কেবল লক্ষ্য করা যায়। এই দৃশ্যে দেখা যায়, মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য অপর্ণার অভিযোগের প্রতিকার হিসেবে অপর্ণাকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে এসে জয়সিংহকে জিজ্ঞাসা করছেন, "ক্ষুদ্র ছাগশিশু/ দরিদ্র এ বালিকার স্নেহের পুত্তলি, / তারে নাকি কেড়ে আনিয়াছ মার কাছে / বলি দিতে ? এ দান কি নেবেন জননী/প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে ?" উত্তরে মন্দিরে জীববলির মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী একনিষ্ঠ দেবীভক্ত জয়সিংহ প্রসন্ন চিত্তে বললেন—

> "কেমনে জানিব,
> মহারাজ, কোথা হতে অনুচরগণ
> আনে পশু দেবীর পূজার তরে !" —১।১

তারপর সেই মনোভাব নিয়েই ছাগশিশুর শোকে ক্রন্দনরতা অপর্ণাকে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেন,—

—"হাঁ গা,
কেন তুমি কাঁদিতেছ? আপনি নিয়েছে
যারে বিশ্বমাতা, তার তরে ক্রন্দন কি
শোভা পায়?" —১।১

দেবতার প্রতি এই সহজ ও দৃঢ়ভক্তি এতদিন জয়সিংহের জীবনে ছিল অব্যাহত। পরম নিশ্চিন্তে এই ভক্ত জীবনকে তিনি নির্বাহ করে আসছিলেন। এই প্রথম তিনি এমন একটি ঘটনার সম্মুখীন হলেন যেখানে তিনি দেখলেন দেবতার প্রতি ভক্তি মানুষের দুঃখের যথেষ্ট সান্ত্বনা নয়। এই উপলব্ধিতেই কার্যতঃ জয়সিংহের জীবনের প্রথম সুরের সমাপ্তি সুরু হয়েছে। দেবতার প্রতি সহজ সুদৃঢ় ভক্তির মধ্যে একটা অসম্পূর্ণতা যেন বোধ করলেন। তাই ছাগ-শিশু-বলি সম্পর্কে জয়সিংহের ব্যাখ্যায় কোনো সান্ত্বনা খুঁজে না পেয়ে ছাগশিশুর প্রতি মানবিক শোকে অপর্ণা যখন ব্যাকুলভাবে কাঁদল, তখন জয়সিংহ দেবতার দিকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন—

'আজন্ম পূজিনু তোরে, তবু তোর মায়া
বুঝিতে পারিনে। করুণায় কাঁদে প্রাণ
মানবের, দয়া নাই বিশ্বজননীর!' —১।১

জীবহত্যার মধ্যে যথার্থই যে শোকের কারণ রয়েছে, তা এতদিন জীববলি দেখতে অভ্যস্ত জয়সিংহ বোঝেননি। অপর্ণার শোক তাঁর চিত্তে সেই অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলল, তিনি অনুভব করলেন, করুণা একটি শাশ্বত এবং সর্বজনীন ধর্ম। কিন্তু দেবতা কি সেই ধর্ম ব্যতিরিক্ত? না হলে যখন করুণার বশবর্তী হয়ে জীবশোকে মানুষের প্রাণ কাঁদে, তখন দেবতা এ সম্পর্কে নির্বিকার থাকেন কি করে? এই উপলব্ধি, এই প্রশ্ন নিয়েই জয়সিংহ তাঁর জীবনের প্রথানিষ্ঠ প্রথম সুরটি অতিক্রম করে এলেন। প্রথাসমৃদ্ধ মন্দিরে মানুষের করুণাকাতর কণ্ঠস্বরে এক নতুন সংগীত যেন শুনলেন তিনি এবং তাঁর ভক্ত-হৃদয় এক অপরূপ বেদনায় ব্যাকুল হয়ে উঠল সেই সংগীত শুনে। —১।১
ছাগশিশুর জন্য অপর্ণার শোক এক আশ্চর্য চাবিকাঠির মতো তাঁর প্রথা-নিরুদ্ধ জীবনের একটা অর্গল খুলে দিল, যে অর্গল দিয়ে প্রথামুক্ত মানুষের হাসিকান্না, প্রেম-ভালোবাসায় পরিপূর্ণ এক অচেনা জগতের আলোবাতাস তাঁর জীবনের

মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল। মন্দিরের পরিচিত অভ্যস্ত আশ্রয় তাঁর কাছে অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। কিন্তু গত্যন্তর কি? অপর্ণাই যেহেতু তাঁর জীবনে এই পরিবর্তনকে আনয়ন করেছে, তাঁর দৃষ্টিতে নূতনতর সত্যের সন্ধান দিয়েছে, তাই অপর্ণাকেই জিজ্ঞাসা করছেন—

"হে শোভনে, কোথা যাব এ মন্দির ছেড়ে?
কোথায় আশ্রয় আছে?" —১।১

আশ্রয়-হীনতার এই বিষণ্ণতা জয়সিংহের জীবনে প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যেও আছে। দেবতাকে তিনি অন্তর দিয়েই ডাকেন, তবু তিনি যেন দেবতার সান্নিধ্যে মনের সঙ্গ খুঁজে পান না—

"মাগো, শুধু তুই আর আমি! এ মন্দিরে
সারাদিন আর কেহ নাই—সারা দীর্ঘ
দিন! মাঝে মাঝে কে আমারে ডাকে যেন।
তোর কাছ থেকে তবু একা মনে হয়!" —১।৩

ঠিক এই সময় জয়সিংহের সম্মুখে অপর্ণা যে গানটি গেয়েছে, তাতে জয়সিংহের একাকীত্বের বিষণ্ণতা কাটতে পারত। অপর্ণা গেয়েছে, "আমি একলা চলেছি এ ভবে, আমায় পথের সন্ধান কে কবে? / ভয় নেই, ভয় নেই, / যাও আপন মনেই / যেমন একলা মধুপ ধেয়ে যায় কেবল ফুলের সৌরভে।" কিন্তু জয়সিংহ তখন তাঁর ভক্ত জীবনের সম্পূর্ণতা সম্পর্কে প্রাথমিক সংশয় অনুভব করছেন। ভক্তজীবনের অসম্পূর্ণতাও যেমন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, তেমনি অন্য কোনো মানবিক ধর্মে জীবনকে সম্পূর্ণ করে তুলবার আগ্রহও তাঁর মধ্যে স্পষ্ট রূপ পায়নি—একলা পথ চিনে চলবার স্বচ্ছদৃষ্টিও তিনি লাভ করেন নি। তাই অপর্ণার গান শুনে তিনি বললেন,—

"কেবলই একেলা! দক্ষিণ বাতাস যদি
বন্ধ হয়ে যায়, ফুলের সৌরভ যদি
নাহি আসে, দশদিকে জেগে ওঠে যদি
দশটি সন্দেহ-সম, তখন কোথায়
সুখ, কোথা পথ? জান কি একেলা কারে
বলে?" —১।৩

"সৃজনের
আগে দেবতা যেমন একা! তাই বটে!

তাই বটে! মনে হয় এজীবন বড়ো
বেশি আছে—যত বড়ো তত শূন্য, তত
আবশ্যক হীন।"

মনের বৃত্তিগুলির অচরিতার্থতার বেদনা এইভাবেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। অপর্ণার ক্রন্দন, অপর্ণার সান্নিধ্য, মন্দির ত্যাগের আহ্বান তাঁর চিত্তের মানবিক বৃত্তিগুলিকে আলোড়িত করে তুলেছে। এই চিত্তবৃত্তিগুলির অচরিতার্থতার বেদনায়ই তিনি মনে করছেন, তাঁর মতো প্রথানিষ্ঠ ভক্তের জীবনে এই চিত্তবৃত্তিগুলি প্রয়োজনের তুলনায় আবশ্যকহীনভাবেই বড়ো বেশি আছে। এই সময় যদি তিনি কঠিন হতে পারতেন, তবে হয়তো তাঁর জীবনের শোচনীয় পরিণামকে পরিহার করা যেত। তিনি ভেবেছেনও, "কঠিনতা নিখিলের অটল নির্ভর"—১।৩, কিন্তু কার্যতঃ কোনোদিনই কঠিন হয়ে উঠতে পারেন নি।

এর পর থেকেই জয়সিংহের জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় সুরু। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যেরই শেষের দিকে থেকে এই পর্যায়ন্তরটি লক্ষ্য করা যায়। রঘুপতি এসে যখন তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন যে, গোবিন্দমাণিক্য মায়ের পূজার বলি নিষেধ করে আদেশ জারি করেছেন, তখন তাঁর "পূর্ণশশী মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের" প্রতি অসীম শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও বললেন—

"মায়ের পূজার বলি নিষেধ করেছে
রাজা? এ আদেশ কে মানিবে?" —১।৩

রঘুপতি বললেন, "না মানিলে নির্বাসন।" কিন্তু রঘুপতির প্রতি একনিষ্ঠ এবং দেব-ভক্তিতে অটল জয়সিংহ সগৌরবে বললেন—

"মাতৃ পূজাহীন রাজ্য হতে
নির্বাসন দণ্ড নহে। এ প্রাণ থাকিতে
অসম্পূর্ণ নাহি রবে জননীর পূজা।" —১।৩

কর্তব্যনিষ্ঠায় অটল, অথচ আবেগদুর্বল জয়সিংহকে ধূর্ত রঘুপতি আগাগোড়াই চিনতেন। কিভাবে তাঁকে আপন উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা যায়, তা রঘুপতির ভালোভাবেই জানা ছিল। তাই তিনি প্রথম থেকেই জয়সিংহের গোবিন্দ-মাণিক্যপ্রীতির প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপ প্রকাশ করতে থাকেন, যেখানে জয়সিংহের দুর্বলতা, সেখানেই আঘাত বর্ষণ করতে থাকেন। ফলে অচিরেই জয়সিংহ মন্দিরের প্রথা রক্ষায় এমন অটল হয়ে উঠলেন।

রঘুপতি গোড়া থেকেই জানতেন যে, জীববলি নিষেধ করে গোবিন্দ-মাণিক্যের যে আদেশ তা চূড়ান্ত, তাকে বাতিল করা যাবে না। আর এই বলি নিষেধের আদেশ কার্যকরী হলে প্রথা বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর পৌরোহিত্য-মর্যাদাও বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। তাই নিজের এই পৌরোহিত্য-মর্যাদাকে রক্ষা করার জন্যই রঘুপতি প্রথম থেকেই ষড়যন্ত্রজাল রচনা করেছেন যাতে গোবিন্দমাণিক্যকে "মাতৃ বিদ্রোহী" নামে অভিযুক্ত করে তাঁকে হত্যা করার জন্য এক এক জনকে প্ররোচিত করা যায়। এই উদ্দেশ্যেই তিনি সেনাপতি নয়ন রায়কে বললেন, "লয়ে তব সৈন্য দল, আক্রমণ করো তারে" (গোবিন্দ-মাণিক্যকে)। নয়ন রায় বিশ্বাসঘাতকতা করতে অস্বীকৃত হলে, চিন্তিত রঘুপতিকে জয়সিংহ বললেন,—

"সৈন্য বলে কোন্ কাজ! অস্ত্র কোন্ ছার!
যার পরে রয়েছে যে ভার, বল তার
আছে সে কাজের। করিবই মার পূজা
যদি সত্য মায়ের সেবক হই মোরা। —১।৫

জয়সিংহ এখানে সহজ বিশ্বাসের বলে বলীয়ান। রঘুপতি রাজসৈন্যের প্রতিরোধ রচনায় সাধারণ পুরবাসীদের প্ররোচিত করতে ব্যর্থ হ'লে এই সহজ বিশ্বাসের শক্তি নিয়েই জয়সিংহ রঘুপতিকে নির্ভয় দিয়ে বলেছেন—

"যেতে দাও প্রভু—প্রাণ ভয়ে ভীত এরা
বুদ্ধিহীন, আগে হতে রয়েছে মরিয়া।
আমি আছি মায়ের সৈনিক। এক দেহে
সহস্র সৈন্যের বল। অস্ত্র থাক্ পড়ে।
ভীরুদের যেতে দাও।"

রঘুপতি যদিও জানেন, "সে কাল গিয়েছে। অস্ত্র চাই—শুধু ভক্তি নয়" —(১।৫), তবু প্রকাশ্যে জয়সিংহকে উৎসাহিত রাখার জন্য তাকে বলি আনতে, পূজার আয়োজন করতে বললেন। জয়সিংহ যখন পূজার আয়োজন সমাপ্ত এবং বলি প্রস্তুত করে এলেন, তখন গোবিন্দমাণিক্য স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে রঘুপতিকে প্রতিরোধ করেছেন। জয়সিংহ তাঁর শ্রদ্ধেয় গোবিন্দ-মাণিক্যকে বললেন—

"মহারাজ, তুমি হেথা!
তবে শোনো নিবেদন—একান্ত মিনতি

যুগল চরণ তলে, প্রভু, ফিরে লও
তব গর্বিত আদেশ। মানব হইয়া
দাঁড়ায়ো না দেবীরে আচ্ছন্ন করি।" —১।৫

জয়সিংহ গোবিন্দমাণিক্যের চরণে পতিত হয়ে এই কথাগুলি বলছিলেন। রঘুপতির শিক্ষায় শিক্ষিত ভক্তি ও প্রথানিষ্ঠা নিয়ে জয়সিংহ এই কথাগুলি বল্লেও তিনি যে গোবিন্দমাণিক্যের চরণে মিনতি স্বরূপ এ কথাগুলি বলছেন, তাতেই জয়সিংহের গুরু হিসেবে রঘুপতির মর্যাদাবোধে আঘাত লাগল। তিনি কঠোর ভাষায় জয়সিংহকে তিরস্কার করে বললেন,—

"ধিক্!
জয়সিংহ, ওঠো, ওঠো! চরণে পতিত
কার কাছে? আমি যার গুরু, এ সংসারে
এই পদতলে তার একমাত্র স্থান।
মূঢ় ফিরে দেখ্—গুরুর চরণ ধরে
ক্ষমা ভিক্ষা কর্। রাজার আদেশ নিয়ে
করিব দেবীর পূজা, করাল কালিকা,
এত কি হয়েছে তোর অধঃপাত! থাক্
পূজা, থাক্ বলি—দেখিব রাজার দর্প
কতদিন থাকে। চলে এস জয়সিংহ।" —১।৫

জয়সিংহের সহজ বিশ্বাসলব্ধ দেবীভক্তির ভদ্র ও শালীন অভিব্যক্তি নিয়ে রঘুপতির উদ্দেশ্য চরিতার্থ হতে পারে না। তাঁর উদ্দেশ্যের চরিতার্থতার জন্য চাই দেবীভক্তির একটি হিংস্র, অসহিষ্ণু অভিব্যক্তি। তাই অহিংস এবং সহিষ্ণু জয়সিংহকে তাঁর চিত্তবৃত্তির পরিপন্থী কঠোর কর্তব্যে নিয়োজিত করে তাঁকে হিংস্র ও অসহিষ্ণু করে তুলবার জন্য রঘুপতি তাঁকে (জয়সিংহকে) নিয়ে পরবর্ত্তী পদক্ষেপের দিকে এগিয়ে চললেন।

পরবর্তী পদক্ষেপে রঘুপতি রাজভ্রাতা নক্ষত্র রায়কে রাজসিংহাসনের লোভ দেখিয়ে রাজা গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা করতে প্ররোচিত করলেন জয়সিংহের সম্মুখেই। দেবী মন্দিরের প্রথা রক্ষার পবিত্র কর্তব্যের নামে রঘুপতি কর্তৃক হীন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেওয়া জয়সিংহের কাছে অচিন্তিতপূর্ব। ভ্রাতৃহত্যার মতো নিন্দনীয় দুষ্কর্মকে দেবীর আদেশ বলে রঘুপতির ব্যাখ্যা করাও জয়সিংহের

সহজ ধর্ম বিশ্বাস ও রঘুপতির প্রতি একনিষ্ঠতার ভিত্তিতে একটা দ্বিধার ফাটল ধরিয়ে দিল। বিস্ময়ে তিনি বললেন,—

একি শুনিলাম! দয়াময়ী মাতঃ একি
কথা! তোর আজ্ঞা! ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা!
বিশ্বের জননী!—গুরুদেব! হেন আজ্ঞা
মাতৃ-আজ্ঞা ব'লে করিলে প্রচার! —২।১

রঘুপতি উত্তরে বললেন, "আর কি উপায় আছে বলো।" রঘুপতির এই উত্তরে জয়সিংহের বিস্ময়ে আরো বেড়ে গেল,—

"উপায়! কিসের
উপায় প্রভু! হা ধিক্! জননী, তোমার
হস্তে খড়্গ নাই? রোষে তব বজ্রানল
নাহি চণ্ডী? তব ইচ্ছা উপায় খুঁজিছে,
খুঁজিছে সুরঙ্গ পথ চোরের মতন
রসাতল গামী? এ কি পাপ!" —২।১

উপায় মানুষের অনুসন্ধানের বিষয়! দুর্বল মানুষ কার্য সিদ্ধির জন্য উপায় খুঁজে বের করে। কিন্তু সর্বশক্তিমতী দেবী তাঁর মন্দিরের প্রথা রক্ষার জন্য উপায় খুঁজবেন কেন?—এবং সে উপায় ভ্রাতৃহত্যার মতো পাপের উপায়! আসলে এটা যে রঘুপতির একটা স্থূল অভিসন্ধি, তা জয়সিংহ বুঝতে পারেন এবং তা বুঝতে পেরেই মন্দিরের পশু বলির ঔচিত্য-অনৌচিত্য সম্পর্কে তাঁর মনের দ্বন্দ্ব সুরু হয়ে যায় এবং আমরা তাঁর ট্র্যাজিক জীবনের তৃতীয় বা চূড়ান্ত স্তরের আরম্ভ লক্ষ্য করি।

রঘুপতি জয়সিংহকে বোঝাতে চান যে, ভ্রাতৃহত্যা কিছু পাপ কার্য নয়। কারণ তাঁর মতে "এজগৎ মহা হত্যাশালা।" এবং "হত্যা মহাকালী কাল স্বরূপিণীর আকাঙ্ক্ষা"—২।১। জয়সিংহ এই ব্যাখ্যা মানতে পারেন না। কারণ তাহলে "প্রেম মিথ্যা, স্নেহ মিথ্যা, দয়া মিথ্যা, মিথ্যা আর সব, সত্য শুধু অনাদি অনন্ত হিংসা।"—২।১। কিন্তু পৃথিবীর অর্থ তা নয়, পৃথিবীর অর্থ এর বিপরীত। এখানে—

"মেঘ হতে, ঝরে আশীর্বাদ সম
বৃষ্টি ধারা দগ্ধ ধরণীর বক্ষ'পরে—
গলে আসে পাষাণ হইতে দয়াময়ী

স্রোতস্বিনী মরুমাঝে—কোটি কণ্টকের
শিরোভাগে,…ফুল ওঠে বিকশিয়া।" —২।১

সুতরাং হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর ধর্ম নয়, হত্যাকাণ্ড দেবীর আকাঙ্ক্ষাও নয়। তবে কি রঘুপতি জয়সিংহকে পরীক্ষা করছেন? দেখতে চাইছেন, "মাতৃভক্তি রক্তসম হৃদয় টুটিয়া ফেটে পড়ে কিনা…হৃদয় বলি দিলে মাতৃপদে।" —২।১

এইভাবে হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জয়সিংহের পাপবোধকে বিদূরিত করতে না পেরে রঘুপতি শেষ পর্যন্ত যখন বললেন, 'বন্ধ হোক বলিদান তবে'। তখন জয়সিংহ স্বাভাবিক ঝোঁকের বশে বলে ফেলেছিলেন, 'বন্ধহোক।' কিন্তু কঠিন আত্মবিশ্বাস তাঁর নেই। নিজের বুদ্ধি অনুসারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে চালিত হওয়া তাঁর অভ্যাসবহির্ভূত। যেটাকে তিনি অন্যায় মনে করেন, সেটাকে যেমন তিনি বর্জন করতে পারেন না, তেমনি যাকে ন্যায় মনে করেন তাকেও জীবনে বরণ না করে পারেন না।—এই দুই-এর আবর্তে তিনি বিপর্যস্ত হন, একটি পক্ষকে অবলম্বন করে তীরে উঠতে পারেন না। এইখানেই তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডির বীজটি নিহিত, এবং এইটাই তাঁর জীবনের ট্র্যাজিক ভ্রান্তি। আশৈশব তিনি রঘুপতির প্রভাবেই পরিবর্দ্ধিত। রঘুপতির দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, রঘুপতির সিদ্ধান্তই তাঁর সিদ্ধান্ত, রঘুপতির বুদ্ধিই তাঁর বুদ্ধি,—এই অভ্যাসের বশে আজ নিজের বিবেক-বুদ্ধি অনুসারে যেটাকে অন্যায় বিবেচনা করছেন, সেটাকে দু'হাতে ঠেলে ফেলে দিতে পারছেন না। এইজন্য বলিদান বন্ধ হোক,—বিবেকের তাড়নায় একথা বলেও, রঘুপতির প্রতি একনিষ্ঠতার অভ্যাস বশতঃ তাঁকে বলতে হ'ল—

"—নানা, গুরুদেব, তুমি
জানো ভালো মন্দ। সরল ভক্তির বিধি
শাস্ত্র বিধি নহে। আপন আলোকে আঁখি
দেখিতে না পায়, আলোক আকাশ হ'তে
আসে। প্রভু ক্ষমা করো, ক্ষমা করো দাসে।
ক্ষমা করো স্পর্ধা মূঢ়তার। ক্ষমা করো
নিতান্ত বেদনা বশে উদ্‌ভ্রান্ত প্রলাপ।" —২।১

রঘুপতির প্রতি তাঁর বিশ্বাস শিথিল হয়ে গেছে। তথাপি রঘুপতি মহাদেবীর রাজরক্ত তৃষ্ণায় যে কথা বলেছেন, তাকে তিনি অবিশ্বাস করতে পারেন না। বলেন,—

…"তোমারে ছাড়িলে, বিশ্বাস আমার
দাঁড়াবে কোথায়? বাসুকির শিরশ্চ্যুত
বসুধার মতো, শূন্য হতে শূন্যে পাবে
লোপ। রাজরক্ত চায় তবে মহামায়া,
সে রক্ত আনিব আমি, দিবনা ঘটিতে
ভ্রাতৃহত্যা।" —২।১

জয়সিংহের ট্র্যাজেডির লক্ষণটি এখানে স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। এখানে তিনি মহামায়ার তথাকথিত রাজরক্ততৃষ্ণা সম্পর্কে রঘুপতির ঘোষণা এবং সেই উদ্দেশ্যে পাপ ভ্রাতৃহত্যা নিবারণ—এই দুইয়ের মধ্যে দুই কূলকেই রক্ষা করবার চেষ্টা করছেন। রঘুপতির কথাকে অবিশ্বাস করার সাধ্য নেই বলে মহামায়ার রাজরক্ত তৃষ্ণাকে তিনি স্বীকার করছেন, কিন্তু পাপবোধের দ্বারা ক্লিষ্ট হয়ে রাজরক্তের জন্য ভ্রাতৃহত্যাকে সমর্থন করতে পারছেন না। আবার ভ্রাতৃহত্যা না ঘটলে দেবীর তথাকথিত রাজরক্ত তৃষ্ণাও মিটবে না। এই বিরোধের মীমাংসা তিনি করলেন নক্ষত্র রায়ের পরিবর্তে নিজে রাজহত্যার দায়িত্ব নিয়ে। এর দ্বারা ভ্রাতৃহত্যা নিবারিত হবে, এবং রাজরক্তও পাওয়া যাবে দেবীর জন্য।

যাঁর কাছে হত্যা ব্যাপারটাই একটা মহাপাপ, এক অচিন্ত্য বিভীষিকা, তিনি নিজে কেবল নীতিবোধের আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে যে রাজহত্যার দায় গ্রহণ করলেন,—এর মধ্যেই তাঁর ট্র্যাজেডির আবর্তে স্বেচ্ছায় অবতরণ লক্ষ্য করা যায়, এই আবর্ত থেকে তিনি উঠতে তো পারবেনই না, বরং ক্রমশঃ তলিয়ে যেতে যেতে নিঃশেষিত হয়ে যাবেন একদিন।

রাজ হত্যাকে কার্যকরী করার পিছনে তাঁর নীতিবোধের কোনো সায় নেই, বরং প্রচণ্ড বিরোধিতা রয়েছে আবার রঘুপতির আদেশ অমান্য করাও তাঁর স্বভাব নয়। রঘুপতির আদেশকে মান্য করতে গেলে নীতিবোধকে বিসর্জন দিতে হয়। আর নীতিবোধকে রক্ষা করতে গেলে গুরু হিসেবে রঘুপতিকে অস্বীকার করতে হয়। এই বিরোধের কোনো মীমাংসা জয়সিংহের পক্ষে সম্ভব নয়। কী করে মীমাংসা করা যায়, বা কোন্ পক্ষকে রক্ষা করবেন,—এই চিন্তা দীর্ঘকাল ধরে তাঁকে ক্লিষ্ট করতে থাকে। তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন চিন্তা করতে করতে, জীবনের হাসি-আহ্লাদ দূর হয়ে যায়। শ্বাস

রুদ্ধকর এই অসহনীয় অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে স্বাভাবিক মানুষের মতো শ্বাস প্রশ্বাস ফেলবার জন্য উৎকণ্ঠায় তিনি ভাবতে থাকেন,—

"চিন্তার নরক চেয়ে কার্য ভালো, যত
ক্রূর, যতই কঠোর হোক। কার্যের তো
শেষ আছে, চিন্তার সীমানা নাই কোথা—
ধরে সে সহস্র মূর্তি পলকে পলকে
বাষ্পের মতন; চারিদিকে যতই সে
পথ খুঁজে মরে, পথ তত লুপ্ত হয়ে
যায়। এক ভালো অনেকের চেয়ে।
তুমি সত্য, গুরুদেব, তোমারি আদেশ সত্য—
সত্যপথ তোমারি ইঙ্গিত মুখে। হত্যা
পাপ নহে, ভ্রাতৃহত্যা পাপ নহে, নহে
পাপ রাজ হত্যা"...... —২।৩

এই ধরনের একটা একপেশে সিদ্ধান্ত মনের মধ্যে গ্রহণ করে তিনি চিন্তার বন্দীদশা থেকে কেবল ক্ষণিকের জন্য মুক্তি পেতে চেয়েছেন। ক্ষণিকের জন্যও তিনি পৃথিবীর আনন্দ-সুখের আয়োজনে অংশ নিয়ে স্বাভাবিক মানুষের জীবন ধর্মে ধন্য হতে চান। মন্দিরের সম্মুখে পথে বসে ক্ষণিকের মুক্ত মনের আনন্দের উচ্ছ্বাসে তিনি অনির্দিষ্ট পথিক জনকে বলতে থাকেন,—

"কোথা যাও ভাইসব, মেলা আছে বুঝি
নিশিপুরে? কুকী রমনীর নৃত্য হবে?
আমিও যেতেছি।—এ ধরায় কত সুখ
আছে—নিশ্চিন্ত আনন্দ সুখে নৃত্য করে
নারী দল, মধুর অঙ্গের রঙ্গভঙ্গ
উচ্ছ্বসিয়া উঠে চারিদিকে, তটপ্লাবী
তরঙ্গিনী সম। নিশ্চিত আনন্দে সবে
ধায় চারিদিক হতে—উঠে গীত গান,
বহে হাস্য পরিহাস, ধরণীর শোভা
উজ্জ্বল মুরতি ধরে। আমিও চলিনু। —২।৩

আনন্দের উচ্ছ্বাসে গান গেয়ে ওঠেন জয়সিংহ। গানের ভাষায় তাঁর এই আকাঙ্ক্ষিত মুক্ত মনের রূপটিও প্রকাশিত হয়ে পড়ে: "তোরা কোন্ রূপের

হাটে / চলেছিস ভবের বাটে, / পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে। তোদের ঐ হাসি খুশি দিবা নিশি / দেখে মন কেমন করে। / আমার এই বাধা টুটে—/ নিয়ে যা লুটে পুটে—/ পড়ে থাক মনের বোঝা ঘরের দ্বারে। /"

জয়সিংহের এই আকস্মিক উচ্ছ্বাস দেখে অপর্ণা অবাক হয়ে যায়। হবারই কথা। কারণ জয়সিংহের চিন্তাজর্জর জীবনে এইভাবে আরোগ্য স্নান সেরে ওঠা এত দ্রুত প্রত্যাশিত নয়। কিন্তু জয়সিংহের পক্ষে ব্যাপারটায় অবাক হবার কিছুই নেই। কারণ পাপ-পুণ্য নিয়ে চিন্তার আত্মদাহ ব্যাপারটাই অপ্রয়োজনীয়। এর যদি কোনো সত্যতা থাকত তা হলে চিন্তা ক্লেশে জর্জরিত মানুষের পক্ষে এত আনন্দ প্রকাশ করা অসম্ভব হ'ত। জগতে মানুষের যে এত আনন্দ, এর দ্বারাই প্রমাণিত হয়, পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্ম সবই মিথ্যা,—এর চিন্তা ক্লেশে জর্জরিত হওয়া একটা বিরাট বঞ্চনা। অপর্ণার বিস্ময়কে দূর করার জন্য তিনি এই তত্ত্বকেই প্রকাশ করেছেন—

সব মিথ্যা, বৃহৎ বঞ্চনা,
তাই হাসিতেছি—তাই গাহিতেছি গান।
ওই দেখো পথ দিয়ে তাই চলিতেছে
লোক নির্ভাবনা, তাই ছোট কথা নিয়ে
এতই কৌতুক হাসি, এত কুতূহল,
তাই এত যত্নভরে সেজেছে যুবতী।
সত্য যদি হত, তবে হ'ত কি এমন?
সহজে আনন্দ এত বহিত কি হেথা? —২।৩
......"হা অপর্ণা,
তুমি আমি কিছু সত্য নই, তাই জেনে
সুখী হও—বিষণ্ণ বিস্ময়ে, মুগ্ধ আঁখি
তুলে কেন রয়েছিস চেয়ে! আয় সখী,
চিরদিন চলে যাই দুইজনে মিলে
সংসারের 'পর দিয়ে, শূন্য নভস্তলে
দুই লঘু মেঘখণ্ড সম।" —২।৩

পাপ-পুণ্যের চিন্তাজাল থেকে ক্ষণিকের এই মুক্তির শক্তিতে জয়সিংহ এই সময় গুরু রঘুপতিকে পর্যন্ত অস্বীকার করতে সমর্থ হন। রঘুপতি প্রবেশ করলে

জয়সিংহ তাঁকে বলেন, "তোমারে চিনিনে আমি।……আমি চলিয়াছি আমার অদৃষ্ট ভরে ভেসে নিজ পথে, পথের সহস্র লোক যেমন চলেছে। তুমি কে বলিছ মোরে দাঁড়াইতে? তুমি চলে যাও—আমি চলে যাই।" —২।৩। রঘুপতির পুনরায় আহ্বানেও জয়সিংহ কর্ণপাত না করে একই মুক্তির আনন্দে বলতে থাকেন—

"চলে যাব ভিক্ষা পাত্র হাতে, সঙ্গে লয়ে
ভিখারিণী সখী মোর। কে বলিল এই
সংসারের রাজপথ দুরূহ জটিল!
……………………………
……………………………
……ক্ষুদ্র এই পরিশ্রান্ত
নরজন্ম সমর্পিব ধরণীর কোলে—
দু'চারি দিনের এই সমষ্টি আমার,
দু'চারিটা ভুল ভ্রান্তি ভয় দুঃখ সুখ,
ক্ষীণ হৃদয়ের আশা, দুর্বলতা বশে
ভ্রষ্টভগ্ন এ জীবন ভার, ফিরে দিয়ে
অনন্ত কালের হাতে, গভীর বিশ্রাম।
এই তো সংসার! কী কাজ শাস্ত্রের বিধি
কী কাজ গুরুতে! —২।৩

কিন্তু রঘুপতির প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে বেশিক্ষণ জয়সিংহের এই মুক্তির মোহ বজায় থাকার কথা নয়। তাই ক্ষণিকের উচ্ছ্বাসে চিন্তার ভারে চাপা পড়া গোপন আর্তিগুলিকে এইভাবে অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ করার পর অকস্মাৎ তিনি যেন রাজহত্যার পাপকার্যের দায় সম্পর্কে সচকিত হয়ে উঠলেন। এমন দায়-ভার জীবনে থাকাকালে মুক্ত জীবনের অভিপ্রায় নিয়ে উচ্ছ্বসিত হওয়া যেন অন্যায়! তাই অনেকটা ক্ষমা ভিক্ষার মতোই রঘুপতিকে বললেন,—

স্বপ্নে ছিনু এতক্ষণ!
এই সে মন্দির—ওই সেই মহাবট
দাঁড়ায়ে রয়েছে, অটল কঠিন দৃঢ়
নিষ্ঠুর সত্যের মতো। কী আদেশ দেব!" —২।৩

তারপরেই তিনি ছুরিকা প্রদর্শন করে বললেন,—

"তোমার আদেশ স্মৃতি অন্তরে বাহিরে
হতেছে শাণিত। আরো কী আদেশ
আছে প্রভু!" —২।৩

রঘুপতির আরো যে আদেশ, তা হচ্ছে অপর্ণাকে জয়সিংহের সান্নিধ্য থেকে দূরে রাখা। একথা ঠিক যে, ছাগশিশুর জন্য অপর্ণার ক্রন্দনই জয়সিংহের চিত্তের অর্গল খুলে দিয়েছে, যেখান দিয়ে নতুন ধরনের আলোবাতাস প্রবেশ ক'রে তাঁর মনে এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে সৃষ্টি করেছে। অপর্ণার ক্রন্দনই তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, মানুষের দুঃখ দেবতার নামে সান্ত্বনা মানে না। সুতরাং অপর্ণা তাঁর নবলব্ধ জীবনবোধের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাঁর নবজীবনের অবিচ্ছেদ্য সাথী। এই যোগসূত্রেই অপর্ণার পক্ষে সম্ভব জয়সিংহের নবলব্ধ জীবনবোধকে বাস্তবে রূপায়িত করা। রঘুপতি হয়তো একথা বোঝেন। তাই কার্যসিদ্ধিকে নিষ্কণ্টক করার জন্য তিনি অপর্ণাকে দূর করে দিতে চান জয়সিংহের কাছ থেকে।

কেবলমাত্র আত্মনিপীড়ন করে যদি কোনো সমস্যার মীমাংসা করা যায়, তবে জয়সিংহ তা সহজেই করতে পারেন, তাতে তাঁর হৃদয়ের রক্তপাত যতটাই হোক। তাই তিনি তীব্র ক্ষোভ নিয়ে বললেও বলতে পারলেন,—

চলে যা অপর্ণা! দয়া মায়া স্নেহ প্রেম
সব মিছে! মরে যা অপর্ণা! সংসারের
বাহিরেতে কিছুই না থাকে যদি, আছে
তবু দয়াময় মৃত্যু। চলে যা অপর্ণা! —২।৩

রঘুপতি জয়সিংহের এই ক্ষোভকে বুঝতে পারেন। তাই তিনি সান্ত্বনা দিতে চান জয়সিংহকে। কিন্তু তীব্র অভিমানে জয়সিংহ বলেন—"থাক্ প্রভু, বোলো না স্নেহের কথা আর। কর্তব্য রহিল শুধু মনে।" —২।৩

অনুভূতিকাতর মানুষেরা, যখন অভিমানাহত হন, তখন অনেক সময় নিজেরাই নিজেদের আক্রোশের কারণ হয়ে ওঠেন। অভিমানের জ্বালায় অপরের মনস্তুষ্টির জন্য নিজের বিবেক বিরোধী কাজও করে বসেন অনেক সময়। অভিমানাহত জয়সিংহও তেমনি অনেকটা মরিয়া হয়েই উঠলেন রঘুপতির মনস্তুষ্টির জন্য রাজরক্ত আনয়নের কর্তব্য সাধন করতে। একদিন মন্দির প্রাঙ্গণে গোবিন্দমাণিক্যকে পেয়ে তাঁকে হত্যার সুযোগ পেলেন, কিন্তু

তার আগে চূড়ান্তভাবে জানা চাই, সত্যই দেবী রাজরক্ত চান কিনা! তাই তিনি দেবীকে উদ্দেশ্য করে বললেন,—

> "বল্ চণ্ডী, সত্যই কি রাজরক্ত চাই?
> এই বেলা বল্, বল্ নিজমুখে বল্
> মানব ভাষায়, বল্ শীঘ্র সত্যই কি
> রাজরক্ত চাই?" —২।৪

রঘুপতি নেপথ্য থেকে বললেন 'চাই'। জয়সিংহ ভাবলেন দেবীরই উক্তি। সুতরাং আর কালক্ষেপ না ক'রে তিনি মহারাজকে প্রস্তুত হতে বললেন। গোবিন্দমাণিক্য বুঝিয়ে দিলেন যে, কণ্ঠস্বর রঘুপতির, দেবীর নয়। জয়সিংহ রাজরক্ত আনয়নের কর্তব্যকে সমাধা করলে তাঁর দ্বন্দ্বের কোনো রকম একটা মীমাংসাই হ'ত। এই মীমাংসা তাঁর অভিপ্রেত হোক না হোক, একটা মীমাংসা হয়ে গেলে তিনি তাঁর চিন্তাজাল থেকে নিষ্কৃতি পান, যে চিন্তাজালে আটক-জীবন তাঁর কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। গোবিন্দমাণিক্যের এই উক্তিতে (যে, কণ্ঠস্বর দেবীর নয় রঘুপতির) জয়সিংহের কোনো রকমের একটা মীমাংসায় পৌঁছানোর সম্ভাবনা বাধাপ্রাপ্ত হ'ল। কিন্তু কোন রকমের একটা মীমাংসায় তিনি পৌঁছাতে চান। তাই এই বাধাকে অস্বীকার করবার জন্য তিনি বললেন,—

> কেবলই সংশয় হতে সংশয়ের মাঝে
> নামিতে পারিনে আর! যখনি কূলের
> কাছে আসি, কে মোরে ঠেলিয়া দেয় যেন
> অতলের মাঝে! সে যে অবিশ্বাস দৈত্য!
> আর নহে! গুরু হোক, কিম্বা দেবী হোক,
> একই কথা! —২।৪

বলেই তিনি ছুরিকা উন্মোচন ক'রে গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা করতে প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু পারলেন না। ধর্মবুদ্ধি তাঁকে বাধা দিল। রক্তের বদলে জবাফুল দেবীকে উৎসর্গ করে বললেন,—

> "ফুল নে মা! নে মা! ফুল নে মা!
> পায়ে ধরি, শুধু ফুল নিয়ে হোক তোর
> পরিতোষ! আর রক্ত না মা আর রক্ত
> নয়! এও যে রক্তের মতো রাঙা, দু'টি

জবাফুল! পৃথিবীর মাতৃবক্ষ ফেটে
উঠিয়াছে ফুটে. সন্তানের রক্তপাতে
ব্যথিত ধরার স্নেহ বেদনার মতো।
নিতে হবে!”

রঘুপতি অন্তরাল হতে সমস্তই শুনলেন, সমস্তই দেখলেন, কিভাবে রাজ-রক্তপাতের এমন সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট হয়ে গেল। তাঁর তীব্র ভর্ৎসনায় আবার আপন কর্তব্য দায় সম্পর্কে সচকিত হয়ে জয়সিংহ কর্তব্যে ত্রুটির জন্য দণ্ড চাইলেন। রঘুপতি প্রাণদণ্ডের চেয়েও গুরুদণ্ড দিলেন তাঁকে,—দেবীর চরণ ছুঁইয়ে তাঁকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করালেন,—“আমি এনে দিব রাজরক্ত শ্রাবণের শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।”—২।৪। গুরুভক্তি সম্পর্কে জয়সিংহের মনে একটি সিদ্ধি সংস্কার আছে, যা অপরিবর্তনীয়। সুস্পষ্টতঃ গুরুকে অন্যায়কারী বুঝলেও, এই গুরুভক্তিকে তিনি প্রত্যাহার করে নিতে পারতেন না। এই সিদ্ধি গুরুভক্তির কাছেই রঘুপতির ধর্মবুদ্ধি, বিবেকের আহ্বান, ন্যায়বোধ পরাভূত হয়েছে, অথচ এগুলির প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা এবং আন্তরিক আকুলতা। গুরুভক্তির কারণে এগুলিকে বারবার অবহেলা করতে হচ্ছে, এটাই তার সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা নিয়েই তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন শ্রাবণের শেষ রাত্রে রাজরক্ত আনয়নের।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে স্বহস্তে দেবীর প্রতিমাকে ঘুরিয়ে রেখে রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে প্রজাদের উত্তেজিত করার যে চেষ্টা করেছেন, তার ষোল আনা মিথ্যাচার এবং কাপট্য জয়সিংহ বুঝতে পারেন, কিন্তু গুরু ভক্তির জন্য কিছুই বলতে পারেন না। মাঝখান থেকে মিথ্যা দিয়ে সত্যকে বুঝবার যে তত্ত্ব তিনি রঘুপতির কাছে শুনলেন, তাতে এই ধারণাটিই তাঁর পাকা হয়ে যায় যে,—

“সত্যনহে, সত্যনহে, সত্যনহে—সবই
মিথ্যা! মিথ্যা! মিথ্যা! দেবী নাই প্রতিমার
মাঝে, তবে কোথা আছে? কোথাও সে নাই!
দেবী নাই! ধন্য ধন্য ধন্য মিথ্যা তুমি!” —৩।১

কিন্তু ‘দেবী নাই প্রতিমার মাঝে’—এই সত্যকে জয়সিংহ আবিষ্কার করেছেন বহু বিলম্বে। ইতোমধ্যে জীবনের মূল্যবান সময়গুলি অতিবাহিত হয়ে গেছে। এই অপচয়ের বেদনা মর্মান্তিক। তাই জয়সিংহের এখনকার

প্রার্থনা—৩।৪, হয় দেবী দয়া করে সত্য হয়ে উঠুন, নইলে "সত্যশূন্য, দয়াশূন্য, সর্বশূন্য মাঝে" এ জীবনের সর্বস্ব প্রদান করার অনুতাপ জয়সিংহের কাছে অসহনীয় হ'য়ে ওঠে। এই অনুতাপ তিনি প্রকাশ করেছেন অপর্ণার কাছে,—

দেবতায়

কোন্ আবশ্যক! কেন তারে ডেকে আনি
আমাদের ছোটখাট সুখের সংসারে?
তারা কি মোদের ব্যথা বুঝে? পাষাণের
মতো, শুধু চেয়ে থাকে! আপন ভায়েরে
প্রেম হতে বঞ্চিত করিয়া, সেই প্রেম
দিই তারে,—সে কি তার কোনো কাজে লাগে? —৩।৪

অনুতাপ আরো তীব্র এইখানে যে, এই মিথ্যা-দেবতার রাজ্যে এতকাল বসবাসের ফলে যে সংস্কার তাঁর গড়ে উঠেছে, সেই সংস্কারের জন্যই গুরুর প্রতি সিদ্ধ বিশ্বাসকে তিনি প্রত্যাহার করতে পারছেন না, এবং এরই ফলে আজ তিনি জীবনের চরম মূল্য দেওয়ার বাধ্যবাধকতার সম্মুখীন। তাই মন্দির ছেড়ে যাওয়ার জন্য অপর্ণার আহ্বানের প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন—

"……যে রাজত্বে আজন্ম করেছি বাস
পরিশোধ ক'রে দিয়ে তার রাজকর
তবে যেতে পাব।" —৩।৪

সমগ্র এই দৃশ্যটিই (৩।৪)—জয়সিংহের এই অনুতাপ, ক্লেশ ও ক্লান্তির পরিচয়ে পরিপূর্ণ। অপর্ণার প্রতি তাঁর আসক্তি, তাকে কাছে এনে মনে মনে কথা বলার আকাঙ্ক্ষা, আবার গুরুর আদেশ মনে পড়ায় নিষ্ঠুরের মতো অপর্ণাকে মন্দির থেকে দূর করে দিতে বাধ্য হওয়া,—এক অপার করুণার সৃষ্টি করেছে দৃশ্যটিতে। ট্র্যাজিক চরিত্রের চূড়ান্ত ট্র্যাজেডি ঘটবার প্রাক্কালে দৃশ্যটি ট্র্যাজেডির সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

বলি নিষেধের আদেশ অমান্যের অপরাধে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত রঘুপতি বিশেষ অনুরোধে রাজার কাছ থেকে শ্রাবণের শেষ দুইদিনের অবসর চেয়ে নিয়েছেন। এই দুই দিনের সুযোগ যাতে কিছুতেই না নষ্ট হয়, সেই উদ্দেশ্যে রঘুপতি অনুভূতিকাতর জয়সিংহের অনুভূতিগুলিকে প্রবলভাবে উত্তেজিত করতে থাকেন। জয়সিংহ আর না পেরে বলে ওঠেন, "পিতা, এ বিদীর্ণ বুকে আর

হানিয়ো না বজ্র। রাজরক্ত চাহে দেবী, তাই তারে এনে দিব। যাহা চাহে সব দিব। সব ঋণ শোধ ক'রে দিয়ে যাব।" —৪।২

পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই জয়সিংহের ট্র্যাজেডির চূড়ান্ত। রঘুপতি মন্দিরে পূজোপকরণ নিয়ে জয়সিংহের জন্য অপেক্ষা করছেন, জয়সিংহ আনবেন রাজরক্ত। অবশেষে জয়সিংহ প্রবেশ করলেন মন্দিরে। দেবীর সম্মুখে গিয়ে বললেন,—

"রাজরক্ত
চাই তোর, দয়াময়ী, জগৎ পালিনী
মাতা? নহিলে কিছুতে তোর মিটিবেনা
তৃষা? আমি রাজপুত, পূর্ব-পিতামহ
ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর
মাতামহবংশ—রাজরক্ত আছে দেহে।
এই রক্ত দিব। এই যেন শেষ রক্ত
হয় মাতা, এই রক্তে শেষ মিটে যেন
অনন্ত পিপাসা তোর, রক্ত তৃষাতুরা।" —৫।১

এই কথা বলেই জয়সিংহ তাঁর সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাবার জন্য বুকে ছুরি বিঁধিয়ে আত্মবিসর্জন করলেন। এই মৃত্যুর দ্বারা জয়সিংহ রঘুপতির কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিকে রক্ষা করলেন, দেবীর চরণ ছুঁয়ে রাজরক্ত আনয়নের যে শপথ নিয়েছিলেন, সেই শপথ রক্ষা করলেন; পূরণ করলেন তাঁর প্রতি রঘুপতির স্নেহের দাবি, পুত্ররূপে তাঁকে প্রতিপালনের পাওনা; এবং জয়সিংহও শোধ করলেন রঘুপতির কাছে তাঁর সমস্ত দেনা: রক্ষা করলেন পিতৃভক্তি, পিতার অভিপ্রেত মন্দিরের চিরাচরিত প্রথা। কিন্তু এসবই জয়সিংহের জীবনের বাইরের দিক—যার নৈতিক মূল্য কিছুই ছিলনা তাঁর কাছে। এইজন্য এই শোচনীয় মৃত্যুর মধ্যদিয়েও তিনি নিজেকে কোনোভাবেই প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারলেন না। মৃত্যু তাঁর অপচীয়মান জীবনেরই যেন একটা অনিবার্য পর্যায়। তাঁর জীবনের শূন্য সঞ্চয়ের ঘরে মৃত্যুও কিছু জমা রেখে যেতে পারল না। একটা মহৎ জীবনের এমন সামগ্রিক অপচয় যথার্থ ট্র্যাজেডির বিষয়। জীবনে যথেষ্ট সঞ্চয়ের সম্ভাবনা তাঁর ছিল। মানুষের প্রার্থনীয় বহুবিধ গুণেরই একত্র সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর জীবনে, এবং এরই মধ্যে নিহিত ছিল তাঁর বিপদ। বহুবিধ

গুণ—বহুবিধ প্রবণতাকে সৃষ্টি করেছিল তাঁর জীবনে। এই প্রবণতাগুলি অনেক সময়ই ছিল পরস্পর বিরোধী। এই জন্যই একদিকে রঘুপতি, আর একদিকে অপর্ণা, একদিকে দেবী আর একদিকে মানুষ, একদিকে প্রথা আর একদিকে খেয়াল, একদিকে পাপবোধ, আর একদিকে ন্যায়বোধ একই সঙ্গে তাঁর মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছে, এবং প্রত্যেকটিই তাঁর মনে এক এক সময়ে সমান সমান প্রশ্রয় লাভ করেছে। এর ফল হয়েছে এই যে, যে শক্তিগুলি প্রবল, সেই-গুলিই তাঁকে মুখ্যতঃ চালিত করেছে। তাঁর জীবনে রঘুপতির শক্তির প্রভাব বেশী। তাই দেখি রঘুপতিই তাঁকে মুখ্যতঃ চালনা করেছেন, কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে তিনি এইভাবে চালিত হতে চাননি। রঘুপতির প্রভাবে তাঁর অনভি-প্রেত প্রবণতাগুলি জয়লাভ করতে থাকলেও, তাঁর মহৎ চিত্তের আকাঙ্ক্ষা ছিল ভিন্নরূপ। কিন্তু তাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে পারছেন না। তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে হচ্ছে রঘুপতির অভিপ্রায়কে। এই আধ্যাত্মিক পাপের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যই তাঁর এই মৃত্যুবরণ—যার প্রয়োজন তাঁর কাছে অনিবার্য হয়ে উঠল অবস্থা বিপাকে। এইখানেই জীবনের ট্র্যাজেডি। 'রাজা ও রানী'র কুমার সেন এবং 'বিসর্জনে'র জয়সিংহের ট্র্যাজেডি সমধর্মী। স্বভাব-ধর্মের বিরুদ্ধাচরণের শোচনীয় পরিণাম রবীন্দ্রনাথ এইসব ট্র্যাজেডির মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন।

'মালিনী' (১৮৯৬) নাটকে ট্র্যাজেডির বৃত্তটি গড়ে উঠেছে দু'টি ধর্মের বা ধর্মমতের সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে। বৌদ্ধধর্ম মৈত্রী ও করুণার আদর্শ নিয়ে নবধর্ম নামে হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করছে। রাজকুমারী মালিনী কাশ্যপের কাছে এই নবধর্মে দীক্ষা নেওয়ায় নবধর্মের শক্তি বৃদ্ধি পায়। এদিকে ব্রাহ্মণ ক্ষেমংকরের নেতৃত্বে হিন্দু প্রজারা নবধর্মের প্রভাব থেকে সনাতন আর্য-ধর্মকে রক্ষায় সংঘবদ্ধ। তারা তাদের হিন্দু রাজার কাছে দাবী জানাতে থাকে, মালিনীকে নির্বাসন দিতে হবে, কারণ রাজার নিজেরই গৃহে নবধর্ম প্রশ্রয় পাওয়ায় তাদের আর্যধর্ম অধিকতর বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এই দাবীতে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কিন্তু মালিনী স্বেচ্ছায় রাজগৃহ ত্যাগ ক'রে বিদ্রোহী হিন্দু প্রজাদের সম্মুখে এসে বললেন, "আমি আসিয়াছি।" প্রজারা মালিনীর 'স্নেহজ্যোতি নেত্র যুগে' এবং 'করুণা মাখানো মুখ' লক্ষ্য করে ভুলে গেল বিদ্রোহের কথা। তথাকথিত 'সংহার মুরতি' মালিনীর মধ্যে খুঁজে না পাওয়ায় তারা বিদ্রোহবাসনা ভুলে গিয়ে মালিনীর ভক্ত হয়ে উঠল। হতাশায়

এদের নেতা ক্ষেমংকর 'বাহির হইতে রক্তস্রোত মুক্ত করি' এই বিধর্মের আগুন নিভানোর জন্য দেশান্তরে গেলেন সৈন্য সংগ্রহে। প্রিয়বন্ধু সুপ্রিয়কে রেখে গেলেন রাজভবনের সংবাদ রাখার জন্য।

কিন্তু জীবন-সম্পর্কশূন্য প্রথানিবদ্ধ হিন্দুধর্মের প্রতি সুপ্রিয়ের আস্থা ক্ষেমংকরের মতো দৃঢ় কখনোই ছিল না। ক্ষেমংকরের প্রতি অটুট বন্ধুত্বই তাঁকে হিন্দুধর্মের দিকে টেনে রেখেছিল। তিনি নিজে মালিনীর নির্বাসনের দাবী মনে প্রাণে সমর্থন করতে পারেন নি,—নবধর্মের প্রতি একটা অনুরাগের বীজ তাঁর মনে গোড়া থেকেই প্রশ্রয় পেয়ে আসছিল। ক্ষেমংকরের অনুপস্থিতিতে এই বীজটিই আত্মপ্রকাশ করতে থাকে,—নবধর্মের প্রতি অনুরাগ মালিনীর প্রতি অনুরাগে রূপান্তরিত হয়,—নবধর্ম তাঁর নিজেরও ধর্ম হয়ে ওঠে! নবধর্মকে রক্ষা করা এখন তাঁর কর্তব্য।

বিদেশ থেকে ক্ষেমংকর বন্ধু সুপ্রিয়কে পত্রদিয়ে জানালেন যে, রত্নবতী পুরীর রাজগৃহ থেকে সৈন্য নিয়ে তিনি আসছেন 'শোণিতের স্রোতে ভাসাইতে নবধর্ম ; এবং 'রাজ কুমারীরে প্রাণদণ্ড দিতে।' নবধর্ম এবং রাজকুমারীর উপর এই সম্ভাব্য আক্রমণের আঘাতে ছিন্ন হয়ে গেল ক্ষেমংকর-সুপ্রিয়ের মধ্যকার প্রাচীন বন্ধুত্ব। সুপ্রিয় বিশ্বাসঘাতকতা করে সংবাদ জানিয়ে দিলেন রাজাকে।

ক্ষেমংকর বন্দী হলেন, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। দণ্ড কার্যকরী করার পূর্বে রাজা শেষ বাসনা জানাতে বললেন ক্ষেমংকরকে। ক্ষেমংকর দেখতে চাইলেন সুপ্রিয়কে। এবং সেই সুযোগে হাতের লৌহ শৃঙ্খলের দ্বারা সুপ্রিয়ের মাথায় আঘাত ক'রে ক্ষেমংকর বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিলেন। সুপ্রিয়ের মৃত্যু হ'ল। করুণা ও মৈত্রীর নবধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্তা মালিনীকে এই পরম দুঃখের সময়েও আদর্শের স্বার্থে বলতে হ'ল—"মহারাজ ক্ষম ক্ষেমংকরে।"

এই বৃত্তে দেখা যায় যে, একই ঘটনা ট্র্যাজেডিকে ঘনিয়ে তুলল ক্ষেমংকর, সুপ্রিয় এবং মালিনীর জীবনে। এঁদের প্রত্যেকের ট্র্যাজেডির মধ্যে তারতম্য থাকলেও ট্র্যাজেডির দুঃখময় স্পর্শ থেকে কেউই প্রকৃত পক্ষে অব্যাহতি পাননি।

ক্ষেমংকরের ট্র্যাজেডি এই যে, আর্যধর্মকে রক্ষা করার জন্য তাঁর নিপুণ আয়োজন ব্যর্থ হয়ে গেল এবং ব্যর্থ হয়ে গেল নিজেরই প্রিয়তম বন্ধু সুপ্রিয়েরই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে। ষড়যন্ত্রের গুপ্ত কথা বিশ্বাস ক'রে যাকেই কেবলমাত্র

বলা চলে, প্রয়োজনের দিনে সে-ই যদি বিশ্বাস ভঙ্গ করে বসে, তবে বিশ্বাস-কারীর পক্ষে সেটা খুবই দুঃখের। প্রকৃতপক্ষে সুপ্রিয়কে বিশ্বাস করাটাই হয়েছিল ক্ষেমংকরের ভুল। যে আর্যধর্ম রক্ষায় ক্ষেমংকরের এতখানি দৃঢ়তা, এত আয়োজন, এত দুঃখ বরণের প্রস্তুতি, সেই আর্যধর্মের প্রতি সুপ্রিয়ের অনুরাগ ও আস্থা যে ক্ষেমংকরের মতো দৃঢ় নয়, তা ক্ষেমংকরের জানা ছিল। মন্দিরপ্রাঙ্গনে তাঁদের পারস্পরিক আলোচনাতেই তা প্রকাশ পেয়েছে। মালিনী নবধর্মে দীক্ষা নেওয়ায় তাঁর নির্বাসন দাবী করে চারুদত্ত যখন বলেছিলেন—

"চলোসবে রাজদ্বারে, বলো, 'রক্ষ রক্ষ
মহারাজ, আর্যধর্মে করিতেছে লক্ষ
তব নীড় হতে সর্প।" (১ম)

তখন সুপ্রিয় বলেছিলেন,—

ধর্ম? মহাশয়,
মূঢ়ে উপদেশ দেহ ধর্মকারে কয়।
ধর্ম নির্দোষীর নির্বাসন?

সোমাচার্যকে তিনি বলেছিলেন,—

ধর্মাধর্ম সত্যাসত্য
কে করে বিচার? আপন বিশ্বাসে মত্ত
করিয়াছ স্থির, শুধু দল বেঁধে সবে
সত্যের মীমাংসা হবে, শুধু উচ্চরবে? (১ম)

তারপর আবার চারু দত্তকে—

প্রিয়ম্বদ, মোর দম্ভ নয়,
আমি অজ্ঞ অতি—দম্ভ তারি যে আজিকে
শতার্থক শাস্ত্রহতে দুটো কথা শিখে
নিষ্পাপ নিরপরাধ রাজকুমারীরে
টানিয়া আনিতে চাহে ঘরের বাহিরে
ভিক্ষুকের পথে—তাঁর শাস্ত্রে মোর শাস্ত্রে
দু-অক্ষর প্রভেদ বলিয়া। (১ম)

রাজকুমারীর প্রতি সুপ্রিয়ের এই দুর্বলতা এবং আর্যধর্মে অটুট সংস্কারের অভাব লক্ষ্য ক'রে ব্রাহ্মণেরা তাঁকে 'কুলশত্রু বিভীষণ' বিবেচনা করেন এবং তাঁকে সভা থেকে বিতাড়িত করতে চান। কিন্তু সকল তর্ক-বিতর্কের অতীত

যে সৌহৃদ্য, তা ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয়ার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাই সুপ্রিয় সকলের কাছে বিদায় চইলেও ক্ষেমংকর তাকে বিদায় দিলেন না। বললেন—

দিব না বিদায়।
তর্কে শুধু দ্বিধা তব, কাজের বেলায়
দৃঢ় তুমি পর্বতের মতো। বন্ধুমোর,
জান নাকি আসিয়াছে দুঃসময় ঘোর—
আজ মৌন থাকো।

সুপ্রিয়ার প্রতি এই সুদৃঢ় বিশ্বাসই ছিল ক্ষেমংকরের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা। এই দুর্বলতাকে তিনি কাটাতে পারেননি অনেকের অনেক সতর্কতা সত্ত্বেও,—এইখানেই ক্ষেমংকরের ট্র্যাজেডির বীজ। বিশ্বাস রক্ষায় সুপ্রিয়ের যে অসামর্থ্যকে তাঁর মতো উদ্যোগী, বুদ্ধিমান এবং দূরদর্শী ব্যক্তির পক্ষে গোড়াতেই বুঝে নেওয়া উচিত ছিল, তা তিনি সময় থাকতে বুঝলেন না। তিনি বাহির থেকে সৈন্য এনে নবধর্মকে বিদূরিত করার যে পরিকল্পনা করেছিলেন, সেই পরিকল্পনার কথা সুপ্রিয়কে তিনি না বলতেও পারতেন। তাতে সুপ্রিয়ের প্রতি তাঁর অনাস্থাও দৃশ্যতঃ প্রকাশ পেত না, আর তাঁর উদ্দেশ্যও সুনিশ্চিত-ভাবেই সিদ্ধ হত। কিন্তু ক্ষেমংকর হয়তো এখানে এই রাবীন্দ্রিক সংস্কারে আচ্ছন্ন যে, মানুষকে বিশ্বাস না করা পাপ। আর বিশ্বাসই যদি করা চলে, তবে পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করতেই বা আপত্তি কি? আর্যধর্মকে রক্ষা করার জন্য অন্য সমস্ত ব্যাপারেই যিনি অত্যন্ত দৃঢ় এবং রূঢ়, বাহির থেকে সৈন্য এনে রক্ত স্রোতে নবধর্মকে ভাসিয়ে দিতেও যাঁর দ্বিধা নেই, তিনি কেবলমাত্র বন্ধুত্বের খাতিরে সম্পূর্ণ ভিন্ন মনোধর্মী সহচরকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশ্বাসের ব্যাপারে এমন সরল হয়ে উঠবেন, এটা স্বাভাবিকও নয়, প্রত্যাশিতও নয়। কিন্তু যাঁর জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটবে। তাঁর সুসমঞ্জস স্বভাবের মধ্যেও এই রকমের একটা গলদ থেকে যায়, এবং সেই জন্যই তিনি অপ্রত্যাশিত ভুল করে বসেন, এবং সেই ভুলেরই ছিদ্র পথে ট্র্যাজেডি প্রবেশ করে তাঁকে ধূলিসাৎ করে দেয়, তাঁর সমস্ত শক্তি, সাহস ও সতর্কতার কোনো কার্যকারিতাই থাকে না। এই প্রকার অস্বাভাবিক বিশ্বাস এবং অপ্রত্যাশিত ভুলেরই পরিণামে ক্ষেমংকরের ট্র্যাজেডি।

সুপ্রিয়ের ট্র্যাজেডি অনেকটা 'বিসর্জনের' জয়সিংহের ট্র্যাজেডির মতো। ক্ষেমংকরের বন্ধুত্বকে অস্বীকার করার ক্ষমতা সুপ্রিয়ের ছিল না। ক্ষেমংকরের

মনোভাবের সঙ্গে তাঁর মনোভাবের মিল নেই, এটা তিনি জানতেন, এবং তাঁকে দিয়ে যে ক্ষেমংকরদের কোনো সাহায্য হতে পারেনা, এটাও তিনি বুঝেছিলেন। বুঝে বিদায় নিতেও চেয়েছিলেন ক্ষেমংকরের কাছে। কিন্তু এই বিদায় নিতে চাওয়ায় তিনি দৃঢ় হতে পারলেন না। যদি দৃঢ় হতে পারতেন, তবে ক্ষেমংকরের সঙ্গে তাঁর ঘটত বিচ্ছেদ। ক্ষেমংকরও তাঁকে বিশ্বাস করে বলে যেতেন না নিজের ষড়যন্ত্রের কথা। এই ষড়যন্ত্রের কথা জানা না থাকায় নবধর্ম ও মালিনীকে রক্ষা করার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করার দায় তাঁর থাকত না এবং পরিণামে ক্ষেমংকরের হাতে তাঁর মৃত্যু এইভাবে না হতেও পারত। কিন্তু সুপ্রিয়ের অদৃষ্টের পরিহাস বা ট্র্যাজিক দুরদৃষ্ট এই যে, তাঁর স্বভাব ছিল বন্ধুত্বকাতর। নিজের বুদ্ধি বিবেচনায় স্থির থাকার উদ্দেশ্যে বন্ধুত্বকে তিনি ভাঙতে পারতেন না। ক্ষেমংকরকে তিনি বললেন,—

বন্ধু, জন্মেছে ধিক্কার।
মূঢ়তার দুর্বিনয় নাহি সহে আর।
যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম ব্রত উপবাস
এই শুধু ধর্ম বলে করিবে বিশ্বাস
নিঃসংশয়ে? বালিকারে দিয়া নির্বাসনে
সেই ধর্ম রক্ষা হবে? ভেবে দেখো মনে
মিথ্যারে সে সত্য বলি করেনি প্রচার;
সেও বলে সত্যধর্ম, দয়াধর্ম-তার,
সর্বজীবে প্রেম—সর্বধর্মে সেই সার
তার বেশী যাহা আছে প্রমান কি তার? (২য়)

এর উত্তরে ক্ষেমংকর যখন বললেন,—

স্থির হও ভাই! মূলধর্ম একবটে,
বিভিন্ন আধার। জল এক, ভিন্ন তটে
ভিন্ন জলাশয়। আমরা যে সরোবরে
মিটাই পিপাসা পিতৃ পিতামহ ধরে
সেথা যদি অকস্মাৎ নব জলোচ্ছ্বাস
বন্যার মতন আসে, ভেঙে করে নাশ
তটভূমি তার, সে উচ্ছ্বাস হলে গত
বাঁধভাঙা সরোবরে জলরাশি যত

বাহির হইয়া যাবে। তোমার অন্তরে
উৎস আছে, প্রয়োজন নাহি সরোবরে—
তাই ব'লে ভাগ্যহীন সর্বজনতরে
সাধারণ জলাশয় রাখিবে না তুমি—
পৈতৃক কালের বাঁধা দৃঢ় তট ভূমি,
বহুদিবসের প্রেমে সতত লালিত
সৌন্দর্যের শ্যামলতা, সযত্ন পালিত
পুরাতন ছায়া তরুগুলি, পিতৃধর্ম
চির পরিচিত নীতি ?······
······ধৈর্য সদা রাখো সখে
ক্ষমা করো ক্ষমাযোগ্য জনে, জ্ঞানালোকে
আপন কর্তব্য করো।" (২য়)

তখন সুপ্রিয় বললেন,—

তব পথগামী
চিরদিন এ অধীন! রেখে দিব আমি
তব বাক্য শিরে ক'রি। যুক্তি সূচি পরে
সংসার কর্তব্য ভার কিছু নাহি ধরে। (২য়)

ক্ষেমংকরের এই অধীনতাকে স্বীকার করা সুপ্রিয়ের বহুদিনকার অভ্যাস। কিন্তু আজ নবধর্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এই অভ্যাসের পরিবর্তন হওয়া উচিত ছিল। তা হ'লে তিনি নবধর্মকে অবলম্বন ক'রে জীবনকে সার্থক করতে পারতেন।

বিদ্রোহী এই ব্রাহ্মণদের সভায় যার নির্বাসন চাওয়া হচ্ছিল, সেই রাজকন্যা মালিনী স্বয়ং এসে উপস্থিত হলে অধিকাংশ ব্রাহ্মণের বিদ্রোহ শান্ত হয়ে গেল, তাদের দেখা গেল মালিনীরই নবধর্মের অনুগামী হয়ে যেতে। নবধর্মের জন্য সুপ্রিয়ের চিত্ত এই সময় আরেকবার বিচলিত হয়ে উঠল। ক্ষেমংকর তাঁকে পুনরায় নিজের অনুগামী ক'রে রাখবার জন্য তাঁর (সুপ্রিয়ের) আবেগকে উদ্বোধিত করবার মানসে বললেন,—

দেখো মনে স্মরি
আর্যধর্ম মহাদুর্গ এ তীর্থ নগরী
পুণ্য কাশী। দ্বারে হেথা কে আছে প্রহরী ?

সেকি আজ স্বপ্নে রবে কর্তব্য পাসরি
শত্রু যবে সমাগত, রাত্রি অন্ধকার,
মিত্র যবে গৃহদ্রোহী, পৌর পরিবার
নিশ্চেতন। হে সুপ্রিয়, তুলে চাও আঁখি।
কথা কও। বলো তুমি, আমারে একাকী
ফেলিয়া কি চলে যাবে মায়ার পশ্চাতে
বিশ্বব্যাপী এ দুর্যোগে, প্রলয়ের রাতে? (২য়)

ক্ষেমংকরের উদ্দেশ্য সফল হল। আবেগে উচ্ছ্বসিত সুপ্রিয় বলে উঠলেন,—"কভু নহে, কভু নহে। নিদ্রাহীন চোখে দাঁড়াইব পার্শ্বে তব।" (২য়) ক্ষেমংকর এইভাবে জোর করে আদায় করছেন সুপ্রিয়ের সহায়তা। হয়তো সুপ্রিয় ছাড়া আর নির্ভরযোগ্য কেউ নেই বলেই ক্ষেমংকর এইভাবে সুপ্রিয়ের সহায়তা আদায় করছেন, বন্ধুত্বের সুযোগ নিচ্ছেন। এর মধ্যে ক্ষেমংকরের সুস্পষ্ট স্বার্থ আছে, কিন্তু সুপ্রিয়ের তেমন কোনো স্বার্থই নেই। তিনি নিঃস্বার্থ ভাবেই, কেবল বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষার্থেই ক্ষেমংকরকে সহায়তা প্রদানে রাজী করলেন এবং তাও নিজের বিবেক বুদ্ধিকেই নির্যাতিত ক'রে। তারপরেই সুপ্রিয়কে জানতে হ'ল ক্ষেমংকরের ষড়যন্ত্রের কথা। ক্ষেমংকর বললেন, "দেখো সখে, তুমিও ভুলোনা শেষে নূতন কুহকে, ছেড়ো না আমায়। মনে রেখো সর্বক্ষণ প্রবাসী বন্ধুরে।" সুপ্রিয় তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, "সখে, কুহক নূতন, আমি তো নূতন নহি। তুমি পুরাতন, আর আমি পুরাতন।"

এই সময় পর্যন্তও বোধহয় সুপ্রিয়ের ধারণা ছিল, তিনি ক্ষেমংকরের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারবেন। আর্যধর্ম সম্পর্কে তাঁর জন্মগত সংস্কার, যে সংস্কারকে ক্ষেমংকর বারে বারে উদ্‌বোধিত ক'রে তাঁর কাছ থেকে সহায়তার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছেন, সেই সংস্কারই হয়ত তাঁকে এই সাহস জুগিয়েছিল যে, তিনি ক্ষেমংকরের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারবেন। কিন্তু সুপ্রিয়ের দুরদৃষ্টক্রমে তা হয়নি। আর্যধর্মের প্রতিভূ ক্ষেমংকরের সান্নিধ্যে তিনি ভেবেছিলেন, তাঁর মধ্যে আর্যধর্মের সংস্কারের কিছু অবশিষ্ট আছে। কিন্তু ক্ষেমংকর দেশান্তরে যাওয়ার পরেই বুঝলেন যে, আর্য-ধর্ম সম্পর্কে তাঁর জন্মগত সংস্কারের কিছুই অবশিষ্ট নেই, নবধর্মের বাণী লাভ ক'রে তিনি যেন অন্য জন্মভূমিতে এসে পৌচেছেন। মালিনীর কাছে ক্ষেমংকরের দেশান্তরে যাওয়ার বৃত্তান্ত বর্ণনা ক'রে তিনি বলেছেন,—

তারপরে জান তুমি কী ঘটিল মোর।
লভিলাম যেন আমি নবজন্ম ভূমি
যেদিন এ শুষ্ক চিত্তে বরষিলে তুমি
সুধাবৃষ্টি। 'সর্বজীবে দয়া' জানে সবে—
অতিপুরাতন কথা—তবু এই ভবে
এই কথা বসি আছে লক্ষ্য বর্ষ ধরি
সংসারের পরতীরে। তারে পার করি
তুমি আজি আনিয়াছ সোনার তরীতে
সবার ঘরের দ্বারে।······ (৪র্থ)

····· স্বর্গ আছে কোন্ দূরে,
কোথায় দেবতা—কেবা সে সংবাদ জানে!
শুধু জানি বলি দিয়া আত্ম অভিমানে
বাসিতে হইবে ভালো, বিশ্বের বেদনা
আপন করিতে হবে—যে কিছু বাসনা
শুধু আপনার তরে তাই দুঃখময়।
যজ্ঞে যাগে তপস্যায় কভু মুক্তি নয়,
মুক্তি শুধু বিশ্ব কাজে······

সুতরাং ভ্রান্ত আর্যধর্মের জন্য ক্ষেমংকরের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষাও যেন তাঁর পক্ষে অধর্ম, রক্ষা না করাও তেমনি অধর্ম। নবধর্মের মর্যাদা রক্ষা করতে হলে প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করাই যেমন কর্তব্য, তেমনি বন্ধুত্ব ও বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করতে হলে প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করাই কর্তব্য। এখন সুপ্রিয় কিসের মর্যাদা রক্ষা করবেন?—এই দ্বন্দ্বের মধ্যে তিনি নিপতিত। ক্ষেমংকরকেও যদি এই নবধর্মের মধ্যে পাওয়া যেত, তবে সেটা হত সবচেয়ে আনন্দের বিষয়। ক্ষেমংকরের জন্য তিনি রাত্রিতে ঘরে ফিরে কেঁদেছেন,—'বন্ধু, বন্ধু, কোথা গেছ বহু বহু দূরে—অসীম ধরণী তলে মরিতেছ ঘুরে।' কিন্তু বৃথা। তাই এখন সুপ্রিয়ের একমাত্র প্রার্থনা, ক্ষেমংকর কাশী নগরীতে যে ঝড় বহন করে আমার শপথ নিয়ে গেছেন, তা যাতে না আসে, সেই ঝড়কে যাতে পরিহার করা যায়। কিন্তু ঝড় অনিবার্যভাবেই এল। ক্ষেমংকরের পত্রে তিনি জানলেন,—

রত্নবতী নগরের রাজগৃহ হতে
সৈন্য লয়ে আসিছে যে শোণিতের স্রোতে
ভাসাইতে নবধর্ম, ভিড়াইতে তীরে
পিতৃধর্ম মগ্নপ্রায়, রাজকুমারীরে
প্রাণ দণ্ড দিতে।

নবধর্ম এবং নবধর্মের অধিষ্ঠাত্রী নায়িকা মালিনীর উপর সম্ভাব্য আক্রমণের এই সংবাদে সুপ্রিয় নবধর্মের প্রতিই তাঁর কর্তব্য করলেন। বন্ধুর কাছ থেকে এত বড় আঘাতে তিনি বন্ধুর বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করতে পারলেন না। বন্ধুত্বের বন্ধন গেল ছিন্ন হয়ে—

প্রচণ্ড আঘাতে সেই
ছিঁড়িল প্রাচীন পাশ এক নিমেষেই।
রাজারে দেখানু পত্র।

নবধর্মের প্রতি কর্তব্য রক্ষা করার জন্য সুপ্রিয় রাজার কাছে সংবাদ ফাঁস করে দিলেন বটে; কিন্তু বন্ধুর বিশ্বাসভঙ্গের আত্মগ্লানিতে তাঁর চিত্তে তীব্র অন্তর্জ্বালা দেখা দিল। মালিনীর কাছে এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

"আমি হেথা লুটাতেছি
পৃথ্বীতলে—আপনার মর্মে ফুটাতেছি
দন্ত আপনার।' (৪র্থ)

এখানে বোঝা যায় যে, নবধর্মের প্রতি কর্তব্য সাধন করতে গিয়ে সুপ্রিয় সর্বজনীন এবং সর্বকালীন ন্যায়-নীতিবোধকে বিস্মৃত হননি। নবধর্মের প্রতি কর্তব্য করতে গিয়ে তিনি যা করলেন. তা যে সর্বজনীন ন্যায় বিচারে একটা গুরুতর বিশ্বাসভঙ্গ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সুপ্রিয় সেই বিচারে নিজেকে অপরাধী বিবেচনা করেছেন, এবং নিজের প্রতি নিজের শাস্তি হিসাবে তীব্র অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছেন।

কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট নয়। সর্বজনীন নীতিভঙ্গের যে সর্বজনীন বিচার, তার শাস্তি কেবল অপরাধীর আত্মগত হলেই চলে না, তার একটা বস্তুগত বিশিষ্ট রূপ ও পদ্ধতি আছে যা অপরাধীকে বাইরে থেকেও আঘাত করে। বন্দী ক্ষেমংকরের শৃঙ্খলাঘাতে সুপ্রিয়ের মৃত্যুর মধ্যে শাস্তির সেই বস্তুগত বিশিষ্ট রূপটি দেখা গেল, যা সুপ্রিয়ের আত্মগত অন্তর্জ্বালার শাস্তির অতিরিক্ত হিসেবে, তাঁকে বাইরে থেকেও আঘাত করে তাঁর মৃত্যু ঘটিয়ে দিল।

ক্ষেমংকরের প্রতি এবং আর্যধর্মের প্রতি বিশ্বাস বজায় রাখার জন্য সুপ্রিয়ের যে কৃত্রিম প্রচেষ্টা, তাই যে তাঁর জীবনের এই শোচনীয় পরিণতির কারণ তা সুস্পষ্ট, সুতরাং এইটাই তাঁর জীবনের ট্র্যাজিক ভ্রান্তি,—এটাকে পরিহার করতে পারলেই নবধর্ম ও বন্ধুত্বের মধ্যকার ট্র্যাজিক আবর্তের মধ্যে প্রবেশ না করেও থাকতে পারতেন। তাঁর এই শোচনীয় মৃত্যুই তাঁর ট্র্যাজেডিকে পরিণতি দান করেছে, তাঁর ট্র্যাজেডির রূপটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ক্ষেমংকরের দৃষ্টিতে এই মৃত্যু সুপ্রিয়ের প্রাপ্য ঠিকই। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব থেকেই বিশ্বাসভঙ্গ জনিত তাঁর যে অনুশোচনা, শাস্তি হিসেবে সুপ্রিয়ের দৃষ্টিতে তাও কিছু কম নয়। তাঁর এই অনুশোচনাই তাঁর প্রতি আমাদের করুণাকে উদ্রিক্ত করে। তার উপরে ক্ষেমংকর প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ড সুপ্রিয়ের পক্ষে অতিরিক্ত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনিবার্য ও যথার্থ এক শাস্তি হিসেবে তা সেখানে এক ভয়ানক ভাবেরও সৃষ্টি করেছে। এই দুটি ভাবেরই সংমিশ্রণে এখানে সৃষ্ট হয়েছে প্রকৃত ট্র্যাজেডির রস।[১২]

রাজকুমারী মালিনীর ট্র্যাজেডি সংযুক্ত রয়েছে সুপ্রিয়ের ট্র্যাজেডির সঙ্গে। সুপ্রিয়কে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে তাঁর নারী জীবনের স্বপ্ন। তাঁর জীবনের ছিল দুটি দিক,—একটি তত্ত্বের দিক যেখানে তিনি নবধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্তা কাশ্যপের শিষ্যা; আর একটি তাঁর নারীত্বের দিক,—যেখানে তিনি সুপ্রিয়ের প্রেমিকা, সুপ্রিয়ের সান্নিধ্য ও মিলন প্রত্যাশায় স্বপ্নাবিষ্ট। ক্ষেমংকরের হাতে সুপ্রিয় নিহত হওয়ায় মালিনীর এই স্বপ্নাবেশ ভেঙ্গে গেল নিষ্করুণ ভাবে, আর সেই চরম দুঃখের ক্ষণে তাঁকে পরীক্ষা দিতে হ'ল নবধর্মের মৈত্রী ও করুণার—সর্বজীবে দয়ার আর রাজার কাছে প্রার্থনা জানাতে হ'ল তাঁর স্বপ্ন ঘাতক ক্ষেমংকরকেই ক্ষমা করার। জীবনের ব্যক্তিগত দিকের সঙ্গে তত্ত্বগত দিকের

১২. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সুপ্রিয়ের চরিত্রের পরিকল্পনার মধ্যেই ট্র্যাজেডির উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "সহস্র শুভ প্রেরণা সত্ত্বেও মানুষ যে নিয়তিকে কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারেনা, সুপ্রিয় তাহারই অমোঘ দণ্ড নিঃশব্দে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কবল হইতে পরিত্রাণের যেমন কোন উপায়ও ছিল না, তিনি তাহার প্রয়াসও করেন নাই। হৃদয়ধর্মের স্রোতোবেগে তিনি কেবল ভাসিয়াই চলিয়াছেন, ক্ষুদ্রতম তৃণখণ্ড তাঁহার হাতের কাছ দিয়া ভাসিয়া যাইতে দেখিয়াও তাহা অবলম্বন করিবার জন্য তিনি কখনও হস্ত প্রসারণ করেন নাই। ট্র্যাজেডির উপাদান হিসাবে এই চরিত্রের পরিকল্পনাই সমধিক সার্থক।"

—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য: বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, (১৯৬১) পৃ. ৯৬।

এইভাবে সামঞ্জস্য বিধান করাটা যথার্থই ট্র্যাজেডির বিষয়। ব্যক্তিগত জীবনের ধ্বংসের উপরে তত্ত্বের পতাকা তুলে ধরায় কৃতিত্ব আছে, কিন্তু বেদনাও আছে। সাহিত্যের রসাস্বাদে কৃতিত্ব অপেক্ষা বেদনাই আমাদের মনে সাড়া জাগায় বেশী! ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করতে বলায় সময়কায় এই মূক বেদনায় উপরই প্রতিষ্ঠিত মালিনীর ট্র্যাজেডি।

কাশ্যপের কাছে নবধর্মের দীক্ষা নেওয়ার পর নবধর্মের উৎসাহে মালিনী তাঁর নারীত্বকে বিস্মৃত। কন্যার মধ্যে এই বৈরাগ্যকে লক্ষ্য ক'রে জননী উদ্বেগে আকুল। মালিনী জননীর উদ্বেগকে দূর করার জন্য জননীকে ভুলে যেতে বলছেন যে তিনি কন্যা,—

"ওগো, ছেড়ে দে মা, কন্যা আমি নহি আজ,
নহি রাজসুতা—যে মোর অন্তরযামী
অগ্নিময়ী মহাবাণী, সেই শুধু আমি।" (১ম)

বিশেষ নারীরূপকে পরিত্যাগ করে নবধর্মের নির্বিশেষ বাণীরূপ লাভ করার এই মোহ মালিনীর মধ্যে আরো দৃঢ় হয়ে উঠল দ্বিতীয় দৃশ্যে বিদ্রোহী এবং মালিনীরই নির্বাসন কামনাকারী আর্য ব্রাহ্মণদের নবধর্মের পক্ষে আনয়ন করতে পারার সাফল্যে। এই সাফল্যের গৌরবে, পরে তিনি জননীর কাছে বলেছেন,—

'মা আমার,
এ প্রাচীরে মোরে আর নারিবে লুকোতে।
তব অন্তঃপুরে আমি আনিয়াছি সাথে
সর্বলোক—দেহ নাই মোর, বাধা নাই,
আমি যেন এ বিশ্বের প্রাণ।' (৩য়)

কিন্তু পুরুষের মতো বিদ্রোহী ব্রাহ্মণদের মধ্যে গিয়ে নবধর্মের কঠোর কর্তব্য পালন করতে গিয়ে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই নিজেকে নবধর্মের 'মহাবাণী', 'এ বিশ্বের প্রাণ' ভাবলেও কার্যতঃ অন্তঃপুরে ফিরে এসে মাতৃস্নেহের কাছে কন্যারূপেই ধরা দিলেন নিজেকে। মাতাকে আলিঙ্গন করে তিনি বললেন,—

মা গো, শ্রান্ত এবে আমি। কাঁপিতেছে দেহ।
কোথা গিয়েছিনু চলে ছাড়ি মা'র স্নেহ

প্রকাণ্ড পৃথিবী মাঝে। মা গো নিদ্রা আন্
চক্ষে মোর। ধীরে ধীরে কর্ তুই গান
শিশুকালে শুনিতাম যাহা। (৩য়)

এখানে বোঝা যায় যে, নবধর্মের বাণী তাঁর মধ্যে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করলেও নবধর্মের কঠোর কর্তব্য পালন করার মতো সাধ্য তাঁর নেই, বাধা তাঁর নারীত্ব যা মায়ের স্নেহ চায়, প্রিয়-র ভালবাসা চায়। নবধর্মের নতুন উৎসাহ প্রায়শঃই তাঁকে তাঁর নারীত্ব সম্পর্কে ভুলিয়ে রাখে, কিন্তু যখনই তাঁর চিত্ত লঘু হয়ে আসে, তখনই এই নারীত্ব আত্মপ্রকাশ করে ফেলে। তৃতীয় দৃশ্যে তাঁর এই লঘুচিত্ত যেমন প্রার্থনা করেছে মাতৃস্নেহ, তেমনি তাঁর এই লঘুচিত্তই চতুর্থ দৃশ্যে সুপ্রিয়ের প্রিয় সান্নিধ্যকে চেয়েছে একান্তভাবে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে।

রাজ উপবনে সুপ্রিয়ের সঙ্গে আলাপরত অবস্থায় যখন প্রতিহারী এসে
...াকে বিদায় করে দেন এই

কাছে
নাহি।
হি—
।" (৪র্থ)

...সম্পূর্ণ করতে পারেনি, তা
...চিত্তকে পূর্ণ করার উৎসের
...খান থেকেই বোঝা যায়।
...মাঝে মাঝে ভরিবার" জন্য
..., এখানেই মালিনীর বিশিষ্ট

...বলেছেন, "ব্যক্তিগত প্রেমের প্রবল
...প্রেরণার চেয়ে প্রবলতর হইয়া দেখা
...া বাহির হইয়া আসিল। নাটকের

—দ্রঃ রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহঃ পূর্ণাঙ্গ সং, (১৯৬৬) পৃ. ৭৩।

সুপ্রিয়ের সান্নিধ্যে আসার পর কাশ্যপের দেওয়া দীক্ষাও মালিনীর কাছে অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেল। সুপ্রিয়ের কাছেই এখন তিনি চাইছেন পথের নিশানা—

…বিশ্বে বাহিরিয়া
আজি মোর জাগে ভয়, কেঁপে ওঠে হিয়া,
কী করিব কী বলিব বুঝিতে না পারি—
মহাধর্ম তরণীর বালিকা কাণ্ডারী
নাহি জানি কোথা যেতে হবে। মনে হয়
বড়ো একাকিনী আমি—সহস্র সংশয়,
বৃহৎ সংসার, অসংখ্য জটিল পথ,
নানা প্রাণী—দিব্যজ্ঞান ক্ষণপ্রভাবৎ
ক্ষণিকের তরে আসে। তুমি মহাজ্ঞানী
হবে কি সহায় মোর? (৪র্থ)

এইভাবে দেখা যায় মালিনী সুপ্রিয়ের মধ্যেই খুঁজে পাচ্ছেন তাঁর প্রার্থিত সব কিছু। সুপ্রিয়ের কাছেই ভরে ওঠে তাঁর নারী-চিত্তের রিক্ততা, আবার সুপ্রিয়ের কাছেই পাওয়া যাচ্ছে নবধর্মে সহায়তা। অর্থাৎ তাঁর চিত্তের ব্যক্তিগত দিক এবং তত্ত্বের দিক—দুটো দিকই সার্থক হয়ে উঠেছে সুপ্রিয়ের সান্নিধ্যে। সুতরাং সুপ্রিয় তাঁর পরিপূর্ণ চিত্তের আকাঙ্ক্ষিত দয়িত. তাঁর নারীজীবনের স্বপ্ন বাসনা।

নিজের এই অপূর্ব বাসনা সম্পর্কে মালিনী নিজেও অসচেতন নন। অনুকূল মুহূর্তে পিতার সম্মুখে তাঁর লজ্জাই প্রমাণ করে দিল তাঁর চিত্তের এই রোমান্টিক স্বপ্ন কল্পনা। রাজার কাছে ক্ষেমংকরের সংবাদ প্রকাশ করে দেওয়ার পুরস্কার হিসেবে রাজা যখন সুপ্রিয়কে বললেন, "রাজার হৃদয় তুমি করিয়াছ জয়, সেথা হতে লহ তুলি রত্ন সর্বোত্তম হৃদয়ের,"—তখনই প্রকাশিত হয়ে পড়ল মালিনীর এই রোমান্টিক লজ্জা: "কোথা হতে এল আজ অশ্রুবাষ্পে ছলছল কম্পমান লাজ—যেন দীপ্ত হোম হুতাশন শিখা ছাড়ি সদ্য বাহিরিয়া এল স্নিগ্ধ সুকুমারী দ্রুপদ দুহিতা।" এই সময় রাজা স্বগত যে উক্তিটি করেছেন, তার মধ্যেই মালিনীর এই নারী রূপটি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে,—

"বহুদিন পরে মোর মালিনীর ভাল
লজ্জার আভায় রাঙা। কপোল উষার

যখনি রাঙিয়া উঠে, বুঝা যায়, তার
তপন উদয় হতে দেরী নাই আর।
এ রাঙা আভাস দেখে আনন্দে আমার
হৃদয় উঠেছে ভরি, বুঝিলাম মনে
আমাদের কন্যাটুকু বুঝি এতক্ষণে
বিকশি উঠিল—দেবী না রে, দয়া না রে,
ঘরের সে মেয়ে।" (৪র্থ)

মালিনীর এই নারীরূপ যখন চরিতার্থতার ঠিক মুখোমুখি, ঠিক তখনই, যাঁকে নিয়ে তাঁর জীবনের চরিতার্থতা, সেই সুপ্রিয়ের হ'ল মৃত্যু। মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ক্ষেমংকর শেষ আকাঙ্ক্ষা হিসেবে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন সুপ্রিয়ের সঙ্গে, আর সেই সুযোগেই ক্ষেমংকর হাতের লৌহ শৃঙ্খল দিয়ে মৃত্যু ঘটালেন সুপ্রিয়ের। সুপ্রিয়ের এই অশুভ পরিণামের পূর্বাভাস মালিনীর চোখে ধরা প'ড়েছিল। ক্ষেমংকরের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ঘটনাস্থলে যখন সুপ্রিয়কে ডেকে আনতে বলা হল, তখনই মালিনী ক্ষেমংকরের মুখের মধ্যে কোনো ভয়ংকর উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। পিতাকে বলেছিলেন—

"হৃদয় কাঁপিছে বুকে।
কী যেন পরমাশক্তি আছে ওই মুখে
বজ্রসম ভয়ংকর। রক্ষা করো পিতঃ,
আনিয়ো না সুপ্রিয়েরে।" (৪র্থ)

এই ইঙ্গিত পাওয়াতেই প্রমাণিত হয় সুপ্রিয় সম্পর্কে মালিনীর চিত্তের গভীরতা। কিন্তু যত গভীরই হোক সুপ্রিয়ের প্রতি তাঁর অনুরাগ, তা কিছুতেই সুপ্রিয়ের মৃত্যুকে বাধিত করতে পারল না, পূর্ব-প্রাপ্ত অশুভ ইঙ্গিত কোনো কাজেই লাগল না। তাঁর চোখের সম্মুখেই ঘটল সুপ্রিয়ের মৃত্যু।

সুপ্রিয়ের এই মৃত্যু মালিনীর স্বপ্নসাধকে ভেঙ্গে ধূলিসাৎ করে দিল—তাঁর নারী জীবনের প্রত্যাশা অচরিতার্থতার বিপরীত মুখী বন্যায় ভেসে গেল। এই পরম দুঃখের মুহূর্তে তাঁর পক্ষে মূর্চ্ছা যাওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু মূর্চ্ছা যাওয়ার পূর্বে তাঁকে একটি কথা বলতেই হ'ল,—"মহারাজ, ক্ষম ক্ষেমংকরে।" ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করার অনুরোধ মালিনী এর পূর্বেও দু'বার (৪র্থ দৃশ্যেই) করেছেন পিতার কাছে। কিন্তু তখন ক্ষেমংকরের হাতে সুপ্রিয়ের মৃত্যু

সম্ভাবনা ছিলনা. এবং মালিনীও তেমন কোনো ইঙ্গিত পাননি। সুতরাং তখন ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করার অনুরোধের অর্থ ছিল নবধর্মের রূপায়ণ,—'সর্বজীবে দয়া', এই শিক্ষার ফল। সাধারণ উদার মনোভাবের বশবর্তী হয়েই এই অনুরোধ তখন তিনি করেছিলেন,—এই অনুরোধ করতে গিয়ে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়নি। কিন্তু এখন সুপ্রিয়ের মৃত্যুর পর ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করতে বলায় তাঁর চিত্ত নিশ্চয়ই পূর্বের মতো নির্বিকার বা সাধারণভাবে উদার ছিল না, তাঁর চিত্তের রক্ত-রুদ্ধ কণ্ঠে এখন তাঁকে বলতে হয়েছে ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করার কথা। যাঁর হাতে তাঁর স্বপ্নসাধ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে, তাঁকে অভিশাপ দেওয়াই ছিল মালিনীর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তার পরিবর্তে তাঁর ধর্মাদর্শ অনুযায়ী পূর্বের ক্ষমা চাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে তাঁকে এমন দুঃখের দিনেও ক্ষেমংকরের জন্য ক্ষমা চাইতে হ'ল। নিজের জীবনের ধ্বংসের মধ্যেও তিনি তুলে ধরলেন তাঁর আদর্শ,—এটা নবধর্মের পক্ষে মস্তবড়ো কৃতিত্ব, কিন্তু মালিনীর পক্ষে সাংঘাতিক ট্র্যাজেডি।

'মালিনী' নাটকের শেষ পরিণতির মধ্যে অনেকেই[১৪] গ্রীক ট্র্যাজেডির রীতিকে খুঁজে পেয়েছেন, এবং গ্রীক ট্র্যাজেডির রীতির সঙ্গে 'মালিনী'র রীতির কতটা সে মিল আছে কি না আছে, সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেইসব আলোচনা উল্লেখযোগ্য। তবে একথাও ঠিক যে, এই নাটকে গ্রীক্‌প্রভাব কতটা আছে কি না আছে, তার গুরুত্বও খুব বেশি নয়,[১৫] বিশেষ যেহেতু রবীন্দ্রনাথ নিজেই নাটকের 'সূচনা'য় এ সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতার অভাবের কথা স্বীকার করেছেন। তবে আমরা মালিনীর জীবনে যেন গ্রীক নাটকের ভবিতব্যতাকে লক্ষ্য করি,—তাঁর সমস্ত ট্র্যাজেডি যেন তাঁর নিয়তির জন্য, তাঁর যেন কিছু করণীয় ছিল না। আর ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয়ের মধ্যে লক্ষ্যকরা যায় রোমান্টিক ট্র্যাজেডির 'চরিত্রই নিয়তি'—এই নীতি। নিজেদের ভুলের কারণেই এদের জীবনে যেন ট্র্যাজেডি ঘটেছে।

ট্র্যাজেডি হিসেবে 'বিসর্জনের' সঙ্গে 'মালিনীর' অনেক বিষয়ে মিল লক্ষ্য করা যায়,—বিশেষতঃ চরিত্র সৃষ্টির দিক থেকে। কিন্তু ট্র্যাজেডির

১৪. ডঃ নীহাররঞ্জন রায় : রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা. ২য়, (১৩৫৩) পৃ. ৭২।
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ (পূর্ণাঙ্গ. ১৯৬৬) পৃঃ ১০০—১০১
১৫. ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র : রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ, ১ম, (১৩৭০) পৃ. ২৬৮।

রসের দিক থেকে বেশ পার্থক্য রয়েছে। "দু'টি নাটকই ট্র্যাজেডি কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মালিনীর ট্র্যাজেডি এত ঘনীভূত এবং এত প্রবল এবং এত স্বল্পকাল বিস্তৃত যে, বিসর্জনের ট্র্যাজেডি সেই তুলনায় অনেকটা তরল ও নিষ্প্রভ। পাঠকের অথবা দর্শকের মনের পুঞ্জীয়মান বেদনা মাঝে মাঝে লাঘব করিবার চেষ্টা 'বিসর্জনে' আছে, 'মালিনী'তে তাহা অনুপস্থিত, এবং সেই হেতু 'মালিনী'র ট্র্যাজেডি অনেক ঘন ও নিবিড়।"[১৬]

'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯) নাটকটি 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসের নাট্যরূপ। এই নাটকেও, যেমন উপন্যাসটিতেও, রাজা প্রতাপাদিত্যের ক্ষমতা-লোলুপতা এবং সেই কারণেই সর্বপ্রকারের হৃদয়-হীনতাকে মুখ্যভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। ক্ষমতালোলুপ প্রতাপাদিত্য-পরিবারের মধ্যেও স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন। তাঁর চিত্ত ক্ষমাহীন এবং বিবক্তি ভাজনদের প্রতি অত্যন্ত অনাবশ্যক ভাবেই তাঁর। পুত্রের প্রতি যেমন তাঁর স্নেহ নেই, পুত্রবধূর প্রতিও তেমনি নেই প্রসন্নতা। কন্যার প্রতি যেমন তিনি সহানুভূতিহীন, তেমনি জামাতার প্রতিও তাঁর ঘৃণা এবং জিঘাংসা। প্রতাপাদিত্যের এই সামগ্রিক হৃদয়-হীনতারই বলি পুত্রবধূ সুরমা এবং কন্যা বিভা।

পুত্র উদয়াদিত্য পিতৃস্বভাবের বিপরীত। মাধবপুর শাসনের ভার তাঁর উপর ছিল। কিন্তু সন্ত্রাস সৃষ্টি করে খাজনা আদায় করতে না পারায় পিতা প্রতাপাদিত্য মাধবপুর শাসনের ভার তাঁর হাত থেকে নিয়ে নেন এবং পুত্রকে অপদার্থ, স্ত্রৈণ, রাজপুত্র হওয়ার অযোগ্য প্রভৃতি তিরস্কারে অবজ্ঞা করতে থাকেন। উদয়াদিত্যের উদার প্রাণ এবং সর্বত্র বিস্তৃত সহানুভূতি প্রতাপাদিত্যের কাছে কোনো মূল্যই পায় না। প্রতাপাদিত্য অমূলক সন্দেহের বশবর্তী হয়ে খুল্লতাত বসন্ত রায়কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন, অনাবশ্যক ক্রোধের বশবর্তী হয়ে আমন্ত্রিত জামাতাকে হত্যার ব্যবস্থা করেন আর উদয়াদিত্য প্রতি-ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছায় পিতার পাপ ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা করেন। রাজা মনে করেন, পুত্রবধূ সুরমাই পুত্রের মস্তিষ্কে এইভাবে দুষ্ট বুদ্ধির সঞ্চার করছে। বিরক্ত হয়ে তিনি সুরমাকে পিতৃগৃহে পাঠাতে চান। মহিষী ঔষধ প্রয়োগ ক'রে সুরমার মধ্যকার অমঙ্গলকে বিতাড়িত করতে চান, যাতে উদয়াদিত্যের উপর সে অমঙ্গলময় প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। সুরমার যেগুলি প্রকৃত গুণ,

১৬. ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ঃ রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, ২য়, (১৩৫৩) পৃ ৭২

সেগুলি যখন দোষ রূপে বিবেচিত হয়, এবং তা দূরীকরণের জন্ম শান্তি ও বশীকরণ ঔষধের ব্যবস্থা হয়, তখন ব্যাপারটা খুবই শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃত পক্ষে রাজমহিষীর পরামর্শে দাসী বামীর হাতুড়ে ঔষধের বিষে সুরমার শোচনীয় মৃত্যুই হয় শেষ পর্যন্ত। নিরপরাধ গৃহবধূর অবজ্ঞা-ক্লিষ্ট জীবনের এরূপ অপমৃত্যু যথার্থ ট্র্যাজিক। সুরমার মৃত্যুর এই ট্র্যাজিক রূপ তার স্বামীর কথায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উদয়াদিত্য ভগিনী বিভাকে স্ত্রীর এই মৃত্যু সম্পর্কে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেছেন, "দুঃখ করিস নে বিভা, সে গেছে, সে সুখে গেছে। এ বাড়িতে এসে সেই সোনার লক্ষ্মী এই আজ প্রথম আরাম পেল।" (৩।৩)। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সুরমার এই ট্র্যাজেডিকে যথার্থ ভাবে চিত্রিত করেন নি এই নাটকে। বরং 'বৌঠাকুরাণীর হাটে'র বৌঠাকুরাণী অর্থাৎ বিভার জীবনের বঞ্চনা এবং সেই সূত্রে গড়ে ওঠা ট্র্যাজেডিকেই রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে বিশদভাবে প্রদর্শিত করেছেন।

এই নাটকে বিভাকে সুরু থেকেই দেখা যায় বিষণ্ণ। পিতৃগৃহে বাস তার কাছে কোনো আনন্দেরই নয়। বরং স্বামীর প্রতি পিতার অপরিসীম অবহেলা তার পক্ষে পিতৃগৃহকে কণ্টকাকীর্ণ করে তুলেছে। গৃহবধূ সুরমা তাঁকে অনুরোধ করে স্বামীর কাছে পত্র লিখবার জন্য। কিন্তু স্বামীর সম্মানরক্ষা প্রয়াসিনী বিভা অনুরোধের জবাবে বলেন, "যেখানে তার আদর নেই সেখানে আসবার জন্যে আমি কেন তাকে লিখব? তিনি আমাদের চেয়ে কিসে ছোটো?"—(১।৫)। প্রতাপাদিত্যের পরিবারের নিষ্করুণ পরিবেশের মধ্যে বিভার এই স্পর্শকাতর ব্যর্থ অভিমান একটা করুণ রাগিণীকে যেন নীরবে বাজিয়ে তোলে। প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত এবং বিভার পিতামহ বসন্ত রায় বিভাকে ঠিকই বলেছেন, "দিদি, রাজার ঘরে যখন জন্মেছিস তখন অভিমান করে ফল নেই—এরা সব পাথর।" (১।৫)

বসন্ত রায়ের চেষ্টায় প্রতাপাদিত্য জামাতা চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রামচন্দ্র রায়কে নিমন্ত্রণ করেন। রামচন্দ্র রায় কিছুটা স্থূলবুদ্ধি মানুষ। বিদূষক রমাই-এর তিনি বিশেষ বশীভূত। রমাইএর পরামর্শ অনুসারেই তিনি তাঁর বুদ্ধির দিক পরিবর্তন করেন। নাটকে রামচন্দ্রকে যখন প্রথম দেখি, তখন তিনি নিজ কক্ষে পারিসদবর্গের সঙ্গে স্থূল তামাসায় ব্যস্ত। যে পত্নী তাঁর জন্যে দুঃখে দিনাতিপাত করছেন, সেই পত্নীর জন্ম গভীরভাবে চিন্তা করবার কোনো সূক্ষ্ম বোধই তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না। স্বামীর সম্মান রক্ষা করার জন্ম

বিভার উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করে স্বামীর মহত্ত্ব এবং অপরাপর গুণাবলী সম্পর্কে আমাদের মধ্যে যে সম্ভ্রম বোধ জেগে উঠেছিল, দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রামচন্দ্র রায়কে দেখে আমাদের সেই সম্ভ্রমবোধ বিচলিত হয়ে যায় এবং স্বামী-গৌরব রক্ষা প্রয়াসিনী বিভার জন্য আমাদের চিত্তে একটা সমবেদনার ভাব জেগে ওঠে। আমরা যেন বুঝতে পারি, বিভা-রামচন্দ্রের পরস্পরের চিত্তবৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব রয়েছে। বিভার স্বামীগতপ্রাণতার চিত্তবৃত্তি রামচন্দ্রের স্থূল চিত্তবৃত্তির কাছে যেন বিড়ম্বিত হতে বাধ্য, এবং বিভার জীবনে সেই সূত্রে ট্র্যাজেডিও অনিবার্য।

প্রতাপাদিত্যের নিমন্ত্রণের সুযোগে রামচন্দ্রের চিত্তে পত্নীপ্রেমের উচ্ছ্বাস বা মিলন ব্যাকুলতার পরিবর্তে পূর্বের একটি তথাকথিত অপমানের উগ্র প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা জেগে উঠল। শ্বশুরালয়ের ঠাট্টাকে সহজভাবে গ্রহণ করার রসবোধও তাঁর নেই। তাই ঠাট্টাকে অপমান হিসেবে ধরে নিয়ে প্রতিশোধ নিতে চাইলেন এবং বিদূষকের শরণাপন্ন হয়ে বললেন, 'রমাই, এবারে গিয়ে জিতে আসতে হবে। যদি জয় হয় তবে তোমাকে আমার আংটি উপহার দেব"—(২১)। রমাই বলল, "মহারাজ, জয়ের ভাবনা কী! রমাইকে যদি অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে পারেন, তবে স্বয়ং শাশুড়ি ঠাকরুণকে পর্যন্ত মনের সাধে ঘোল খাইয়ে আসতে পারি" (২।১)। রামচন্দ্র উল্লসিত হয়ে বললেন, 'তার ভাবনা? তোমাকে আমি অন্তঃপুরেই নিয়ে যাব" -(২।১)। পূর্বের একটা তুচ্ছ অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য কাণ্ডজ্ঞানহীন রমাইএর উপর এইভাবে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়াটাই পরিণামে বিভার পক্ষেই মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। কারণ পরিণাম যত দুঃখেরই হোক না কেন, রামচন্দ্রকে তা বিচলিত করে না। তাঁর পক্ষে কোনো প্রকারে বেঁচে যেতে পারলেই সব হ'ল। তাই পরিণামের অপমান তাঁকে বিদ্ধ করতে পারে না। বিদ্ধ করে কোমল প্রাণা, স্বামীর কুকর্মের দায়ভার বহন করতে সতত প্রস্তুত ট্র্যাজিক বিভাকে। তাই শ্বশুরালয়ে এ যাত্রায় জয়লাভ করার জন্য রমাইকে নিয়ে রামচন্দ্রের এই পরিকল্পনা শুধু মাঝখান থেকে বিভার ট্র্যাজেডিকেই ত্বরান্বিত করেছে।

দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যেই দেখা যায় যে, শ্বশুরালয়ে অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য রামচন্দ্র ও রমাই-এর পরিকল্পনার ফল অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে। রামচন্দ্রের এই কাণ্ডজ্ঞান বিহীন স্থূল রসিকতাবোধের পুরস্কার

হিসেবে প্রতাপাদিত্য তাঁর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। বিভার বৈধব্য সংঘটক এই নৃশংস সিদ্ধান্তের পরিবর্তনের জন্ত রাজশ্যালক আবেদন করেছেন। আবেদন করেছেন বসন্ত রায়, "ছেলেমানুষ, অপরিণামদর্শী, সেকি তোমার ক্রোধের যোগ্যপাত্র?" জবাবে প্রতাপাদিত্য বলেছেন, "ছেলেমানুষ! আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায় এ বোঝবার বয়স তার হয়নি? ছেলেমানুষ! কোথাকার একটা লক্ষ্মীছাড়া মূর্খ ব্রাহ্মণ, নির্বোধদের কাছে দাঁত দেখিয়ে যে রোজগার করে খায়, তাকে স্ত্রীলোক সাজিয়ে আমার মহিষীর সঙ্গে বিদ্রূপ করবার জন্ত এসেছে—এতটা বুদ্ধি যার মাথায় যোগাতে পারে, তার ফল কী হতে পারে সে বুদ্ধিটা তার মাথায় জোগাল না? দুঃখ এই, বুদ্ধিটা যখন মাথায় জোগাবে, তখন তার মাথাও শরীরে থাকবে না।"—(২।৫)। প্রতাপাদিত্যের এই সিদ্ধান্ত একেবারেই অপরিবর্তনীয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবার পূর্বেই উদয়াদিত্যের সহযোগিতায় রামচন্দ্র রায় রক্ষা পান, তিনি নৌকাযোগে রাত্রির অন্ধকারে চন্দ্রদ্বীপ পলায়ন করতে হন।

রামচন্দ্র রায় প্রাণে বেঁচে খুশি হলেন, কিন্তু অপমানের বিধ্বংসী আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন বিভার চিত্তে। স্বামীর অপরিণামদর্শী, কুরুচিপূর্ণ স্থূল রসিকতার জন্ত তিনি অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছেন। যে স্বামীর সম্মান রক্ষায় তাঁর এত ব্যস্ততা, সেই স্বামী নিজেই নিজেকে এমন বিকট নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে হাস্যাস্পদ করে তুলবেন,—এটা বিভার পক্ষে এক পরম লজ্জার বিষয়। এর যা দুঃখ, তা স্বামীর প্রাণদণ্ড থেকে অব্যাহতি পাওয়াতেও লাঘব হবার নয়। লজ্জায়-দুঃখে তিনি নিস্তব্ধ হয়ে গেছেন, চোখে তাঁর জল পর্যন্ত নেই। সুরমা বিভাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলল,—"তোর হয়ে যে আমাকে কাঁদতে ইচ্ছা করে ভাই। সব কথাই কি এমনি করে চেপে রাখতে হয়?"—(৩।২)। বিভা উত্তরে বলেন, "কোনো কথাই তো চাপা রইল না বউরাণী। ভগবান তো লজ্জা রাখলেন না।" (৩।২) সুরমা পুনরায় তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্ত বলে, "আমি কেবল এই কথাই ভাবি যে, জগতে সব দাহই জুড়িয়ে যায়। অনেকের মতো এমন কপাল পোড়া সকাল তো রোজ আসবে না; সংসার লজ্জা দিতেই যেমনি, লজ্জা মিটিয়ে দিতেও তেমনি! সব ভাঙাচোরা জুড়ে আবার দেখতে দেখতে ঠিক হয়ে যায়।" কিন্তু কোনো সান্ত্বনাই এখন আর বিভার কাছে সান্ত্বনা নয়। সান্ত্বনা লাভ করতে পারলে তাঁর দুঃখের ব্যাপ্তি

ও গভীরতার পরিমাপ ছোটো প্রমাণিত হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর দুঃখ অসীম এবং সেইজন্যই সান্ত্বনা-নিরপেক্ষ। অসীম দুঃখের অসীম যন্ত্রণা তাঁর জীবনে যেমন অনিবার্যভাবে আসছে, তেমনি তাকে সহ্য করতেও তিনি সর্বরকমে প্রস্তুত হচ্ছেন। সুরমাকে তিনি বললেন, "ঠিক নাও যদি হয়ে যায়, তবেই বা কী? যেটা হয়, সেটা তো সইতেই হয়"—(৩।২)। বিভার জীবনে এই সময়কার হাহাকার সবচেয়ে সুন্দরভাবে বুঝেছে সুরমা। স্বামী উদয়দিত্যর কাছে এ সম্পর্কে সে বলেছে, "এতদিন স্বামীর অনাদরে বাপের পরেই তার (বিভার) অভিমান ছিল—আজ যে তার অভিমান করবারও মুখ রইল না। বাপের নিষ্ঠুরতার চেয়ে তার স্বামীর এই নীচতা তাকে অনেক বেশী বেজেছে। একে তো ভারী চাপা মেয়ে, তার পরে এই কাণ্ড। আজ থেকে দেখো, ওর স্বামীর কথা আমার কাছেও বলতে পারবে না। স্বামীর গর্ব যে স্ত্রীলোকের ভেঙেছে জীবন তার পক্ষে বোঝা, বিশেষতঃ বিভার মতো মেয়ে।" (৩।২)

কিন্তু বিভার এই অন্তর্দাহের এক কণা আগুনও স্পর্শ করতে পারেনি রামচন্দ্র রায়কে। তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে দেখা যায় যে, পত্নীর জন্য তাঁর কাতরতাও নেই, প্রাণ বাঁচাবার জন্য পলায়ন ক'রে চলে আসার জন্য লজ্জাও নেই। তিনি পূর্বের মতোই পারিষদ বর্গের সঙ্গে উদ্দেশ্য বিহীন স্থূল পরিহাসে ব্যস্ত। উপরন্তু রমাই তাঁকে বলছে যে, প্রতাপাদিত্যের কন্যাকে আর ঘরে তুলে এনে ঘর নীচু করার কোনই অর্থ হয় না,—মহারাজ, আপনি যে পাঁকে পা দিয়েছেন সে তো পাঁকের বাবার ভাগ্যি, কিন্তু তাই বলে ঘরে ঢোকবার সময় পা ধুয়ে আসবেন না তো কী? (৩।৫)

এই রমাই-এর বিদ্রূপকে রামচন্দ্র রায় রীতিমত ভয় করেন। পত্নী সম্পর্কে তাঁর মনোভাব যে কখনোই প্রকাশিত হয় না, তার কারণও এই রমাই। তাই তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর মল্ল রামমোহন বিভাকে নিয়ে আসার জন্য যখন অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন রামচন্দ্র অনেক গড়িমসি ক'রে অনুমতি দিয়েও বললেন, "এ কথা যেন কেউ শুনতে না পায়। রমাই কিম্বা মন্ত্রীর কানে এ কথা যেন কোনোমতে না ওঠে।" (৩।৫)।

রামমোহন কিন্তু বিভাকে চন্দ্রদ্বীপে নিয়ে আসতে সফল হয়না। কারণ রামচন্দ্ররায়ের পলায়নে সহায়তা করার অপরাধে উদয়াদিত্য প্রতাপাদিত্যের কারাগারে বন্দী। স্বামীর হিতার্থে বন্দীত্বকে বরণ করেছেন যে ভ্রাতা, তাঁকে

নিঃসঙ্গ অবস্থায় (কিছুকাল পূর্বেই সুরমার মৃত্যু হয়েছে) কারাগারে রেখে স্বার্থপরের মতো স্বামীর কাছে চলে আসতে পারলেন না বিভা। রামমোহনকে তিনি ফিরিয়ে দিলেন। রামমোহন বিভার মনের অব্যক্ত বাণীকে ঠিকই বুঝতে পেরেছিল। রামচন্দ্রকে সে বলল, "সতী লক্ষ্মী যদি এবার তাঁর ভাইকে ছেড়ে চলে আসতেন তা হলে তাঁর স্বামীর পাপ বৃদ্ধি হত—সেই ভয়েই তিনি হৃদয় পাষাণ করে রইলেন, আসতে পারলেন না।" (৪।৩)। কিন্তু বিভার এই মনোভাবকে হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা স্থূল-বুদ্ধি রামচন্দ্র ও রমাই-এর নেই। রামচন্দ্র তাই ক্ষুব্ধ হলেন এবং বিদূষক রমাই মহারাজকে অনুরোধ করলেন আর একটি বিবাহ করতে। বিভা তাঁর শুভ বুদ্ধি এবং কর্তব্য পরায়ণতার পুরস্কার এই ভাবে লাভ করার দিকে এগিয়ে চললেন। জীবনে তাঁর বঞ্চনার ভাগ ক্রমশঃ বাড়তে থাকল এবং এই ভাবে তিনি জীবনের চূড়ান্ত রিক্ততার দিকে এগিয়ে চললেন।

পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে দেখা যায় বরবেশে রামচন্দ্র। বিবাহ আয়োজন—সম্মুখে নৃত্যগীত। অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, এই চূড়ান্ত সময়েই মাত্র রামচন্দ্রের মনে অস্বস্তির উদয় হচ্ছে—পত্নীর কথা তাঁর মনে পড়ছে। পূর্বরাত্রে পত্নীকে স্বপ্নে দেখার কথাও সেনাপতির কাছে তিনি ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এখন আর কোনো পথ নেই ফিরবার। তিনি একটা কিছু উপায় করে দেবার জন্য রামমোহনের শরণাপন্ন হন, কিন্তু সবই ব্যর্থ।

উপসংহার দৃশ্যে স্বামী সন্দর্শনপিয়াসিনী বিভা উদয়াদিত্যের সঙ্গে চন্দ্রদ্বীপের নদীতীরে অবতরণ করেছেন। রাজ্য পরিত্যাগের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে মুক্ত উদয়াদিত্য কাশী গমনের পথে ভগিনী বিভাকে স্বামী গৃহে রেখে যেতে এসেছেন। কিন্তু এসে দেখলেন চন্দ্রদ্বীপে বিভার আসন শূন্য নেই, পূরণ হতে চলেছে। এই সময় রামমোহনের সঙ্গে বিভার কথাগুলি অত্যন্ত ট্র্যাজিক। রামচন্দ্রের পুনর্বিবাহের আয়োজন দেখে বিভা ভাবলেন তাঁরই জন্য বুঝি এই আয়োজন,—'আজ বুঝি শুভ লগ্ন পড়েছে।' রামমোহন যখন বলল, দেরি হয়ে গেছে, লগ্ন ফুরিয়ে গেছে, লগ্ন আর ফিরবে না, তখন জীবনের ভগ্ন তরীকে সাফল্যের কিনারায় পৌঁছেদেবার প্রাণপণ চেষ্টায় বিভা বললেন, "আমি তপস্যা করে ফেরাব। মোহন, এখনই তুই আমাকে নিয়ে যা। দেরি হয়ে থাক্, আর এক মুহূর্ত দেরী করব না।" রামমোহন আর থাকতে না পেরে শেষ পর্যন্ত বলে ফেলে, "মিথ্যে দিয়ে তোমার কাছে আর কথা চাপা দিতে পারলুম

না। মা জননী, এ রাজ্যের লক্ষ্মী তুমি, কিন্তু এ রাজ্যে তোমার আজ আর স্থান নেই। চলো মা, তুমি ফিরে চলো—"

বিভা কিছু একটা অমঙ্গল আন্দাজ করতে পেরে বললেন, "মোহন, যা তোর বলবার আছে, সব তুই বল্। আমি যে কত দুঃখ বইতে পারি তা কি তুই জানিস্ নে?" রামমোহন জানাল, আজ আরেক রানী আসছে, আজ মহারাজের বিবাহ। এই কথায় বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন বিভা। রামমোহন বলল, "অমন চুপ করে বসে রইলে কেন মা? কেমন করে যে কাঁদতে হয়, তাও কি একেবারে ভুলে গেলে? মা, কোন্ দিকে তাকিয়ে আছ মা? তোমার এই সন্তানের মুখের দিকে একবার চাও।" আঘাত সইতে সইতে যে বিভার চিত্ত অনেকটা অসাড় হয়ে এসেছে, সেই বিভার চিত্তেও রামচন্দ্রের দ্বিতীয় বিবাহের সংবাদ কত গভীর বেদনার সৃষ্টি করেছে, রবীন্দ্রনাথের ঐ বর্ণনা থেকেই তা জানা যায়।

বিভা রামমোহনকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজের কাছেই যেতে চান। রামমোহনের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "সেখানে আমার কোনো আশা নেই বলেই যাব। আমার রাগ অভিমান, আমার সমস্ত বাসনা বিসর্জন করব বলেই যাব। আমি কি এতদূরে এসে অমনি চলে যাব! যে আজ আসছে তাকে আশীর্বাদ করে যাব না? নিজ হাতে করে তার হাতে আমার রাজাকে সমর্পণ করব।" এবং তারপরে, "ভগবানের পৃথিবীতে অভাগাদেরও আশ্রয় মেলে, আমারও মিলবে।

স্বামীগৃহাভিমুখে রওয়ানা হওয়ার সময় বিভা বোধহয় ভেবেছিলেন, দুঃখের পালা যা কিছু ছিল, সব বুঝি চুকে গেছে, এবার সম্মুখে আনন্দের আগমনী। কিন্তু স্বামীগৃহের দুয়ারে এসে দেখলেন দুঃখের সমস্তটাই বাকী আছে, চুকে গেছে খুব সামন্যই। বুঝলেন, "সেদিন অপরাধ যে সত্যি হয়েছিল (রমাইকে নিয়ে শ্বশ্রূঠাকুরানীর সঙ্গে রসিকতার অপরাধ)—সে কথা তো আর ভোলবার নয়। যে অপরাধের শাস্তি না হয়ে তো মিটবে না। সে শাস্তি আমিই নিলুম—প্রায়শ্চিত্ত আমাকে দিয়েই হবে।" এইভাবে বিভা তাঁর পিতার হাতের আঘাতকেও যেমন মাথায় করে নিয়েছেন, তেমনি স্বামীর হাতের এই আঘাতকেও মাথায় করে নিলেন। তাঁর জীবনের দুঃখের ডালা পূর্ণ হ'ল। দুঃখের পূর্ণতা নিয়েই বাসনার সংসার থেকে তাঁর হ'ল মুক্তি। উদয়াদিত্যকে তিনি বললেন, "দাদা, আমি আজ

মুক্তি পেয়েছি। এখন তোমার চরণ সেবা করে আমার জীবন আনন্দে কাটবে।"—

বিভার ট্র্যাজেডি এই নাটকের নামকরণের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একজনের অপরাধের শাস্তি যদি আরেক জনকে পেতে হয়, একজনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত যদি আরেক জনকে জীবন দিয়ে করতে হয়, এবং যাঁকে শাস্তি ভোগ বা প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে, তিনি যদি সম্পূর্ণ নিরপরাধ হন, এবং দুঃখভোগের যদি কোনো কারণই তাঁর মধ্যে না থাকে, তবে ব্যাপারটা একটা যথার্থ ট্র্যাজেডির বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এই নাটকে বিভার স্বামী রামচন্দ্রই প্রকৃত দুষ্কৃতকারী, কিন্তু তিনি পাকে-প্রকারে সবসময়ই অব্যাহতি পেয়ে গেছেন, অপরাধের শাস্তিও ভোগ তিনি করেননি, এবং প্রায়শ্চিত্তও তাঁকে করতে হয়নি। শাস্তি আগাগোড়াই পেলেন বিভা এবং প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ল স্বামীর অপরাধের জন্য জীবনের সবকিছু দিয়ে। আসলে যেখানে পরস্পর বিপরীতধর্মী চিত্তবৃত্তির মিলন হয়, তখন একের আনন্দের জন্য অপরকে এমনি ভাবে মূল্য দিয়ে নিঃস্ব হতে হয়। স্থূল চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন রামচন্দ্রের পক্ষে দান করবার মতো কিছুই ছিল না,—স্থূল জীবনধর্ম পালন করতে পারাতেই তাঁর ছিল আনন্দ। তাই কোমলপ্রাণা, সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্না বিভার জীবনাবেগ এবং দাম্পত্য গৌরববোধ রামচন্দ্রের মধ্যে কোনো সাড়াই জাগিয়ে তুলতে পারেনি। বরং রামচন্দ্রের স্থূল কৃতকর্মগুলির জন্য বিভাকেই বরণ করে নিতে হয়েছে ক্রমবর্দ্ধমান লজ্জা ও বেদনার ভার। রামচন্দ্রের চিত্তবৃত্তি এতই মূঢ় যে, লজ্জা ও বেদনাও তাঁর চিত্তে জাগেনা বা স্থায়ী হয় না। এমতাবস্থায় তাঁর ভাগ্যের সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন অংশীদারের জীবনেই কেবল বেদনা বেড়ে যায়। তাই বিভার জীবনেও বেদনা বাড়ল এবং শেষ পর্যায়ে তা অপরিসীম হয়ে উঠল। বিভার এই ট্র্যাজেডি চিত্রণে রবীন্দ্রনাথের চাতুর্য এখানেই, যে, যাঁর জীবনে প্রকৃত ট্র্যাজেডি হওয়ার কথা, সেই রামচন্দ্রকে তিনি এমন ভাবে ট্র্যাজেডির স্পর্শ থেকে অব্যাহতি দিয়ে এসেছেন বরাবর যে, রামচন্দ্র জানতেই পারলেন না, কত বড় আঘাত তিনি জীবনে পেয়েছেন। এই কথাটিই উপসংহার দৃশ্যে রামমোহন বলেছে, "কিন্তু আমি বলছি মা, সকলের চেয়ে বড় দণ্ড পেলে তোমার স্বামী। সে আজ দ্বারের কাছে থেকেও তোমাকে হারাল।" রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা অপূর্ব। রামচন্দ্রের মতো মূঢ় চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের জীবনে ট্র্যাজেডিও আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। ট্র্যাজেডির বিকাশের জন্যও

কতকগুলি সূক্ষ্ম অনুভূতি থাকা দরকার। তা না থাকায় রামচন্দ্র ট্র্যাজেডির অযোগ্য।[১৭] রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁকে ট্র্যাজেডির কশাঘাত থেকে দৃশ্যতঃ অব্যাহতি দিয়ে, সেই আঘাতকে মর্মান্তিক করে তুলেছেন তাঁর জীবনের অংশীদার বিভার মধ্যে।

বিভার জীবনের এই অনুচিত বেদনার দাহকে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত শান্তরসে নির্বাপিত করেছেন। এটা স্বাভাবিক হয়েছে। যাঁকে সর্বস্ব পরিত্যাগ করতে হ'ল, তার পক্ষে আর শোক করবারও কিছু নেই। শোকটাই যখন জীবন হয়ে উঠেছে, তখন শোকটা আর বিশেষ কিছু নয়, শোক তখন এক নির্বিশেষ জীবনবাণী। আত্মজীবন কেন্দ্রিক এবং সর্বত্রব্যাপী শোক তখন তাঁকে এক বৈরাগ্যের বার্তা এনে দেয়। তাই বিভা শেষ পর্যন্ত হলেন ধনঞ্জয় বৈরাগীর সঙ্গী। ধনঞ্জয় বৈরাগীর গানের মধ্যেই ফুটে উঠল তাঁর ট্র্যাজেডি-বিক্ষুব্ধ জীবনের পরিণত প্রশান্ত বাণী—

আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর ফিরব না রে—
এমন হাওয়ার মুখে ভাসল তরী,
কূলে ভিড়ব না আর ভিড়ব না রে !
ছড়িয়ে গেছে সুতো ছিঁড়ে,
তাই খুঁটে আজ মরব কি রে !
এখন ভাঙা ঘরের কুড়িয়ে খুঁটি
বেড়া ঘিরব না আর ঘিরব না রে !
ঘাটের রশি গেছে কেটে,
কাঁদব কি তাই বক্ষ ফেটে ?
এখন পালের রশি ধরব কষি,
এ রশি ছিঁড়ব না আর ছিঁড়ব না রে !

১৭. ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এই প্রসঙ্গে অবশ্য একটি তথ্য প্রদর্শন করে বলেছেন, 'দ্বিতীয়বার বিবাহোদ্যত, রমাই-ভীত বরবেশী রামচন্দ্র বিভার কথা স্মরণ করিয়া যখন বলিতেছেন, 'সেনাপতি আমি তোমাকে গোপনে বলছি, কাউকে বোলোনা, আমি তাকে কিছুতে ভুলতে পারছিনে। কাল রাত্রে আমি তাকে স্বপ্নে দেখেছি।' এবং ফর্নাণ্ডিজকে আদেশ করিতেছেন মোহনকে খবর দিয়া বিভাকেই পূর্বাহ্ণেই দুঃসংবাদ জানাইয়া সাবধান করিয়া দিতে, তখন রামচন্দ্রের চরিত্রে নূতন আলোকপাত হইতেছে, এবং দানব রামচন্দ্রের হৃদয়ে মনুষ্য ধর্মের স্পর্শ লাগিতেছে। বিভার জীবনের ট্র্যাজেডি ইহাতে আরও ঘনীভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় এবং তাহা কবিজনোচিত সমাপ্তি লাভ করিয়াছে উপসংহারে।"—রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, ২য়, (১৩৫৩), পৃ. ১৩১

এই নাটকে রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি পরিকল্পনায় দেখা যায়, জীবন এখানে ট্র্যাজেডির বিপর্যয়ে ভেঙে যায়নি, বরং নতুনতর সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এইটি রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি চেতনার একটি বিশিষ্টতা।

প্রায়শ্চিত্ত নাটকের একেবারে শেষে রবীন্দ্রনাথ যে ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, সেইটিই পরিত্রাণ নাটকের মূলভাব। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটককেই ঈষৎ পরিবর্তিত ক'রে আরো সংহত রূপে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন 'পরিত্রাণ' (১৯২৯)। পাত্র-পাত্রী এবং ঘটনাধারার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবই 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে যেমন, 'পরিত্রাণ' নাটকেও তেমনি। পার্থক্য শুধু এই যে, 'প্রায়শ্চিত্তে' বিভার জীবন-ট্র্যাজেডি ক্রমশঃ স্পষ্ট ও অনিবার্য হয়ে উঠতে উঠতে শেষকালে মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে, আর 'পরিত্রাণে' বিভার জীবন-ট্র্যাজেডির এই তীব্রতা অন্তঃপ্রবাহ একটি আবহাওয়ায় ততটা তীব্রতা লাভ করতে পারেনি। 'প্রায়শ্চিত্তে' যে ধনঞ্জয় বৈরাগীকে মাঝে মাঝে দেখা গেছে, এবং নাটকের শেষে যাঁর আবির্ভাব বিভার মর্মান্তিক ট্র্যাজেডিকে শান্তরসের সিঞ্চনে কোমল করে তুলেছে, সেই ধনঞ্জয় বৈরাগীকে 'পরিত্রাণ' নাটকে সুরু থেকেই একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় নাটকের মূল সুরটিকে ধ্বনিত করতে দেখা যায়। 'পরিত্রাণ' নাটকের এই মূল সুর হচ্ছে বৈরাগ্যের সুর। এই বৈরাগ্যকে বরণ করে নিতে পারলে সমস্ত দুঃখ কষ্ট, মান-অপমান, দাহ-জ্বালা প্রভৃতি সবপ্রকার যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এই নাটকের প্রায় প্রতিটি চরিত্রেরই জীবনে কম-বেশী এই বৈরাগ্য ভাবের উদয়-সম্ভাবনা রয়েছে। এই বৈরাগ্যভাব শেষ পর্যন্ত যাঁর জীবনে উদিত হয়েছে সম্পূর্ণ ভাবে, তাঁরই জীবন থেকে অন্তর্হিত হয়েছে সমস্ত বেদনা। এই ভাবেই বেদনা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন উদয়াদিত্য। এই ভাবেই বেদনার তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে বিভার জীবনে।

নাটকের প্রথম দৃশ্যেই ধনঞ্জয় বৈরাগীর একটি গানে এই বৈরাগ্যের ভাবটি পরিস্ফুট হয়েছে,—

> কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারি ঘায়ে—
> নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে।
> তোমার অভিসারে
> যাব অগম পারে
> চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়ে।

পরাণে বাজে বাঁশী, নয়নে বহে ধারা—
দুখের মাধুরীতে করিল দিশাহারা!

'পরিত্রাণ' নাটকে রবীন্দ্রনাথ বিভার জীবনের মধ্যদিয়ে দেখাতে চেয়েছেন, দুঃখের চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত দুঃখের পরিসমাপ্তি নেই,—এবং দুঃখের পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত শান্তি অসম্ভব। শান্তি তখনই লাভ করা যায়, যখন দুঃখের স্তরগুলিকে পরিপূর্ণভাবে অতিক্রম করা হয়। তাই দুঃখের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে হলে যতদ্রুত সম্ভব জীবনের দুঃখের অনিবার্য পথপরিক্রমা শেষ করা দরকার। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে প্রজাদের কাছে ধনঞ্জয় বৈরাগী এই কথাই বলেছেন—"দেখ্ পাঁচকড়ি, অমন চাপা চুপি দিয়ে রাখলে ভালো হয় না। যতদূর পর্যন্ত হবার, তা হতে দে, নইলে কিছুই শেষ হতে চায় না। যখন চূড়ান্ত হয় তখনই শান্তি হয়।" বিভার জীবনেও শান্তি এল, বৈরাগ্যের মাধ্যমে, তাঁর জীবনের দুঃখের চূড়ান্ত হবার পর।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় প্রতাপাদিত্যের মহিষীও বুঝেছেন যে, পথে বেরিয়ে পড়াতেই প্রকৃত আনন্দ। পথে বেরুনোর দুঃখের ভয়ে গৃহবন্ধ হয়ে থাকলে কখনো দুঃখের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। উদয়াদিত্য যখন মায়ের কাছে বিদায় কালীন আশীর্বাদ চেয়ে বললেন, "না মা, ও বাড়িতে আর নয়—রাস্তা বেয়ে সোজা চলে যাব, আমাদের পিছনে তাকাবার কিছুই নেই।"—তখন মহিষী বললেন, "বুঝতে পারছি। তোদের দুঃখের দিন ঘুচল। এবার ঈশ্বর তোদের সুখেই রাখবেন।"—

চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে ধনঞ্জয় বৈরাগী একই সুরে গাইছেন—

"যে পড়েছে পড়ার শেষে—
ঠাঁই পেয়েছে তলায় এসে—
ভয় মিটেছে, বেঁচেছে সে,
তারে কে আর পাড়বে।"

ধনঞ্জয় ভাবছেন উদয়াদিত্যের সঙ্গে বিভাও বুঝি পথেরই সঙ্গী। উদয়াদিত্য সেই ভুল ভাঙ্গিয়ে দিতে বললেন, "ঠাকুর, তুমি কি ভাবছ বিভা আমার পথের সঙ্গিনী। ওকে আমি ওর শ্বশুর বাড়ী পৌছে দিতে যাচ্ছি।" কিন্তু ধনঞ্জয় বোধ হয় বুঝেছিলেন যে, বিভার জীবনের দুঃখের চূড়ান্তকাল আসন্ন। সুতরাং অনতিবিলম্বে তাঁকেও পথের সঙ্গিনীই হতে হবে। তাই তিনি উদয়াদিত্যের ঐ কথার জবাবে বললেন, "বেশ, বেশ, হরি যেখানে নিয়ে যান সেইখানেই

ভালো। দেখি তিনি কোন্‌খানে পৌছিয়ে দেন, আমিও সঙ্গে আছি। কোনো ভয় নেই দিদি, কোনো ভয় নেই।"

প্রকৃত ক্ষেত্রে ধনঞ্জয়ের ধারণাই সত্য হয়েছিল। স্বামী-সোহাগের প্রত্যাশায় পরিপূর্ণ বিভা দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহে উদ্যত স্বামীর গৃহদ্বার থেকে মনের মধ্যে এক সর্বব্যাপী শূন্যতা নিয়ে ফিরে এলেন। তাঁর দুঃখের হ'ল পরিসমাপ্তি। সুতরাং এরপর পথই তাঁর আশ্রয়। পথের বৈরাগ্য জীবনে বরণ করে নিয়েই পরাজিত করতে চাইলেন তাঁর জীবনের আগ্রাসী দুঃখায়োজনকে।

এইভাবে কোনো ক্ষতি যেখানে ক্ষতি নয়, দুঃখ যেখানে বিধ্বংসী নয়, সেখানে ট্র্যাজেডির রসনিষ্পত্তিও হয়না। 'পরিত্রাণ' নাটকে বিভার দুঃখ শেষ পর্যন্ত বিভার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি, তাঁকে ধ্বংস করতে পারেনি। তাই তাঁর জীবনব্যাপী দুঃখের জন্য আমাদের মনের মধ্যে চিরাচরিত ট্র্যাজেডির বোধ জন্মায় না। বরং বৈরাগ্যের মাধ্যমে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ায় তাঁর জন্য আমরা স্বস্তি বোধ করি এই ভেবে যে, এক আধ্যাত্মিক ভাবলোকের ছোঁয়া পেয়ে জীবনটা তাঁর চূড়ান্ত অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। কাহিনীর পরিণতিতে এই ভাবটি চিরাচরিত ট্র্যাজেডিরসের পরিপন্থী হয়ে ওঠে। 'পরিত্রাণ' নাটকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই ভাবটি নাটকের ট্র্যাজেডির দিকটাকে আত্মপ্রকাশ করতে দেয়নি নিজরূপে।

প্রায়শ্চিত্ত নাটকে বিভার চূড়ান্ত ট্র্যাজেডির পরমুহূর্তে ধনঞ্জয় বৈরাগীর আবির্ভাব যে ভাবের সৃজনের দ্বারা রসাভাসের সৃষ্টি করেছিল, 'পরিত্রাণ' নাটকে সেই ভাবটিকেই রবীন্দ্রনাথ নাটকের মূল ভাব ক'রে তুলেছেন। সুতরাং চিরাচরিত রীতির এবং সিদ্ধরসের ট্র্যাজেডি না হলেও নাটকীয় ভাবের দিক থেকে 'পরিত্রাণ' আগাগোড়া সঙ্গতিপূর্ণ এবং নিখুঁত। আর 'প্রায়শ্চিত্ত' যথার্থ ট্র্যাজেডি হলেও শেষকালে কিঞ্চিৎ রসাভাস দোষদুষ্ট।

'প্রায়শ্চিত্তে'র পর ট্র্যাজেডির বোধ জাগে, এমন নাটক 'গৃহপ্রবেশ' (১৯২৫)। 'গৃহপ্রবেশ' প্রায় ঘটনাবিহীন, সংলাপ বহুল একখানি নাটক। ঘটনার মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়ে না ওঠায় "শেষের রাত্রি" গল্পটির সঙ্গে এই নাটকটির বিশেষ পার্থক্য নেই। অথচ 'শেষের রাত্রি' গল্পটিকেই নাট্যায়িত করে রচনা করা হয়েছে 'গৃহপ্রবেশ'। নাটকটির সংলাপ মূলতঃ রুগ্ন মৃত্যুপথ যাত্রী যতীন এবং তার মাসির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই দু'জনের সংলাপের মধ্যে

আগাগোড়াই একটা অতি করুণ সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। যতীনের উক্তিগুলি মন্ময়তার দিক থেকে 'ডাকঘরে'র অমলের উক্তিগুলিকে মনে করিয়ে দেয়। এক স্বতঃস্ফূর্ত গীতিধর্মিতায় নাটকখানি আগাগোড়াই উচ্ছ্বসিত এবং সেই গীতিধর্মিতাও রসের দিক থেকে করুণরসকেই সৃষ্টি করেছে সর্বদা।

এই নাটকে করুণরসের আলম্বন বিভাব যতীন, যার জীবনে স্বপ্ন ও কল্পনা অসীম, কিন্তু সামর্থ্য অত্যন্ত সীমিত। এই সীমিত সামর্থ্য নিয়ে সে পরিকল্পনা রচনা করেনা, করলে তার জীবনে দুঃখের কিছুই থাকত না। তার পরিকল্পনা ছিল বেহিসেবী—অতিরোমান্টিক। তাই দুঃখ ছিল তার অনিবার্য। এই দুঃখকে সে সহজভাবে স্বীকার করে নিয়েছে জীবনে, অস্বীকার করবার জন্য বা পরিহার করবার জন্য, সে বর্জন করেনি তার স্বপ্ন-কল্পনাকে বা জোর করেনি কোনো প্রকারে তাকে সফল করে তুলতে। ফলে অসীমকে চেয়ে এবং কোনো কিছু না পেয়েই হ'ল তার জীবনের পরিসমাপ্তি। সারা জীবনব্যাপী এই না পাওয়ার অনুভূতিটাই করুণ রসদ্যোতক এবং ট্র্যাজিক। নাটকের শেষের দিকে, (এই নাটক দু'টি মাত্র অঙ্কে বিভক্ত) দ্বিতীয় অঙ্কে, মাসির প্রতি যতীনের একটি উক্তির মধ্যে তার জীবনের যাবতীয় আক্ষেপের এক ট্র্যাজিক দীর্ঘনিশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে : "মাসি, একটা কথা গর্ব করে বলতে পারি। যা পাইনি তা নিয়ে কোনোদিন কাড়াকাড়ি করিনি। সমস্ত জীবন হাত জোড় করে অপেক্ষাই করলুম। মিথ্যাকে চাইনি ব'লেই এত সবুর করতে হ'ল। সত্য হয়তো এবার দয়া করবেন।"—

দু'টি বিষয়ের জন্য যতীনের ছিল আতীব্র প্রত্যাশা। প্রথমটি তার রোমান্টিক পরিকল্পনা অনুসারে রচিত একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর বাড়ি, তার স্ত্রীর নামানুসারে যার নাম হবে 'মণিসৌধ', আর দ্বিতীয়টি ছিল স্ত্রীর স্নিগ্ধ প্রেম। এই দুটি প্রত্যাশার একটিও পূর্ণ হয়নি। 'মণিসৌধ' সম্পূর্ণ হয়নি অর্থাভাবে, আর স্ত্রীর কাছে প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি, স্বামীকে সেবা শুশ্রূষা পরিচর্যা সান্ত্বনা সহানুভূতি বরাভয় প্রভৃতির মধ্যদিয়ে প্রেমকে শতদলে ফুটিয়ে তুলতে স্ত্রী মণির অনভ্যাস ও অনাগ্রহের কারণে। কিন্তু এই দুটি প্রত্যাশারই অপূর্ণতার বিভীষিকাকে মাসী রুগ্ন ও মৃত্যু-পথযাত্রী যতীনের কাছে স্পষ্ট করে তুলতে চাননা, বরং প্রাণপণে গোপন করতেই চান তার কাছে। যতীনের ভগ্নী হিমির কাছে মাসি এই কথাই বলেছেন, "খুব ঘটা করে আরম্ভ করেছিল—বাইরের মহল শেষ হতে হতেই দেউলে—ভিতরের

মহলের ভারা আর নামল না। আজ ওকে কেবলই ভোলাতে হচ্ছে। বাড়িটা নিয়েও, মণিকে নিয়েও।" (১ম)। মৃত্যুপথ যাত্রীর কাছে এরূপ ছলনার যৌক্তিকতা সম্পর্কে হিমি প্রশ্ন তুললে মাসি বললেন, "মৃত্যু যখন সামনে, তখন ঘর তৈরি সারা হোক না হোক, কী এলো গেল। তাই ওকে বলি, একান্ত মনে সংকল্প করেছ যা সেইটেই সম্পূর্ণ হয়েছে। হিমি সেইটেই তো সত্য।"

হিমি প্রশ্ন তুলল, "বাড়িটা যেন তাই হোল। কিন্তু বউদিদি?" মাসি একই উত্তর দেন, "হিমি, তোর বউদিদিকে যিনি সুন্দর করেছেন, তাঁর সঙ্কল্পের মধ্যে ও সম্পূর্ণ। চিরদিনের যে মণি, ভগবানের আপন বুকের ধন যে-মণি সেই তো কৌস্তভ রত্ন—তার মধ্যে কোথাও কোনো খুঁত নেই। মৃত্যু-কালে যতীন বিধাতার সেই মানসের মণিকেই দেখে যাক্।" (১ম)। যতীনকে 'মণিসৌধ' এবং মণি সম্পর্কে এইভাবে ক্রমাগত সান্ত্বনা দিয়ে যাওয়াটাই এখানে করুণ রসকে উৎসারিত করেছে।

এই ভাবেই মণির কাছে যতীন খবর পায় যে, তেতলার ঘরের সব পাথর বসানো হয়ে গেছে। সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, "যাক্, এত দিন পরে শেষ হয়ে গেল। আমার কতকালের ঘর বাঁধা সারা হ'ল, আমার কতদিনের স্বপ্ন।" (১ম)। সুতরাং এরপর গৃহ প্রবেশ,—সেই কথা ভাবতে ভাবতে যতীন বলে, "মন আমার বলছে, শুভদিন এল। তাই তো হিমিকে ডেকে গান শুনছি। গৃহ-প্রবেশের সানাই যেন আজ শরতের আকাশে বাজতে আরম্ভ করেছে।" (১ম)। যার জীবনে মৃত্যু আসন্ন, তার পক্ষে আকাশ জুড়ে এইভাবে গৃহ-প্রবেশের সানাই-এর সুর শোনা,—রূপকের অর্থে প্রত্যাশাপূর্ণ জীবনে এক নিষ্করুণ বিদ্রূপের মতো আসন্ন মৃত্যুর ঘনায়মানতাকেই যেন দ্যোতিত করে এবং সমস্ত পরিবেশটিকে বেদনাময় করে তোলে।

মণিসৌধ সম্পূর্ণ হওয়ার সংবাদে যতীন আনন্দিত ঠিকই। কিন্তু সম্পূর্ণ হওয়াটা তার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিলনা। কিন্তু তার জন্য মণির উৎকণ্ঠা, অশ্রুপাত সম্পূর্ণভাবেই তার কাছে অপ্রত্যাশিত। কারণ "যতীন ওকে মর্মে মর্মেই বুঝেছিল,"—শৈলকে মাসি এ সম্পর্কে বলেছেন,—"একদিন দেখেছি যতীন মাথা ধরে বিছানায় প'ড়ে, মণি দল বেঁধে থিয়েটরে চলেছে। থাকতে না পেরে আমি যতীনকে পাখার বাতাস করতে গেলুম। ও আমার হাত থেকে পাখা ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দিলে। ওরে বাস্‌রে কী ব্যথা। সে সব দিনের কথা মনে করলে আমার বুক ফেটে যায়"—(১ম)। হয়তো এই

জন্যই যতীন মণিকে সেবা শুশ্রূষার দায় থেকে অব্যাহতি দিতে চেয়েছিল। স্ত্রীর প্রতি সুপ্ত অভিমানকে আদর্শান্বিত ক'রে সে মাসির কাছে প্রস্তাব করেছে, "একদিন ছিল, যখন স্ত্রী সহমরণে যেত, সে অন্যায় তো এখন বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু মণির আজ এ যে পলে পলে সহমরণ, বেঁচে থেকে সহমরণ। মনে করে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে—এর থেকে ওকে দাও মুক্তি মাসি, দাও মুক্তি।"—(১ম)।

বাস্তবিক পক্ষে মণিও এই সময়, স্বামীর মরণাপন্ন অবস্থার মধ্যেই, নিজের কনিষ্ঠা ভগিনীর অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে পিতৃগৃহে যাবার দাবি জানাচ্ছে মাসির কাছে। কিন্তু মাসি সেসব কথা গোপন করেই মণি সম্পর্কে যতীনকে প্রসন্ন করে তুলবার জন্য বললেন, "সেদিন বাপের বাড়ি যাবার কথা যেমনি একটু ইশারায় বলা, অমনি বউ কেঁদে অস্থির।" (১ম) মাসির কাছে এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে যতীন পুলকিত হয়ে উঠল। চতুর্দিক যেন শুভলক্ষণে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল—গৃহপ্রবেশ তার হবেই। উৎসাহে সে মাসিকে বলে ওঠে—"তুমি মনে করেছিলে, মণিকে নিয়ে আমি সুখী হতে পারিনি, তাই তার উপরে রাগ করতে। কিন্তু সুখ জিনিসটি ঐ তারাগুলির মতো অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে দেখা দেয়। জীবনের ফাঁকে ফাঁকে কি স্বর্গের আলো জ্বলেনি। আমার যা পাবার পেয়েছি, কিছু বলবার নেই।" এবং তারপর,—

"যখন থেকে শুনেছি মণি কেঁদেছে, তখন থেকেই বুঝেছি, ওর মন জেগেছে। ওকে একবার ডেকে দাও, মাসি। দুপুর বেলা একবার এসেছিল। তখন দিনের প্রথম আলো, দেখে হঠাৎ মনে হ'ল, ওর মধ্যে ছায়া একটুও কোথাও নেই। একবার এই সন্ধের অন্ধকারে দেখতে দাও, হয়তো ও ভিতরের সেই চোখের জলটুকু দেখতে পাব।" (১ম)।

মণির মধ্যে এই অনুকূল অনুভূতিকেই খুঁজছিল যতীন। এরই জন্য সে এতদিন অপেক্ষা করছিল। আজ মাসির কাছে মণির মধ্যে সেই অনুকূল অনুভূতি জাগার সংবাদ পেয়ে জীবনে তার আর কোনো খেদ নেই, সব দুঃখের যেন পরিসমাপ্তি হয়েছে। যতীনের মধ্যে এই বোধটা জেগে ওঠাই সবচেয়ে ট্র্যাজিক এবং 'গৃহপ্রবেশ' নাটকের করুণ রস বা ট্র্যাজেডি রসের বৈচিত্র্যও এখানেই। যেখানে যতীন মনে করছে, তার জীবনে শোকের কোনো কারণ নেই, সেইখানেই জমাট বাঁধছে তীব্র শোক। কারণ তার শোক দূরীভূত হয়ে যাচ্ছে কয়েকটি মাত্র সান্ত্বনা বাক্যে—যেগুলির কোনো সত্য ভিত্তি

নেই। যেমন তার মণিসৌধও প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ হয়নি এবং তার মণিও তার জন্য কাঁদা তো দূরের কথা, সে এখন অনেক দূরে পিতৃগৃহে। অথচ এর বিপরীতটা ভেবেই যতীন আনন্দিত। তার এই আনন্দিত হওয়াটাও তার পক্ষে একটা প্রতারণা—যে সরল বিশ্বাসে সে আনন্দিত, সেই সরল বিশ্বাসের কাছে আনন্দিত হয়েই সে প্রতারিত। আনন্দিত হয়েও আসলে এই প্রতারিত হওয়াটাতেই তার ট্র্যাজেডির বৈচিত্র্য। যেখানে যতীনের পক্ষে আনন্দিত হওয়ার কোনো কারণ নেই, সেখানে সে যখন এত সহজে আনন্দিত হয়ে ওঠে, তখন তার এই প্রতারিত সহজ বিশ্বাসের জন্যই তার প্রতি জাগে করুণা, যা এই নাটকে ট্র্যাজেডির বোধটিকে গড়ে তুলেছে। তাই এই নাটকে যতীনের আনন্দটাই যতীনের ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজিক আনন্দে অভিভূত হয়ে যতীন এর পর যা কিছু বলে, তাতে তার ট্র্যাজেডি উত্তরোত্তর বেড়ে যায়। সে মাসির কাছে ব্যক্ত করে একটি একান্ত অভিপ্রায় ; "আমি তার (মণির) সঙ্গে বিশেষ করে একটু কথা বলতে চাই।" "আমার মণিসৌধ তৈরী শেষ হয়ে গেলে, সেই খবরটা আপন মুখে তাকে দিতে চাই। গৃহপ্রবেশ আমার নয়, গৃহপ্রবেশ তাকেই করতে হবে—তার জন্যেই আমার এই সৃষ্টি, আমার এই ইট-কাঠের বীণায় গান।" (১ম)

কিন্তু ঠিক এই সময়েই মণি যতীনের গৃহেও নেই, সে তিনদিন যাবৎ পিতৃগৃহে। এই তিনদিন মণিকে একবারও না দেখতে পাওয়ার আক্ষেপ যতীন মাসির কাছে জানলে, মাসি এই সান্ত্বনাপ্রতারিত মৃত্যুপথ যাত্রী সর্বস্বরিক্ত ভগিনীপুত্রকে সান্ত্বনার আর কোন কথা যোগাতে পারেন না। প্রসঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টায় তিনি অশ্রুরুদ্ধ হৃদয়ে শুধু বলেন,—"বাবা, একটু বেদনার রস খাও। তোমার গলা শুকিয়ে আসছে।" যতীন অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়, তার উইলের কথা বলে। মণির প্রতি অপরিসীম বিশ্বাস নিয়ে সে মাসিকে বলে, "আমি মণিকে সব লিখে দিলুম বটে, কিন্তু তোমারই রইল। ওতো কখনো তোমাকে অমান্য করবে না।" (১ম)।

যতীনের এই বিশ্বাস সর্ব প্রথম আঘাত প্রাপ্ত হয় দ্বিতীয় অঙ্কে। ভৃত্য শম্ভু জানে না যে মাসি এবং হিমি অনবরত নানা প্রকার সান্ত্বনা বাক্যে যতীনকে ভুলিয়ে রেখেছে। তাই সে যতীনের প্রশ্নের জবাবে সোজাসুজিই বলে ফেলে, বউ আজ তিন দিন হল সীতারামপুরে পিতৃগৃহে গেছে। চমকিত হয়ে যতীন সুরু করে ট্র্যাজিক প্রশ্নঃ ? "তুই কে ? আমি কি

চোখে ঠিক দেখছি।" "ঠিক করে বলতো, আমার তো কিছু ভুল হচ্ছে না।" "কোন্ ঘরে আছি আমি? এই কি সীতারামপুর।" শম্ভু যখন জানায়, এটা কোলকাতা, এবং এটা তারই (যতীনের) শোবার ঘর, তখন যতীন বলে ওঠে, "মিথ্যে নয়! এ সমস্তই মিথ্যে নয়?"—অর্থাৎ তার স্বপ্ন, তার উপলব্ধির জন্য এই বাস্তব সত্যগুলিই মিথ্যে হয়ে যাক। তার যে কল্পনা আজ একান্তভাবেই তার কাছে সত্য হয়ে উঠেছে মাসির সান্ত্বনাকে বিশ্বাস ক'রে, সেইটাই আজকে তার কাছে সব চেয়ে বড় সত্য—এটাকে সে আকুলভাবে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। মিথ্যাকে এইভাবে সত্য মনে করে বাঁচিয়ে রাখার আকুল প্রচেষ্টা আমাদের মধ্যে বেদনাকে আরো জাগিয়ে তোলে, এবং আমরাও এর মধ্যে ট্র্যাজেডিরই আস্বাদ লাভ করি।

যতীন আবার তার কল্পনার মধ্যে আশ্বস্ততা লাভ করে যখন তার স্নেহময়ী মাসি স্নেহ নিয়ে—সান্ত্বনা নিয়ে তার কাছে আসেন। কিন্তু কি ভাবে যেন সে তার অতিচেতন মনে বুঝতে পারে একটা ব্যর্থতার সম্ভাবনা। যেটা বাস্তব সেটা কি ভাবে যেন তার অতিচৈতন্যলোকে নিজের পরিচয়টা দিয়ে গেছে। সে মাসির কাছে জানায় তার স্বপ্নের কথা, "মণি যেন আমার ঘরে আসবার জন্য দরজা ঠেলছিল। কোনো মতেই দরজা এতটুকুর বেশী ফাঁক হ'ল না। সে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। কিছুতেই ঢুকতে পারলে না। অনেক করে ডাকলুম, তার আর গৃহ প্রবেশ হল না। হল না, হ'ল না, হ'ল না—বুঝেছি মাসি, বুঝেছি, আমি দেউলে। সবদিকে। এ বাড়িটাও নেই,—সব বিক্রি হয়ে গেছে, কেবল নিজেকে ভোলাচ্ছিলুম।"—২য়।

মাসি শপথ করে বললেন বাড়ী ঠিক আছে, এবং যতীনের উকিল বন্ধু অখিল তার সাক্ষী আছে। এতে আশ্বস্ত এবং উৎসাহিত হয়ে যতীন ভাবল, তাহলে আর দুঃখ কিসের? বাড়িটা যদি থাকে, তবে একদিন না একদিন মণির গৃহপ্রবেশ ঘটবেই, "বৎসরের পর বৎসর সে দরজা খুলে থাকুনা দাঁড়িয়ে।"—২য়। পরম নির্ভরযোগ্য ছোট ভগিনীকে ডেকে বলে, "ভাই হিমি, তুই থাকবি আমার ঘরটিতে। একদিন হয়তো সময় হবে, ঘরে প্রবেশ করবে। সেদিন যে লোকেই থাকি, আমি জানতে পারব।"—২য়।

ঠিক এই সময়ই মণি তার পিতার সঙ্গে ফিরে এসেছে। সে গিয়ে পড়ল যতীনের পায়ের উপর। কিন্তু যতীন তখন বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত। সে ভাবল একটা শাল বুঝি চাপা দেওয়া হল তার পায়ে। সে বলল, পায়ের উপর ও শালটা

নয়, ও শালটা নয়। সরিয়ে দাও, সরিয়ে দাও।" এখানে গভীর ট্র্যাজেডি সৃষ্টি হয়েছে। কারণ এখানে মণি সম্পর্কে যতীন যে কল্পনা করে এসেছে, বা যে সান্ত্বনা লাভ করে এসেছে, তা বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু ঠিক এখনই এই বাস্তবকে প্রত্যক্ষ ক'রে ধন্য হবার সম্ভাবনা থেকে যতীন বঞ্চিত। যতদিন সে সচেতনভাবে মণি সম্পর্কিত সান্ত্বনাবাক্যে বিশ্বাস ক'রে কল্পনার জাল বুনছিল, ততদিন এই বাস্তব ছিল তার কাছ থেকে নির্মমভাবে অনেক দূরে। আজ বাস্তব যখন কাছে এল, তখন যতীনের কাছে তার আর কোনো অর্থই নেই—বাস্তবের স্বাদ লাভ থেকে সে বঞ্চিত থেকেই গেল। এতদিন সে বাস্তবকে পায়নি, এবং সেই বেদনা একরকম, আর আজ বাস্তবকে পেয়েও না পাওয়ার বেদনা আরও গভীর। ট্র্যাজেডি এখানেই।

মণিকে নিয়ে রচিত একটি প্রেমের নীড়ই ছিল যতীনের আকাঙ্ক্ষিত গৃহ— যার নাম 'মণিসৌধ'। ইঁট পাথরের প্রাসাদ নির্মাণটা বাইরের ব্যাপার। আসলে মণির জীবনের সুধা নিয়েই গড়ে উঠবে মণিসৌধ,—এটাই ছিল যতীনের প্রত্যাশা। 'মণিসৌধ' নামে প্রাসাদ নির্মাণ এই প্রত্যাশার একটা স্থূল রূপক মাত্র। সুতরাং 'গৃহ প্রবেশ' কথাটির প্রকৃত অর্থ—মণির জীবনের সুধা নিয়ে গড়ে ওঠা মণিসৌধে যতীন ও মণির প্রবেশ ও স্থিতিলাভ। আর সেইখানেই ছিল যতীনের ব্যর্থতা। মণির জীবনের সুধাকেই সে পেল না, সুতরাং প্রত্যাশিত মণিসৌধ রচনা থেকে গেল অপূর্ণ। ইঁটপাথরের স্থূল প্রাসাদ নির্মাণের অসম্পূর্ণতা রূপক হিসেবে যতীনের এই মানস প্রত্যাশার অপূর্ণতাকেই বুঝিয়ে দিচ্ছে। এই মানস-মণিসৌধেই যতীন মণিকে নিয়ে কিছুতেই প্রবেশ করতে পারছিল না—এরই যন্ত্রণায় সে ভুগেছে এবং প্রবেশের প্রত্যাশায় গভীরভাবে বিশ্বাস করেছে নিছক সান্ত্বনা হিসেবে উক্ত মণি সম্পর্কিত মিথ্যা প্রশংসাবাক্যে। এবং তারই ফলে তার মানস-মণিসৌধে গৃহপ্রবেশের উৎসবের সানাইয়ের সুর সে শুনেছে আকাশে বাতাসে। ট্র্যাজেডি এই যে, এই বিশেষ গৃহপ্রবেশ কিছুতেই সম্ভব হচ্ছিল না, যখন সম্ভব হবার সময় হ'ল, মুমূর্ষু যতীনের কাছে যখন মণি এল তার সুধা নিয়ে তখন গৃহপ্রবেশের মূল উদ্যোক্তার জীবন প্রায় অবসিত। সারাজীবন ধরে যার জন্য অপেক্ষা করেছে, তা যখন এল, তখন তা এল যেন বেদনার যেটুকু বাকি ছিল, সেটুকু পূর্ণ করে দিতে। যতীনের জীবন-গৃহপ্রবেশের বা 'গৃহ প্রবেশ' নাটকের ট্র্যাজেডি এখানেই।

'গৃহপ্রবেশ' নাটক রবীন্দ্রনাথের একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্বকেও দ্যোতিত করে থাকতে পারে। অন্ততঃ গৃহপ্রবেশ নাটকের গানগুলি সেই দিকেই ইঙ্গিত করে। মানুষের প্রকৃত গৃহ কোথায়? জীবনে না জীবনাতীতে। জীবনাতীতেই মানুষের গৃহ। সুতরাং এই জীবনটাই মানুষের গৃহপ্রবেশের অন্তরায়। এইজন্যই যতীন রুগ্ন অবস্থায় কেবলই গৃহ-প্রবেশের জন্য অপেক্ষমান, এবং যতক্ষণ তার অপেক্ষা, ততক্ষণই মণির জন্য তার চিন্তা, জীবনময়ী মণির গৃহ-প্রবেশ না হওয়ার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন—যে মণিসৌধে তার গৃহপ্রবেশ, মণিকে বাদ দিয়ে সেখানে সে প্রবেশ করে কি করে? কিন্তু জীবনের অন্তিম মুহূর্তে গৃহপ্রবেশ যখন আসন্ন তখন আর তার মণির চিন্তা নেই, মণি পায়ে এসে পড়লেও, সে মণিকে চিনতে পারে না। তখন "জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে" সে তার বন্ধুকে দেখেছে। এবং "গভীর কী আশায় নিবিড় পুলকে তাহার পানে" সে চায় "দুবাহু বাড়ায়ে।" এই বন্ধুর বীণা থেকে নিঃসৃত "সুরের রণনে গানের বেদনায়" সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। এটা যতীনের একটা পরম লাভ—জীবনাতীত আধ্যাত্মিক সত্যের সঙ্গে সাযুজ্য প্রাপ্তি। এইখানেও এই নাটকের সঙ্গে 'ডাকঘরের তত্ত্বগত মিল দেখা যায়। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে, 'গৃহপ্রবেশ' নাটকে এই তত্ত্বকে স্বীকার করতে গেলে নাটকে ট্র্যাজেডির বিষয় আর কিছু থাকে না, সেই বোধটি কখনো জাগে না।

'গৃহ প্রবেশের পরের বছরই রবীন্দ্রনাথের "নটির পূজা" (১৯২৬) প্রকাশিত হয়। নাটকটির আঙ্গিকের মধ্যে গ্রীক্ ট্র্যাজেডির রীতিনীতি লক্ষ্য করা যায়।[১৮] গ্রীক্ ট্র্যাজেডির সংহতরূপ, বিশেষতঃ ঐক্যনীতি এই নাটকে অনেকটা বজায় আছে। কিন্তু গ্রীক ট্র্যাজেডির যে মূলকথা, চরিত্রের উপর নিয়তির অমোঘ জয়, নিয়তির অপ্রতিরোধ্য বিধান, তা এই নাটকে লক্ষ্য করা যায় না। এখানে গ্রীক ট্র্যাজেডির মতো নিয়তিই চরিত্র হয়ে ওঠেনি, বরং চরিত্রই নিয়তি হয়ে উঠেছে। শ্রীমতীর যে পরিণতি, তা শ্রীমতী সচেতনভাবে নিজেই আনয়ন করেছে জীবনে,—তার চরিত্রনিরপেক্ষভাবে পূর্বথেকেই স্থিরীকৃত হয়ে থাকেনি।

---

১৮. "বৌদ্ধযুগের আত্মত্যাগের কাহিনী অবলম্বনে অনেকটা গ্রীকট্র্যাজেডির আঙ্গিকে ইহা রচিত হইয়াছে। নৃত্যগীতের বাহুল্য থাকিলেও ইহার তীব্রতীক্ষ্ণ ঘটনাসংবেগ, গ্রন্থনকৌশল এবং অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বিস্ময়কর।"

—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ আধুনিক বাংলাসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ৫ম সং, পৃঃ ২৩৮

এখন প্রশ্ন, শ্রীমতীর এই পরিণতি ট্র্যাজিক কিনা, বা তার পরিণতি ট্র্যাজেডির বিষয় কি না। নাটকের আখ্যানভাগ সুরু থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বৌদ্ধধর্মের প্রতি নিজ বিশ্বাসকে রক্ষা করার জন্য রাজবাড়ির সর্বরকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যদিয়েই শ্রীমতী অগ্রসর হচ্ছে। শাক্ত রাজার বিরোধিতা ক'রে এইভাবে একাকী বৌদ্ধধর্ম বজায় রাখার চেষ্টায় যে বিপদ আছে, তাও শ্রীমতীর অজানা নয়। দ্বিতীয় অঙ্কে ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণা বসন্ত পূর্নিমায় ভগবান বোধিসত্ত্বের জন্মোৎসবে অশোকবনে পূজা নিবেদনের ভার দিলেন শ্রীমতীকে। রাজকন্যা রত্নাবলী সামান্য নটীর এই গৌরবে ক্ষিপ্ত হ'ল এবং রাজ-মহিষীর সহচরী মল্লিকার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে ঠিক হল যে কিছুতেই শ্রীমতীকে পূজা করতে দেওয়া হবে না।

দ্বিতীয় অঙ্কে শ্রীমতী বনের প্রবেশপথে পূজা সমাধা করে, স্তূপমূলে পূজা করতে যাওয়ার সময় অন্তঃপুর রক্ষিণীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হ'ল। শ্রীমতীর, রাজবাড়ীর সঙ্গিনীরা ভয় পেল। কিন্তু শ্রীমতী বলল, "আমি ভয় করিনে। জানি প্রথম থেকেই কেউ মন্দিরে দ্বার খোলা পায় না। ক্রমে যায় আগল খুলে। তবু আমার বলতে কোনো সঙ্কোচ নেই যে, প্রভু আহ্বান করেছেন আমাকে। বাধা যাবে কেটে। আজই যাবে।" রাজকন্যাদের মধ্যে সবচেয়ে বৌদ্ধ বিরোধী রত্নাবলী বলল, "নেই রাজার বাধা? সত্যি নাকি? যেয়ো তুমি পূজা করতে, আমি দেখব দুই চোখের আশা মিটিয়ে।" কিন্তু শ্রীমতীর তথাপি কোনো ভয় নেই। সে বলল, "যিনি অন্তর্যামী তিনিই দেখবেন। বাহির থেকে সব সরিয়ে দিলেন, তাতে আড়াল পড়ে।" রত্নাবলী ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, "তোমার দিন এবার হয়ে এসেছে, অহংকার ঘুচবে।" শ্রীমতীও অম্লান বদনে বলল, "তা ঘুচবে। কিছুই বাকি থাকবে না। কিছুই না।"

এই সময় নগরে বৌদ্ধধর্মের উপর শাক্ত ধর্মের আক্রমণ সুরু হয়ে গেছে। শ্রমণেরা শঙ্কিত। এই সংবাদ ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণা দিয়ে গেলে শ্রীমতীর সহচরী মালতী ভীত হয়ে উঠল, বলল, "দিদি, বাইরে ওই যেন মরণের কান্না শুনতে পাচ্ছি। আকাশে দেখছ ওই শিখা। নগরে আগুন লাগল বুঝি। জন্মোৎসবে এই মৃত্যুর তাণ্ডব কেন।" শ্রীমতী এর উত্তরে সুস্থিরভাবেই বলল, "মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়েই জন্মের জয়যাত্রা।"

একটু পরেই একজন অন্তঃপুররক্ষিণী এসে শ্রীমতীকে বলল, "রাজা প্রচার করেছেন সেখানে (অশোক তলে প্রভুর আসনে) যে-কেউ আরতি করবে,

স্তবমন্ত্র পড়বে, তার প্রাণদণ্ড হবে। শ্রীমতী, তাহ'লে তুমি আর কি করবে এখানে।" শ্রীমতী বলল, "অপেক্ষা করে থাকব"......"যতদিন না পূজার ডাক আসে। যতদিন বেঁচে আছি ততদিনই।" রক্ষিণী বলল, "হয়তো রাজার আদেশে তোমাকেও আঘাত করতে হবে।" শ্রীমতী বলল, "করো আঘাত।" রক্ষিণী—"সে আঘাত হয়তো রাজবাড়ির নটীর উপরে পড়বে, কিন্তু প্রভুর ভক্ত সেবিকাকে আজও আমার প্রণাম, সেদিনও আমার প্রণাম, আমাকে ক্ষমা করো। শ্রীমতী বলল, "আমার প্রভু আমাকে সকল আঘাত ক্ষমা করবার বর দিন। বুদ্ধো থমতু, বুদ্ধো থমতু।"

এই সময়ই রত্নাবলী এবং একজন রক্ষিণী এসে শ্রীমতীকে জানাল মহারাজের নিষ্ঠুর আদেশ যে, তাকে আজই অশোক বনে প্রভুর পূজার স্থানে বৌদ্ধধর্ম বিরোধী নটীনৃত্য করতে হবে। শ্রীমতী অমান্য করল না আদেশ।

এর পরে চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায় অশোক তলে স্তূপমূলে শ্রীমতী নটীনৃত্য করতে গিয়ে সুরু করল বৌদ্ধ আরাধনা। এবং রাজার আদেশ অনুসারে রক্ষিণীর হাতে ঘটল তার মৃত্যু।

শ্রীমতীর এই মৃত্যু আমাদের কাছে শোকের, কিন্তু এটা এত মহৎ এক পরিকল্পিত আত্মত্যাগ যে আমরা তার জন্য করুণা প্রকাশ করতে পারি না। এই ব্যাপারটাই এখানে ট্র্যাজেডি রসের পরিপন্থী। তাছাড়া যে জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটে, সেই জীবনে একটা চূড়ান্ত অপচয়, বা একটা অনুচিত দুর্ভাগ্য ঘটবেই, যা আমাদের মধ্যে প্রবল দুঃখকে জাগিয়ে তোলে। কিন্তু এখানে শ্রীমতীর দিক থেকে যদি দেখি তবে দেখব যে, এই মৃত্যুকে সে প্রকৃতপক্ষে একপা একপা করে সচেতনভাবে বরণ করেছে এবং এর মধ্যে সে তার জীবনের একটা পরম কৃতার্থতা খুঁজে পেয়েছে। তার কাছে এটা জীবনের অপচয়ও নয়, দুর্ভাগ্যও নয়। বরং তার ধর্ম রক্ষার্থে এটা তার জীবনের একটা পরম সৌভাগ্য এবং সদ্ব্যবহার। সুতরাং শ্রীমতীর এই জীবন, আমাদের কাছে দুঃখের লাগলেও ঠিক ট্র্যাজেডির বিষয় হয়ে ওঠে না।

বৌদ্ধধর্ম রক্ষার্থে শ্রীমতীর এই মৃত্যু যে তার জীবনের সাধনারই একটা সফল পরিণতি, তা নাটকের সূচনা-দৃশ্য থেকেই বোঝা যায়। সেখানে ভিক্ষু উপালিকে নটী বলছে, "প্রভু, তাহলে তিনি স্বয়ং তুলে নিন, যা আমার আছে।" উপালি বললেন, "তাই নেবেন, তোমার পূজার ফুল। ঋতুরাজ বসন্ত যেমন করে পুষ্পবনের আত্মদানকে আপনিই জাগিয়ে তোলেন। তোমার

সেইদিন এসেছে আমি তোমাকে জানিয়ে গেলুম। তুমি ভাগ্যবতী।" নটী বলল, "আমি অপেক্ষা করে থাকব।" নাটকের চতুর্থ অঙ্কে নটীর এই অপেক্ষার শেষে আত্মদানের কৃতার্থতা। সুতরাং ভাগ্যবতী হিসেবে এই আত্মদানের জন্য যে সাধনার পথে সে অপেক্ষা করছিল, অশোকতলে স্তূপ মূলে মৃত্যুর মধ্যদিয়ে তার সেই সাধনার হোল শেষ। সুতরাং এর মধ্যে আমরা শ্রীমতীর জীবনের কোনো অপচয় দেখি না, কোনো অনুচিত দুর্ভাগ্যকে দেখি না—এবং সেইজন্যই শ্রীমতীর এই জীবনে ট্র্যাজেডিও লক্ষ্য করা যায় না।

অনেক সময় শ্রীমতীর এই আত্মদানকে 'বিসর্জন' নাটকের জয়সিংহের আত্মদানের সঙ্গে তুলনীয় মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দু'টি আত্মদানের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রেমধর্ম এবং প্রথাধর্মের মধ্যকার দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে না পেরে জয়সিংহ আত্মদান করেছে। সেখানে আত্মদানের মধ্যদিয়ে সে প্রকাশ করেছে রঘুপতির প্রতি তার ক্ষোভ এবং অভিমান। তার অচরিতার্থ জীবন-তৃষ্ণার মর্মভেদী রূপটি গাঢ় হয়ে প্রকাশিত হয়েছে এই আত্মদানে। তাই তার এই আত্মদানকে মনে হয় অনুচিত দুর্ভাগ্য, এবং তার জীবনকে দেখি একটি চূড়ান্ত অপচয় হিসেবে। এইজন্যই জয়সিংহের মৃত্যু একটি ট্র্যাজেডি। কিন্তু শ্রীমতীর কোনো দ্বন্দ্বই ছিল না। তার জীবনের ব্যক্তিগত কোনো আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তার ধর্মজীবনের কোনো সংঘাতই ঘটেনি, কারো প্রতি কোনো ক্ষোভ বা অভিমানেও সে এই আত্মদান করেনি, কেবল নিজের জীবনের একমাত্র সানন্দ চরিতার্থতার জন্যই তার এই আত্মদান। জয়সিংহের মহৎ আত্মদানের আড়ালেও তার জীবনের ক্রন্দন শুনতে পাওয়া যায়, অনুতাপকে বুঝতে পারা যায়। কিন্তু শ্রীমতীর মহৎ আত্মদানের আড়ালে কোনো অনুশোচনা বা আফশোস নেই, কোনো ক্রন্দন নেই, আছে শুধু জীবনের প্রার্থিত পরম সার্থকতা। এই পার্থক্যই শ্রীমতীর মৃত্যুকে ট্র্যাজেডির বিষয় হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থেকে দূরে রেখেছে।

এই নাটকে দ্বন্দ্ব একমাত্র যদি থেকে থাকে, তবে তা আছে রাজমহিষী লোকেশ্বরীর জীবনে। রাজমহিষী বৌদ্ধধর্মে একনিষ্ঠ, বৌদ্ধধর্মের জন্য উৎসর্গী-কৃতপ্রাণা। কিন্তু এই বৌদ্ধধর্মই একদিন তাঁর মাতৃহৃদয়ে আঘাত করল যেদিন তাঁর একমাত্র পুত্র চিত্র তাঁর কোল ছেড়ে চলে গেল ভিক্ষু হয়ে। সেদিন ধর্মের প্রতি তাঁর আনুগত্যের দাবিকে অস্বীকার করে তিনি বললেন, "আমার একমাত্র ছেলে চিত্র—রাজপুত্র আমার,—তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেল

ভিক্ষু করে। তবু বলে পূজা দাও। লতার মূল কেটে দিলে তবু চায় ফুলের মঞ্জরী।"—১ম।

তারপর থেকেই তিনি বৌদ্ধধর্মের উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন। এখন তাঁর মন্ত্র "নমো বজ্রক্রোধ ডাকিন্যৈ, নমঃ শ্রীবজ্র মহাকালায়। অস্ত্র দিয়ে আগুন দিয়ে রক্ত দিয়ে জগতে শান্তি আসবে। নইলে মার কোল ছেড়ে ছেলে চলে যাবে, সিংহাসন থেকে রাজ মহিমা জীর্ণ পত্রের মতো খসে খসে পড়বে।"—১ম।

ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি রাজকন্যাদের বলেন,—"যেখানে রাজার প্রভাব ছিল সেখানে ভিক্ষুর প্রভাব হবে—একে ধর্ম বলিস তোরা বিশ্বাসঘাতিনীরা?" তারপর তিনি শ্রীমতীকে বললেন, "উপালি তোকে কী মন্ত্র দিয়েছে উচ্চারণ কর দেখি নটী। দেখি কত বড় সাহস? পাপ রসনায় পক্ষাঘাত হবে না?" কিন্তু শ্রীমতী যেই উপালির দেওয়া মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে ভাব পরিবর্তন হ'ল লোকেশ্বরীর। তিনিও শ্রীমতীর সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন এবং বললেন, "কে বলে ধর্ম মিথ্যা। পুণ্য মন্ত্রের যেমনি উচ্চারণ অমনি গেল অমঙ্গল"—১ম। এইটিই হচ্ছে লোকেশ্বরীর দ্বন্দ্ব। বৌদ্ধধর্ম তাঁর পুত্রকেও তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ায় বৌদ্ধধর্মের প্রতি যেমন তাঁর আক্রোশ, তেমনি বৌদ্ধধর্মের মধ্যেই শান্তি ও সান্ত্বনালাভের অভ্যাসের ফলে বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ। এই জন্যই মল্লিকা যখন লোকেশ্বরীকে বলল, "বুদ্ধের ধর্মকে নির্বাসিত করলে আবার ফিরে আসবে—অন্যধর্ম দিয়ে চাপা না দিলে শান্তি নেই। দেবদত্তের কাছে যখন নূতন মন্ত্র নেবে, তখনই সান্ত্বনা পাবে", তখন লোকেশ্বরী বলে উঠলেন, "দেবদত্ত ক্রূর সর্প, নরকের কীট। যখন অহিংসা ব্রত নিয়েছিলেন তখনো মনে মনে তাকে প্রতিদিন দগ্ধ করেছি, বিদ্ধ করেছি। আর আজ! যে আসনে আমার সেই পরম নির্মল জ্যোতির্ভাসিত মহাগুরুকে নিজে এনে বসিয়েছি, তাঁর সেই আসনেই দেবদত্তকে ডেকে আনব! ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো। দ্বারত্রয়েন কৃতং সর্বং অপরাধীং ক্ষমতু মে প্রভো"—২য়।

এই মনোভাবই লোকেশ্বরীকে চতুর্থ অঙ্কে অশোকতলে স্তূপমূলে শ্রীমতীর নটীনৃত্যের সময় শ্রীমতীকে বিষ প্রদানে প্ররোচিত করেছে। বিষ নিয়ে তিনি শ্রীমতীকে বললেন, "এই নে, শীঘ্র খেয়ে ফেল। এখানে মলে স্বর্গ পাবি, এখানে নাচলে যাবি অবীচি নরকে।"—৪র্থ। তারপর রক্ষিণীর ছুরিকাঘাতে শ্রীমতীর মৃত্যু হ'লে লোকেশ্বরী শ্রীমতীর ভিক্ষুণীবেশের একপ্রান্তে মাথা

ঠেকিয়ে বললেন, "নটী, তোর এই ভিক্ষুণীর বস্ত্র আমাকে দিয়ে গেলি।" অর্থাৎ এরপর লোকেশ্বরী নিজেই ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণ করলেন। জয় হোল বৌদ্ধধর্মের। পুত্রের জন্য যে বেদনা তাঁকে বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল, তা শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনে স্থিত থেকে তাঁর জীবনের সামঞ্জস্যবোধ বা নীতিবোধের ভারসাম্যকে বানচাল করে দেয়নি, দিলে সেখানে ট্র্যাজেডির উপাদান সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকত। তাই শেষ পর্যন্ত এই চরিত্রেও ট্র্যাজেডির কোনো লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এবং সামগ্রিকভাবে এইজন্য 'নটীর পূজা' একটি ভক্তি রসাশ্রিত নাটক,—আদিতে এবং অন্ত্যে কোথাও-ই ট্র্যাজেডি নেই।

'বাঁশরী' (১৯৩৩) নাটকে রবীন্দ্রনাথ প্রেম ও ভালোবাসা সম্পর্কে একটি তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। পুরন্দর সন্ন্যাসীর বক্তব্যেই আভাসিত হয়েছে এই রবীন্দ্রতত্ত্ব, যেমন পুরন্দরের চিঠি থেকে পড়ে শোনাচ্ছে বাঁশরী—"প্রেমে মানুষের মুক্তি সর্বত্র। কবিরা যাকে বলে ভালোবাসা সেইটাই বন্ধন। তাতে একজন মানুষকেই আসক্তির দ্বারা ঘিরে নিবিড় স্বাতন্ত্র্যে অতিকৃত করে। প্রকৃতি রঙীন মদ ঢেলে দেয় দেহের পাত্রে, তাতে যে মাতলামি তীব্র হয়ে ওঠে তাকে অপ্রমত্ত সত্যবোধের চেয়ে বেশি সত্য বলে ভুল হয়। খাঁচাকেও পাখি ভালোবাসে যদি তাকে আফিমের নেশায় বশ করা যায়। সংসারের যত দুঃখ, যত বিরোধ, যত বিকৃতি সেই মায়া নিয়ে যাতে শিকলকে করে লোভনীয়। কোন্‌টা সত্য কোনটা মিথ্যে চিন্‌তে যদি চাও তবে বিচার করে দেখো কোন্‌টাতে ছাড়া দেয়, আর কোন্‌টা রাখে বেঁধে। প্রেমে মুক্তি, ভালোবাসায় বন্ধন।"—২।১।

"বাঁশরী' নাটকে এই ভালোবাসার সম্পর্ককে অস্বীকার ক'রে প্রেমের সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু ভালোবাসার সম্পর্কটা যেহেতু প্রাকৃতিক, তাই সেটাকে তত্ত্বের জোরে অস্বীকার করবার প্রচেষ্টার মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে মানবচিত্তের চাপা কান্না। পরিশেষে প্রেমের প্রতিষ্ঠার দ্বারা তত্ত্বের জয় ঘোষিত হলেও, তার পূর্বপর্যায়ের বেদনার ইতিবৃত্তও কম উল্লেখযোগ্য নয়।

'বাঁশরী'তে এই বেদনার ইতিবৃত্ত গড়ে উঠেছে বাঁশরীর জীবনকে অবলম্বন ক'রে। রাজা সোমশংকরের সঙ্গে বাঁশরীরই যথার্থ ভালোবাসার সম্পর্ক। এরা উভয়েই উভয়কে চায় ভালোবাসার চরিতার্থতার জন্য। কিন্তু পুরন্দর তাঁর আদর্শের বৃহত্তর স্বার্থে বাঁশরীকে সোমশংকরের সঙ্গে মিলিত হতে দেবেন

না। তিনি সোমশংকরের সঙ্গে মিলন ঘটালেন সুষমার, যে সুষমা আবার পুরন্দরেরই প্রকৃত অনুরাগিনী। পুরন্দর যদি সুষমার অনুরাগকে জীবনে প্রশ্রয় দিতেন, কিংবা তিনি যদি বাঁশরীর সঙ্গে সোমশংকরের বিবাহের বাধা হয়ে না দাঁড়াতেন, তবে কোনোদিক থেকেই কোনো বেদনার কারণ থাকত না। কিন্তু বেদনার সিঁড়ি ভাঙ্গার পরই রবীন্দ্রনাথ তাঁর চরিত্রদের সত্যের সন্ধান দেন। তাই সত্যকে লাভ করবার পূর্বে বাঁশরীর পাওনা ছিল অশেষ দুঃখ, গভীর যন্ত্রণা। তাই পুরন্দর বাঁশরীর প্রিয়তম সোমশংকরের সঙ্গে সুষমারই বিবাহের ব্যবস্থা পাকা করলেন। এই অনুষ্ঠানের পরে (এন্‌গেজমেন্ট অনুষ্ঠান) তিনি সোমশংকর ও সুষমার কাছে ব্যক্ত করলেন তাঁর আদর্শ: "তোমাদের মিলনের শেষ কথাটা ঘরের দেয়ালের মধ্যে নয়, বাইরে, বড়ো রাস্তার সামনে। সুষমা বৎসে. যে সম্বন্ধ মুক্তির দিকে নিয়ে চলে তাকেই শ্রদ্ধা করি। যা বেঁধে রাখে পশুর মতো প্রকৃতির গড়া প্রবৃত্তির বন্ধনে বা মানুষের গড়া দাসত্বের শৃঙ্খলে ধিক্ তাকে। পুরুষ কর্ম করে, স্ত্রী শক্তি দেয়। মুক্তির রথ কর্ম, মুক্তির বাহন শক্তি। সুষমা, ধনে তোমার লোভ নেই, তাই ধনে তোমার অধিকার। তুমি সন্ন্যাসীর শিষ্যা তাই রাজার গৃহিণীপদে তোমার পূর্ণতা।"—১।৩। অর্থাৎ আসক্তি যাতে স্ত্রী পুরুষের কর্মক্ষেত্রকে বাধাগ্রস্ত না করে, সেই দিকেই পুরন্দরের লক্ষ্য। এই আসক্তিই তাঁর প্রতি সুষমার এবং সোমশংকরের প্রতি বাঁশরীর রয়েছে বলেই পুরন্দর নিজে সুষমার ভালোবাসাকে প্রশ্রয় দেন নি এবং সোমশংকর ও বাঁশরীর মিলনে বাধা দিলেন, আর মিলিয়ে দিলেন সোমশংকরের সঙ্গে সুষমার, যাদের মধ্যে পারস্পরিক আসক্তি এতটুকুও নেই—সুতরাং আদর্শের পথে তারা বাধাগ্রস্ত নয়, মুক্ত। আবার সোমশংকরের সঙ্গে বিবাহিত না হতে পারায় বাঁশরীর জীবনেও সোমশংকরের প্রতি আসক্তি বেশীদিন না থাকার কথা। তাই পুরন্দরের আদর্শের পথে তাকেও মুক্ত অবস্থায় পাওয়ার সম্ভাবনা বজায় থাকল। এইভাবে পুরন্দর সার্থক করলেন তাঁর পরিকল্পনা মানবচিত্তের আসক্তির মূলে কুঠারাঘাত ক'রে।

কিন্তু বাঁশরীর জীবনে অন্ততঃ, এই আসক্তিটাই ছিল সবচেয়ে বড়ো সত্য। সুষমার মতো এত সহজে নিজের আসক্তিকে পরিত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই নাটকের প্রথম থেকেই দেখি তার ভাষায় জীবনের এই আসক্তির অচরিতার্থতার বেদনা এক দুর্নিবার জ্বালায় পরিণত হয়েছে। "বিলিতিয়ুনিভার্সিটির' পাস করা মেয়ে' এবং আধুনিক জীবন-দৃষ্টি সম্পন্ন

বাঁশরী জীবনের স্বাভাবিক আসক্তির দিকটাকেই সত্য বলে বিশ্বাস করে। আদর্শের জন্য আসক্তিকে বিসর্জন দেওয়া তার বিবেচনায় বড়ই কৃত্রিম এবং মিথ্যাচার। তাই বাঁশরী স্বভাবের অতিরিক্ত কোনো আদর্শকে মানতে চায়না। এই নিয়েই পুরন্দরের সঙ্গে তার বিরোধ। মধ্যযুগীয় আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত সামন্ত নৃপতি-সন্তান সোমশংকরকে বাঁশরীই আধুনিক করে তুলেছিল। "দেখতে দেখতে যে রকম রূপান্তর ঘটল কারও সন্দেহ ছিল না ওঁর গোত্রান্তর ঘটবে বাঁশরীর গুষ্টিতেই। বাপ প্রভুশংকর খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি আধুনিকের কবল থেকে নিয়ে গেলেন সরিয়ে।" কিন্তু "বাঁশরীর চেয়ে বড়ো ওস্তাদ ঐ পুরন্দর সন্ন্যাসী, সব ক'টা বেড়া ডিঙ্গিয়ে রাজার ছেলেকে টেনে নিয়ে এলেন এই ব্রাহ্মসমাজের আঙটি বদলের সভায়। সবচেয়ে কঠিন বেড়া স্বয়ং বাঁশরীর।" এইখানেই বাঁশরীর পরাজয়, এই পরাজয়েই তার ট্র্যাজেডি। তার সুস্পষ্ট জীবনাসক্তি যে সোমশংকরকে ধরে রাখতে পারল না, সেই সোমশংকরকেই ধরে নিয়ে এল সন্ন্যাসীর আদর্শ! কৃত্রিম আদর্শের কাছে জীবনের আসক্তির এই পরাজয়কে কিছুতেই বাঁশরী মেনে নিতে চায় না। তার যন্ত্রণাক্লিষ্ট চিত্ত শতধা হয়ে গেছে এই পরাজয়কে মানতে গিয়ে। এই নাটকের শেষ দৃশ্যটি ছাড়া আর সব দৃশ্যেই তাই বাঁশরীর প্রতিটি উক্তিই তার ট্র্যাজেডি-নিপীড়িত, যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনের অচরিতার্থ আসক্তির এক একটি জ্বালাময় অভিব্যক্তি।

বাঁশরী তার জীবনের এই ট্র্যাজেডির কাহিনীটিরই সন্ধান দিতে চায় গল্পলেখক ক্ষিতীশকে। নাটকের প্রথম দৃশ্যেই এ সম্পর্কে সে ক্ষিতীশকে ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় বলে, "চতুর্দিকের আবহাওয়াটার কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, বলব, কোনো একটা জায়গায় ডিপ্রেশন ঘটেছে। গতিকটা ঝোড়ো রকমের; বাদলা কোনো না কোনো পাড়ায় নেমেছে, বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি" —১।১। এই কথাগুলি দৃশ্যতঃ এবং প্রসঙ্গসূত্রে সুষমার অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করলেও, এর মধ্য থেকে বাঁশরীর নিজের অবস্থাটাও দ্যোতিত হয়েছে। পুরন্দর সোমশংকরকে বাঁশরীর জীবন থেকে সরিয়ে নেওয়ায় যে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে বাঁশরীর প্রবঞ্চিত জীবন-স্পৃহা ঝটিকার মতো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, এবং তার নিজের জীবনের আঙ্গিনাতেই বাদলা কিছু কম নামেনি। অশ্রুবর্ষণের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে তো বেশি বটেই, কারণ তার যা বেদনা, তা স্বাভাবিক পরিমিত অশ্রুবর্ষণের মাধ্যমে রূপ পেতে পারেনা,—

অশ্রুবিহীন শুষ্ক দাহ-জ্বালার মাধ্যমেই তার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটতে পারে, এবং প্রকৃতপক্ষে এই দাহজ্বালার মধ্যদিয়েই প্রকাশিত হয়েছে বাঁশরীর বেদনা।

জীবনে সোমশংকরকে না পাওয়ার বেদনায় এবং অভিমানে বাঁশরী সোমশংকরের ভালোবাসার অভিজ্ঞান স্বরূপ প্রদত্ত অলংকারগুলি সোমশংকরকে ফেরৎ দিলে, সোমশংকর বলেছিল, "ভুল বুঝো না আমাকে। আমার শেষ কথাটা শুনে যাও। আমি জঙ্গলের মানুষ। শহরে এসে কলেজে পড়ার আরম্ভের মুখে প্রথম তোমার সঙ্গে দেখা। সে দৈবের খেলা। তুমিই আমাকে মানুষ করে দিয়েছিলে, তার দাম কিছুতেই শোধ হবে না"—১।২। কিন্তু বাঁশরী নিজেও সোমশংকরের কাছে নিজের ঋণ স্বীকার করে। তাই সোমশংকরের কথার জবাবে সে বলল, "আমার তখন প্রথম বয়েস, তুমি এসে পড়লে সেই নতুন জাগা অরুণ রঙের দিগন্তে। ডাকদিয়ে আলোয় আনলে যাকে তাকে লও বা না লও নিজে তো তাকে পেলুম। আত্ম পরিচয় ঘটল। ব্যস্, দুইপক্ষে হয়ে গেল শোধবোধ। এখন দু'জনেই অঋণী হয়ে আপন আপন পথে চললুম"—১।২। এই উক্তিটির মধ্যে আপাতঃদৃষ্টিতে বাঁশরীর একটা সান্ত্বনালাভের অভিপ্রায় লক্ষ্য করা গেলেও, আসলে হতাশার যন্ত্রণাটা বাঁশরীর চরিত্রের মূল ভাব। এই ভাবটিই প্রকাশ পেয়েছে উপরোক্ত উক্তিটি করার সময় বাঁশরীর দৃষ্টিতে, যা দেখে সোমশংকর ভয় পেয়েছে, এবং যার অর্থ বাঁশরীর নিজের ভাষায়, "আমি তাকিয়ে আছি একশো বছর পরেকার যুগান্তে। সে দিকে আমি নেই, তুমি নেই, আজকের দিনের অন্য কেউ নেই। ভুল বোঝার কথা বলছ! সেই ভুল বোঝার উপর দিয়ে চলে যাবে কালের রথ। ধুলো হয়ে যাবে, সেই ধুলোর উপরে বসে খেলা করবে তোমার নাতি-নাতনিরা। সেই নির্বিকার ধুলোর হোক জয়"—১।২। অর্থাৎ বাঁশরীর পক্ষে সোমশংকরকে ভুল বুঝবার কিছু নেই এবং এই ভুল বোঝা-বুঝির ব্যাপারটা কোনো প্রকার সান্ত্বনার বিষয়ও নয় বাঁশরীর কাছে। তার যা ক্ষতি, সেটা চূড়ান্তভাবেই ক্ষতি, জীবনের নগদমূল্যেই বাঁশরী তার পরিমাপ বুঝতে পারে। সুতরাং যে কোনো আদর্শের বশবর্তী হয়েই সোমশংকর বাঁশরীর জীবন থেকে সরে থাক না কেন, তাতে সোমশংকরের কৃতার্থতা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু বাঁশরীর তাতে পুরোটাই ক্ষতি, এবং সে ক্ষতির যন্ত্রণা সোমশংকরের কোনো স্তোকবাক্যে প্রশমিত হবার নয়। এই নিদারুণ

যন্ত্রণাই এই নাটকে বাঁশরীর চরিত্রকে স্পষ্ট করে তুলেছে। অর্থাৎ এই নাটকে বাঁশরীর চরিত্র বাঁশরীর ট্র্যাজেডিরই একটা জীবন্ত প্রতিমূর্তি।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে বাঁশরী ক্ষিতীশকে বলছে, "সাহিত্যিক, হতাশ হয়ে পড়েছি তোমার অসাড়তা দেখে। নিজের চক্ষে দেখলে একটা আসন্ন ট্র্যাজেডির সংকেত—আগুনের সাপ ফণা ধরেছে—এখনও চেতিয়ে উঠল না তোমার কলম, আমার তো কাল সারারাত্রি ঘুম হল না।"—২।১। এখানে বাঁশরী কার জীবনের ট্র্যাজেডির কথা উল্লেখ করছে,—সোমশংকরের না তার নিজের,—তা অবশ্য স্পষ্ট বোঝা যায় না, কিন্তু একথা বোঝা যায় যে, তার নিজের জীবনের ট্র্যাজেডিই তার কাছে সবচেয়ে বেশী দুর্বহ। কিন্তু বিশেষত্ব এই যে, বাঁশরী নিজে সচেতনভাবে কখনোই নিজের এই দুর্বহ ট্র্যাজেডিকে প্রকাশ করে না, তার ট্র্যাজেডির যন্ত্রণাকে নির্বিশেষ করে তোলে এমনভাবে যে মনে হয়, সে সোমশংকরের জন্যই বেশী উদ্বিগ্ন, সোমশংকরের ট্র্যাজেডিই তাকে বিচলিত করেছে বেশি। কিন্তু খোঁজ করলেই দেখা যায় যে, নিজের কথা ভুলে কেবল সোমশংকরের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো আত্মজীবন সম্পর্কে নিস্পৃহ স্বভাব বাঁশরীর নয়।

ক্ষিতীশ বাঁশরীকে প্রশ্ন করেছিল, সোমশংকর বা সুষমার অবস্থায় পড়লে বাঁশরী কি করত?—এর উত্তরে বাঁশরী বলেছিল, "সন্ন্যাসীর উপদেশ সোনার জলে বাঁধানো খাতায় লিখে রাখতুম। তারপরে প্রবৃত্তির জোর কলমে তার প্রত্যেক অক্ষরের উপর দিতুম কালির আঁচড় কেটে। প্রকৃতি জাদু লাগায় আপন মন্ত্রে, সন্ন্যাসীও যাদু করতেই চায় উল্টো মন্ত্রে। ওর মধ্যে একটা মন্ত্র নিতুম মাথায়, আর একটা মন্ত্রে প্রতিদিন প্রতিবাদ করতুম হৃদয়ে"—২।১। বাঁশরীর এই উত্তরেই বোঝা যায় যে, জীবন সম্পর্কে প্রকৃতির নির্দেশ অনুসারে সে কতখানি আসক্ত। সুতরাং নিজের জীবনের যন্ত্রণাকে ভুলে গিয়ে কেবলমাত্র সোমশংকরের জন্য বিচলিত হওয়া তার কাছে প্রত্যাশিত নয়। বরং এ কথাই মনে হয় যে, নিজের জীবনের ট্র্যাজেডির পরিমাপ নিয়ে সে সোমশংকরের ট্র্যাজেডিরও পরিমাপ করেছে। সুতরাং ক্ষিতীশের কাছে "একটা আসন্ন ট্র্যাজেডির সংকেত"—এর উল্লেখে যদি সে সোমশংকরের ট্র্যাজেডির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেও থাকে, তবু সেই উদ্বেগের মধ্যদিয়ে প্রকৃতপক্ষে সে নিজেরই ট্র্যাজেডির নিরুদ্ধ যন্ত্রণাকে প্রকাশ করেছে;—প্রকাশ করে ফেলেছে তার ট্র্যাজেডির যন্ত্রণার গভীরতা।

এই নাটকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাঁশরীর ব্যবহারে তার ট্র্যাজেডির দাহ-র দিকটাই প্রকাশিত হয়েছে, শোকের দিকটা বিশেষ প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু তার এই ট্র্যাজেডির শোক যে তাকে গভীরভাবে কাতর করে তুলেছিল, তার পরিচয়ও আছে। শৈলের একটা উক্তিতে বাঁশরীর এই ট্র্যাজেডি-পীড়িত সুগভীর অথচ নিস্তব্ধ শোকমগ্নতার একটি চিত্র পাওয়া যায়: সে (বাঁশরী) মনের মধ্যে মরণ-বাণ বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, অথচ কবুল করবার মেয়ে নয়। ওর ব্যথায় হাত বুলোতে গেলে ফোঁস করে ওঠে, সেটা যেন সাপের মাথার মণি। তাই সময় পেলে কাছে এসে বসি, যা তা ব'কে যাই। পরশুদিন সকালে এসেছিলুম ওর ঘরে। পায়ের শব্দ পায়নি। ওর সামনে এক বাণ্ডিল চিঠি। ডেস্কে ঝুঁকে পড়ছিল বসে, বেশ বুঝতে পারলুম চোখ দিয়ে জল পড়ছে। যদি জানত আমি দেখতে পেয়েছি তাহলে একটা কাণ্ড বাধত, বোধহয় আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যেত। আস্তে আস্তে চলে গেলুম। কিন্তু, সেই ছবি আমি ভুলতে পারিনে"—২।১। বাঁশরী সম্পর্কে শৈলের এই উক্তিটির মধ্যে বাঁশরীর সুগভীর শোকের পরিচয়টা পাওয়া যায়। এই শোককে সে প্রকাশ করেনি, কারণ, তাতে তার দুর্বলতা প্রকাশিত হবে—এই ভয় তার ছিল। তাই সে শোককে চেপে রেখে জ্বালাকেই প্রকাশ করেছে বেশী। শোককে গোপন করার এই যে সচেতন প্রচেষ্টা—এটাই তার শোকের ব্যাপ্তি ও গভীরতার প্রমাণ। এবং এটাই তার ট্র্যাজেডিকে আরো বেশী পরিমাণে মর্মন্তুদ করে তুলেছে।

এইভাবে শোককে গোপন করার মধ্যদিয়ে প্রকৃতপক্ষে বাঁশরী তার ট্র্যাজেডিকে কার্যতঃ অস্বীকার করবার চেষ্টা করেছে,—চেষ্টা করেছে তার পরাজিত জীবন-আকাঙ্ক্ষার উপর জয়লাভ করতে, আর সেইখানেই হয়েছে তার ট্র্যাজেডি আরো ঘনীভূত। সে চেষ্টা ক'রেছে সোমশংকরের প্রতি তার সমস্ত আকর্ষণকে ছিন্ন ক'রে নির্মোহ মন নিয়ে কোন রকমে বেঁচে উঠতে। তাই দেখি সোমশংকর যখন বাঁশরীকে বলল, "ওর (সুষমার) একটি ব্রত আছে। ওর জীবনে সমস্ত দরকার তাই নিয়ে, তাকে সাধ্যমত সার্থক করা আমারও ব্রত"—২।২,—তখন প্রবল ধিক্কারে বাঁশরী সোমশংকরকে বলতে পেরেছে, "ওর (সুষমার) ব্রত আগে, তারই পশ্চাতে তোমার—পুরুষের মতো শোনাচ্ছে না. একথা ক্ষত্রিয়ের মতো নয়ই। এত বড়ো পুরুষকে মন্ত্র পড়িয়েছে ঐ সন্ন্যাসী। বুদ্ধিকে দিয়েছে ঘোলা করে, দৃষ্টিকে দিয়েছে চাপা। শুনলুম সব, ভালো হ'ল। গেল আমার শ্রদ্ধা ভেঙে, গেল আমার বন্ধন ছিঁড়ে।

বয়স্ক শিশুকে মানুষ করবার ভার আমার নয়, সে কাজের ভার সম্পূর্ণ দিলেম ছেড়ে ঐ-মেয়ের (সুষমার) হাতে"—২।২।

জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটলে তারজন্য কেঁদে কেটে ভেসে যাবার মতো সাধারণ মেয়ে বাঁশরী নয়, এ কথাটা প্রমাণ করবার জন্যই বাঁশরী এইভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে সোমশংকর সম্পর্কে নির্মোহ হবার। তৃতীয় অঙ্কে বা শেষ দৃশ্যেও দেখি লীলা যখন বাঁশরীকে বলছে যে, সুষমা-সোমশংকরের বিয়ে বাড়ি সাজাবার ভার লীলার উপরই পড়েছে, এবং লজ্জায় এ ভার বাঁশরীকে দেওয়া যায় নি, তখন বাঁশরী একই ভাবে নিজেকে সাধারণ মেয়ের অতিরিক্ত কিছু একটা প্রমাণিত করবার মানসে বলল, "না ডেকেই লজ্জা দিলে আমাকে। ভাবছে আমি অন্নজল ছেড়ে ঘরে দরজা দিয়ে কেঁদে মরছি। ওদের সঙ্গে যখন তোর দেখা হবে কথা প্রসঙ্গে বলিস, 'বাঁশি বিছানায় শুয়ে কমিক গল্প পড়ছিল, পেট ফেটে যাচ্ছিল হেসে হেসে। নিশ্চয় বলিস"—শেষ দৃঃ।

কিন্তু নারীর যে মোহ তা সাধারণ মেয়ের চেয়ে বেশিই ছিল বাঁশরীর। তাই সাধারণ মেয়ের পক্ষে নির্মোহ হওয়া যদিই বা সম্ভব ছিল, বাঁশরীর পক্ষে তা কিছুতেই সম্ভব নয়! তাই সে যখন চেষ্টা করে প্রমাণ করতো যে, সাধারণ মেয়েদের মতো সেন্টিমেণ্টাল সে নয়, তখন প্রকৃতপক্ষে তার শোকার্ততার গভীরতাটাই আরও যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জীবন-সম্পর্কিত মোহ সাধারণ মেয়েদের চেয়ে বাঁশরীর বেশি এবং সেই জন্যই সে ভুলতে পারেনা জীবনকে, অস্বীকার করতে পারে না জীবনের দাবিকে। এই মোহ-নিষ্ঠ জীবনাকাঙ্ক্ষা এক অনির্বাণ অগ্নিশিখার মতো তার চিত্তকে জ্বালিয়েছে, এবং সেই জ্বালা নিয়ে সে পুরন্দরের সঙ্গে প্রবৃত্ত হয়েছে জীবনে মোহের প্রয়োজনীয়তা-অপ্রয়োজনীয়তার তর্কে, আর এই তর্কের মধ্যদিয়েই প্রকাশিত হয়েছে তার ট্র্যাজেডি-পীড়িত জীবনের শূন্যতার দীর্ঘ-নিশ্বাস, হাহাকার। পুরন্দর তাকে বলেছিলেন, "মোহ নইলে সৃষ্টি হয় না, মোহ ভাঙলে প্রলয়, এ কথা মানতে রাজি আছি। কিন্তু, তুমিও একথা মনে রেখো, আমার সৃষ্টি তোমার সৃষ্টির চেয়ে অনেক উপরে। তাই আমি নির্মম হয়ে তোমার সুখ দেব ছারখার করে। আমিও চাইব না সুখ; যারা আসবে আমার কাছে সুখের দিক থেকে, মুখ দেব ফিরিয়ে। আমার ব্রতই আমার সৃষ্টি, তার যা প্রাপ্য তা তাকে দিতেই হবে। যতই কঠিন হোক"—২।২।

এর জবাবে বাঁশরী প্রায় ক্ষিপ্ত হয়েই পুরন্দরকে বলেছে, "সেই জন্যেই

সজীব নয় তোমার আইডিয়া, সন্ন্যাসী। তুমি জান মন্ত্র, জাননা মানুষকে। মানুষের মর্মগ্রন্থি টেনে ছিঁড়ে সেইখানে তোমার কেঠো আইডিয়ার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে অসহ্য ব্যথার পরে মস্ত মস্ত বিশেষণ চাপা দিতে চাও। তাকে বল শান্তি? টিকবে না ব্যাণ্ডেজ, ব্যথা যাবে থেকে। তোমরা সব অমানুষ, মানুষের বসতিতে এলে কী করতে। যাও না তোমাদের গুহা গহ্বরের বদরিকাশ্রমে। সেখানে মনের সাধে নিজেদের শুকিয়ে পাথর করে ফেলো। আমরা সামান্য মানুষ, আমাদের তৃষ্ণার জল মুখের থেকে কেড়ে নিয়ে মরুভূমিতে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে সাধনা বলে প্রচার করতে চাও কোন্ করুণায়। ব্যর্থজীবনের অভিশাপ লাগবে না তোমাকে? যা নিজে ভোগ করতে জাননা তা ভোগ করতে দেবে না ক্ষুধিতকে?"—২।২।

বাঁশরীর এই উক্তির মধ্যেই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে তার ব্যথাটা কোথায়, আঘাতটা কোন্‌খানে লেগেছে,—তার ট্র্যাজেডির মূল কারণটা কী? সে যতই চেষ্টা করুক তার ব্যথাকে গোপন করতে,—এবং সেই চেষ্টার মধ্যদিয়ে সাধারণ মেয়েদের থেকে অতিরিক্ত কিছু একটা হয়ে উঠতে,—ব্যথা তার প্রকাশিত হয়ে পড়লই। তার তৃষ্ণার জল মুখের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ব্রতের মরুভূমিতে ছড়িয়ে দিচ্ছেন পুরন্দর—এখানেই তার ব্যথা,—এতেই তার জীবন ব্যর্থ। আর এইটাই তার শেষ ট্র্যাজিক আকাঙ্ক্ষা যে, যে তার জীবনকে এইভাবে ব্যর্থ করে দিল, তাকেও লাগবে তার এই ব্যর্থ-জীবনের অভিশাপ।

বাঁশরীর ব্যর্থ জীবনের আক্রোশ এই সময় তার ভাষাতেও যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তাই অগ্নিস্রাবী ভাষাতেই ট্র্যাজেডির তুষানলে দগ্ধ বাঁশরী সুষমাকে এর পরেই বলেছে, "মরিয়া হয়ে মেয়েরা চিতার আগুনে মরেছে অনেক, ভেবেছে তাতেই পরমার্থ। তেমনি করেই নিজের হাতে নিজের ভাগ্যে আগুন লাগিয়ে দিনে দিনে মরতে চাস জ্বলে জ্বলে? চাসনে তুই ভালোবাসা, কিন্তু যে মেয়ে চায়, পাষাণ সে করেনি আপন নারীর প্রাণ, কেন কেড়ে নিতে এলি তার চিরজীবনের আনন্দ। এই আমি আজ বলে দিলুম তোকে, ঘোড়ায় চড়িস, শিকার করিস, সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্র নিস. তবু তুই পুরুষ নোস—আইডিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তোর দিন কাটবে না গো, তোর রাত বিছিয়ে দেবে কাঁটার শয়ন"—২।২।

বাঁশরীর এই উক্তির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তার আতীব্র জীবন তৃষ্ণা। এত তীব্র তার জীবন তৃষ্ণা, যে তার ব্যর্থ জীবনের শোচনা কেবল অশ্রুপাতের

মধ্যেই যথেষ্টভাবে প্রকাশিত হতে পারে না। জীবনের জ্বালার তাপে তার অশ্রু বাষ্পীভূত হয়ে যায়,—পুড়ে ছাই হয়ে যায় জীবনের সমস্ত কোমলতা। তাই তো বাঁশরীর এমন বিশুষ্ক কঠোর মুখরতা, এমন তপ্ত ধারাল আক্রমণ। ট্র্যাজেডির অগ্নিকাণ্ডে পুড়তে পুড়তে সে নিজেই যেন আগুনে পরিণত হয়ে গেছে, জীবন বলতে তার যা কিছু, সব পুড়ে গেছে আগেই।

কিন্তু এইভাবে নিজের ব্যর্থ জীবনের অন্তর্জ্বালাকে প্রকাশ করবার অর্থ কি কিছু আছে? অর্থ কিছুই নেই। সে কথা বাঁশরীও বোঝে। কারণ দুঃখ, বেদনা, অন্তর্জ্বালা প্রভৃতিকে প্রকাশ ক'রে তার ভগ্নদশাপ্রাপ্ত জীবনকে কোনোভাবে গড়ে তুলবার বা পুরাসংঘটিত জীবন-ট্র্যাজেডিকে ফিরিয়ে দেবার কোনো সম্ভাবনা আর নেই। তাই এখন দুঃখ, বেদনা ও অন্তর্জ্বালাকে প্রকাশ করা বাঁশরীর মতো সচেতন চরিত্রের পক্ষে কেবল একটা অসংযমের লজ্জা। এই লজ্জাতেও বাঁশরী ধিক্কার দিয়েছে নিজেকে। ব্যর্থ জীবনের আক্রোশকে সাধারণ মেয়ের মতো এমন অসংযতভাবে প্রকাশ করার লজ্জায় সে ধিক্কার দিয়েছে নিজেকে,—সোমশংকরকে তাই সে বলল, "মনে কোরো না মরব বুক ফেটে। জীবন হবে চিরচিতানলের শ্মশান। কখনও এমন বিচলিত দশা হয়নি আমার। আজ কেন এল বন্যার মতো এই পাগলামি। লজ্জা! লজ্জা! তোমাদের তিনজনের সামনে এই অপমান! থামো সোমশংকর, আমাকে দয়া করতে এসো না। মুছে ফেলব এই অপমান, কোনো চিহ্ন থাকবে না এর কাল। এই আমি বলে গেলুম"—২।২।

বাঁশরী তার ট্র্যাজেডিতে এমনিতেই অত্যধিক পীড়িত। তার উপর এইভাবে নিজেকে তিরস্কৃত ক'রে আত্মশাসন তার ট্র্যাজেডি-জর্জর জীবনের পক্ষে হয়তো মাত্রাতিক্রমকারী। বাঁশরীর ভেঙে পড়ারই কথা। কিন্তু সে ঋজু রেখেছে নিজেকে। এত কঠিন যার ব্যক্তিত্ব, তাকে ধ্বংস করে যে ট্র্যাজেডি, সে ট্র্যাজেডি যে কত গভীর, তা এ থেকেই বোঝা যায়।

শেষের দিকে বাঁশরী তার জীবনের ট্র্যাজেডির এই দুঃখ-যন্ত্রণাকে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে,—যেন সেটা কিছুই নয়। তার এই সব চেষ্টা দেখে আমরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যাই: যার জীবনে এত দুঃখ সে তার দুঃখ নিয়ে নিজেই এমনভাবে ঠাট্টায় মেতে উঠতে পারে, এটা আমরা ভাবতে পারি না। আবার এর মধ্যদিয়েই তার সম্পর্কে আমাদের মধ্যে ট্র্যাজেডির বোধ আরো স্থিতিলাভ করে,—আমরা দেখি সে তার জীবনকে কোনোভাবেই

আর মূল্যবান মনে করছে না। হয় সে তার জীবনের প্রাপ্যকে ষোলআনাই পাবে, নইলে ঠাট্টা ক'রে বঞ্চিত জীবনকে উড়িয়ে দেবে, সমবেদনা ও সহানুভূতির জন্য এই দুইয়ের মাঝামাঝি কোনো পর্যায়ে সে তার জীবনকে রাখবেনা,—কারণ দুঃখ তার কাছে সহনীয়, কিন্তু তাকে দুর্বল ভেবে পাঁচজনে তার প্রতি সমবেদনা বা সহানুভূতি জানাবে,—এটা তাঁর কাছে একেবারেই অসহ্য। তাই সে কিঞ্চিৎ স্থূল মনোভাবাপন্ন ক্ষিতীশকে অকস্মাৎ বিবাহ করতে রাজি হয়ে যায়। ক্ষিতীশের প্রতি বাঁশরীর প্রেম বা ভালোবাসা কিছুই ছিল না, ছিল কিছু কৃপা, আর তার চেয়েও যেটা বেশি ছিল, সেটা কৌতুক। বাঁশরীর প্রসঙ্গেই লীলার একটি উক্তির উল্লেখ করে বলা যায়, "মেয়েরা যাকে গাল দেয় তাকেও বিয়ে করতে পারে, কিন্তু যাকে বিদ্রূপ করে, তাকে নৈব নৈব চ"—১২। কিন্তু তথাপি বাঁশরী যে ক্ষিতীশকে বিবাহ করতে রাজি হয়ে গেল, তার কারণ তার জীবন তার কাছে এখন একটা ঠাট্টার বিষয়,—একটা মেলোড্রামার উপজীব্য মাত্র। ট্র্যাজেডি-পীড়িত জীবনকে এখন সে একটা মেলোড্রামার মধ্যদিয়ে নিঃশেষিত করে দিতে চায়। তাই বাঁশরীর এই বিবাহ-প্রস্তাব সম্পর্কে লীলা যখন বলল, "সবচেয়ে দুঃখ এই যে, যেটা ট্র্যাজেডি সেটাকে দেখাবে প্রহসন", তখন বাঁশরী অক্লেশেই উত্তর দিয়েছে, "ট্র্যাজেডির লজ্জা ঘুচবে ঠাট্টার হাসিতে। অশ্রুপাতের চেয়ে অগৌরব নেই।" বাঁশরীর ট্র্যাজেডির প্রকৃত রূপটাই এখানে প্রকাশিত হয়েছে: জীবনে জয়লাভ করাতেই তার একমাত্র গৌরব, সেই জয়লাভ সে করতে পারেনি, পরন্তু পরাজিত হয়েছে পুরন্দরের কাছে. সুতরাং তার জীবনের সমস্ত গৌরবই ভূলুণ্ঠিত। তার অশ্রুপাত হয়তো তার প্রতি আমাদের সহানুভূতিকে আরো প্রবলভাবে উদ্রিক্ত করতে পারে, কিন্তু তার দৃষ্টিতে অশ্রুপাত তার পরাজিত জীবনের অগৌরবকেই শুধু প্রকাশ করে। তাই তার জীবনের যে ট্র্যাজেডির পরিণতিতে অশ্রুপাত, সেই ট্র্যাজেডিকে সে ঠাট্টার হাসির মধ্যে নিঃশেষিত করে ফেলতে চায়। এতে যে তার জীবনের দুঃখ কমবে, তা নয়, কিন্তু অপরে যে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করার সুযোগ পাবে না, এইটাই তার সবচেয়ে বড়ো লাভ। কারণ, সেইখানেই তার জিষ্ণু জীবনবোধের লজ্জা। তার যা দুঃখ তা থাকবেই তার সঙ্গে। তার জীবনে যে বিরাট ট্র্যাজেডি ঘটেছে, তাকে সে কিছুতেই ভুলতে পারে না। ক্ষিতীশের সঙ্গে বিবাহ তার কাছে কোনো সান্ত্বনাই নয়। যদি ক্ষিতীশের সঙ্গে বিবাহের দ্বারা তার ট্র্যাজেডি-

নিরুদ্ধ জীবনাকাঙ্ক্ষার যন্ত্রণা নির্বাপিত হ'ত, তাহলে এই বিবাহের একটা অর্থ থাকত। কিন্তু তা নয় বলেই এই বিবাহ তার পক্ষে তার ট্র্যাজেডি-পীড়িত জীবনের উপর আরো এক লাঞ্ছনা বলেই আমাদের মনে হয়, এতে তার ট্র্যাজেডির মাত্রা যেন দীর্ঘায়িত হল আরো। তার বান্ধবী লীলাও সেই রকমই ভেবেছে: "যদি তার জ্বালা নিভত শোক করতুম না। জ্বালা সে সঙ্গে করে নিয়েই চলল অন্ধকারের তলায়।"—শেষ দৃঃ। কিন্তু বাঁশরী সেজন্য আর নতুন করে কাতর নয়। সে বলল, "তা হোক, ডার্ক হীট, কালো আগুন, কারো চোখে পড়বে না। আমার জন্য শোক করিসনে, যে আমার সাথী হতে চলল শোচনীয় সে-ই"—শেষ দৃঃ।

এই কালো আগুনই বাঁশরীর ট্র্যাজেডির আগুন, বাইরে থেকে এ আগুনকে দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু এ আগুন যাকে স্পর্শ করেছে তাকে ছারখার করে দেয় সকলের অলক্ষ্যে। বাঁশরীর ট্র্যাজেডির কালো আগুন এইভাবেই এই পর্যন্ত তাকে পুড়িয়ে নিয়ে এসেছে। এর পরেই ঘটল তার সত্যলাভ—নির্মোহ প্রেমের উপলব্ধি—এবং তারই ফলে রবীন্দ্রনাথের হাতে সে পেল ট্র্যাজেডির কালো আগুনের যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ।

সোমশংকর বিবাহে যাবার পূর্বে বাঁশরীর সঙ্গে একটু পরেই এল দেখা করতে, আসলে জানাতে বাঁশরীর প্রতি তার ভালোবাসা। তাদের এই সময়কার সংলাপের অংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।—

সোমশংকর। তোমার কাছ থেকে যা পেয়েছি আর আমি যা দিয়েছি তোমাকে, এ বিবাহে তাকে স্পর্শমাত্র করতে পারবে না, এ তুমি নিশ্চয় জান।

বাঁশরী। তবে বিবাহ করতে যাচ্ছ কেন।

... ...

সোমশংকর। কঠিন ব্রত নিয়েছি, একদিন প্রকাশ হবে, আজ থাক্, দুঃসাধ্য আমার সংকল্প, ক্ষত্রিয়ের যোগ্য। কোনো এক সংকটের দিনে বুঝবে সে ব্রত ভালোবাসার চেয়েও বড়ো। তাকে সম্পন্ন করতেই হবে প্রাণ দিয়েও।

বাঁশরী। আমাকে সঙ্গে নিয়ে সম্পন্ন করতে পারতে না?

সোমশংকর। নিজেকে কখনো তুমি ভুল বোঝাও নি বাঁশি। তুমি নিশ্চিত জান তোমার কাছে আমি দুর্বল। হয়তো একদিন তোমার ভালোবাসা আমাকে টলিয়ে দিত আমার ব্রত থেকে।...

বাঁশরী। সন্ন্যাসী হয়তো ঠিকই বুঝেছেন। তোমার চেয়েও তোমার

ব্রতকে আমি বড়ো করে দেখতে পারতুম না। হয়তো সেইখানেই বাধত সংঘাত। আজ পর্যন্ত তোমার ব্রতের সঙ্গেই আমার শত্রুতা। তবে এই শত্রুর দুর্গে কোন্ সাহসে তুমি এলে।...

... ...

সোমশংকর। তোমাকে বিশ্বাস করি। আমার সত্য কখনোই ভাঙা পড়বে না তোমার হাতে। সংকটের মুখে যাবার পথে আমাকে হেয় করতে পারবে না তুমি।...

বাঁশরী। শংকর তুমি ক্ষত্রিয়ের মতোই ভালোবাসতে পার। শুধু ভাব-দিয়ে নয়, বীর্য দিয়ে। সত্যি করে বলো, আজও কি আমাকে সেদিনের মতোই ততখানি ভালোবাস।

সোমশংকর। ততখানিই।

বাঁশরী। আর কিছুই চাইনে আমি। সুষমাকে নিয়ে পূর্ণহোক তোমার ব্রত, তাকে ঈর্ষা করব না।—শেষ দৃঃ।

তারপর সোমশংকর ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ নিজের হাতে অলংকার পরিয়ে দিল বাঁশরীকে। বাঁশরী বলল, "মনে করেছিলুম আমার সব হারিয়েছে। ফিরে পেয়ে অনেকখানি বেশি করে পেলুম।.... শক্ত আমার প্রাণ। তোমার কাছেও কোনোদিন কেঁদেছি বলে মনে পড়ে না, আজ যদি কাঁদি কিছু মনে কোরো না"—শেষ দৃঃ;—এই কথা বলেই মাথায় হাত-দিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল বাঁশরী। যে কান্না তার ট্র্যাজেডি-পীড়িত জীবনে ছিল নিরুদ্ধ, এইভাবে তার নির্বাধ প্রকাশের মধ্যদিয়ে ট্র্যাজেডির ভার হয়ে গেল লঘু—তার বেদনা হয়ে গেল দূর, যন্ত্রণা হ'ল নির্বাপিত। বিবাহবন্ধন-হীন এক নির্মোহ প্রেমের সত্যতাকে সে এর মধ্যদিয়েই উপলব্ধি করতে পারল,—সঠিক বলে বিবেচিত হ'ল তার কাছে সন্ন্যাসীর তত্ত্বই। তাই সে বলে উঠল "জয় হোক সন্ন্যাসীর।"

এরপরই দেখি সন্ন্যাসী বাঁশরীকে বলছেন, সোমশংকরকে শক্তি দিতে পারে, এমন একটি মেয়েই আছে সংসারে, যদিও সে সুষমা নয়, আবার সেই একটি মেয়েই সোমশংকরের সমস্ত শক্তি হরণ করে নিতেও পারে,—ভয় এখানেই। তখন বাঁশরী বলল, "আজ অভয় দিচ্ছে সে। আপন অন্তরের মধ্যে সে আপনি পেয়েছে দীক্ষা। তার বন্ধন ঘুচেছে, সে আর বাঁধবে না"—শেষ দৃঃ।

যে কারণের জন্য বাঁশরীর ট্র্যাজেডি, এইভাবে সেই কারণটাকেই বাঁশরী দিল উন্মূলিত ক'রে। যে মোহময়-ভালোবাসাকে সে জীবনের একমাত্র সত্য

বলে বিবেচনা করেছিল, এবং যা তার জীবনে সফল হয়ে না ওঠাতেই তার জীবনে ঘটেছিল ট্র্যাজেডি, সেই মোহময় ভালোবাসাতেই যে জীবনের একমাত্র চরিতার্থতা নয়, অনেক দুঃখের সিঁড়ি পেরিয়ে বাঁশরী তা বুঝতে পারল। তাই তার জীবনের শেষতম যে অভিজ্ঞতা তা ট্র্যাজিক নয়, তার মধ্যে কোনো ক্ষতির বেদনা নেই, আছে পূর্ণভাবে কিছু পাওয়ার তৃপ্তি। রবীন্দ্রনাথ এখানে যেন এটাই প্রমাণ করেছেন যে, দুঃখের পথ পরিক্রমা করেই পূর্ণকে পাওয়া যায়। তাই ট্র্যাজেডিতে জীবনের শেষ নয়, পূর্ণতার আনন্দেই জীবনের শেষ—ট্র্যাজেডি আমাদের জীবনে যেন সেই পূর্ণতার সন্ধান দেয়।

"না চাহিলে যারে পাওয়া যায়
তেয়াগিলে আসে হাতে,
দিবসে সে-ধন হারায়েছি আমি
পেয়েছি আঁধার রাতে।......"

এই গানটির মধ্যদিয়েই যেন আভাসিত হয়েছে এই নাটকে বাঁশরী ট্র্যাজেডির তাৎপর্য—সুখের দিনে সত্যকে পাই না, কিন্তু দুঃখের দিনে সত্যকে পেয়ে যাই,—দখল করবার চেষ্টায় প্রাপনীয়কে পাই না, ত্যাগ করতে চাইলেই পাই। 'প্রায়শ্চিত্ত' বা 'পরিত্রাণ' নাটকেও রবীন্দ্রনাথ জীবনের ট্র্যাজেডিকে এইভাবে এক নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছেন।

কিন্তু আবার সেইজন্যই 'প্রায়শ্চিত্ত' বা 'পরিত্রাণ' নাটকের মতোই, এই নাটকেও অনিবার্য শিল্পপরিণতি বিঘ্নিত হয়েছে! ট্র্যাজেডি এবং সান্ত্বনাবিহীন ট্র্যাজেডিই এই নাটকের অনিবার্য শিল্প পরিণতি ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশিষ্ট বক্তব্যকে উপস্থাপিত করার জন্য বাঁশরীর মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির জ্বালাকে প্রশমিত করেছেন। তিনি শেষ পর্যন্ত বাঁশরী-সোমশংকরের মধ্যে একটা মিলন ঘটিয়ে দিয়েছেন। "কিন্তু এইটুকু মিল না করিলেই বোধ করি ভালো ছিল। ওই টুকুতে বাঁশরীর মহিমা যেন ক্ষুণ্ণ হইয়াছে; আগ্নেয়গিরির উচ্চ-চূড়ায় বেদনার তাপে দেদীপ্যমান তাহার মূর্তি সান্ত্বনার ক্ষণিক মেঘে কিয়ৎ পরিমাণে যেন পরিম্লান হইয়াছে; এই কৃপাটুকু কবি তাহার উপরে না করিলে কল্পনার জগতে তাহার স্থান উজ্জ্বলতর হইত; বেদনার রসই ইহার প্রকৃত রস, কারণ মূলতঃ ইহা ট্র্যাজেডি।"[১৯]

নির্বিকল্প বিষাদান্ত নাটকের বা কাহিনীর প্রতি প্রাচীন ভারতীয় কবিদের যে, অনীহা, এ-সব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ হয়তো সেই ঐতিহ্যেরই পরিচয় দিয়েছেন।

১৯. অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী: রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ: পূর্ণাঙ্গ সং, (১৯৬৬,) পৃ. ৫৩৪।

রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা : নাট্যকাব্যে

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য সমূহের মধ্যে 'গান্ধারীর আবেদন', 'সতী', 'নরকবাস' এবং 'কর্ণ কুন্তী সংবাদ'-এ ট্র্যাজেডি-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা পূর্বেই মনে রাখা দরকার। নাটকের মূল রহস্য এই যে, নাট্যকারকে একই সময়ে নাটকের পাত্রপাত্রীর গভীরতার মধ্যে তলিয়ে যেতে হবে আবার সেই সঙ্গে সমস্ত ঘটনাটিকে অনিবার্য পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ একই সময়ে নাটকের এই দুই গতিকে —গভীরতামুখী এবং পরিণতিমুখী—কার্যকরী করে তুলতে পারেন নি। তাঁর প্রতিভার স্বাভাবিক প্রবণতা অন্তর্মুখী, পাত্রপাত্রীর মনের গভীরতাকে প্রকাশ করতেই তিনি অধিকতর স্বচ্ছন্দ। নাটকের পরিণতির দিকে সক্রিয় সচলতার প্রতি তিনি বিশেষ যত্ন নেননি। এইজন্যই আবার নাট্যকাব্যে রবীন্দ্রনাথের সুবিধা হয়েছিল বেশি। কারণ নাট্যকাব্যে পরিণতির অনিবার্য আহ্বান নেই, কেবল পাত্রপাত্রীর মানসিক গভীরতার বিশ্লেষণের সুযোগ আছে। সুতরাং পাত্রপাত্রীর চরিত্রের গভীরতা সৃষ্টির প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে স্বাভাবিক প্রবণতা ও নৈপুণ্য, নাট্যকাব্যে তা নির্বাধ প্রকাশ লাভ করেছে। নাট্য-কাব্যগুলির ট্র্যাজেডির রসাস্বাদ নেওয়ার সময় আমাদের এই কথা মনে রাখা দরকার,—নাটকের ট্র্যাজেডি আর নাট্যকাব্যের ট্র্যাজেডির প্রকাশ বা উপস্থাপনা-রীতিতে পার্থক্য থাকবেই।

"গান্ধারীর আবেদনে" (১৮৯৭) আমরা দেখতে পাই, অধর্মের মাধ্যমে পাণ্ডবপক্ষকে পরাজিত করে কৌরবপক্ষ বিজয়ী। বিজয়ের উল্লাসে উল্লসিত এবং মদমত্ত দুর্যোধন। পিতা ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের অন্যায় জয়লাভ সম্পর্কে সচেতন থেকেও অন্ধ পুত্রস্নেহের জন্য তিনি দুর্যোধনের এই বিজয়ে আনন্দিত না হয়ে পারছেন না। অন্যায় জয়লাভে মনে মনে তিনি লজ্জিত, দুর্যোধনের আত্মশ্লাঘাকে তিরস্কৃত করে তিনি বলেছেন,—

> "জিনিয়া কপটদ্যূতে তারে কোস্ জয় ?
> লজ্জাহীন অহংকারী !"

কিন্তু তিনি জানেন যে, দুর্যোধনকে এইভাবে পাপের পথে প্ররোচিত তিনিই করেছেন। তাই দুর্যোধনকে তিরস্কার করেও মনে মনে ভাবছেন,—

মণিলোভে কালসর্প করিলি কামনা,
দিনু তোরে নিজহস্তে ধরি তার ফণা।
অন্ধ আমি।—অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে
চিরদিন, তোরে লয়ে প্রলয় তিমিরে
চলিয়াছি ; বন্ধুগণ হাহাকার রবে
করিছে নিষেধ ; নিশাচর গৃধ্র সবে
করিতেছে অশুভ চীৎকার ; পদে পদে
সংকীর্ণ হতেছে পথ ; আসন্ন বিপদে
কণ্টকিত কলেবর ; তবু দৃঢ় করে
ভয়ংকর স্নেহে বক্ষে বাঁধি লয়ে তোরে
বায়ুবলে অন্ধবেগে বিনাশের গ্রাসে
ছুটিয়া চলেছি মূঢ় মত্ত অট্টহাসে
উল্কার আলোকে। শুধু তুমি আর আমি,"

সুতরাং আজ দুর্যোধনের অন্যায় জয়লাভ সম্পর্কে তাকে তিরস্কার করে কোনো লাভ নেই, বরং মেনে নিতেই হচ্ছে দুর্যোধনের এই অন্যায় জয়লাভের বীভৎস আনন্দ। কিন্তু এই আনন্দকে মেনে নিতে গিয়ে পীড়িত হচ্ছে ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায়বোধ—মনের অভ্যন্তরে নির্যাতিত হচ্ছে তাঁর ধর্মবুদ্ধি। সুতরাং তাঁর এই আনন্দ ট্র্যাজিক,—অন্ধ পুত্রস্নেহের পরিণামী এই যন্ত্রণামিশ্রিত আনন্দ তাঁর কাছে একটা ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডির বেদনাই প্রকাশিত হয়েছে যখন ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের জয়লাভে আনন্দ প্রকাশ করেছেন,—

"ওরে, তোরা জয়বাদ্য বাজা।
জয়ধ্বজা তোল্ শূন্যে। আজি জয়োৎসবে
ন্যায়ধর্ম, বন্ধু ভ্রাতা কেহ নাহি রবে ;
না রবে বিদুর ভীষ্ম, না রবে সঞ্জয়,
নাহি রবে লোক নিন্দা লোকলজ্জা-ভয়,
কুরুবংশরাজলক্ষ্মী নাহি রবে আর—
শুধু রবে অন্ধ পিতা, অন্ধপুত্র তার,
আর কালান্তক যম—শুধু পিতৃস্নেহ
আর বিধাতার শাপ, আর নহে কেহ।"

ধৃতরাষ্ট্রের এই ট্র্যাজিক আনন্দ তাঁর নিজকৃত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত।

অপরিণামদর্শী অন্ধ পুত্রস্নেহই তাঁর জীবনে নিয়ে এসেছে এই ট্র্যাজেডি,—এর বৈচিত্র্য হচ্ছে এই যে, যেখানে তাঁর পরম বেদনা, সেখানেই তাঁকে প্রকাশ করতে হচ্ছে চরম উল্লাস, এর থেকে বড়ো শাস্তি আর তাঁর পক্ষে কিছু হতে পারে না,—এই শাস্তিই তাঁর ট্র্যাজেডি।

কিন্তু গান্ধারীর সমস্যা ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁর পুত্রস্নেহ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র-স্নেহের চেয়েও গভীর। কারণ তিনি মাতা। কিন্তু তাঁর পুত্রস্নেহ অন্ধ নয়। তাই পুত্রস্নেহের বশবর্তী হয়ে তিনি ধর্মবুদ্ধিকে বিসর্জন দিতে পারেন না, বরং ধর্মবুদ্ধিকে রক্ষা করার জন্য তিনি পুত্রকে বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। সেই কথাই তিনি বলেছেন পুত্রের জয়লাভের আনন্দ-উল্লসিত ধৃতরাষ্ট্রকে,—

"মহীপতি! পুত্রে তব ত্যজ এইবার—
নিষ্পাপেরে দুঃখ দিয়ে নিজে পূর্ণ সুখ
লইয়ো না। ন্যায়ধর্মে কোরোনা বিমুখ
পৌরব প্রাসাদ হতে—দুঃখ সুদুঃসহ
আজ হতে। ধর্মরাজ, লহো তুলি লহো,
দেহো তুলি মোর শিরে।"

তিনি জানেন, এইভাবে ধর্মরক্ষা করতে যাওয়ার দুঃখ অনেক, কিন্তু সেই দুঃখও তাঁর পক্ষে সহনীয়, কিন্তু অন্যায়ের আনন্দ তাঁর পক্ষে সহনীয় নয়। যে সন্তানকে জননী গর্ভে ধারণ করেছেন, যাকে স্নেহ দিয়ে, স্তন্য দিয়ে, মাধুর্য দিয়ে আশীর্বাদ দিয়ে জননী বড়ো করে তুলেছেন, ধর্মরক্ষার জন্য সেই সন্তানকে পরিত্যাগ করতে যাওয়ার বেদনা জননীর পক্ষে মোটেই কম নয়, কিন্তু আদর্শের জন্য সেই মাতৃত্বকে অস্বীকার করতে হচ্ছে জননীর,—যন্ত্রণা এখানেই। গান্ধারীর এই যন্ত্রণাকে যদি ট্র্যাজিক বলি, তবে দেখব যে, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর ট্র্যাজেডি পরস্পর বিপরীত ধরনের। ধৃতরাষ্ট্রের ট্র্যাজেডি অধর্মকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য, আর গান্ধারীর ট্র্যাজেডি ধর্মকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে স্নেহের জন্য নির্যাতিত হয়েছে ধর্ম, আর গান্ধারীর কাছে ধর্মের জন্য নির্যাতিত হচ্ছে স্নেহ। কিন্তু তবু তুলনায় ধৃতরাষ্ট্রের ট্র্যাজেডির দাহ বেশী বলেই মনে হয়। তুষের আগুনের মতো তাঁর ট্র্যাজেডি তাঁকে দগ্ধ করেছে। গান্ধারীর ট্র্যাজেডি প্রশান্ত। আগুন যদি তাতে থাকে, তবে তাতে দাহ নেই, কেবল আলো আছে, এবং সেই আলো তাঁকে দীপ্তিময়ী করেছে,

ধৃতরাষ্ট্রের মতো দগ্ধ করেনি। এবং দগ্ধ করেনি বলেই গান্ধারীর এই ট্র্যাজেডিকে সম্পূর্ণ ট্র্যাজেডি বলে মনে না হতেও পারে।[২০]

কিন্তু এই তুলনার দ্বারা একথা কখনোই বোঝা যায় না যে, গান্ধারীর ট্র্যাজেডিকে বরণ করা গান্ধারীর পক্ষে খুব সহজ হয়েছিল। বরং প্রকৃতপক্ষে অধিকতর কঠিন হয়েছিল। তাঁর পুত্রস্নেহই ছিল তাঁর কঠিন ব্রতরক্ষার প্রধান অন্তরায়। কিন্তু ধর্ম ও অধর্মের বিচার বড় কঠিন। মহাকালের হাতে সেই বিচারের ভার। এই বিচারের সময় ব্যক্তিগত কামনা বাসনা, স্নেহ-অনুরাগের কোনো স্থান নেই। জননীর চিত্তে তো তা আছে অক্ষয়, অব্যয় এবং অপরিবর্তনীয় রূপে। তাই ধর্ম ও অধর্মের এই কঠিন বিচারের সময় স্নেহ-দুর্বল জননী গান্ধারী মহাকালের কাছেই শক্তি চেয়ে নিচ্ছেন, যাতে সম্ভব হয় তাঁর পক্ষে এই মহা বিচারকে রক্ষা করা—

"যেদিন সুদীর্ঘ রাত্রি 'পরে
সদ্য জেগে ওঠে কাল সংশোধন করে
আপনারে, সেদিন দারুণ দুঃখদিন।
দুঃসহ উত্তাপে যথা স্থির গতিহীন
ঘুমাইয়া পড়ে বায়ু—জাগে ঝঞ্ঝাঝড়ে
অকস্মাৎ, আপনার জড়ত্বের 'পরে
করে আক্রমণ, অন্ধ বৃশ্চিকের মতো
ভীমপুচ্ছে আত্মশিরে হানে অবিরত
দীপ্ত বজ্রশূল, সেই মতো কাল যবে
জাগে, তারে সভয়ে অকাল কহে সবে।
লুটাও লুটাও শির, প্রণম, রমণী,
সেই মহাকালে : তার রথচক্রধ্বনি
দূর রুদ্রলোক হতে বজ্র ঘর্ঘরিত

২০. এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের মন্তব্যটি অত্যন্ত সমর্থনযোগ্য : "ধৃতরাষ্ট্র পাঠকের সমবেদনায় সকলের চেয়ে বড় অংশীদার। এমন হইবার কারণ ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রে ট্র্যাজেডির দ্বন্দ্ব-জাত বেদনা আছে, গান্ধারীর চরিত্রে তাহা নাই। রাজমাতার হৃদয়ে পুত্রদের পাপাচারজনিত মাতৃগর্বনাশী গ্লানি আছে, পুত্রত্যাগের দুঃখ আছে, কিন্তু ধর্মত্যাগের মহত্তর দুঃখ নাই। 'অন্তরে বাহিরে অন্ধ' ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রে পুত্রের জন্য ধর্মত্যাগের দুঃখ আছে; ধর্মত্যাগের জন্য গ্লানি আছে, এই দুঃখের বেদনাই তাহার শুভ্র শীর্ষে ট্র্যাজেডির আগ্নেয় কিরীট পরাইয়া দিয়াছে।"—রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, (১৯৬৬), পৃঃ ২১।

ওই শুনা যায়। তোর আর্ত জর্জরিত
হৃদয় পতিয়া রাখ্, তার পথ তলে।
ছিন্ন সিক্ত হৃৎপিণ্ডের রক্ত শতদলে
অঞ্জলি রচিয়া থাক্ জাগিয়া নীরবে
চাহিয়া নিমেষহীন। তারপরে যবে
গগনে উড়িবে ধূলি, কাঁপিবে ধরণী,
সহসা উঠিবে শূন্যে ক্রন্দনের ধ্বনি—
হায় হায় হা রমনী, হায়রে অনাথা,
হায় হায় বীরবধূ, হায় বীর মাতা,
হায় হায় হাহাকার—তখন সুধীরে
ধূলায় পড়িয়া লুটি অবনত শিরে
মুদিয়া নয়ন। তার পরে নমো নম
সুনিশ্চিত পরিণাম, নির্বাক নির্মম
দারুণ করুণ শান্তি; নমো নমো নম
কল্যাণ কঠোর কান্ত, ক্ষমা স্নিগ্ধতম।
নমো নমো বিদ্বেষের ভীষণা নির্বৃতি।
শ্মশানের ভস্মমাখা পরমা নিষ্কৃতি।"

নিজ ধর্মবোধকে রক্ষা কর'র জন্য জননীর পুত্রস্নেহ পরিত্যাগের বেদনাকে সাধারণীকৃত তত্ত্বে পরিণত ক'রে তুলে সেখান থেকে শক্তি সঞ্চয় করবার এই যে মর্মান্তিক প্রচেষ্টা, এই প্রচেষ্টাই গান্ধারীর ট্র্যাজেডিকে অনেক গভীর এবং সুন্দর করে তুলেছে।

একই বছরে লিখিত 'সতী' (১৮৯৭) নাট্যকাব্য সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, "এই নাটকটিকে একটি পঞ্চাঙ্ক ট্র্যাজেডির পঞ্চম অঙ্ক বলিয়া মনে করিলে নিতান্ত ভুল হইবে না; পঞ্চমাঙ্কের অনিবার্য পরিণামের প্রায় সকল লক্ষণই ইহার মধ্যে আছে।[২১]

এই নাট্যকাব্যের দ্বন্দ্ব গড়ে উঠেছে সতীত্বের সংজ্ঞা নিয়ে। অমাবাই-এর মতে সতীত্ব প্রেমধর্ম এবং মানবধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত। প্রথাধর্মের বা অনুষ্ঠানের

২১. রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ পৃ. ২৮।

মধ্যে বিধিবদ্ধ ধর্মের কোনো ভূমিকা সেখানে নেই। কিন্তু অমাবাইয়ের পিতা বিনায়ক রাও-এর প্রথমদিকে এবং মাতা রমাবাই-এর আগাগোড়াই মত হচ্ছে সতীত্ব প্রতিষ্ঠিত প্রথাধর্মের উপর, পুরুষানুক্রমে মেনে আসা অনুষ্ঠানবদ্ধ ধর্মের উপর। এই মতপার্থক্যই এখানে সৃষ্টি করেছে নাটকীয় সংঘাত।

কাহিনী অংশে দেখা যায় পিতা বিনায়ক রাও কন্যা অমাবাইয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন জীবাজির সঙ্গে। কিন্তু বিবাহরাত্রে বিবাহের পূর্বেই, বিজাপুর-রাজের জনৈক মুসলমান সভাসদ জীবাজিকে বন্দী করে, অমাবাইকে অপহরণ করে নিয়ে যায় ও তাকে বিবাহ করে। বিনায়ক রাও এবং জীবাজি প্রতিজ্ঞা করেন বিজাপুর রাজসভাসদের এই দস্যুবৃত্তির প্রতিশোধ নিতে। কিন্তু অমাবাই স্বেচ্ছায় তার মুসলমান স্বামীর পত্নীত্ব গ্রহণ করে, এবং প্রেম, ভালোবাসা, মাধুর্য, শুভদৃষ্টি দিয়ে মুসলমান স্বামীর সংসারকে গড়ে তুলতে থাকে, স্বেচ্ছায় গর্ভে ধারণ করে মুসলমান স্বামীর সন্তান। কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ়চিত্ত বিনায়ক রাও এবং জীবাজি শেষ পর্যন্ত হত্যা করেন অমাবাইয়ের মুসলমান স্বামীকে। এবং তার পরেই নাটকের সুরু।

যুদ্ধক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুর পর অমাবাই পিতার কাছে বিদায় চেয়ে নিচ্ছে—,

"অন্যায় সমরে জিনি
স্বহস্তে বধিলে তুমি পতিরে আমার,
হায় পিতা, তবু তুমি পিতা! বিধবার
অশ্রুপাতে পাছে লাগে মহা অভিশাপ
তব শিরে, তাই আমি দুঃসহ সন্তাপ
রুদ্ধ করি রাখিয়াছি এ বক্ষ পঞ্জরে।
....

পিতঃ! প্রণমি চরণে
পদধূলি তুলি শিরে লইব বিদায়।
আজ যদি নাহি পার ক্ষমিতে কন্যায়
আমি তবে ভিক্ষা মাগি বিধাতার ক্ষমা
তোমা লাগি পিতৃদেব।"

পিতা কন্যাকে ভর্ৎসনা করে উত্তর করেন,—

"ওরে দুর্ভাগিনী নারী,
যে বৃক্ষে বাঁধিলি নীড় ধর্ম না বিচারি

"সে তো বজ্রাহত, দগ্ধ, যাবি কার কাছে
ইহকাল-পরকাল হারা ?"

পিতৃহস্তে সর্বস্বরিক্ত অভিমানিনী অমাবাই তখন বলল,—

"হে নির্দয়, আছে মৃত্যু, আছে যমরাজ,
পিতা হতে স্নেহময়, মুক্ত দ্বারে যাঁর
আশ্রয় মাগিয়া কেহ ফিরে নাই আর।"

কিন্তু পিতা কন্যাকে পরামর্শ দেন তীর্থবাসের, যেখানে ক্রমশঃ ক্ষালন হবে কন্যার পাপ। বিধর্মীর সঙ্গে সংসার করায় কন্যার হয়েছে এই পাপ, বিনষ্ট হয়েছে তার সতীত্ব। কিন্তু অমাবাই-এর কাছে এটাই একটা প্রচণ্ড মিথ্যা। ঐই মিথ্যার তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তার ধর্ম লঙ্ঘনের বা সতীত্ব লঙ্ঘনের অপবাদ তার কাছে অসহ্য। তাই পিতাকে ধিক্কার দিয়ে সে বলল,—

"তব ধর্ম কাছে
পতিত হয়েছি, তবু মম ধর্ম আছে
সমুজ্জ্বল। পত্নী আমি, নহি সেবাদাসী।
বরমাল্যে বরেছিনু তাঁরে ভালোবাসি
শ্রদ্ধাভরে ; ধরেছিনু পতির সন্তান
গর্ভে মোর, বলে করি নাই আত্মদান।
....
পূর্ণ ভক্তি ভরে
করেছি পতির পূজা ; হয়েছি যবনী
পবিত্র অন্তরে ; নহি পতিতা রমণী,—
পরিতাপে অপমানে অবনত শিরে
মোর পতিধর্ম হতে নাহি যাব ফিরে
ধর্মান্তরে অপরাধী সম।..."

জননী রমাবাই এসে কন্যার প্রতি প্রকাশ করলেন ঘৃণা। বললেন—

"জানিস কাহারে বলে পতি ! নষ্ট মতি
ভ্রষ্টাচার ! রমণীর সে যে একগতি,
একমাত্র ইষ্টদেব। ম্লেচ্ছ মুসলমান,
ব্রাহ্মণ কন্যার পতি !"

অমাবাই এর জবাবে বলল,—

"মোরে করে ঘৃণা
এমন কে সতী আছে? নহি আমি হীনা
জননী তোমার চেয়ে,—হবে মোর গতি
সতী স্বর্গ লোকে।"

কিন্তু সতীত্ব সম্পর্কে রমাবাঈ সংস্কারাশ্রয়ী। প্রেম নয়, প্রথাই হচ্ছে তাঁর কাছে মাননীয়। সুতরাং অমাবাই-এর সঙ্গে তার মুসলমান স্বামীর যে প্রেমের বা মানবতার সম্পর্ক, তা রমাবাই স্বীকার করেন না। তাঁর মতে এটা একটা ভ্রষ্টাচার; অমাবাই পতিতা, অসতী এবং অমাবাই-এর মুসলমান স্বামী নারীর ধর্ম এবং সতীত্ব অপহরণকারী। তাই এই ভ্রষ্টাচার, সতীত্ব হানি, ধর্ম হানির পাপ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য অমাবাই এর প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার। এবং সে প্রায়শ্চিত্তও অন্য কিছু নয়,—রমাবাই-এর মতে তাঁর কন্যার যে প্রকৃত স্বামী—যুদ্ধে নিহত সেই জীবাজির চিতায় অমাবাই-এর সহমরণ। সেই নিষ্ঠুর প্রস্তাবই করলেন রমাবাই,—

"জীবাজি
বাগ্‌দত্ত পতি তোর। তারি ভস্মে আজি
ভস্ম মিলাইতে হবে। বিবাহ রাত্রির
বিফল হোমাগ্নিশিখা শ্মশানভূমির
ক্ষুধিত চিতাগ্নিরূপে উঠেছে জাগিয়া;
আজি রাত্রে সে রাত্রির অসমাপ্ত ক্রিয়া
হবে সমাপন।"

কন্যার প্রতি জননীর এই নিষ্ঠুর বিধানে পিতা বিনায়ক রাও-এর চিত্ত পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন, সমাজের নামে ধর্মের নামে কী প্রচণ্ড হৃদয়-হীনতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে, আর অস্বীকার করা হয়েছে স্নেহ, প্রেম, ক্ষমা, মমতা প্রভৃতি চিত্তের সুকুমারবৃত্তিকে। তাই ধর্মের নামে সহমরণের এই নিষ্ঠুর বিধানের হাত থেকে কন্যাকে রক্ষায় এগিয়ে এলেন পিতা। বললেন,—

"আয় বৎসে! বৃথা আচার বিচার।
পুত্রলয়ে মোর সাথে আয় মোর মেয়ে
আমার আপন ধন। সমাজের চেয়ে
হৃদয়ের নিত্যধর্ম সত্য চিরদিন।

পিতৃস্নেহ নির্বিচার বিকার বিহীন
দেবতার বৃষ্টি সম,—আমার কন্যারে
সেই শুভ স্নেহ হতে কে বঞ্চিতে পারে—
কোন্ শাস্ত্র, কোন্ লোক, কোন্ সমাজের
মিথ্যা বিধি, তুচ্ছ ভয় ?"

কিন্তু বিনায়ক রাও রক্ষা করতে পারলেন না কন্যাকে। তিনি নিজেই হলেন বন্দী। সৈন্য সেনাপতি সহ রমাবাই বাহুবলে রক্ষা করতে চললেন প্রথাবদ্ধ ধর্মের তথাকথিত মহিমা।

প্রথাধর্মের কাছে নিত্যধর্মের বা মানবধর্মের এই লাঞ্ছনাই এখানে সৃষ্টি করেছে ট্র্যাজেডি। কারণ এখানে পীড়িত হয়েছে আমাদের শাশ্বত ন্যায়-বোধ। যেটা সত্য, যেটা ন্যায়, সেটা যদি প্রতিষ্ঠা না পায়, উপরন্তু যদি লাঞ্ছিত হয়, তবে বিচলিত হয় আমাদের ন্যায়বোধ, আমাদের ঔচিত্যবোধ এবং আমরা বোধ করি ট্র্যাজেডি। শাশ্বতকালের মানবতার আলোকে যেটা উচিত, তারই পক্ষে দাঁড়িয়ে আমরা বোধ করি এই ট্র্যাজেডি,—বিপক্ষে দাঁড়ালে এই ট্র্যাজেডি বোধ করতে পারতাম না। তাই যে শোচনীয় পরিণাম অমাবাই-এর জন্য নির্দিষ্ট হ'ল, তা বিনায়ক রাও-এর নিত্যধর্মের দৃষ্টিতে যেমন অনুচিত, তেমনি রমাবাই-এর প্রথাধর্মের দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণ উচিত। এই জন্যই বিনায়ক রাও-এর কাছে কন্যার এই অনুচিত দুর্ভাগ্য ট্র্যাজেডির বিষয়, কিন্তু রমাবাই-এর কাছে কন্যার উচিত দুর্ভাগ্য ট্র্যাজেডির বিষয় নয়। প্রথাধর্মের সংস্কার থেকে যদি আমরা মুক্ত হতে পারি, তবে অমাবাই-এর এই কথাগুলি আমাদের কাছে অপরিসীম সত্য হয়ে ওঠে, "লোকের মুখের বাক্যে করিয়ো না মাপ,—সত্যেরে প্রত্যক্ষ করো মৃত্যুর আলোকে সতী আমি। ঘৃণা যদি করে মোরে লোকে তবু সতী আমি।"—এবং সেই সত্যের অস্বীকৃতিতে, অবমাননায়, এবং সেই সত্যের উপর বাহুবল, অস্ত্রবলের অত্যাচারে আমরা শোকার্ত হই এবং আতঙ্কিত হই (সহানুভূতিতে জাগে শোক এবং সত্যের পরাভবে জাগে আতঙ্ক) এবং আমাদের চিত্তে জেগে ওঠে ট্র্যাজেডির অনুভূতি।

এই নাট্যকাব্যটির সঙ্গে 'গান্ধারীর আবেদন'-এর চরিত্রগুলির মিল লক্ষ্য করা যায়। বিনায়ক রাও যেন ধৃতরাষ্ট্রের অনুরূপ। ধৃতরাষ্ট্রের যে ট্র্যাজিক দ্বন্দ্ব তাঁর জীবনকে বিষাদগ্রস্ত করে তুলেছিল, বিনায়ক রাও-এর মধ্যেও সেই ট্র্যাজিক দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করি। বিনায়ক রাও-এর প্রতি আমরা শেষ পর্যন্ত সহানু-

অনুভূতিশীল হই তাঁর ঐ ট্র্যাজিক দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা-কাতরতার জন্য। আর "রমাবাই চরিত্র গান্ধারী চরিত্রের মতোই ক্ল্যাসিকাল শিলাখণ্ড কুঁদিয়া কাটা; তাহার ধর্মাদর্শের সঙ্গে পাঠকের সহানুভূতি না থাকিতে পারে, কিন্তু দুর্নিবার ইচ্ছা-শক্তির প্রভায় মহিমময়ী এই বীর রমণী বিস্ময় উদ্রেক না করিয়া ছাড়ে না; ইহাকে দেখিয়া গ্রীক ট্র্যাজেডির মীডিয়া ও ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রাকে মনে পড়িয়া যায়। এই নাটকে সত্যই যদি কেহ করুণার পাত্র থাকে তবে সে বিনায়ক বা অমাবাই নয়; সে এই নিষ্করুণ জননী।"[২২]

কিন্তু এই নিষ্করুণ জননী করুণার পাত্র হলেও ট্র্যাজিক চরিত্রের প্রতি আমরা যে পরিমাণে সহানুভূতিসম্পন্ন হই, রমাবাই-এর প্রতি তেমন হইনা। অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আমাদের।[২৩] আর সেখানেই ট্র্যাজিক চরিত্র হিসেবে রমাবাইয়ের অসম্পূর্ণতা।

'নরকবাস' নাট্যকাব্যটির ঋত্বিক এবং সোমকের জীবনের পরিণাম ট্র্যাজিক হয়ে উঠেছে। ঋত্বিক রাজা সোমকের রাজপুরোহিত ছিলেন। একমাত্র পুত্রের প্রতি স্নেহবশে রাজা সোমক রাজকার্যের প্রতি অমনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন। ঋত্বিক রাজাকে এই স্নেহ-বশ্যতা থেকে মুক্ত করবার মানসে রাজার শিশুপুত্রকে বলি দেন। ক্ষত্রিয় গৌরবে অন্ধ রাজা সোমক এই নিষ্ঠুর কার্যে বাধা দিলেন না, কারণ ব্রাহ্মণের নির্দেশিত পথে কোনো ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠা ক্ষত্রিয় জনোচিত নয়।

ঋত্বিক এবং সোমক,—জীবৎকালে এঁরা কেউই নিজেদের পাপ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। তাঁরা কখনোই মনে করেন নি, যে, তাঁরা ভয়ানক পাপকে জীবনে প্রশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু মৃত্যুর পরে সেই পাপবোধ তাঁদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। এই পাপবোধ তাঁদের জীবনকে যেভাবে যন্ত্রণায় বিক্ষুব্ধ করেছে, তাতে তাঁদের দু'জনের জীবনেই ট্র্যাজেডির স্পর্শ লেগেছে।

ঋত্বিককে তাঁর পাপের শাস্তিতে নরকবাস করতে হচ্ছে। সোমকের শিশুকে বলি দেওয়া যে তাঁর একটা যথার্থ পাপ—সে সম্পর্কে তিনি এখন সচেতন। কিন্তু তাঁর পাপক্লিষ্ট অন্তরের ট্র্যাজিক যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে প্রেতগণের অনুরোধে সেই নিষ্ঠুর ঘটনার বিবরণ দানের মধ্যে। এই নিষ্ঠুর কার্যে যদি ঋত্বিকের এখনো সমর্থন থাকত, তবে তাঁর এই বিবরণের ভাষা

২২. রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ পৃ. ২৮-২৯।
২৩. রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ পৃ. ৩০।

অন্যপ্রকার হোত, ব্যঞ্জনাও অন্যরূপ হোত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঋত্বিকের এই বিবরণের ভাষা ও ব্যঞ্জনা এমন যে, স্পষ্ট বোঝা যায়, ঐ নিষ্ঠুর কার্যের প্রতি ঋত্বিকের কোনো সমর্থন তো নেই-ই, বরং সেই ঘটনার এই ব্যঙ্গাত্মক বিবরণ-দানের সুযোগে তিনি তাঁর নবোদ্বোধিত মানবিক বিবেক-বুদ্ধির কশাঘাতে তাঁর পূর্বের অমানবিক সত্তাকে নির্মমভাবে জর্জরিত করছেন। এইটাই তাঁর পক্ষে ট্র্যাজিক। যেমন ঋত্বিক বলছেন,—

"যজন সময়ে
কেহ নাই,—কে আনিবে রাজার তনয়ে
অন্তঃপুর হতে বহি? রাজভৃত্য সবে
আজ্ঞা মানিল না কেহ। রহিল নীরবে
মন্ত্রিগণ। দ্বাররক্ষী মুছে চক্ষু জল,
অস্ত্রফেলি চলি গেল যত সৈন্যদল।
আমি ছিন্ন মোহপাশ, সর্বশাস্ত্রজ্ঞানী,
হৃদয়বন্ধন সব মিথ্যা ব'লে মানি,—
প্রবেশিনু অন্তঃপুর মাঝে। মাতৃগণ
শত-শাখা-অন্তরালে ফুলের মতন
রেখেছেন অতিযত্নে বালকেরে ঘেরি
কাতর-উৎকণ্ঠা-ভরে।...........
...............কহিলাম হাসি,—
মুক্তি দিব এ নিবিড় স্নেহবন্ধ নাশি,
...............এতবলি বল করি
মাতৃগণ-অঙ্ক হতে লইলাম হরি
সহাস্য শিশুরে। পায়ে পড়ি দেবীগণ
পথ রুধি আর্তকণ্ঠে করিল ক্রন্দন—
আমি চলে এনু বেগে।"

এখানে দেখা যায় ঋত্বিকের এই নিষ্ঠুর কার্যের বিরোধী প্রসঙ্গগুলির,—যেমন রাজভৃত্যের আজ্ঞা না মানা, মন্ত্রিদের নীরবতা, সৈন্যদের অস্ত্র পরিত্যাগ, এবং সর্বোপরি মাতৃগণের কাতরতা এবং উৎকণ্ঠা প্রভৃতির সশ্রদ্ধ উল্লেখ করছেন তিনি। এবং এর মধ্য দিয়ে শিশুকে সঙ্গে নিয়ে 'বেগে' চলে আসা এখন

তাঁর নিজের দৃষ্টিতেই যেন অত্যন্ত অমানবিক এবং স্থূল। সুতরাং এই বিবরণ থেকেই বোঝা যায় যে, ঋত্বিক এখন ট্র্যাজিক অনুশোচনায় দগ্ধ।

তাছাড়া এই নাট্যকাব্যের শেষের দিকে ধর্ম যখন সোমককে স্বর্গের জন্য ত্বরা করতে বলছেন, তখন ঋত্বিক কাতরভাবে সোমককে বললেন, "যেয়ো না যেয়ো না তুমি চলে মহারাজ।······নূতন বেদনা বাড়ায়ো না বেদনায় তীব্র দুর্বিষহ,"—এখানে "নূতন বেদনা" কথাটি লক্ষণীয়। সোমক তাঁর কাছ থেকে চলে যাওয়ায় তাঁর পক্ষে যদি নূতন বেদনার সৃষ্টি হয়, তবে পুরাতন বেদনা বা প্রথম বেদনা অবশ্যই নিজকৃত শিশুবলির মতো নিষ্ঠুর কার্যের জন্য অনুশোচনা এবং অন্তর্জ্বালা। নিজের ভুলকে তিনি বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু সেই ভুলকে সংশোধন করবার এখন আর কিছু নেই। এখন যা আছে, তা এই অনুশোচনা এবং অন্তর্জ্বালা,—যার কোনো সান্ত্বনামূলক ব্যাখ্যা নেই তাঁর কাছে, এবং সেইজন্যই এটা ট্র্যাজিক।

ঋত্বিকের এই ট্র্যাজিক অনুশোচনা এবং অন্তর্জ্বালা লক্ষ্য ক'রে রাজা সোমকেরও নিজের পাপ সম্পর্কে সচেতনতা জেগে উঠেছে। তাই তিনি স্বর্গে যেতে অস্বীকার কোরে বললেন,—

"মত্ত হয়ে ক্ষাত্র-অহংকারে
নিজকর্তব্যের ত্রুটি করিতে ক্ষালন
নিষ্পাপ শিশুরে মোর করেছি অর্পণ
হুতাশনে, পিতা হয়ে।"

এই গ্লানি সোমকের চিত্তে বৃশ্চিক দংশনের যন্ত্রণা সৃষ্টি করেছে। তিনি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে ব্রাহ্মণের আদেশ মেনেছেন নিজের মানবিক বিবেক-বুদ্ধিকে অস্বীকার ক'রে। তথাকথিত শাস্ত্রীয় বিধির কাছে মানবিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করা এবং সেই সূত্রে নিজের শিশুর মৃত্যুর মতো শোচনীয় মৃত্যুকে সংঘটিত করার যে দারুণ পাপ, তা থেকে সোমক যে অব্যাহতি পেতে পারেন না, এই বোধ তাঁর মনের মধ্যে রয়েছে। তিনি বলছেন,—

"সে পাপ জ্বালায়
জ্বলিয়াছি আমরণ,—এখনো সে তাপ
অন্তরে দিতেছে দাগি নিত্য অভিশাপ।"

দেবতা হয়তো এ পাপকে মার্জনা করতে পারেন, কিন্তু সোমক পারেন না,—কারণ নিজের সেই শিশুকে তিনি ভুলতে পারেন না, শিশুর বিশ্বাসের প্রতি

পিতা হয়ে তাঁর প্রতারণার নিষ্ঠুরতাকে তিনি ভুলতে পারেন না। তাই তিনি বলেন,—

> "দেবতা ভুলিতে পারে এ পাপ আমার,
> আমি কি ভুলিতে পারি সে দৃষ্টি তাহার,
> সে অন্তিম অভিমান? দগ্ধ হব আমি
> নরক-অনল-মাঝে নিত্য দিনযামী,
> তবু বৎস, তোর সেই নিমেষের ব্যথা,
> আচম্বিত বহ্নিদাহে ভীত কাতরতা
> পিতৃমুখ পানে চেয়ে, পরম বিশ্বাস
> চকিতে হইয়া ভঙ্গ মহা নিরাশ্বাস,
> তার নাহি হবে পরিশোধ।"

নরকের আগুনে প্রতিদিন দগ্ধ হলেও সোমকের এই পাপের কোনোদিন পরিশোধ হবে না,—কী গভীর এবং ব্যাপক সোমকের পাপবোধ।

শিশুবলির মতো কঠিন এবং নিষ্ঠুর কার্যের প্রস্তাবনার পূর্বে ঋত্বিক যখন ইতস্ততঃ করছিলেন, তখন সোমক সগর্বে বলেছিলেন, "নাহি হেন সুকঠিন কাজ পারি না করিতে যাহা ক্ষত্রিয় তনয়—কহিলাম স্পর্শি তব পাদপদ্মদ্বয়।" এবং তারপর সেই নিষ্ঠুর প্রস্তাবটি শুনেও রাজা বলেছিলেন,—"তাই হবে প্রভু, ক্ষত্রিয়ের পণ মিথ্যা হইবে না কভু।"

তখন হয়তো সোমকের এই দৃঢ়তার মূলে ছিল তাঁর শাস্ত্রানুগামিতার গৌরব, ব্রাহ্মণকে মেনে চলার প্রথাসিদ্ধতা। কিন্তু এখন তিনি দেখছেন সেই ব্রাহ্মণই ভ্রান্ত—ব্রাহ্মণ পুরোহিত ঋত্বিক নিজেই পাপের অনুশোচনায় দগ্ধ। সুতরাং সোমকের দুঃখ এবং মর্মপীড়া দুর্নিবার হয়ে ওঠার পক্ষে যে একটু সামান্য বাধা ছিল—তা অপসৃত হয়ে গেল, এখন তাঁর কাছে আর কোনো সান্ত্বনাই অবশিষ্ট রইল না, নিজের অন্যায়ের বীভৎসতা দেখে তিনি নিজের শাস্তি নির্দিষ্ট করলেন নরকবাস। নরকবাস তাঁর কাছে উপযুক্ত শাস্তি নয়। কিন্তু তাঁর পাপ এত বড় যে তার উপযুক্ত শাস্তিও তাঁর জানা নেই,—প্রতিদিন নরকের আগুনে দগ্ধ হলেও এর কোনো পরিশোধ হবে না।

সোমকের এই অবস্থাটিই ট্র্যাজিক। পুত্রের হত্যাকে যখন তিনি সমর্থন করেছিলেন, তখন তিনি জেনেছিলেন, যে তিনি ব্রাহ্মণের সঠিক নির্দেশ পালন করছেন। এখন তিনি বুঝলেন যে, তিনি সঠিক নির্দেশ পালন করেন নি,—

অথচ এর আগেই পুত্র হারানো, এবং জীবনের মানবিক মূল্যবোধ হারানো,— দু'দিক থেকেই তাঁর ক্ষতি চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এখন আর কিছুই ফিরে পাওয়া যাবে না। সোযকের জীবনের এই সামগ্রিক ক্ষতিটাই যথেষ্ট ট্র্যাজেডির বিষয়, এবং তাঁর এই অপরিসীম দুঃখভোগ ট্র্যাজিক তো অবশ্যই।

'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' (১৮৯৯) নামক নাট্যকাব্যটিতে কুন্তীর জীবনকে অবলম্বন করে ট্র্যাজেডি গড়ে উঠেছে। এখানে কুন্তীর জীবনে দেখা যায় ট্র্যাজেডির কিছু উপাদান রয়েছে। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের প্রাক্-মুহূর্তে কুন্তী এসেছেন তাঁর কুমারী জীবনের পুত্র কর্ণের কাছে তার মাতৃ পরিচয় দিয়ে তাকে শত্রুপক্ষ থেকে ফিরিয়ে আনতে। কর্ণের জন্ম কুন্তীর কুমারী জীবনের লজ্জা। তাই সে কথা তিনি কোনোদিন প্রকাশ করেন নি। কিন্তু আজ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্-মুহূর্তে কর্ণ ও অর্জুনাদির মধ্যে ভ্রাতৃরক্তপাতের আশংকায় উদ্বেগাকুল মাতৃহৃদয় নিয়ে কুন্তী কুমারী জীবনের মর্মান্তিক লজ্জাকেও প্রকাশ করলেন পুত্র কর্ণের কাছে, যাতে ভ্রাতৃ-রক্তপাত নিবারিত হয়। কিন্তু তিনি সফল হলেন না। তাঁর গোপন লজ্জা প্রকাশিত হ'ল, অথচ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল না, উপরন্তু ধিকৃত হলেন। ট্র্যাজেডি এখানেই। রবীন্দ্রনাথের রচনায় কুন্তীর জীবনের এই দিককার ট্র্যাজেডি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

কর্ণ যখন জিজ্ঞাসা করলেন কুন্তীকে, "কহো মোরে, জন্ম মোর বাঁধা আছে কী রহস্য ডোরে তোমা-সাথে হে অপরিচিতা।" তখন কুন্তীর সব কথাই প্রকাশ করে ফেলবার মর্মান্তিক মুহূর্ত। পুত্রের কাছে সে কথা প্রকাশ করে ফেলা একটুও সহজ নয়, অথচ সেই কঠিন কাজ আজ তাঁকে করতে হবে। সূর্যালোকে, প্রকাশ্যভাবে এই লজ্জার কথা প্রকাশ করতে স্বাভাবিক সঙ্কোচ তাঁকে বাধা দিল। তিনি চান, তাঁর কথা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে তাঁর লজ্জাকে নিবারণ করে। তিনি কর্ণকে তাই বললেন,—

> "ধৈর্য ধর্
> ওরে বৎস, ক্ষণকাল। দেব দিবাকর
> আগে যাক অস্তাচলে। সন্ধ্যার তিমির
> আসুক নিবিড় হয়ে—কহি তোরে, বীর,
> কুন্তী আমি।"

কর্ণ এইভাবে তাঁর মাতৃ পরিচয় এবং ক্রমশঃ মাতৃস্নেহের পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠলেন। বারবার ক'রে এই কথাটাই তিনি শুনতে চান যে,

কুন্তী তাঁর জননী। কিন্তু এতদিনকার মাতৃস্নেহবঞ্চনার পুঞ্জীভূত অভিমান আজ অকস্মাৎ তাঁর মুখে প্রশ্নের আকারে দেখা দিল: "কেন চিরদিন ভাসাইয়া দিলে মোরে অবজ্ঞার স্রোতে—কেন দিলে নির্বাসন ভ্রাতৃকুল হতে?" কর্ণ জানেন, এ প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। অভিমানের বশে তিনি এই প্রশ্ন করছেন, যদিও তিনি জানেন তাঁর জননী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। তাই তিনি জননীকে বললেন,—

"লজ্জা তব, ভেদকরি অন্ধকার স্তর
পরশ করিছে মোরে সর্বাঙ্গে নীরবে,
মুদিয়া দিতেছে চক্ষু—থাক্ থাক্ তবে।
কহিয়োনা, কেন তুমি ত্যজিলে আমারে।
বিধির প্রথম দান এ বিশ্বসংসারে
মাতৃস্নেহ, কেন সেই দেবতার ধন
আপন সন্তান হ'তে করিলে হরণ,
সে কথার দিয়োনা উত্তর। কহো মোরে
আজি কেন ফিরাইতে আসিয়াছ ক্রোড়ে।"

জননীর গোপন লজ্জা পুত্রের মুখে এমন কঠোরভাবে পরোক্ষে প্রকাশমান হয়ে উঠলে তা জননীর পক্ষে এক নিদারুণ শাস্তি। এই শাস্তি আরো কঠোর হয়ে উঠল কর্ণের শেষ উক্তিতে—"কহো মোরে, আজি কেন ফিরাইতে আসিয়াছ ক্রোড়ে।"—অর্থাৎ কর্ণের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, কেন তুমি জন্ম মুহূর্তে আমাকে অবজ্ঞার স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিলে, সে প্রশ্নের উত্তর দিতে না হয় তোমার অপরিসীম লজ্জার কারণ আছে, তাই সে কথার উত্তর আমি চাইছি না। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে আজ আমাকে ফিরিয়ে নিতে চাও, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে নিশ্চয়ই সেরকম কোনো লজ্জা নেই, তাই সে কথার উত্তর তুমি দাও।

কর্ণের এই ধরনের বক্তব্য নিশ্চয়ই কুন্তীকে অনুশোচনায় দগ্ধ করে তুলেছে,—পুত্রের কাছে জননীর সম্মান তো থাকল না। কুমারী জীবনের অপ্রকাশিত লজ্জার কাহিনী পুত্রের ভাষায় যেন বীভৎস হয়ে উঠল—কোনো কিছুই যেন আর অপ্রকাশিত থাকল না। উপরন্তু মাতা-পুত্রের সুকুমার সম্পর্ককে ছিন্ন ক'রে বিচারকের নির্মম ঔদাসীন্য নিয়ে কর্ণ বললেন, আমাকে পরিত্যাগের কারণ না হয় বুঝলাম, কিন্তু ফিরিয়ে নিতে চাইবার কারণ কি? কর্ণের এই প্রশ্ন কুন্তীর মধ্যে এক সংকীর্ণ উদ্দেশ্যকে যেন খুঁজছে,—কোনো

গূঢ় উদ্দেশ্য চরিতার্থতার মানসেই নাকি কুন্তী কর্ণকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন। সঙ্কীর্ণ-উদ্দেশ্য-অনুসন্ধিৎসু এই প্রশ্নে লাঞ্ছিত হ'ল কুন্তীর মাতৃস্নেহ, তিরস্কৃত হ'ল পুত্রের কাছে জননীর আত্মপরিচয় দানের বেদনাদায়ক মহাকর্তব্য। এখানেই কুন্তীর ট্র্যাজেডি। তাঁর কাছে তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টাই অনাবশ্যক এবং অতিরিক্ত বিবেচিত হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু তথাপি শেষ চেষ্টা হিসেবে তিনি কর্ণের ইঙ্গিত-মুখর প্রশ্নেরও জবাব দিলেন,—

"যবে মুখে তোর
একটি ফুটেনি বাণী, তখন কঠোর
অপরাধ করিয়াছি—বৎস, সেই মুখে
ক্ষমা কর্ কুমাতায়। সেই ক্ষমা বুকে
ভর্ৎসনার চেয়ে তেজে জ্বালুক অনল—
পাপদগ্ধ করে মোরে করুক নির্মল।"

...   .

"তোরে লব বক্ষে তুলি
সে সুখ আশায়, পুত্র, আসি নাই দ্বারে।
ফিরাতে এসেছি তোরে নিজ অধিকারে।
সূতপুত্র নহ তুমি, রাজার সন্তান—
দূরকরি দিয়া, বৎস, সর্ব অপমান
এসো চলি যেথা আছে তব পঞ্চভ্রাতা।"

কুন্তীর এই কাতর আহ্বানও ব্যর্থ হ'ল কর্ণের শুধু অভিমানের কাছে নয়, কর্ণের ভদ্রতা, এবং ধর্মবোধের কাছেও। কর্ণ বললেন,—

"একদিন যে সম্পদে করেছ বঞ্চিত
সে আর ফিরায়ে দেওয়া তব সাধ্যাতীত।
মাতা মোর, ভ্রাতা মোর, মোর রাজকুল
এক মুহূর্তেই মাতঃ, করেছ নির্মূল
মোর জন্মক্ষণে। সূতজননীরে ছলি
আজ যদি রাজজননীরে মাতা বলি,
কুরুপতি কাছে বদ্ধ আছি যে বন্ধনে
ছিন্ন করে ধাই যদি রাজ সিংহাসনে,—
তবে ধিক্ মোরে।"

এখানেই কুন্তীর ট্র্যাজেডির চূড়ান্ত। লজ্জার কারণেই হোক, বা যে কোনো কারণেই হোক যে জননী সন্তানকে পরিত্যাগ করতে পেরেছেন, তিনি হারিয়েছেন সঙ্গত কারণেই পুত্রকে ফিরে পাবার দাবি। একথা কুন্তী চূড়ান্তভাবেই বুঝলেন কর্ণের কথায়। একথা চূড়ান্তভাবে বুঝতে পারার যে অপরিসীম দুঃখ, তা-ই কুন্তীর জীবনের ট্র্যাজেডি, এবং ট্র্যাজেডি এখানেই শেষ নয়, কুন্তী দেখলেন তাঁর সন্তানের ভদ্রতা এবং ধর্মবোধও সন্তানকে ফিরে পাবার পথে এক অতি সঙ্গত বাধা। যে সূতজননীকে এতদিন কর্ণ 'মাতা' সম্বোধন ক'রে এসেছেন, তাকে পরিত্যাগ করে রাজজননীকে কোনো কারণেই 'মাতা' সম্বোধন করা কর্ণের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ তাতে কর্ণের সঙ্কীর্ণ—স্বার্থপরতার পরিচয় দেওয়া হবে। উপরন্তু হবে অভদ্রতা। আবার যুদ্ধে কৌরব পক্ষকে সহায়তা করার জন্য কর্ণ কুরুপতির কাছে অঙ্গীকৃত। আজ মাতার সন্ধান পেয়ে এবং মাতার ইচ্ছানুসারে তিনি যদি পক্ষ পরিবর্তন ক'রে তাঁর পাণ্ডব ভ্রাতাদের অন্যতম হয়ে ওঠেন, তবে তাও হবে অধর্ম। সুতরাং ভদ্রতা রক্ষা এবং ধর্মরক্ষার জন্যও তিনি কুন্তীর আহ্বানে সাড়া দিতে পারছেন না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হবেই। আর এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধই হচ্ছে কুন্তীর কাছে সবচেয়ে বড়ো আতঙ্ক। তাই কুন্তী বুঝলেন, পুত্রের অভিমান এবং পুত্রের ধর্ম পুত্রকে তাঁর কাছ থেকে চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন করেছে। পুত্রের অভিমানকে দূর করার জন্য জননীর কাছে সান্ত্বনাবাক্য কিংবা ব্যাখ্যা আরো কিছু থাকতে পারে, কিন্তু পুত্রের ধর্মবোধকে দূর করার জন্য জননীর কাছে কোনো বক্তব্যই থাকতে পারে না। তাই কুন্তীকে মেনে নিতেই হ'ল পুত্রের সঙ্গে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ। এই মেনে নেওয়ার যে হৃদয় বিদারক উপলব্ধি, তা-ই কুন্তীর ট্র্যাজেডিকে শেষ সীমায় নিয়ে গেছে। পুত্রের ধর্মবোধ জননীর পক্ষে গর্বের বিষয়,—আনন্দের বিষয়,—আঘাতের বা বেদনার বিষয় নয়। অথচ অদৃষ্টের পরিহাসে কর্ণের ধর্মবোধ আজ কুন্তীর মাতৃহৃদয়ে আঘাতের রূপে এল,—অপরিসীম বেদনার কারণ হয়ে এল। এটাকেই কুন্তী তাঁর স্বকৃত অপরাধের অভিশাপ হিসেবে বিবেচনা করলেন,—বুঝলেন ধর্মের সুকঠোর দণ্ড এইভাবেই তাঁর জীবনে আঘাত করল। কিন্তু এ দণ্ড লঘুই হোক, আর গুরুই হোক, মাতা হিসেবে এতবড় দণ্ডকে বহন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাই ধর্মের দণ্ডকে চিনতে পেরেই আর্তনাদ করে উঠল তাঁর মাতৃচিত্ত,—

…"বীর তুমি, পুত্র মোর,
ধন্য তুমি!—হায় ধর্ম, এ কী সুকঠোর
দণ্ড তব! সেইদিন কে জানিত, হায়,
ত্যজিলাম যে শিশুরে ক্ষুদ্র অসহায়
সে কখন বলবীর্য লভি কোথা হতে
ফিরে আসে একদিন অন্ধকার পথে,
আপনার জননীর কোলের সন্তানে
আপন নির্মম হস্তে অস্ত্র আসি হানে!
এ কী অভিশাপ!"

কুন্তীর মাতৃহৃদয়ের এই আর্তনাদেই ফুটে উঠেছে তাঁর সান্ত্বনার অতীত এক মহাদুঃখকে অভিশাপ হিসেবে মেনে নেওয়ার বাধ্যবাধকতার ক্রন্দন, এবং এই ক্রন্দনেই তাঁর ট্র্যাজেডির চূড়ান্ত।

গান্ধারীর ট্র্যাজেডির মূলে নিজের ধর্মবোধ, আর কুন্তীর ট্র্যাজেডির মূলে পুত্রের ধর্মবোধ।

রবীন্দ্রনাথ সবসময়ই চরিত্রের গভীর সমস্যার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কুন্তীর জীবনের ট্র্যাজেডিও তাঁর জীবনের গভীর সমস্যার উপর স্থাপিত। রবীন্দ্রনাথ কুন্তীর জীবনের ট্র্যাজেডির পরিচয় দিতে গিয়ে কুন্তীর জীবনের সেই গভীর সমস্যাকে প্রকাশ করেছেন, এবং আমরাও কুন্তীর জীবনের সেই গভীর সমস্যাকে বুঝতে গিয়েই তাঁর ট্র্যাজেডিকে বুঝতে পারি। অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয়ও খুব সংক্ষেপে কুন্তীর জীবনের এই ট্র্যাজিক সমস্যার একটি পরিচয় দিয়েছেন: "এই কাব্যে কুন্তীই সত্যিকার ট্র্যাজিক চরিত্র, এবং তাহার জীবনের irony-টাও বড় কম নয়। কন্যা বয়স হইতে তাহার সমস্যা—ধর্ম রাখিবে, না পুত্র রাখিবে? ধর্মরক্ষার জন্য কানীন-পুত্রকে জলে ভাসাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু ধর্ম রক্ষা করিয়াও তো মনে কখনো শান্তি পায় নাই। তবে কি যাহাকে সে ধর্ম বলিয়া রক্ষা করিয়াছিল আদৌ তাহা ধর্ম নয়? আবার জীবনের শেষে কন্যাবয়সের সেই সমস্যা ফিরিয়া আসিল। ধর্ম রাখিবে না পুত্র রাখিবে? তখন পুত্রকে ত্যাগ করিয়া তবেই ধর্মরক্ষা চলিত, এখন পুত্রকে আহ্বান করিয়া তবেই ধর্মরক্ষা করা চলে। যে লজ্জা সে বিশ্বের কাছে লুকাইতে চেষ্টা করিয়াছে, নিয়তির পরিহাসে ঘটনাচক্রের নিষ্ঠুর নিষ্পেষে আজ

তাহা নিজমুখে তাহারই কাছে প্রকাশ করিতে হইল, বোধ করি যাহার কাছে প্রকাশ করা সবচেয়ে লজ্জাজনক।"[২৪]

নাট্যকাব্য নাট্যের আকারে শ্রব্যকাব্যই, দৃশ্যকাব্য নয়। তাই দৃশ্যকাব্যে বা নাটকে যে ট্র্যাজেডিকে আমরা ঘটতে দেখি প্রত্যক্ষ, নাট্যকাব্যে সেই ট্র্যাজেডিকে আমরা কল্পনা করে নিই বা মানশ্চক্ষে দেখি মাত্র। এইদিক থেকে নাট্যকাব্যের ট্র্যাজেডি উপন্যাস বা ছোটগল্পের ট্র্যাজেডির মতোই বিবরণ ধর্মী, এবং সেই কারণেই এসব ক্ষেত্রে ট্র্যাজেডি রবীন্দ্রকবি-চিত্তের গভীর মন্ময়তার স্পর্শ লাভ ক'রে অপূর্ব গভীরতা এবং নিবিড় কারুণ্যে মণ্ডিত হয়েছে। দৃশ্য-কাব্যে, যেখানে ঘটনার সংঘটনের উপরে সব কিছু নির্ভর করে, সেখানে এমনটা করা প্রায়ই হয়না। তথাপি রবীন্দ্রনাথের নাটকে, কাব্যময়তার প্রাধান্যের জন্যই নিবিড় কারুণ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

তবে এ কথাও ঠিক, রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে, ছোটগল্পে এবং নাট্যকাব্যে যে-ভাবে নিবিড় কারুণ্যকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেছেন, নাটকে প্রায়ই শেষ পর্যন্ত সেইভাবে স্বতঃস্ফূর্ত নিবিড় কারুণ্যকে রক্ষা করেননি। প্রাচীন ভারতীয় কবিদের আদর্শে অথবা নিজের বিশিষ্ট দার্শনিকতার প্রভাবে তিনি অনেক সময়ই নাটকের ক্ষেত্রে ট্র্যাজেডির কারুণ্যের এক ভিন্নতর অর্থ প্রদান করেছেন। দুঃখ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল "দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতা সূচক ; কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা এসে বাধা দেয়। সে আশঙ্কা না থাকলে দুঃখকে বলতুম সুন্দর। দুঃখে আমাদের স্পষ্ট করে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা, ট্র্যাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে, সেই ভূমৈব সুখম।"[২৫]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে অন্তত: ট্র্যাজেডির ঐ দুঃখকে বলতে চেয়েছেন 'সুন্দর' এবং সেইজন্যই নাটকের ট্র্যাজেডিতে তিনি শেষ পর্যন্ত 'অনিষ্টের আশঙ্কা'কে আর বজায় রাখেন নি। 'অনিষ্টেরআশঙ্কা' বিবর্জিত ট্র্যাজেডির দুঃখ আমাদের কাছে 'ভূমা'র সন্ধান দিয়েছে। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে ট্র্যাজেডির নিবিড় কারুণ্যের এক ভিন্নতর অর্থ প্রদান করেছেন। তাঁর উপন্যাস, ছোটগল্প, নাট্যকাব্যের ট্র্যাজেডির সঙ্গে তাঁর নাটকের ট্র্যাজেডির এখানেই পার্থক্য।

---

২৪. রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ পৃ. ৪৩-৪৪।

২৫. রবীন্দ্রনাথ : সাহিত্যের পথে (১৩৬৫) পৃ. ৯।

রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা: তত্ত্বনাট্যে

সাধারণতঃ ঘটনার মধ্যদিয়ে রূপায়িত একটি জীবন কাহিনীর মধ্য থেকে আমরা মানুষের জীবনের ট্র্যাজেডির রসাস্বাদ গ্রহণ করতে সমর্থ হই। এইজন্য তত্ত্বমূলক রচনায়, যেখানে ঘটনা ও কাহিনী অস্পষ্ট এবং অনুপস্থিত এবং সেই কারণে যেখানে চরিত্রগুলি রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষ হয়ে উঠতে পারে না, সেখানে ট্র্যাজেডির রসাস্বাদ গ্রহণ করাও কঠিন হয়ে পড়ে। অবশ্য কোনো কোনো রচনায় তত্ত্বের রূপায়ন এত জীবন্ত চরিত্র এবং তাদের কাহিনীর মাধ্যমে নিষ্পন্ন হয় যে তত্ত্বের কথা মনে না রেখেও আমরা কেবল প্রত্যক্ষ কাহিনীটিরই সৌন্দর্যে ও রসাবেদনে মুগ্ধ হয়ে যাই। ফাউস্ট কাব্যের তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু সেই বিতর্কমূলক তত্ত্বের প্রসঙ্গকে বিস্মৃত হয়েও আমরা ফাউস্ট, মেফিস্টোফিলিস এবং গ্রেশেনের প্রতি আকৃষ্ট হই। এদের অবলম্বন কোরে ফাউস্ট কাব্যের তত্ত্ব একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্পরূপ লাভ করেছে। শিল্পের সৌন্দর্য তত্ত্বটিকে ভুলিয়ে দেয় এবং আমরা ফাউস্ট কাব্যের চরিত্র ও কাহিনীর মধ্য থেকে যথেষ্ট মানবিক রসের সন্ধান পাই। বঙ্কিম-চন্দ্রের 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী' এবং 'সীতারাম'ও তত্ত্বমূলক রচনা; 'গীতা'র একটি তত্ত্বের শিল্পরূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে এই উপন্যাসগুলিতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সব উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্র যথেষ্ট আকর্ষনীয়, কাহিনী অস্পষ্ট এবং চরিত্রগুলি একেবারে ছায়াময় নয়। আনন্দমঠকে যদিও এ ব্যাপারে ত্রুটিপূর্ণ বলা চলে, কিন্তু সীতারামের সাফল্য অপরিসীম। তত্ত্বের কথা ভুলে গিয়েও সীতারাম উপন্যাসের মানবিক রসে আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই। যেখানে এই মানবিক রসের অভাব ঘটে, সেখানে ট্র্যাজেডির-বোধ জাগতে পারেনা কারণ মানবিক রসের মধ্যেই ট্র্যাজেডির অবস্থান।

রবীন্দ্রনাথের রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটকে, যেগুলিকে সাধারণভাবে তত্ত্বনাট্য নামে অভিহিত করা হয়, সেগুলির অনেক ক্ষেত্রেই তত্ত্ব ঘটনাভিত্তিক একটি স্পষ্ট কাহিনী এবং জীবন্ত চরিত্র অবলম্বন ক'রে শিল্পরূপ লাভ করতে পারেনি; তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত স্পষ্টতঃ এবং দৃশ্যতঃ একটি তত্ত্বই থেকে গেছে। মানুষের জীবন কাহিনীর মধ্যদিয়ে তত্ত্ব রূপায়িত হয়নি। তাই মানবিক রসের আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্যে প্রায় নেই বললেই চলে, এখানে আকর্ষণ তত্ত্বেরই, আর কাব্যময় রচনানৈপুণ্যের। মানবিক রসের এই অভাবে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্যে জীবনের ট্র্যাজেডি গভীর ও ব্যাপক হয়ে উঠতে পারেনি।

যে নাটকে মানুষের জীবনরূপেরই একান্ত অভাব, সেখানে মানুষের জীবনের ট্র্যাজেডি ফুটে উঠতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্যে মানুষের এই জীবনরূপের অভাব সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের একটি মন্তব্য খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, "তত্ত্বনাট্য বা তত্ত্বোপন্যাস যখন শিল্পে পরিণত হয় তখন দেখা যায় যে, কাহিনীর প্রবল বেগে নরনারীর বিচিত্র জীবনরূপে তাহা দেখা দিয়াছে। গঙ্গোত্রীতে যখন বরফ গলে জল আপনি গঙ্গার খাত বাহিয়া চলিয়া আসে। আবার গঙ্গোত্রীতে গিয়া এক কমণ্ডলু জল হাতে বহন করিয়াও আনা সম্ভব। দুইই গঙ্গার জল। কিন্তু দুইয়ে ভেদ আছে। তত্ত্বনাট্য যেখানে সার্থক শিল্প, সেখানে তাহা আপন বেগে বাহিয়া আসে, আর যেখানে শিল্প হইয়া ওঠে নাই, বুঝিতে হইবে তাহা কমণ্ডলুতে বাহিত। তাহার পবিত্রতা ও স্নিগ্ধতা কম নয়—আবার স্বয়ং কবি কর্তৃক আনীত বলিয়া তাহার মূল্যও বেশি হইতে পারে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, তাহা গঙ্গার স্বাভাবিক প্রবাহ নহে।"[২৬]

অধ্যাপক বিশী মহাশয় আরো বলেছেন, "এইসব নাটকে কাহিনীর অংশ অতিশয় ক্ষীণ—তাহার গতিও ক্ষীণ। অনেক স্থলেই তত্ত্বাশ্রয়ী সংলাপ ও সুমধুর সঙ্গীত কাহিনীর অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। সংলাপের অভিব্যক্তি কাহিনীর নয়, কাহিনীর অভিব্যক্তিই সংলাপে। যেখানে কাহিনী ক্ষীণ বা একেবারেই নাই, সেখানে সংলাপও নাটকীয় সংলাপ হয় না, তত্ত্বের ঊর্ণাতন্তু অবলম্বন করিয়া শূন্যে ঝুলিয়া থাকে। ইহাই নাটকগুলি সম্বন্ধে সাধারণ সত্য।"[২৭]

ট্র্যাজেডির রস-সৃষ্টির অন্তরায় এইসব ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্যে রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজিক জীবনচেতনার কোনো পরিচয় আছে কিনা, তা-ই আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা রাজা', 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা' এবং 'রক্তকরবী' নাটককে আলোচনার জন্য গ্রহণ করতে পারি। কারণ এই ক'টি নাটকেই মানুষের জীবনের দুঃখভোগ এবং ভাগ্য বিড়ম্বনার একটা অনুভূতিগ্রাহ্য লৌকিক রূপ আমরা দেখতে পাই।

'রাজা' (১৯১০-১১) নাটকে রাজা অরূপের প্রতীক। ঠাকুরদা এবং

---

২৬. প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ, পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, (১৯৬৬) পৃ. ৪৫৬।

২৭. রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ পৃ. ৪৫৭।

রানী সুরঙ্গমা এই অরূপের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে। কিন্তু রানী সুদর্শনার এই সিদ্ধিলাভ ঘটেনি। এই সিদ্ধি অর্জন করতে তাকে যে কঠিন দুঃখের মধ্যদিয়ে যেতে হয়েছিল, তা এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে। কঠিন দুঃখের আগুনে তার সমস্ত অভিমান ও ভ্রান্তি, মলিনতা ও অহঙ্কার পুড়ে নিঃশেষিত হয়ে যাবার পর তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল রাজার অরূপত্বকে উপলব্ধি করা।

রানী সুদর্শনা রাজাকে লাভ করতে চেয়েছিল রূপের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধন জন খ্যাতি, সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরের সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না;—নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা একথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল,—সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, সকল রূপে, আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়,— এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।"[২৮]

যে গভীর দুঃখের মধ্যদিয়ে সুদর্শনা তার নিজের রাজার পরিচয় লাভ করল, অরূপের মধ্যে প্রকৃত রূপকে উপলব্ধি করতে পারল, সেই গভীর দুঃখভোগই হচ্ছে সুদর্শনার জীবনের ট্র্যাজেডি।[২৯] এই গভীর দুঃখে সে যেমন তার নিজের রাজাকে সত্যরূপে চিনল, তেমনি নিজেকেও জানল স্পষ্টরূপে। রূপজমোহ এবং আত্মম্ভরিতায় তার কাছে সবই হয়ে উঠেছিল ঝাপসা। তাই

---

২৮. ভূমিকা: অরূপরতন।

২৯. 'রাজা'র অভিনয়যোগ্য সংস্করণ 'অরূপরতনে' সুদর্শনার দুঃখভোগের তীব্রতা বেশি।

কিন্তু এটা শুধু উত্তরকূটের সাম্রাজ্যবাদের ট্র্যাজেডি, বা একটা সাম্রাজ্যবাদী জাতির শ্রেণীগত ট্র্যাজেডি। ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডির পরিচয়ও মুক্তধারায় পাই, এবং তার সৌন্দর্যও কম নয়। অভিজিতের ট্র্যাজেডি সেই ট্র্যাজেডি।

রাজা রণজিৎ উত্তরভৈরবের মন্দিরে পূজার আয়োজন করেছেন। তাঁর ধারণা উত্তরভৈরব কেবল তাঁদেরই পুরদেবতা। তাঁরা যে মুক্তধারার জলকে বেঁধে শিবতরাইকে শুকিয়ে মারবার আয়োজন করেছেন. এও যেন উত্তর-ভৈরবের ইচ্ছা এবং অনুগ্রহ। শিবতরাইকে তৃষ্ণার শূলে বিদ্ধ করে উত্তর-ভৈরব তাকে উত্তরকূটের সিংহাসনের তলায় ফেলে দিয়ে যাবেন,—এইটিই উত্তরভৈরবের ভক্ত রাজা রণজিতের ধারণা, এবং সেই উদ্দেশ্যেই উত্তর-ভৈরবের মন্দিরে পূজার আয়োজন। সুতরাং দেবতা উত্তরকূটে ভৃত্যের ভূমিকায় অপমানিত, পূজা সেখানে অর্ঘ্য নয়, বেতন বা উৎকোচ।

ভক্তির নামে ধর্মের নামে উত্তরকূটের এই যে ব্যভিচার, রাজার খুল্লতাত বিশ্বজিৎ সেটা রাজাকে বলে দিয়েছেন। শিবতরাইয়ের জননেতা ধনঞ্জয় বৈরাগীও উত্তরকূটের কৃত্রিম প্রশাসনের অন্তঃসার শূন্যতার কথা রাজার কাছে সাহস করে বলেছেন। কিন্তু অভিজিতের দায়িত্ব আরো বেশি। তিনি নিজের জীবনদিয়ে মুক্তধারার বাঁধ ভেঙ্গে দিলেন। বিশ্বজিৎ আর ধনঞ্জয় করেছেন প্রতিবাদ, আর অভিজিৎ করলেন প্রাণ দিয়ে বিদ্রোহ।

নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে অভিজিৎ যে কেবল মুক্তধারার জলই শিব-তরাইয়ের জন্য—নির্বিশেষ মানুষের জন্য মুক্ত করে দিলেন, তাই নয়, তিনি উত্তরকূটকেও সাম্রাজ্যবাদী মূঢ়তার বন্দীদশা থেকে মুক্ত করলেন—দেবতাকে মুক্ত করলেন ভৃত্যত্ব থেকে, পূজাকে মুক্ত করলেন বেতনের অসম্মান এবং উৎকোচের ঘৃণ্যতা থেকে এবং সমগ্রভাবে উত্তরকূটের মানুষদের মুক্ত করলেন অনাবশ্যক আত্মম্ভরিতা, ঔদ্ধত্য এবং কৃতার্থম্মন্যতা থেকে। এই সামগ্রিক মুক্তিই হচ্ছে অভিজিত কর্তৃক মুক্তধারার বাঁধভাঙ্গা।

নিজের প্রাণদিয়ে অভিজিৎ এই যে উত্তরকূটের সামগ্রিক মুক্তি সাধন করলেন, এরই মধ্যে রয়েছে অভিজিতের জীবনের ট্র্যাজেডি। তিনি উত্তর-কূটের মানুষ, যে উত্তরকূট যন্ত্রশক্তির প্রমত্ততায় সাম্রাজ্যবাদী এবং মানবতা বিরোধী। তিনি যে-উত্তরকূটকে ভালোবাসেন, সেই উত্তরকূটের এই মানবতা-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী প্রমত্ততায় তিনি ব্যথিত এবং মর্মাহত। পীড়ক দেশের মানুষ হিসেবে অভিজিতের আত্মার এই যে লাঞ্ছনা, এইখানেই তাঁর ট্র্যাজেডি।

'মুক্তধারা' নাটকে যে যন্ত্র রয়েছে উত্তরকূটের, সেই যন্ত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করছে, অতএব প্রাণদিয়েই যন্ত্রকে অভিজিৎ ভেঙেছে, যন্ত্রদিয়ে নয়। যন্ত্রদিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে—কেননা যে মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে—তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে। আমার নাটকের অভিজিৎ হ'চ্ছে সেই মারনেওয়ালার ভিতরকার পীড়িত মানুষ। নিজের যন্ত্রের হাত থেকে নিজে মুক্ত হবার জন্যে সে প্রাণ দিয়েছে।......যাকে আঘাত করা হচ্ছে সে সেই আঘাতের দ্বারাই আঘাতের অতীত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু যে-মানুষ আঘাত করছে আত্মার ট্র্যাজেডি তারই—মুক্তির সাধনা তাকেই করতে হবে, যন্ত্রকে প্রাণদিয়ে ভাঙবার ভার তারই হাতে।[৩২] সুতরাং রবীন্দ্রনাথও পীড়ক দেশের মানুষ হিসেবে অভিজিতের যে আত্মগ্লানি, তারই মধ্যে তাঁর ট্র্যাজেডিকে দেখেছেন।

মুক্তধারা নাটকে যন্ত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সাধারণ অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়নি। ধনঞ্জয়ের উক্তিতে তিনি বলেছেন, "যে শক্তি দুরন্ত তাকে বেঁধে ফেলা কি কম কথা? তা সে অন্তরেই হোক, আর বাহিরেই হোক।" মানুষের জীবনধারণের উপকরণ হিসেবেই এই যন্ত্রের আবিষ্কার। কিন্তু এই যন্ত্র যখন মানুষের জীবন-ধারণের সহায়ক না হয়ে জীবন সংহরণের উপকরণ হয়ে ওঠে, তখনই যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্রয়োজন হয়। মানুষের জীবনের প্রতি মমতায় তখন বিদ্রোহী নিজের জীবনকেও বিসর্জন দিতে দ্বিধা করে না। নিজের মূল্যবান জীবনকেই তখন সে মানবতা-বিরোধী যন্ত্রকে ধ্বংস করার যোগ্য অস্ত্র হিসেবে মনে করে।

এই বিচারেই অভিজিৎ নিজের প্রাণদিয়ে মুক্তধারার বাঁধ ভেঙেছেন এবং এর মধ্যে অভিজিতের অপরিসীম মহত্ত্বও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এইভাবে যে তরুণ অভিজিতের উচ্ছল তাজা কবিপ্রাণ বিনষ্ট হ'ল, সেখানেই তো তাঁর মহত্ত্বের মধ্যেও এক মর্মভেদী ট্র্যাজেডির অবস্থান। সঞ্জয়ের সঙ্গে কথোপকথনে অভিজিৎ বলেছেন, "সইতে পারছিনে ওই বীভৎসটাকে যা এই ধরণীর সঙ্গীত রোধ করে দিয়ে আকাশে লোহার দাঁত মেলে অট্টহাস্য করছে। স্বর্গকে ভালো লেগেছে বলেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে দ্বিধা করিনি।" "আমারও বুক কান্নায় ভরে রয়েছে। আমি কঠোরতার অভিমান রাখিনে। চেয়ে

৩২. রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৩৩ (১৩৬০ সংস্করণ)।

দেখো ওই পাখী দেবদারু গাছের চূড়ার ডালটির উপর একলা বসে আছে : ও কি নীড়ে যাবে, না, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দূর প্রবাসের অরণ্যে যাত্রা করবে জানিনে; কিন্তু ও যে এই সূর্যাস্তের আকাশের দিকে চুপ ক'রে চেয়ে বসে আছে সেই চেয়ে থাকার সুরটি আমার হৃদয়ে এসে বাজছে, সুন্দর এই ছবিটি।"—অভিজিতের এই সুন্দর কবিপ্রাণতাই আমাদের কাছে তাঁর মৃত্যুকে করুণ করেছে। যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে এরূপ একটি কবি-প্রাণের অবসান মর্মান্তিকভাবে ট্র্যাজিক। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মহাশয় ঠিকই বলেছেন,—"যে-মানুষ আগাগোড়াই কঠোর সে যদি যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে—তাহা যেন যন্ত্রের বিরুদ্ধে যন্ত্রেরই বিরোধ; তাহাতে মানবিক ট্র্যাজেডি নাই; অভিজিতের আত্মদান ট্র্যাজিক, কারণ তাহা যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রাণের বিদ্রোহ।"[৩৩]

অভিজিতের এই ট্র্যাজেডির সঙ্গেই সংযুক্ত রাজা রণজিতের ট্র্যাজেডি। রণজিৎ অভিজিতকে সমর্থন করতেন না ঠিকই, কিন্তু তাকে ভালোবাসতেন। অভিজিতের বক্তব্য এবং আচরণকে তিনি ঠিক বুঝতে পারেননি বলেই অভিজিতকে তিনি নানাভাবে নির্যাতিত করেছেন। কিন্তু অভিজিতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শত্রুতার নয়, আর সেইজন্যই অভিজিতের মৃত্যু তাঁর পক্ষেও ট্র্যাজিক হয়েছে। তাঁর অভিজিত ছিলেন দেবতার প্রিয়, তাঁকে তিনি রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারলেন না। নিজের সাম্রাজ্যবাদী ও মানবতা-বিরোধী বিমূঢ়তায় তাঁকে এইভাবে হারাতে হ'ল তাঁর প্রাণাধিক অভিজিতকে। এইখানেই তাঁর ট্র্যাজেডি। 'বিসর্জন' নাটকে জয়সিংহের মৃত্যু যেমন রঘুপতির ট্র্যাজেডি, এই নাটকেও তেমনি অভিজিতের আত্মদান রণজিতের পক্ষেও ট্র্যাজেডি হয়ে উঠেছে।

'মুক্তধারা'র রণজিতের ট্র্যাজেডিরই সমধর্মী ট্র্যাজেডি 'রক্তকরবী'র (১৯২৬) রাজার। 'রক্তকরবী' নাটকটিও তত্ত্বনাট্য। কিন্তু এই নাটকের আখ্যানভাগ একটা সুদীর্ঘ ইতিহাসের যেন শেষ দৃশ্য। সমস্ত ঘটনা যেন সেখানে এসে একটা পরিণাম লাভ করেছে। তাই সেখানে এসেছে ঘটনার দ্রুততা। আবার সেই সঙ্গে সমস্ত ঘটনার মধ্য থেকে একটা লৌকিক রসও খুঁজে পাওয়া যায়। ঘটনার অন্তরালে যে তত্ত্বই থাক না কেন, ঘটনার দৃশ্যরূপটিকে লৌকিক জগতের ঘটনা হিসেবে মেনে নিতে খুব বেশি অসুবিধা হয় না। এই অর্থে

৩৩. রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ, পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, (১৯৬৬), পৃ. ৩৮৮।

তত্ত্ব এখানে মোটামুটি একটা আদর্শ শিল্পরূপ লাভ করেছে। এইজন্যই এই নাটকের দৃশ্য ঘটনাবলী থেকে একটা ট্র্যাজেডির অনুভূতি জাগে।

মুক্তধারার রণজিতের ট্র্যাজেডির মতো এই নাটকের মকররাজের ট্র্যাজেডি। মকররাজ স্বর্ণলিপ্সু। তিনি মাটি খুঁড়ে তাল তাল স্বর্ণ সংগ্রহে কেবল ব্যস্ত। যে সব শ্রমিক এই কাজে নিযুক্ত তাদের প্রতি তিনি উদাসীন, —তাদের জীবন-যৌবন মকররাজের এই স্বর্ণগৃধ্নুতায় নির্মমভাবে অপচয়িত। এই কাজ যাতে যথাযথ নির্বাহ হয়, সেই উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন এক মজবুত প্রশাসন, যার শিকার হয়েছেন রাজা নিজে। রাজার এই শোষণ-জীবী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জীবন ও যৌবনের দাবী নিয়ে রঞ্জন এসেছে বিদ্রোহ করতে। সুতরাং রঞ্জনকে রাজা দমন করতে চান। কিন্তু রঞ্জন শক্তিমান, নির্ভীক এবং সমুন্নত, তাই তার প্রতি রাজার মমতাও রয়েছে। সেইজন্যই তিনি রঞ্জনের মৃত্যু ঘটাতে চান নি। রাজার এই দুর্বলতার কথা জানত রাজার প্রশাসনিক সর্দারেরা। তাদেরই ষড়যন্ত্রে রাজা শেষ পর্যন্ত ভুল কোরে রঞ্জনকে হত্যা করলেন। সর্দারেরা রঞ্জনকে ভ্রান্ত পরিচয়ে পরিচিত করেছিল রাজার কাছে।

রাজা যখন সর্দারদের এই ষড়যন্ত্র ও প্রবঞ্চনা বুঝলেন, তখন তাঁর আর কিছুই করার নেই, কেবল নিজের প্রশাসন, নিজের রাজ্যকে ধ্বংস করা ছাড়া। এইখানেই রাজার ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডি রাজাকে রাজার নিজসৃষ্ট পাপের যক্ষপুরী থেকে মুক্তি দিল, যেমন মুক্তি দিয়েছিল অভিজিতের মৃত্যু রণজিৎকে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের বিমূঢ়তা থেকে। অভিজিতের মৃত্যু আর রঞ্জনের মৃত্যুর তাৎপর্য একপ্রকারের, আর রণজিতের ট্র্যাজেডি ও মকররাজের ট্র্যাজেডিও এক প্রকারের।

অভিজিতের মৃত্যুর মধ্যে রয়েছে যেমন অভিজিতের জীবনের ট্র্যাজেডি, তেমান রঞ্জনের মৃত্যুর মধ্যেও আছে রঞ্জনের জীবনের ট্র্যাজেডি। কিন্তু অভিজিতকে মুক্তধারা নাটকে যেমন স্পষ্ট কোরে চেনা যায়, রঞ্জনকে রক্তকরবী নাটকে তেমন স্পষ্ট কোরে চেনা যায় না, তাকে কখনোই কোনো ঘটনার মধ্যে দেখা যায় না। তাই অভিজিতের ট্র্যাজেডির মতো রঞ্জনের ট্র্যাজেডি আমাদের কাছে বিশেষ স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি, বরং রঞ্জনের মৃত্যুতে নন্দিনীর ট্র্যাজেডি আমাদের কাছে অনেক স্পষ্ট।

কিন্তু রঞ্জনের ট্র্যাজেডি এই নাটকে স্পষ্ট না হলেও এর মধ্যদিয়েই

রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি পরিকল্পনার একটি সাধারণ লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত ট্র্যাজেডিতেই দেখা যায় যে ট্র্যাজিক চরিত্রগুলির মধ্যে কোনো একটা প্রবৃত্তির প্রবলতা একসময় ভয়ংকর হয়ে ওঠে। তাদের প্রবৃত্তির আত্যন্তিকতা এতই ভয়ংকর এবং সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে যে তা শেষে তাদেরও গ্রাস করে ফেলে, তাদের ভালোমন্দজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যায়, নিজেরাই নিজেদের প্রবৃত্তির শিকার হয়ে পড়ে। শেক্সপীয়রের লীয়র, ম্যাকবেথ, ওথেলোর মতো রবীন্দ্রনাথের বিক্রম, রঘুপতি, মকররাজ এই ধরনেরই ট্র্যাজিক চরিত্র। শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিতে নায়কেরা তাদের এই আত্মনাশী প্রবৃত্তির আক্রমণ থেকে কিছুতেই অব্যাহতি পায় না, তাদের মৃত্যুবরণ করতেই হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই সবক্ষেত্রে নায়কের মৃত্যুকে পরিণাম হিসেবে স্বীকার ক'রে নেন নি। তাঁর বিবেচনায় মানুষ তার প্রবৃত্তির আত্যন্তিকতার পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে গভীর দুঃখভোগের মধ্যদিয়ে—ট্র্যাজেডির মধ্যদিয়ে। প্রবৃত্তি-তাড়িত চরিত্রের এই ট্র্যাজেডি তাঁর নাটকে প্রায়ই ঘটেছে অন্য একটি সুকুমার চরিত্রের ট্র্যাজিক আত্মদানে। তাই বিক্রমের ট্র্যাজেডি যেমন ঘটেছে কুমার সেন ও সুমিত্রার মৃত্যুতে, রঘুপতির ট্র্যাজেডি যেমন ঘটেছে জয়সিংহের ট্র্যাজিক মৃত্যুতে, রণজিতের ট্র্যাজেডি যেমন অভিজিতের ট্র্যাজিক মৃত্যুতে, তেমনি মকররাজের ট্র্যাজেডি ঘটেছে রঞ্জনের ট্র্যাজিক মৃত্যুতে। সব সময়ই একটা নিষ্পাপ জীবনের ট্র্যাজেডি পাপীর জীবনের ট্র্যাজেডির কারণ হয়েছে এবং পাপের কালিমা থেকে পাপীকে মুক্ত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্যে জীবনের ট্র্যাজেডির লৌকিক রূপটি সর্বত্রই যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে না উঠলেও, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনার বিশিষ্ট লক্ষণটি ঠিকই অব্যাহত আছে, এবং সেইটিই আমাদের লক্ষণীয় এবং অনুধাবনযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা : নৃত্যনাট্যে

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে ট্র্যাজেডির একটি ঘনীভূত রূপ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর আরো অনেক নৃত্যনাট্যেও জীবনের সুগভীর দুঃখ ও বেদনাকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, কিন্তু সেইসব নৃত্যনাট্যে শেষপর্যন্ত জীবনের একটা মিলনান্ত পরিণতির মধ্যদিয়ে দুঃখ ও বেদনার অবসান ঘটিয়েছেন।